পিএইচ. ডি. (কলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

বাংলা ভাষার ‘ইসলামি প্রাইমার’ : বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষার আলোকে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ (১৯৯০ – ২০২০)

গবেষক : ফিরোজ খান

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নং : AOOBE1500318

তত্ত্বাবধায়ক : ড. জয়দীপ ঘোষ

সহযোগী অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

Certified that the Thesis entitled

বাংলা ভাষার 'ইসলামি প্রাইমার' : বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষার আলোকে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ (১৯৯০ - ২০২০) [*Bangla Bhashar 'Islami Primer' : Bidyalay O Madrasa Shikshar Aloke Ekti Tulonamulok Bishleshan (1990 – 2020)*] submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Joydeep Ghosh, Associate Professor, Department of Bengali, Jadavpur University.

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Candidate

Countersigned by the Supervisor ----------

---------- (Firoj Khan)

Dr. Joydeep Ghosh Dated ----------

Associate Professor
Department of Bengali
Jadavpur University
Kolkata – 700032
Dated ----------

প্রস্তাবনা

'বাংলা ভাষার 'ইসলামি প্রাইমার' : বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষার আলোকে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ (১৯৯০ - ২০২০)' শীর্ষক এই গবেষণা সন্দর্ভ পরিকল্পনার পেছনে একটি সামান্য ইতিহাস আছে। মফঃস্বলের মুসলমান পরিবারের সদস্য হওয়ার দরুন শৈশব থেকেই ইসলামি রক্ষণশীলতার নানা পাঠ পরিবার অপেক্ষা সমাজ থেকে অধিকতর পেয়েছি। সেই পাঠ-কে পোক্ত করবার জন্য গ্রামে বছরে একবার করে ধর্মীয় জলসা হতো। আমি তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র, সময়টা ২০০৬। হঠাৎ একদিন পাড়ার এক ধর্মীয় জলসায় শুনলাম কোনো এক ঐতিহাসিক বক্তা বলছেন, মুসলমান ছেলেমেয়েদের অশিক্ষা কুশিক্ষার মূল কারণ হলো তাদের পাঠ্য বইপুস্তক। বিদ্যালয়ে শৈশবে যে সমস্ত বইপত্র পড়ানো হয় সেগুলির মধ্যেই আছে বেয়াদবি ও অমানুষ ব'নে যাওয়ার যাবতীয় আয়োজন। উক্ত বক্তা নিজের মত প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যুক্তি দিলেন – 'অ – এ অজগর আসছে তেড়ে' পড়তে পড়তে শিশু ভয়ে মায়ের কোলে সেঁধিয়ে যাবে; অজগরের ভয়ে সে পড়বে টা কী?' 'আ – এ আমটি আমি খাবো পেড়ে' – পড়তে পড়তে শিশু চুরি করে আম পেড়ে খাওয়ার মতো অসামাজিক বিদ্যা রপ্ত করবে। আবার 'ই – এ ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে' পড়তে পড়তেও শিশু ভয়ের বশবর্তী হয়ে পড়বে। উক্ত বক্তা আরো এককদম এগিয়ে রবীন্দ্রনাথকেও দোষারোপ করতে ছাড়েন না। অতঃপর 'সহজপাঠ' এর পঙক্তি উদ্ধৃত করে বলেন 'ছোট খোকা বলে অ আ / শেখেনি সে কথা কওয়া'। বক্তার স্পষ্ট অভিযোগ খোকা কথা কইতে শিখলো না অথচ অ আ বলে কীভাবে? অর্থাৎ এখানেও মিথ্যা বুজরুকি দিয়ে মন ভোলানো হচ্ছে। সুতরাং এই ধরণের পাঠ্যপুস্তক সমাজে বেয়াদব, ভীতু ও অসৎ নাগরিক জন্ম দেবে বলে তাঁর অভিযোগ। অবিলম্বে এই ধরণের শিশুপাঠ্য বই পরিত্যাগ করে ইসলামি তরিকায় শিশু মানুষ করতে হলে মুসলমানের বর্ণপরিচয় পড়াতে হবে। সৎ, চরিত্রবান, ইমানদার, আদব কায়দা জানা বান্দা গড়ে তুলতে হলে মাদ্রাসার সঠিক জ্ঞান ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। তাই 'ইসলামী বর্ণপরিচয়' পড়ানো উচিত বলে তিনি মনে করেন।

সেদিনকার জলসার এই কথাগুলি আমাকে পীড়িত করেছিল। মেনে নিতে পারিনি কথাগুলি, কেননা আমিও তো বর্ণপরিচয়, শিশুশিক্ষা কিংবা সহজপাঠের মতো প্রাইমার পড়েই বড়ো হয়েছি। কিন্তু বেয়াদব বা অসৎ এরকম তো কিছু হইনি। বাবার সঙ্গে সেইবয়সে তর্কযুদ্ধে নামলেও কোনো উপযুক্ত উত্তর তাঁর থেকে পাইনি। বরং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া বাবা বিশ্বাসীর মন থেকে এর

বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস পাননি। কেননা এখনো পর্যন্ত অসংখ্য গ্রামীণ মুসলমানের এটাই স্থির বিশ্বাস যে, উৎকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষা পাওয়া যায় মাদ্রাসাতেই। মাদ্রাসার 'দ্বীনিয়াত শিক্ষার' হাত ধরেই শিক্ষার্থী নিজে সহ গোটা পরিবারের সকলকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তাই এই দু'দিনের দুনিয়াদারির জ্ঞান বা 'ইল্‌ম' অপেক্ষা 'দ্বীনের শিক্ষা' উৎকৃষ্ট। তখনো আমি দেবীপ্রসাদ পড়িনি, তা সত্ত্বেও একান্তই সংশয়বাদী মন থেকে নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম, যে জ্ঞান ইহজীবনকে সুন্দর করে না, সুখ দেয় না, শুধু নিজের আত্মাকে বেড়ি পরাতেই সদা ব্যস্ত এবং মৃত্যুর পরবর্তী সুখ সমৃদ্ধিকে নিশ্চয়তা দান করে তার অর্থক্রিয়াকারিতা কোথায়? এই প্রশ্ন নিজের মধ্যে ঘুরপাক খেলেও তার কোনো সদুত্তর মেলেনি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাশ করে বাড়ি ফিরে ২০১৫ সালে যখন গৃহশিক্ষকতা শুরু করি তখন ক্লাস ওয়ানের একটি বালকের হাতে 'আমার বই', 'সহজপাঠ' এর সঙ্গে দেখি 'ইসলামী বর্ণপরিচয়'। চমকে উঠি। তবে 'আমার বই', 'সহজ পাঠ' এগুলির উপরেও বিশ্বাস রাখা যাচ্ছে না? জানতে পারি ছেলেটির আব্বা মা তাকে ইস্কুলের বইয়ের সঙ্গে এই বইটিও পড়াতে বলেছেন। কী আছে সেই বইতে যার জন্য বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠ্যসূচিকেও নাকচ করতে পারেন অভিভাবকেরা? এই প্রশ্ন ও কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি নানা রকম ইসলামি পাঠে ভরপুর এই পাঠ্যবই আসলে মগজ মেরামতের তীক্ষ্ণ হাতিয়ার। সেখানে শিশুকে শেখানো হয় – 'অ – অজু করে নামাজ পড় / ঈমান আমাল শক্ত কর। আ – আজান শোনার সাথে সাথে / ধরো জামাত দিনে রাতে। ই – ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা কর / দ্বীন ইসলামের খেদমত কর।' এর সঙ্গে সোচ্চারে ঘোষণা করা হয়েছে – 'ত – তালিম নাও মাদ্রাসাতে / সঠিক জ্ঞান পাবে তাতে' অর্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষা যেন বেঠিক, তাই তাকে পরিত্যাগ করে সঠিক জ্ঞানের জন্য মাদ্রাসাই একমাত্র আশ্রয়। এই সমস্ত বয়ান সেই বছরের মতো আমার রাতের ঘুমে কড়া নেড়েছে বারবার। ২০০৬ সালের সেই জলসা মজলিসের বক্তার কথাগুলিকে পাশাপাশি সাজিয়ে নিয়ে দেখলাম যে, হ্যাঁ তাঁরা মানুষকে সমঝে দিতে পেরেছেন যথেষ্ট। যার দরুন মগজ মেরামতের অভিযান মাদ্রাসার চৌহদ্দি অতিক্রম করে জনপরিসরেও থাবা বসিয়েছে। তাইই হয়তো বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির সমান্তরালে কোনো মুসলমান বালককে হাতে তুলে নিতে হয়েছে 'ইসলামী বর্ণপরিচয়'।

যে মুসলমান জাতিসত্তার দিক থেকে বাঙালি। নৃতাত্ত্বিকভাবে বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতিতে যে মুসলমানের বিকাশ তাঁদের কাছে পৃথক প্রাইমার কেন জরুরী হয়ে পড়লো? কোন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মুহূর্তে পৃথক প্রাইমারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো? এই সমস্ত

প্রশ্নকে সামনে রেখেই বিশ্বভারতীতে এম.ফিল গবেষণায় উনিশ শতকের ইসলামি প্রাইমারের উপর কাজ করলাম। সেই কাজের অতৃপ্তি ও আস্বাদ দুইই আমাকে বিশ-একুশ শতকের ইসলামি বাংলা প্রাইমারের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে টেনে এনেছে। স্বাভাবিকভাবে বর্তমান গবেষণায় আমি বিশ শতকের আটের দশক থেকে যখন আবার নতুন করে ইসলামি প্রাইমারগুলি মাথাচড়া দিয়ে উঠছে সেই সময় থেকে ২০২০ পর্যন্ত রচিত প্রায় ৩৪ টি প্রাইমার ও ফলো-আপ সংগ্রহ করেছি এবং সেগুলির সঙ্গে মূলধারার প্রাইমারগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছি।

বর্তমান গবেষণা কর্মে যেকোনো সমস্যায় সুচিন্তিত পরামর্শ এবং মতামত প্রদান করে এই গবেষণাকর্মকে সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করেছেন আমার তত্ত্বধায়ক অধ্যাপক ড. জয়দীপ ঘোষ মহাশয়। স্নেহ, প্রশ্রয় এবং চিন্তার স্বাধীনতা দান যেকোনো কাজকে কতোখানি ভারমুক্ত ও আনন্দদায়ক করে তোলে তা টের পেয়েছি তাঁর সমৃদ্ধ সাহচর্যে। তিনি আমার আচার্য, তাঁকে নমস্কার জানাই। নমস্কার জানাই আমার বাকি দুই সহতত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা এবং ড. ইন্সিতা হালদার মহাশয়াকে। তাঁদের সতর্ক পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও নির্দেশদান প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে। কৃতজ্ঞতা জানাই অধাপক ড. বরেন্দু মণ্ডল মহাশয়কে যিনি শাসন, তাড়ন, বারণ, ও নতুন নতুন বইপত্রের হদিশ দিয়ে সর্বদা এগিয়ে চলার মন্ত্র শুনিয়েছেন। বিভাগীয় অধ্যাপক ড. আব্দুল কাফি নিরন্তর অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন তা আমার পরম প্রাপ্তি। অধ্যাপক সুচেতনা চট্টোপাধ্যায় কয়েকটি বইয়ের পিডিএফ দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বর্তমান গবেষণাকর্ম সম্পূর্ণ করার জন্য প্রতি নিয়ত তাগাদা দিয়েছেন এবং উৎসাহিত করেছেন অধ্যাপক ড. সুমন ভট্টাচার্য, ড. শ্রীপর্ণা দত্ত। দরকারে অদরকারে প্রয়োজনীয় বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন সুমন দা। ওঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। গবেষক-বন্ধু স্নেহাশিস দাসকর্মকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁকে সবিশেষ ধন্যবাদ জানাই। ‘মাদ্রাসা দর্পণ’ পত্রিকার একটি মূল্যবান সফ্‌টকপি দিয়ে সাহায্য করেছেন ‘পূবের কলম’ পত্রিকার সাংবাদিক একরামুল হক শেখ। ওঁর নিঃস্বার্থ সহযোগিতা বিস্মৃত হওয়ার নয়। অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক অনুপম দাস এবং নির্মল দাস মহাশয় সর্বদা উৎসাহিত করেছেন। ওঁদেরকে ধন্যবাদ।

প্রয়োজনীয় তথ্য ও বইপত্র সংগ্রহ করেছি বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও অন্তর্জাল মাধ্যম থেকে। বিশেষত যে সমস্ত লাইব্রেরি থেকে বিভিন্ন সময়ে তথ্য সংগ্রহ করেছি সেগুলি হলো - জাতীয় গ্রন্থাগার : কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার, জাহান্নগর গ্রামীণ পাঠাগার, পূর্বস্থলী কলেজ লাইব্রেরি ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারকর্মীদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সেকশন এবং পিএইচ.ডি. সেল এর সকল আধিকারিকদের।

বিগত তিন বছর যে মানুষটি চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করেছেন তিনি আমার সহধর্মিণী ফিরোজা, তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার প্রশ্নই ওঠে না। আর দুটি মানুষ যাঁরা সর্বদা এই কাজের অলক্ষ্যে থেকে আল্লাহর কাছে দু'হাত তুলেছেন তাঁদের কাছে আমি চির ঋণী। সর্বোপরি মা; যাঁর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ ছাড়া আজ এই কাজ সম্পূর্ণ হতো না, তিনি আমার সকল সংগ্রামের বন্ধু। এই কর্ম প্রচেষ্টা সবটা তাঁকেই উৎসর্গ করছি।

পরিশেষে জানাই বর্তমান গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহ থেকে তথ্য বিশ্লেষণ প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কার মুক্ত থাকবার চেষ্টা করেছি। প্রাইমারগুলিতে যে ধর্মীয় ভাষ্য পেয়েছি সেগুলিকে অবিকৃত রেখেই তার বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছি, ধর্মীয়ভাবে কোনো সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত করার কোনো অভিপ্রায় আমাদের নেই। প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার পরেও যদি কোনো মুদ্রণ ও বানান প্রমাদ থেকে যায় তার জন্য গবেষক ক্ষমাপ্রার্থী।

ফিরোজ খান

সূচিপত্র

প্রাককথন : i – iv

ভূমিকা : ১ – ১৯

প্রথম অধ্যায় : ২০ – ৭৭

উনিশ শতকের বাঙালির বিভাজিত শিক্ষাপদ্ধতি এবং মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায় : ৭৮ – ১৭৯

বিশ - একুশ শতকের মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইসলামি প্রাইমার

তৃতীয় অধ্যায় : ১৮০ – ২২৫

ধর্ম প্রসঙ্গ ও ইসলামি প্রাইমার

চতুর্থ অধ্যায় : ২২৬ – ৩৬০

আত্ম – অপর সম্পর্ক : প্রচলিত ও ইসলামি বাংলা প্রাইমার

পঞ্চম অধ্যায় : ৩৬১ – ৩৯৮

নীতিশিক্ষা ও ইসলামি প্রাইমার

ষষ্ঠ অধ্যায় : ৩৯৯ – ৪৬৫

স্ত্রী শিক্ষা ও নারী ভাবনায় ইসলামি প্রাইমার

উপসংহার : ৪৬৬ – ৪৭০

গ্রন্থপঞ্জি : ৪৭১ – ৪৯৮

ভূমিকা

অজানাকে জানা, অদেখাকে দেখা, অচেনাকে চেনা, অশ্রুতকে শোনা এবং না-বোঝাকে বোঝার মধ্যে দিয়ে নিখিল মানবের জীবন পথকে সুন্দর, সাবলীল ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলবার নামই হলো শিক্ষা। এই কারণে শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার নানামুখিন উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। তবে দেশে দেশে কালে কালে প্রতিবেশ ভেদে শিক্ষার মৌল লক্ষ্যগুলি অভিন্ন থাকলেও শিক্ষাকে সমাজ, রাষ্ট্র ও প্রচলিত ব্যবস্থা নানা সময়ে নানাভাবে ব্যবহার করেছে। যার জন্য আমরা দেখি ভিন্ন সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের হাতে শিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব লাভ করেছে। আসলে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম শিক্ষাকে নানা সময়ে নানাভাবে কল্পনা করেছে। যে কারণে প্রাচীন ভারতে শিক্ষার আদর্শ একরকম, মধ্যভারতে তার থেকে আলাদা, আধুনিক ভারতে আরেকরকম। আবার ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র কাঠামোয় শিক্ষার আদর্শকে অন্যরকমভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এখানেই সব থেকে বড়ো প্রশ্ন ওঠে, তাহলে শিক্ষা আমাদের গড়ে তোলে নাকি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান বা ক্ষমতাতন্ত্র যথা সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র – এঁরা সচেতনভাবে দায়িত্বের সঙ্গে শিক্ষার কাঠামো গড়ে তোলে?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে আনতোনিও গ্রামশির *On The Intellectuals and On Education* শীর্ষক ছোট্ট পুস্তকটিতে। এই বইতে গ্রামশি 'হেজিমনি' বা 'আধিপত্য' এবং 'ডমিনান্‌স' বা 'প্রাধান্য' বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, শিক্ষার সঙ্গে শাসকের এক নিবিড় ও অনিবার্য সম্পর্কে রয়েছে, যা শাসককে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করে। আর শাসক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকবার জন্যই প্রাথমিক স্কুল থেকে শুরু করে বিদ্যাচর্চার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত পাঠ্যসূচি নির্ধারণ থেকে শুরু করে তার পাঠদান পদ্ধতিটুকুও বাতলে দেন। 'হীরক রাজার দেশে' চলচ্চিত্রে আমরা দেখি রাজ সরকার তাঁর ইচ্ছে মতো উদয়ন পণ্ডিতের পাঠশালা ভেঙে দিয়েছে, আবার কখনোবা মগজ মেরামতের জন্য যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। এই ছবিতেই সত্যজিৎ রায় দেখিয়েছেন 'যত বেশি জানে তত কম মানে', সুতরাং 'জানা' ক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ ও রাষ্ট্র [ক্ষমতার] নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারলে বিপত্তি। তাই রাষ্ট্র তাঁর সুবিধা মতো আখ্যান খাঁড়া করে 'জানার কোনো শেষ নাই / জানার চেষ্টা বৃথা তাই'। এই জায়গা থেকেই কী জানবো? কতটা জানবো? কীভাবে জানবো এবং কোন কোন সময় পরিসরে জানবো তা ঠিক করে দেয় রাষ্ট্র। তাই ক্ষমতা ও রাষ্ট্রের মর্জি মাফিক গড়ে ওঠে পাঠ্যপুস্তক, পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠদান পদ্ধতি। এমনকি বিদ্যালয় ব্যবস্থা।

যাকে আমরা বলি 'বিদ্যালয়' তা এসেছে ইংরেজি 'স্কুল' শব্দ থেকে। 'স্কুল' কথাটি আবার এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে যার অর্থ হলো – 'অবসর'। ছেলেরা অলস হয়ে বসে থেকে যাতে সমাজে একটা সমস্যা সৃষ্টি না করে সেই জন্যই দিনের কিছুটা সময় তাদের পুরে দেওয়া হতো বিদ্যালয়ে। নামে বিদ্যালয় হলেও সেই প্রতিষ্ঠানটি ছিল নিছক শাসনালয়।[১] তাই 'বিদ্যালয়'কে রবীন্দ্রনাথ কারখানার সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন – 'ইস্কুল হলো শিক্ষা দিবার কল এবং মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ।'[২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কালান্তর' গ্রন্থের 'বিবেচনা অবিবেচনা' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন 'প্রাণচঞ্চল', 'লক্ষ্মীছাড়া', 'দুঃসাহসী' ছাত্রদেরকে কব্জা করতেই ইস্কুলের আবির্ভাব। তাঁর মতে – 'পৃথিবীতে যে কোনো শক্তিই মানুষকে সম্পূর্ণরূপে আপনার তাঁবেদার করিতে চায় সে প্রাণের লীলাকেই সবচেয়ে ভয় করে – সেই কারণেই আমাদের সমাজে ঐসকল প্রাণবহুল দুরন্ত ছেলেকে শিশুকাল হইতে নানাপ্রকার শাসনে এমনই ঠাণ্ডা করিতে চায় যাহাতে তাহাদের ভালোমানুষি দেখিলে একেবারে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। মানা, মানা, মানা – শুইতে বসিতে কেবলই তাহাদিগকে মানা মানিয়া চলিতে হইবে। ... এই প্রকার হতবুদ্ধি হতোদ্যম মানুষকে আপন তর্জনিসংকেতে ওঠ্‌বোস করানো সহজ। আমাদের সমাজ সমাজের মানুষগুলাকে লইয়া এই প্রকার একটা প্রকাণ্ড পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে। তারে তারে কেমন করিয়া বাঁধিয়াছে, কী আশ্চর্য তাহার কৌশল। ... বিধাতাকে এমন সম্পূর্ণরূপে হার মানানো, প্রাণীকে এমন কলের পুতুল করিয়া তোলা জগতে আর কোথায় ঘটিয়াছে?'[৩] বিধাতার নিয়মকে লঙ্ঘন করে তন্ত্রের (System) নিয়মের নিগড়ে পুতুলের মতো নির্মিত হয়েছে সুবোধ বালক গোপালেরা। যাঁদের 'ভালোমানুষি দেখিলে একেবারে প্রাণ জুড়িয়ে যায়'। আর তার এই ভালোমানুষি নিজে হাতে গড়ে দিয়েছে 'পাঠশালা'। মিশেল ফুকো তাঁর 'ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ : দ্য বার্থ অফ প্রিজন' গ্রন্থে দেখান সতেরো শতকের খ্রিষ্টীয় বিদ্যালয়গুলি তৈরি হয়েছিল গরীব শিশুদের গোল্লায় যাওয়া থেকে রক্ষা করতে, তাদের ভিখিরা বা গুণ্ডা হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে।[৪] লেখাবাহুল্য এই কাজে সফল হতে গিয়ে বিদ্যালয়গুলিকে যথেষ্ট নির্দয় এবং কঠোর হতে হয়েছে; অন্তত হতে হয় বলেই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও। তাই তিনি ফুকোর 'ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ' প্রকাশের আটত্রিশ বছর আগে ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে 'প্রচলিত দণ্ডনীতি' প্রবন্ধে পাঠশালা ও কারাগারকে একই বর্গে বিচার করে লিখেছেন – 'নির্দয় প্রণালী যে কার্যকরী এই ধারণা বর্বর প্রবৃত্তির স্বভাবসংগত। পাঠশালা থেকে আরম্ভ করে পাগলাগারদ পর্যন্ত এর ক্রিয়া দেখা যায়।'[৫] মিশেল ফুকোও তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে বিদ্যালয় ও কারাগারাকে পাশাপাশি রেখেছেন এবং দুটিকেই নিয়ন্ত্রণ আর নজরদারির প্রতিষ্ঠান হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য স্কুল বাড়িটাও তৈরি হয় সেই নিয়ন্ত্রণকামী আদলে। তার লক্ষ্য

হলো শিশুদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে একটা বিশেষ দিকে পরিচালিত করা বা 'ট্রেইন' করা। পোশাক আশাক থেকে শুরু করে শিষ্টতা-সুশীলতা-সুনীতি এমনকি জ্ঞানেরও একটা মান নির্ধারণ করে দেয় বিদ্যালয়গুলি। তাই বিদ্যালয়ের পরীক্ষা মানে নির্ধারিত জ্ঞান ছাত্রছাত্রীরা কতটা অর্জন করেছে তার বিচার। এক্ষেত্রে নির্ধারিত জ্ঞানের স্বল্পতা যেমন তার ব্যর্থতার সূচক তেমনই তার আধিক্যও ব্যবস্থা লঙ্ঘনের সূচক বলে বিবেচিত হতে পারে। তাই পূর্বেই সত্যজিৎ রায়ের কথা ধার করে বলা হয়েছে 'যত বেশি জানে তত কম মানে'। সুতরাং জানা ক্রিয়াটিও নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রের অনুকূলে। আবার শিষ্টতা-ভদ্রতার প্রমিত মান থেকে বিচ্যুতি ঘটলেও বিদ্যালয়ের চোখে তা দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই ফুকো বলেছেন বিদ্যালয়ের ভেতরেই যেন একটা 'ছোটো আদালত' বসানো আছে।[৬] আমাদের আলোচ্য গবেষণায় বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রেক্ষিত 'শিক্ষা'কে কীভাবে বিচার করা হয়েছে এবং শাসনতান্ত্রিক প্রকৌশল (Technic) হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা মূল্যায়ন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ব্যবস্থার অনুকূল সুশীল বালক নির্মাণে প্রাইমারগুলির গুরুত্ব বিচার করা হয়েছে।

বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা কার্যত দুটিই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলেও এই দুইয়ের মধ্যেই নিহিত আছে ভিন্ন ধারার শিক্ষা আদর্শ। 'মাদ্রাসা' শব্দের মধ্যে আক্ষরিক অর্থে ধর্মের কোনো যোগ না থাকলেও কালে কালে 'মাদ্রাসা' আসলে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবেই নিজেকে রূপান্তরিত করে নিয়েছে। মাদ্রাসার এই রূপ বদলের ইতিবৃত্ত আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে অনেকের আলোচনায় দেখেছি যে, তাঁরা মাদ্রাসাকে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবেই দেখতে চান এবং বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার সমান্তরালে তার সচলতার গৌরব প্রকাশ করেন। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এক ধরণের পক্ষপাতিত্ব ও অর্ধসত্য মানসিকতা আছে। গুটিকয়েক সরকারি মাদ্রাসা বাদে রাজ্য তথা বিশ্বের অধিকাংশ মাদ্রাসাই ধর্মের দ্বারা চালিত। এমনকি সরকারি অনুমোদন ও অনুদানের বাইরে থাকা এই সুবৃহৎ মাদ্রাসা শিক্ষা বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থাকে তার প্রতিস্পর্ধী হিসেবেই দেখে এবং তাকে সমালোচিত করে, তার অবমূল্যায়ন করে, তাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করতে চায়।[৭] এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা পর্যবেক্ষণে করেছি বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা এই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক অবস্থানে বিরাজ করছে – মাদ্রাসা; ধর্ম ও ইসলামি ঐতিহ্য নির্ভর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ব্যতিক্রম আছে, যা বিরলতায় দুর্লক্ষ্য) এবং বিদ্যালয়; ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এই দুই বর্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তাঁদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে কখনোই একটি সুনির্দিষ্ট চিন্তার দ্বারা চালিত হয়নি। শাসকের বা রাষ্ট্র পরিচালকদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দুই শ্রেণির প্রতিষ্ঠানেই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির অদল বদল লক্ষ করা গেছে। এই পাঠক্রম নিয়ন্ত্রণের পেছনে

নিহিত থাকে রাষ্ট্রশক্তির স্বার্থ। এ প্রসঙ্গে গ্রামশি মনে করেন যেকোনো শ্রেণি ক্ষমতা লাভ করতে কোনো না কোনো ভাবে জোর খাটায়, জোর খাটিয়ে সেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। এই যে ক্ষমতা যা জোর বা শক্তিরই দান, গ্রামশি তাকেই বলেন 'প্রধান্য'। কিন্তু এই প্রাধান্যকে যদি যথার্থই প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তবে তার পত্তনের আগেই এবং পত্তনের অব্যবহিত পরেও চালিয়ে যেতে হবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। অর্থাৎ সমগ্র জনসমাজের মধ্যে ঐ শ্রেণির ভাবাদর্শ তথা মূল্যবোধ তথা সামগ্রিক চিন্তাপদ্ধতি সর্বস্তরে প্রোথিত করে দিতে হবে।[৮] আর ভাবাদর্শ তথা মূল্যবোধ এক স্তর থেকে আরেক স্তরে পৌঁছে দেবার সহজ পথ হলো শিক্ষা। শিক্ষার দ্বারাই তৈরি হয় বিশ্বাসের জমি। কিন্তু এই বিশ্বাসের জমি গড়ে তোলবার জন্য প্রয়োজন দীক্ষিতকরণ ও অভিভাবন। ইংরেজিতে যাকে বলে 'Indoctrination' আমরা তার বাংলা তর্জমা করেছি 'দীক্ষিতকরণ' এবং 'Suggestion' এর বাংলা হিসেবে গ্রহণ করেছি 'অভিভাবন' শব্দ দুটিকে।

কোনো মতের অনুগামিতা করা, সেই মতবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা বিশদর্থে সেই বিশ্বাসের নিরিখে জীবন ধারণই হল দীক্ষিতকরণ। অনুরূপভাবে 'অভিভাবন' মনোবিজ্ঞান থেকে এসেছে, যার সরল অর্থ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মনে নির্দিষ্ট ধারণা অনুপ্রবিষ্ট করানো। অভিভাবন মানুষের শিক্ষা, মত, আচার, রুচি এককথায় সামগ্রিক ধ্যান ধারণাকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ দীক্ষিতকরণ হলো কোনো মত বা তত্ত্বে বিশ্বাস, অভিভাবন সেই বিশ্বাসে প্রভাবিত হয়ে কাজ করা। দীক্ষিতকরণ > অভিভাবন দুটিই টিকে থাকার ও ক্ষমতাতন্ত্রের পথকে প্রশস্ত করবার রসদ যোগায়। সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন জনসমষ্টি অভিভাবিত হতে পারে দুইভাবে –

ক. সামূহিক অভিভাবন

খ. ব্যক্তিগত বা স্ব-অভিভাবন।

হিটলারের বক্তৃতায় জার্মানের বৃহদংশের মানুষ অভিভাবিত হয়েছিল, যে ইহুদিরা প্রকৃতই জাতীয় নিরাপত্তার বাধা। আবার স্বাভিভাবনের দৃষ্টান্ত হলো আমরা কঠিন কাজে প্রথমে ভয় পেলাম কিন্তু পরক্ষণেই নিজেদেরকে বোঝালাম যে, আমাদের মধ্যে যথেষ্ট কর্মক্ষমতা এবং বুদ্ধি আছে, অতঃপর ভয় চলে গেলো এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো। দীক্ষিতকরণ – অভিভাবনের এই দুই রূপ, সামূহিক ও ব্যক্তিক, তাদের সময়কালের বিচারে আবার দুভাবে দেখা দেয়। যথা – ক. সাময়িক খ. দীর্ঘস্থায়ী। সাময়িক দীক্ষিতকরণের উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি টেলিভিশনের পর্দায় বুদ্ধিজীবী কিংবা রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য শুনে আমরা এতটাই অভিভাবিত হলাম যে, তাঁর পক্ষে নির্বাচনে ভোট প্রদান করলাম। আর দীর্ঘস্থায়ী দীক্ষিতকরণের উদাহরণ হলো আমাদের মনের মধ্যে সেঁধিয়ে থাকা

নানাবিধ প্রথা, আচার অথবা সংস্কার। এই ধরণের সংস্কার বা প্রথা আমাদের মনের মধ্যে এতটাই স্থায়ী আসন লাভ করে থাকে যে, কখনো সেই সংস্কার বা প্রথার দ্বারা মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হলেও আমরা সেই সংস্কার কিংবা লোকাচারের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারিনা, পরিবর্তে তার সমর্থনে এমনকি তাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকি।

এই দীক্ষিতকরণ ও অভিভাবন নানাভাবে কাজ করে। বিশেষত ক্ষমতাতন্ত্র নিজেকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই দীক্ষিতকরণ-অভিভাবনের তত্ত্ব প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ দ্বন্দ্বটা ক্ষমতার। আর ক্ষমতাকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থাকবার জন্য শক্তি সংগ্রহ করে যেমন ক্ষমতাসীনকে মোকাবিলা করা যায়, তেমনই দুর্বলকে টিকে থাকতে হয় ক্ষমতাসীনের আধিপত্য স্বীকার করে নিয়ে। এখন শক্তি সংগ্রহ এবং আধিপত্য স্বীকার করানো - এই দুটি ক্ষেত্রেই দীক্ষিতকরণ ও অভিভাবন চমৎকার কাজ করে। 'জেহাদ' এবং 'জামায়াত' এর নামে দীক্ষিতকরণ করে অসংখ্য মুসলমানকে সংগঠিত করা যায় এবং শক্তি সংগ্রহ করা যায়। আবার 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' অর্থাৎ মানুষের অধিকার শুধু কর্মে, কর্মফলে নয় – এইসব শাস্ত্রবাক্য দীক্ষিতকরণের মধ্যে দিয়ে অতি সহজে এক শ্রেণির মানুষেকে শ্রমের মূল্য থেকে বঞ্চিত করে ক্ষমতাসীনের আধিপত্য বজায় রাখা যেতে পারে।

লক্ষ করবার বিষয় শক্তিমান ও ত্রাসসৃষ্টিকারী ক্ষমতাসীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে, এতকালের যারা নিপীড়িত, দলিত তাদের বাড়তি সাহস লাগে, দরকার হয় বাড়তি মনোবলের। দীক্ষিতকরণ > অভিভাবন সেই মনোবল ও শক্তি যোগায়। তেমনই অন্যায়কে বাধ্য হয়ে মেনে নিতে দৈনন্দিন নিষ্পেষণ, নিপীড়নের গ্লানিকেও অতিক্রম করতে দরকার হয় অভিভাবনের।[৯] তাই শাসক সর্বদাই আপন স্বার্থে অভিভাবনকে প্রয়োগ করে থাকেন।

উপরিউক্ত এই দীক্ষিতকরণ এবং অভিভাবন তত্ত্বের উপরেই কি টিকে নেই আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা? তা নইলে শাসকের বদল হলেই কেন বদলে যায় পাঠক্রম নিদেনপক্ষে পাঠ্যসূচি?[১০] অথবা বিদ্যালয় শিক্ষার প্রতিস্পর্ধী অবস্থানে কেন বেড়ে ওঠে টোল কিংবা মাদ্রাসা শিক্ষা? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চেয়েছিলেন, যে শিক্ষা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করে ও সক্রিয় করে, আমাদের মনকে অবুদ্ধির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারে সেই শিক্ষার দ্বারাই আমাদের সমস্ত দুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটাতে।[১১] কিন্তু দেশে দেশে কালে কালে শাসকের হাতে তাঁর মর্জি মাফিক নব নব অবয়ব লাভ করেছে শিক্ষা। কখনো তা বুদ্ধিকে মুক্ত করেছে কখনো বা বুদ্ধিকে চালিত করেছে শাসকের অধীনে। আর সেই শিক্ষার অনুকূলে রচিত হয়েছে পাঠ্যপুস্তক – তা শিশুশিক্ষা থেকে শুরু করে বয়স্ক শিক্ষা পর্যন্ত সম্প্রসারিত।

বর্তমান গবেষণায় আমাদের আলোচনা নির্দিষ্ট করা হয়েছে প্রাইমার অর্থাৎ শিশুপাঠ্যপুস্তকের উদ্ভব বিকাশ, শ্রেণিকরণ ও তার সমাজতাত্ত্বিক ভাষ্য নিয়ে। এক্ষেত্রে আমরা বিদ্যালয় শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার আলোকে বাংলা ভাষায় রচিত ইসলামি প্রাইমারের মূল্যায়ন করেছি। যেহেতু বিদ্যালয় শিক্ষাকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ এবং মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে আমরা ধর্মীয় শিক্ষার অঙ্গন হিসেবে চিহ্নিত করেছি তাই বিদ্যালয় শিক্ষায় প্রচলিত প্রাইমারের প্রতিস্পর্ধী হিসেবেই মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাইমারগুলিকে বিচার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় শিক্ষায় প্রচলিত প্রতিনিধি স্থানীয় প্রাইমারগুলির সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষায় প্রচলিত নির্বাচিত প্রাইমারগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আমরা জানি প্রাইমার হল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষণ গ্রন্থ। একটি প্রাইমার যেমন শিশুর শব্দ বাক্যের মৌখিক শিক্ষণকে বর্ণ-শব্দ-বাক্য – এর ক্রম মেনে পাঠের বিন্যাস ঘটায় তেমনই পাঠ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিকতা নৈতিকতা ধর্ম-অধর্ম ন্যায় অন্যায় ভালো-মন্দ ও অন্যান্য নানাধরণের সহবত শেখায়। উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলবার তালিম দেয় শৈশব থেকেই। শিশুর শূন্য পটে (Tabula Rasa) একাধিক বিষয়ে দীক্ষিতকরণ (indoctrination) ও অভিভাবন (Suggestion) – এরও ভার নেয় এই প্রাথমিক শিক্ষণ গ্রন্থটি। একারণে প্রাইমারকে জীবনের ষোল কলা পূরণের দায় নিয়ে আসরে নামতে হয়। সংখ্যা বর্ণ শব্দ বাক্য শিক্ষার পাশাপাশি প্রাগুক্ত চাহিদাগুলি মেটাবার জন্য প্রাইমারগুলিকে হয়ে উঠতে হয় ভালো সাহিত্য। এখানেই একটি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, ইসলামের সঙ্গে সাহিত্য তথা প্রাইমারের যোগাযোগ নিয়ে। কারণ আমরা যে ইসলামি প্রাইমারকে কেন্দ্র করে আলোচনায় অগ্রসর হতে চলেছি সেখানে প্রথমেই বিতর্ক উঠবে এই 'সাহিত্য' শব্দটিকে নিয়ে। ইসলামে সাহিত্য ও ললিতকলা চর্চা নিষিদ্ধ। তাহলে কেন কোন পটভূমিতে ইসলামে সাহিত্য অনুমোদন পেল বা পাচ্ছে?

ইসলামি নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসা প্রাইমার সংক্রান্ত এই আলোচনার শুরুতেই বলে রাখা ভালো ইসলামে 'সাহিত্য' শব্দটিই ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ। কারণ ইসলাম সাহিত্যকে অনুমোদন দেয় না। সাহিত্য সম্পর্কে ইসলামের ধারণা অন্যতর। এবিষয়ে ইসলাম মনে করে সাহিত্য একপ্রকার মিথ্যা, অবাস্তব ও মনগড়া কাহানিয়াতে ভরপূর অব্যবহারিক ও উপযোগিতাশূন্য ভাবনারাজ্য, যা কোনোভাবেই মানবকল্যাণের সহায়ক নয়। এমনকি কোরানে বলা হয়েছে আল্লাহর সৃষ্টিকে নকল করার জন্য কেউ যেন কবিদের সঙ্গে না থাকে, তাঁরা পাগলের সমতুল।[১২] সুতরাং তা অবিশ্বাস্য ও পরিত্যাজ্য। শুধু সাহিত্য নয় যে কোনো শিল্প, গানবাজনা, খেলাধুলো ও ললিতকলার চর্চাতেই

ইসলামের অনাস্থা ও নিষেধাজ্ঞা আছে। কেননা, তা বেদাতের সমর্থক। তাই শিল্প সাহিত্যের চর্চাকারীরা আসলে বেদাতের চর্চাকারী। এই কারণে শিল্প সৃষ্টি সম্পর্কে বেশ কড়া ভাষায় সমঝে দিয়েছে শাস্ত্রকারেরা। চিত্র বা তসবির সম্পর্কে বলা হয়েছে - 'হুযূর (স) বলেছেন যে ঘরে প্রাণী জাতীয় জীবজন্তুর তথা মানুষের চিত্র, ফটো ক্যলেন্ডার বা কুকুর থাকে সে গৃহে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করে না। – বুখারী, মুসলিম।'[১৩]

এখনেই শেষ নয়, আরো ভয়ানক ভাবে বলা হচ্ছে চিত্রপ্রেমী মানুষদেরকে -'যে ব্যক্তি পৃথিবীতে ছবি তৈরি করবে (প্রাণদার জীবজন্তুর) কিয়ামত দিবসে তাকে উহাতে প্রাণসঞ্চার করতে বলা হবে। কিন্তু সে ব্যর্থ হবে। (অতঃপর দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে) – বুখারী"।[১৪]

আসলে এক্ষেত্রে 'আদত' বা ইসলামি অলঙ্ঘনীয় নিয়মকে উপেক্ষা করে 'বেদাত' (innovation) কে কোনোভাবেই মান্যতা দেবার রেওয়াজ নেই। 'বেদাত' হল কোরান নির্দেশিত পথের পরিবর্তন অথবা উক্ত পথে নতুন কিছুর প্রবর্তন। "বেদাত" ইসলাম বিরোধী বলে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।[১৫] 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' কাব্য সৃষ্টি তো চূড়ান্তভাবেই "বেদাত" – এর নমুনা। এক্ষেত্রে তার জন্য যে কী ধরনের অনুশাসন ব্যবস্থা থাকবে আমরা খুব সহজেই তা অনুমান করে নিতে পারি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যাবতীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে ইসলাম ধর্মের চৌহদ্দিতে থেকেই অসংখ্য মুক্তবুদ্ধিকামী মানুষ 'ইসলামের শ্রেষ্ঠ সত্য তৌহিদ' বা মানবচিত্তের চির মুক্তির বাণীকে অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এখানেও প্রশ্ন জাগে, সেই সাহিত্য কি হতে পেরেছে পুরোপুরি ধর্ম নিরপেক্ষ ? নাকি সেটিও হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী সাহিত্যের মতোই নিজেকে 'সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের'[১৬] খাঁচাতেই বারবার পুরে ফেলতে চেয়েছে ? অথবা জনপরিসরে কতখানি গণপাঠ গড়ে তুলতে পেরেছে তাও ভাববার বিষয়।

এখানে বলে রাখা উচিত আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলমান লেখকেরা পদার্পণ করেন ১৮৭০ সালের পরে। আর এই সময় বিশেষ একটি ঐতিহাসিক পটভূমিতে তাঁরা সাহিত্য সাধনা শুরু করেন। বাংলা সাহিত্যের যে সমৃদ্ধ যুগের সূচনা হয় উনিশ শতকে সেই আধুনিক যুগের সাহিত্য সম্পর্কে সেকালের মুসলমান লেখকদের মন দ্বিধা দ্বন্দ্বে ছিল ভরপুর। ছিল প্রবল আপত্তি ও অনাস্থা। কারণ উনিশ শতকের শেষার্ধে তাঁদের রচনায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের যে ভাব দেখা দিয়েছিল তা কোনোভাবেই অনুমোদন করতে পারেননি মুসলমানেরা। সেই সাহিত্য সম্পর্কে আপত্তিকর দিকগুলি নির্দেশ করেছেন আনিসুজ্জামান মহাশয় - 'এক, মুসলমানের নিত্যব্যবহার্য আরবি, ফারসি ও হিন্দুস্থানি শব্দ আধুনিক সাহিত্যের ভাষায় স্থান পায়নি; দুই, এই সাহিত্যে মুসলিম জীবনের কোনো

পরিচয় নেই; তিন তার চেয়েও শোচনীয় ব্যাপার এই যে, ইতিহাসাশ্রিত যেসব কাব্য-নাটক-উপন্যাসে মুসলমান চরিত্র স্থান পেয়েছে, সেসব রচনায় মুসলমানের শ্রদ্ধেয় বহু ঐতিহাসিক চরিত্র কলঙ্কিত হয়েছে।'[১৭]

১৮৭০ সালে আধুনিক সাহিত্যে পদার্পণ করে মুসলমান লেখকদের একটিই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো – বাংলা সাহিত্যের উপরোক্ত ত্রুটি দূর করা এবং ওই অভাব পূরণ করা। ফলে উনিশ শতকের শেষার্ধে প্রচলিত সাহিত্য ধারার অ্যান্টি-থিসিস হিসেবেই মুসলমানি সাহিত্য সাহিত্যের ময়দানে নামল। অবশ্য এই মৌলিকতাহীন গতানুগতিক সাহিত্য ধারা বিশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে নজরুল ইসলাম – জসীমউদ্দীন এবং চল্লিশের দশকে নতুন লেখককুলের হাতে পরিমার্জিত হবে। কিন্তু সেটি স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ।

এখন বিষয় হলো বাংলা সাহিত্যে প্রাইমারের উদ্ভব ১৮১৬ সালে 'লিপিধারা' প্রকাশের মধ্যে দিয়ে এবং ইসলামি প্রাইমার রচিত হতে শুরু করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ১৮৬৯ সাল থেকে। তাই সময়ের বিচারে প্রায় দুশো বছরের মধ্যে প্রচুর প্রাইমার রচিত হয়েছে। প্রাইমারের এই ইতিহাস ও বিদ্যায়তনিক অবদান নিয়ে চমৎকার আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন ভাষাতাত্ত্বিক পবিত্র সরকার, অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ও সমাজতাত্ত্বিক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক আশিস খাস্তগীর, গবেষক আবীর কর এবং খুব সম্প্রতি গবেষক রাকিব। এই দুশো বছরের প্রাইমার চর্চার মধ্যে সময়কালের নিরিখে আমরা বেছে নিয়েছি ১৯৯০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে বাংলা ভাষায় রচিত ইসলামি প্রাইমারগুলিকে। এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, উপরিউক্ত গবেষকদের মধ্যে ইসলামি প্রাইমারের উপরে প্রথম গবেষণা করেছেন অধ্যাপক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি, মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা' প্রাইমারটি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন তাঁর 'আবার শিশুশিক্ষা' বইটিতে। এছাড়া গবেষক রাকিব তাঁর গবেষণাকর্মটিতে মাদ্রাসা শিক্ষায় প্রচলিত বাংলা প্রাইমারের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর কাজের নির্দিষ্ট কোনো সময় বা পরিসীমা আমরা লক্ষ করিনি। বর্তমান গবেষণায় আমরা নির্দিষ্ট সময় খণ্ডের মধ্যে (১৯৯০ – ২০২০) রচিত বাংলা ভাষার ইসলামি প্রাইমারগুলি নিয়ে তুলনামূলক পদ্ধতিতে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছি। সেক্ষেত্রে আমাদের এই গবেষণায় পূর্বে অনালোচিত প্রায় তিরিশটি প্রাইমার ও ফলো-আপ সংগ্রহ করেছি। এর মধ্যে দু'একটি প্রাইমারকে গবেষক শ্রী রাকিব তাঁর গবেষণায় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন।

এখন যে সমস্ত প্রশ্নকে সামনে রেখে আলোচ্য গবেষণায় আমরা অগ্রসর হয়েছি সেই ধরণের প্রাসঙ্গিক কয়েকটি প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক।

'বাংলা ভাষার 'ইসলামি প্রাইমার' : বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষার আলোকে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ (১৯৯০ – ২০২০)' শীর্ষক এই গবেষণায় যে প্রশ্নটি প্রথমেই আমাদের মনে জাগে তা হলো কেন আমরা বিদ্যালয় শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার পৃথক প্রাইমারের ধারণায় উপনীত হলাম? অর্থাৎ ভাষা এক হওয়া সত্ত্বেও কোন ঐতিহাসিক ক্ষণ থেকে মূলধারার বাংলা প্রাইমারগুলির সঙ্গে ইসলামি প্রাইমার বা মাদ্রাসা প্রাইমারগুলির বিচ্ছিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য কল্পনা করা হলো?

এই প্রশ্নের অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি যে, উনিশ শতকে যে বিপুল সংখ্যক প্রাইমার রচিত হয়েছে; অধ্যাপক গবেষক আশিস খাস্তগীরের মতে প্রায় পাঁচশোর অধিক, সেখানে মুসলমান রচিত প্রাইমারের সংখ্যা নগন্য। ১৮১৬ সালে রচিত 'লিপিধারা' শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয় খ্রিস্টীয় মতাদর্শকে সামনে রেখে। ১৮৩৫ সালে শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বসু রচিত 'শব্দসার' তা বাঙালি হিন্দুর হাতে রচিত প্রথম প্রাইমার। আর ১৮৬৯ প্রকাশিত হচ্ছে মহম্মদ জহুরুদ্দীন রচিত 'জ্ঞানশিক্ষা – ১' যেটি মুসলমানের হাতে রচিত প্রথম প্রাইমার। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে যখন শতাধিক হিন্দু প্রাইমার রচয়িতা প্রায় পাঁচশোর উপর প্রাইমার লিখছেন সেখানে মাত্র ১২ জন মুসলমান বাঙালির হাতে ১৪ টি প্রাইমারের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। হিন্দু বাঙালির হাতে রচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রাইমারগুলির অধিকাংশই প্রতিলিপি সহজলভ্য। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে তার বেশকিছু কপিও আছে জানা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো মুসলমান বাঙালির হাতে রচিত উক্ত ১৪ টি প্রাইমারের মধ্যে কোনোটির হদিশ পাওয়া যায়নি। মুসলমান বাঙালির হাতে রচিত আদি যুগের প্রাইমারের সেই নমুনা সংগ্রহ ও তা সংরক্ষণের উদাসীনতা আমাদের আজো বিচলিত করে। এই প্রাইমারগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় কেবলমাত্র জেমস্ লঙের ক্যাটালগ থেকে।

এখন পরিতাপের বিষয় হলো উনিশ শতকের যে বিপুল সংখ্যক প্রাইমার হিন্দু বাঙালির হাতে রচিত হচ্ছিল সেখানে মুসলমান বাঙালির অবস্থান ছিল শূন্য। অর্থাৎ কী চরিত্র, কী সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন, কী প্রতিনিধিস্থানীয় আদর্শ সবদিক থেকে সেযুগের প্রাইমারগুলি ছিল সম্পূর্ণভাবে মুসলমান বিবর্জিত ও মুসলমান শূন্য। সংক্ষেপে বললে এই সমস্ত প্রাইমারের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল (১) স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ, বানান, ফলা, যুক্তাক্ষর, ত্র্যক্ষর চত্বরাক্ষর (২) ভূগোল, ইতিহাস, নীতিকথা, (৩) উপাধি পদ্ধতির সঙ্গে মানুষের নাম। যেমন – কর্মকার, গন্ধকার, নাপিত, মোদক, গন্ধকার ইত্যাদি (৪) বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, মাস , রাশি ,কাল নির্ণয়, ঋতু বর্ণন; (৫) বানানের

নিয়ম ইত্যাদি।[১৮] লক্ষণীয় বিষয় বার তিথি রাশি প্রভৃতি বিষয় নির্ধারণে যেমন হিন্দু শাস্ত্র ও আচারের প্রভাব থাকত তেমনভাবেই নীতিশিক্ষা ও ধর্মবোধ জাগিয়ে তুলতেও হিন্দুত্বই ছিল 'একমেবঃ অদ্বিতীয়ম'। যেমন "শিশুজ্ঞান চরিত্র" থেকে প্রাথমিক ও নৈতিক শিক্ষার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় – বাবা ও মা ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব এবং বড়ো ভাইকে ভক্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ব্রাহ্মণকে দেখে নমস্কার না করলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুর অংশ সুতরাং তাদের আশীর্বাদে কল্যাণ হয়।[১৯] অর্থাৎ উনিশ শতকে প্রাইমারের এই প্রাঙ্গণটি সেক্যুলার কোনো সামাজিক প্রস্থান গড়ে তোলে নি। এমনকি লক্ষ করবার বিষয় বিদ্যাসাগর মহাশয়য় অন্যান্য প্রাইমার লেখকদের অপেক্ষা মুক্তবুদ্ধি ও 'মডারেট' হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রাইমারে গোপাল – রাখাল – গিরিশ – যাদবদের বিপ্রতীপে কোনো রহিম – করিম – মহিমারা আসেনি। অনেক পরে রচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত 'সহজপাঠ' – এ আর্দালি তুর্কি মিঞা ও গোরুর গাড়ি গাড়োয়ান তমিজ মিঞা ছাড়া আর কোনো প্রতিনিধিস্থানীয় মুসলমান চরিত্র নেই। এই বঞ্চনাবোধ থেকেই উনিশ শতকে ইসলামি প্রাইমার রচনার সূত্রপাত। যার মূলে ধর্মীয় আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান জানিয়েছেন বাংলা প্রাইমারের এই বিপুল জনপ্রিয়তার ঐতিহাসিক লগ্নে ১৮৭০ সাল নাগাদ মুসলমান লেখকরা আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পন করছেন।[২০] ফলে এর আগেভাগে মুসলমানদের দ্বারা প্রাইমার লেখবার সুযোগ ও সম্ভাবনা কম এবং এই সাহিত্যবর্গটি তাঁদের কাছে একেবারেই আনকোরা। একারণে উনিশ শতকে প্রাইমার রচনার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের আনুপাতিক হারের ব্যবধান চোখে পড়ার মতো।

দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হলো - এদেশে ইসলামি প্রাথমিক শিক্ষার গোড়াপত্তনের মূলে রয়েছে প্রথমত বিজিত ধর্মান্তরিতদের ইসলামি আদর্শে শিক্ষিতকরণ ও কোরান – এর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। আমরা জানি, কোরান-ই ইসলামি প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি ও একমাত্র বিষয়। পয়গম্বরের মৃত্যুর বছর পঁচিশ পরে মুসলমানদের মধ্যে যে দু একজন লিখতে পড়তে জানতেন তাঁরা আরবি ভাষায় কোরান-এর একটি প্রামাণ্য সংকলন তৈরি করেন। আর এই কোরান-এর উপর ভিত্তি করেই ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।[২০] জিমার জানাচ্ছেন যে, 'চারবছর চারমাস চারদিন বয়সে মুসলমান শিশুর বিসমিল্লা সংস্কার হত।'[২২] গরিব ছেলেরা মসজিদে আর ধনী সন্তানেরা গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করতো। তোতাপাখির মতো কোরান মুখস্থ করানো

হত প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এভাবেই ইসলামি শিক্ষার গোড়াপত্তন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য থেকে মুসলমানের শিক্ষা সম্পর্কে এই ধরণের একাধিক নমুনা আমরা পেশ করেছি।

ইসলামের ধর্ম নির্ভর মধ্যযুগের শিক্ষা কাঠামোর এই ধারাটির রেশ আঠারো উনিশ শতকেও পুরো মাত্রায় থেকে গেছে মুসলমান সমাজে একারণে ১৭৮০ সালে মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানেও হাদিশ ও তফসিরকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে পাঠক্রমে রেখে দেওয়া হয়। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে বাঙালি জাতি শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এক উত্তাল ভাব আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলেও ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে কোরান কেন্দ্রিকতার কোনো অপসারণ ঘটেনি, বরং নিজেদের আত্মগৌরব ও ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠা দেবার লক্ষ্যে ধর্মেই আস্থা রেখেছে অধিক। আর তারই প্রভাব পড়তে থাকে উনিশ শতকের শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলিতে। হলিমন্নেষা খাতুন 'সরল আদিশিক্ষা' বলতে কী বোঝাতে চান?, কিংবা মহ. জুহুরুদ্দিন তাঁর 'জ্ঞানশিক্ষা' বইতে 'জ্ঞান' বলতে যে কোরানের আদি ও অকৃত্রিম জ্ঞানকেই ইঙ্গিত করছেন তা আমাদের বুঝতে বাকি থাকেনা।

উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলমান সমাজে ধীরে ধীরে নবচেতনার প্রসার ঘটলে একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা হল – শিক্ষার আবশ্যকতা। শিক্ষা বিবেচিত হয়েছিল সকল রোগের প্রতিকারক হিসেবে। আবার এও মনে হয়েছিল যে - 'মুসলমান ছাত্রের পক্ষে বিদ্যালয়ের পরিবেশ অনুকূল নয়, পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু মুসলমান হিসেবে তার মানসিক বিকাশের অনুপযুক্ত...'[২৩] এই অভাব থেকেই তো গড়ে উঠেছে মুসলমানের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক – শিশুর মানসিক বিকাশের উপযোগী প্রাইমার। সুতরাং ভাষা ভাব ও চরিত্রে অভিনবত্ব এনে রচিত হল বিকল্প প্রাইমার।

মীর মশাররফ হোসেনের 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা'য় হিন্দুর ধর্মীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে আমরা প্রথম ইসলামি জীবন ও সংস্কৃতির বিস্তৃত ভাষ্য খুঁজে পাই। উনিশ ও বিশ শতক জুড়ে মুসলমান বাঙালির শিক্ষা ধারা বহুলাংশে প্রবাহিত হয়েছে মাদ্রাসাকে অবলম্বন করে, ফলে উনিশ শতকে গড়ে ওঠা নতুন নতুন স্কুল বা বিদ্যালয়ের বিপরীতে মাদ্রাসা শিক্ষার আবেগকে বুকে নিয়েই ইসলামি প্রাইমারগুলি রচিত হয়েছে। এযুগেও ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয় শিক্ষার প্রতিস্পর্ধী হিসেবে মাদ্রাসা ও শিশুমাদ্রাসা এমনকি ইসলামি মিশনগুলির জন্য ইসলামি প্রাইমার রচিত হয়ে চলেছে। এই কারণে বাংলা ভাষাতে রচিত হলেও ধর্মীয় বয়ানসমূহের আধিপত্যকে চিহ্নিত করতেই আমরা

বিদ্যালয় শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষায় পৃথক প্রাইমারের ধারণাকে বিচার করেছি এবং এগুলিকে 'বাংলা ভাষার ইসলামি প্রাইমার' বলে চিহ্নিত করে বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছে।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটির উত্তর আমাদের এই গবেষণায় খোঁজবার চেষ্টা করা হয়েছে তা হলো, বিদ্যালয় শিক্ষার প্রতিস্পর্ধী ধর্মীয় দিক থেকে বিপরীত চরিত্রের যে প্রাইমার একই দেশকালে একই ভাষায় রচিত হলো বাস্তবিক তার কোনো সমাজিক প্রগতিসূচক অবদান আছে কিনা?

এই প্রশ্নটি পর্যালোচনা ও বিচার করতে গিয়ে আমরা লক্ষ করেছি উনিশ শতকে ইসলামি বাংলা প্রাইমার সমূহ রচিত হয়েছিল প্রচলিত বাংলা প্রাইমারের বিরোধী বয়ানজমি নির্মাণের উদ্দেশ্যে। ইংরেজদের এদেশে ক্ষমতা দখলের পর থেকে আত্মাভিমানী মুসলমানরা নিজেদেরকে পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। পরিবর্তে তাঁদের মধ্যে ধর্মাশ্রয়ী একটি স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থা স্থায়ী রূপ পায়। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের নবচেতনার ফলস্বরূপ সমাজে পুনরায় জাগরণ শুরু হয় এবং আপন স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা সাহিত্য চর্চার আসরে নামেন। এই সময়েই ইসলামি প্রাইমার সমূহ মুসলমানের 'আত্ম' প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। মুসলমানের ইতিহাস, তার নিজস্ব ধর্ম সংস্কৃতি, আদব কায়দা ও জীবনাচারণের যাবতীয় নির্দেশ শৈশব থেকেই বলবৎ করবার বাসনা থেকেই এই প্রাইমারি উদ্যোগ। অর্থাৎ শৈশব থেকেই মগজ মেরামতের যন্ত্র হিসেবে এই প্রাইমারগুলি ব্যবহৃত হতে শুরু করে। কিন্তু দেখা গেছে শিক্ষাক্ষেত্রে এই পৃথক শিক্ষা চিন্তা মুসলমানের অগ্রগতিকে মোটেও সুবিধার জায়গায় নিয়ে যায়নি। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে মুসলমান সমাজ ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে। আজো মুসলমানদের মধ্যে কোনো স্থায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠতে পারেনি। আজো মুসলমানদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা ও প্রগতিশীলতার ব্যাপক অভাব লক্ষণীয়। গোটা দেশে ১৪ শতাংশেরও বেশি মুসলমান তবুও মুসলমানদের সাক্ষরতার হার দেশের অন্যান্য বেশির ভাগ সম্প্রদায়ের থেকে অনেক কম। এর পেছনে ব্যাপকভাবে দায়ী শৈশবের শিক্ষা। মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যবহৃত প্রাইমারের ছত্রে ছত্রে আমরা লক্ষ করেছি, আনন্দবিহীন, নীরস, কঠোর শিক্ষাপ্রণালী যা শিশুশিক্ষার্থীর জীবনকে ছাত্রশাসনতন্ত্রে নিয়ত প্রহৃত করে। আলোচ্য গবেষণায় এই দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, আমাদের আলোচ্য সময়কালে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য রচিত ও ব্যবহৃত প্রাইমারগুলিতে ধর্মীয় অনুষঙ্গ কী আছে এবং কতটা আছে তার পরিমাণ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

চতুর্থত, বিদ্যালয় শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যবহৃত প্রাইমারগুলিতে কোনো প্রকার আত্ম – অপর সম্পর্কের বিন্যাস বা জাল রচিত হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করা হয়েছে।

পঞ্চমত, নীতিশিক্ষা প্রতিষ্ঠায় ইসলামি প্রাইমারগুলির অবস্থান কীরকম? তা বিচার করা হয়েছে। সেইসঙ্গে মূলধারা প্রাইমারের সঙ্গে এর কোনো যোগ পাওয়া যায় কিনা তা অনুসন্ধান করা হয়েছে।

ষষ্ঠত, স্ত্রীশিক্ষা ও নারী ভাবনায় এই শ্রেণির প্রাইমারগুলির স্বতন্ত্র্য কোনো বয়ান আছে কিনা তা যাচাই করা হয়েছে।

এবারে আসা যাক বর্তমান গবেষণার অধ্যায় ভিত্তিক অনুসন্ধান ও তার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে।

আলোচ্য গবেষণায় মোট ছয়টি অধ্যায়ে পৃথক পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক কিছু প্রশ্নের অনুসন্ধান করা হয়েছে এবং মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার প্রাইমারের সঙ্গে সেই প্রশ্নগুলিকে অন্বিত করে প্রাইমারগুলির সমাজতাত্ত্বিক ভাষ্য নির্মাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমাদের গবেষণার প্রথম অধ্যায়টির শিরোনাম ‘উনিশ শতকের বাঙালির বিভাজিত শিক্ষাপদ্ধতি এবং মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস’। এই অধ্যায়ে আমরা উনিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলি চিহ্নিত করেছি। বিশেষত সেই দিকগুলি যেগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা হিন্দু – মুসলমানের সমন্বয় অথবা বিচ্ছন্নতার সূত্রগুলি আলাদা করে অনুভব করতে পারি।

উনিশ শতকে বাংলায় শিক্ষাব্যবস্থার একাধিক ধারা প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। সেগুলি হলো – পাঠশালা শিক্ষা, টোলের শিক্ষা এবং মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষা। পাঠশালা শিক্ষা ছিল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সর্বজনীন ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা। অন্যদিকে টোলের শিক্ষা ছিল হিন্দু ধর্মের আবেগের সঙ্গে যুক্ত। আর মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদের জন্য পৃথক শিক্ষা হিসেবে প্রচলিত ছিল। বর্তমান অধ্যায়ে এই তিন শ্রেণির শিক্ষাব্যস্থার স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। সেইসঙ্গে দেখানো হয়েছে ইংরেজ প্রবর্তিত স্কুল শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে পাঠশালা শিক্ষা অন্তর্হিত হলো এবং মাদ্রাসা শিক্ষা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলো।

এই শতকেই আমরা দেখেছি রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাচ্যুত মুসলমান জাতি কীভাবে আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে ধর্মকেই প্রধান আত্মপরিচয় হিসেবে বড়ো করে দেখতে শুরু করে। যার দরুন তারা সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে তারা পিছিয়ে পড়ে। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রহণ করে কীভাবে হিন্দু সমাজে অগ্রগতির জোয়ার আসে।

মুসলমানরা ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সুনজরে দেখেনি। একমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষার উপর ভর করেই তারা এগিয়ে যেতে থাকে। ফলে উনিশ শতকের এই মাদ্রাসা শিক্ষাই ভবিষ্যতের মুসলমান বাঙালির সত্তা নির্মাণে কীভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে বর্তমান অধায়ে তা দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'বিশ – একুশ শতকের মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইসলামি প্রাইমার'। প্রসঙ্গত এখানে আমরা প্রাচীন মাদ্রাসা শিক্ষার বিশ ও একুশ শতকীয় চেহারাটি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি। স্বভাবতই বিশ শতকের প্রথমার্ধের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষার বিবর্তন এবং ক্ষমতা হস্তান্তর, দেশভাগ পরবর্তীকালে মাদ্রাসা শিক্ষার নানামুখি পরিবর্তনকে দেখানো হয়েছে। প্রসঙ্গত মাদ্রাসার শ্রেণীকরণসহ বিদ্যালয় শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠক্রম আলোচনা করে তাদের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ও অভিমুখকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেহেতু আমাদের মূল আলোচনা মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যবহৃত প্রাইমারসমূহ তাই আমরা উল্লিখিত সময় পর্বে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য রচিত ইসলামি প্রাইমারগুলির পরিচয় দিয়েছি। এই সময়পর্বে (১৯৯০ – ২০২০) আমরা প্রায় তিরিশটি নতুন প্রাইমার সংগ্রহ করেছি। সেই সমস্ত প্রাইমারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলি রচনার উদ্দেশ্য ও অভিমুখ চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত কোন ধরণের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে এই ধরণের পৃথক প্রাইমার রচনা নতুন করে গতি পেলো সে বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আমাদের গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়টির নাম 'ধর্ম প্রসঙ্গ ও ইসলামি প্রাইমার'। এই অধ্যায়ে ইসলামি প্রাইমারগুলির ধর্মীয় স্বরূপ ও চরিত্র বিচার করা হয়েছে। ধর্মই যেহেতু এখানে পৃথক প্রাইমারের ধারণাকে সম্প্রসারিত করেছে তাই ধর্মীয় প্রসঙ্গকে এখানে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা হয়েছে। দেখতে চাওয়া হয়েছে ধর্মের সংজ্ঞার্থ, প্রাইমারগুলিতে ধর্ম কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিশদর্থে ধর্মীয় উপকরণ, ধর্মীয় পরিচয় প্রাইমারগুলিতে কীভাবে বিন্যস্ত হয়েছে এবং ধর্ম সম্পর্কে কী ধরণের বার্তা দিতে চেয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণায় প্রস্তাবিত চতুর্থ অধ্যায়টির শিরোনাম 'আত্ম - অপর সম্পর্ক : প্রচলিত ও ইসলামি বাংলা প্রাইমার'। এই অধ্যায়ের গোঁড়ায় আমরা সৃষ্টিকর্মে আত্ম প্রক্ষেপ তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং দেখিয়েছি যে যুগে যুগে কালে কালে রচিত সাহিত্যে কীভাবে স্রষ্টার আত্মচিন্তা প্রবিষ্ট হয়। প্রসঙ্গত উনিশ শতকে হিন্দু বাঙালির হাতে রচিত সাহিত্যে আত্মভাবনা কীভাবে মুসলমান বাঙালিকে 'অপর' বর্গ হিসেবে দূরে ঠেলে দেয় এবং তারই প্রতিস্পর্ধী ধারা হিসেবে উনিশ শতকেই মুসলমান বাঙালির 'আত্ম' রচিত হয় এবং প্রত্যাঘাত হিসেবে তাঁরাও হিন্দু

বাঙালিকে 'অপর' হিসেবে বিচার করে এক প্রকার দূরত্ব রচনা করে তা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখানো হয়েছে। প্রসঙ্গত এই ধারাটিই প্রাইমার রচনার ক্ষেত্রে কীভাবে সক্রিয় থেকেছে এবং হিন্দু – মুসলমানকে মাঝখানে রেখে তাদের তাঁদের আত্ম – অপর সম্পর্ক রচিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনার বিষয় ইসলামি প্রাইমারে নীতিশিক্ষার প্রসঙ্গ। এই অধ্যায়টির নাম দেওয়া হয়েছে 'নীতিশিক্ষা ও ইসলামি প্রাইমার'। এই অধ্যায়ে আমরা নীতিতত্ত্ব ও নীতিশিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনা করার পাশাপাশি প্রাইমারে নীতিশিক্ষার প্রায়োগিকতা ও তার ইতিহাস আলোচনা করেছি। শিশুপাঠ্য পুস্তকে নীতিশিক্ষার অনিবার্যতা ও নীতিশিক্ষার রাজনীতি যেমন বিচার করেছি তেমনই নীতিশিক্ষাকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করে আমাদের নির্বাচিত প্রাইমারগুলিতে সেগুলির প্রয়োগ এবং প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য গবেষণায় ইসলামি প্রাইমারগুলিতে নারী শিক্ষা ও নারী ভাবনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে আমরা মনে করেছি। সেই জায়গা থেকেই আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়টির পরিকল্পনা করেছি এবং এটির শিরোনাম দিয়েছি 'স্ত্রী শিক্ষা ও নারী ভাবনায় ইসলামি প্রাইমার'। এক্ষেত্রে আমরা শুরুতেই হিন্দু ও ইসলামি শাস্ত্রে নারীর সংজ্ঞার্থ নির্মাণের চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গত কোরান হাদিস এবং শরিয়তে নারীকে যেভাবে কল্পনা করা হয়েছে তা আমারা বিশ্লেষণ করেছি। সমান্তরালভাবে কোরান হাদিসে নারীশিক্ষা প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা কতদূর তা দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে শরিয়তের নানা প্রকার বিধিনিষেধকে বিচার করেছি এবং নারীর স্বাধীনতা ও শিক্ষায় কোরানের সঙ্গে শরিয়তের দ্বান্দ্বিক অবস্থানটি স্পষ্ট করেছি। প্রসঙ্গত এই অধ্যায়ে নির্বাচিত প্রাইমারগুলিতে নারীর অবস্থান ও তার ভবিষ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রাইমার রচয়িতাদের মনোরাজ্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিয়েছি তা হল - নারী-পুরুষ সহাবস্থান : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়, লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাতিত্ব, নারীর আধুনিকতা ও পিছুটান, নারী শিক্ষা ও নারী অধিকার, সৎ নারীর আদর্শ নির্মাণ ইত্যাদি।

বিষয়াবতারণা শেষে স্বাভাবিকভাবেই এই গবেষণার পদ্ধতি প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা জরুরী। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে তুলনামূলক ও সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। যেহেতু বিদ্যালয় শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার ধারায় রচিত প্রাইমারগুলির তুলনামূলক

বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সেগুলির সমাজ সাংস্কৃতিক প্রভাব নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই তুলনামূলক পদ্ধতির দ্বারা কার্যত সমাজতাত্ত্বিক বয়ানসমূহকে পুনর্বিবেচনাও করা হয়েছে।

সমগ্র গবেষণা সন্দর্ভটি বিন্যস্ত করা হয়েছে চারটি পর্বে। যথা – ভূমিকা, মূল আলোচনা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি। মূল আলোচনায় মোট ছয়টি অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে, যেগুলি সম্পর্কে আমরা পূর্বে সংক্ষিপ্ত ধারণা দান করেছি। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষ তথ্যসূত্র বা উল্লেখপঞ্জি সংযুক্ত হয়েছে।

গবেষণা সন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে আমরা বিদ্যালয় শিক্ষায় প্রচলিত প্রাইমার অর্থাৎ মূলধারা বাংলা প্রাইমারগুলি যেমন সংগ্রহ করেছি তেমনই নির্বাচিত সময়কালের মধ্যে আমাদের প্রাপ্ত প্রাইমারগুলিকেও আকর গ্রন্থ হিসেবে বিচার করেছি। এই প্রাইমারগুলির আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা অসংখ্য সহায়কগ্রন্থের সহযোগিতা গ্রহণ করেছি। সেগুলিও তথ্যসূত্রে সংযুক্ত হয়েছে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে হুবহু তথ্য গৃহীত হয়েছে সেইসমস্ত ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহারের পরিবর্তে ইনডেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে এবং হরফের আয়তন ১২ পয়েন্টে রাখা হয়েছে। খুব কম জায়গায় উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্ধৃতি চিহ্নযুক্ত সহায়ক মন্তব্যগুলি ১৪ পয়েন্টেই মুদ্রিত করা হয়েছে। তাছাড়া সমগ্র গবেষণাপত্রটি ইউনিকোড কালপুরুষ ফন্টে ১৪ পয়েন্টে মুদ্রিত হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি নির্দেশিত বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে প্রাইমারগুলির নাম, রচয়িতার নাম ও ইনডেন্ট -এর উদ্ধৃত তথ্যের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণের ক্ষেত্রে MLA হ্যান্ডবুকের মান্য পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. বন্দ্যোপাধ্যায়. সন্দীপ, 'পাঠশালা, কারাগার : ফুকো', দেখুন. শূর. চিরঞ্জীব (সংকলক), *মিশেল ফুকো,* আলোচনাচক্র, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৬, পৃ. ৭৪

২. বন্দ্যোপাধ্যায়. সন্দীপ, ঐ, ঐ, ঐ, উদ্ধৃত, পৃ. ৭৩

৩. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, 'বিবেচনা অবিবেচনা', দেখুন. *কালান্তর,* বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৫৫, পৃ. ২৪ – ২৫

৪. Foucault. Michel, *Discipline and Punish : The Birth of Prison*, (Trans. A Sheridan), Pantheon, New York, 1977, pp. 210 -211

৫. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, 'প্রচলিত দণ্ডনীতি', দেখুন. *কালান্তর,* বিশ্বভারতী, কলিকাতা, আশ্বিন ১৪২৫, পৃ. ৩৫৪

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়. অমল, 'মিশেল ফুকো বা মানুষের অন্তর্ধান', দেখুন. *উত্তর আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৮০ – ৮৫

৭. সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় অনুষঙ্গের স্বল্পতা লক্ষ করে প্রফেসর গোলাম আযম তাঁর 'শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামী রূপরেখা' শীর্ষক পুস্তিকায় আক্ষেপ এবং বিষোদগার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে লেজুর হিসেবে 'ধর্মীয় শিক্ষা' নামে গতানুগতিক ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যাশা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামি জীবন দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে তুলে শিক্ষার বিষয় সমূহকে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ঢেলে সাজানো। তা নইলে তাঁর আশঙ্কা 'সাধারণ শিক্ষা ধর্মনিরপেক্ষই থেকে যাবে, যার ফলে মাদ্রাসা শিক্ষাও আলাদাভাবে চালু থাকবে। এভাবে দু'জাতের শিক্ষিত লোক তৈরি হতে থাকলে জাতীয় ঐক্য কখনো সৃষ্টি হবে না।' সুতরাং তাঁর সহজ সমাধান এবং চূড়ান্ত নিদান বিদ্যালয় শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে বিপুলত করে ইসলামের জীবন দর্শন নির্ভর মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবস্থা করা – 'গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে একমুখী ও সমন্বিত করতে হলে হলে শিক্ষাকে ইসলামীকরণের বিকল্প নেই।'

দেখুন. আযম. অধ্যাপক গোলাম, *শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামী রূপরেখা,* বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ. ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ. ৬

৮. গ্রামশি. আনতোনিও, *বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা* (সম্পাদনা ও অনুবাদ : বন্দ্যোপাধ্যায়. শমীক ও ভট্টাচার্য. সৌরীন), অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি. ২০১৪, পৃ. ১৫ – ১৬

৯. নাগ. অরুণ, 'বিশ্বাসের জমি : দীক্ষিতকরণ ও অভিভাবন', দেখুন. *পাঁচমিশালি,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০২০, পৃ. ২৭৭ – ২৮৩

১০. লাহিড়ী. আশীষ, 'ধর্ম যখন ইতিহাসের বাহন', *ইতিহাস্যকর সংখ্যা, রোববার,* অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), ১১ জুন ২০২৩, পৃ. ৮

১১. সেন. প্রবোধচন্দ্র, 'শিক্ষার লক্ষ্য', দেখুন. *রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ জানুয়ারি. ১৯৯১, পৃ. ৫৯ – ৬০

১২. গনি, ড. ওসমান, *চরিত্র ও সমাজ গঠনে কোরাআন শরীফ,* (চতুর্থ খণ্ড), পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩৫৭

১৩. কাসেমী, আব্দুল হামিদ, *সর্ব-বৃহৎ হাক্কানী নামাজ ও মাসআলা শিক্ষা,* রহমানিয়া লাইব্রেরী, মগরাহাট, ২০১১, পৃ. ২৩৮

১৪. কাসেমী, আব্দুল হামিদ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২৩৯

১৫. 'বেদাত' হওয়ার জন্য সঙ্গীত বা চিত্রকলা, নাট্যাভিনয় বা নৃত্যকলা সম্পর্কে ধর্মবিশ্বাস-আশ্রিত একধরনের আপত্তি দীর্ঘকাল ধরেই প্রচলিত ছিল। বিশ শতকের প্রারম্ভেই (১৯০০ সালে) আমরা দেখতে পাই *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকায় থিয়েটারের সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ায় তার মুসলমান সম্পাদককে নিদারুণ ভর্ৎসনা করছিলেন *ইসলাম প্রচারক* সম্পাদক। ইসলামে সঙ্গীত সিদ্ধ কিনা এই নিয়ে ১৯২০-র দশক জুড়েই *ইসলাম দর্শন, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মহাম্মদী, শিখা* প্রভৃতি পত্রিকায় বাদ-প্রতিবাদ চলেছিল।

১৬. 'সাম্প্রদায়িক সাহিত্য' কথাটি কাজী আব্দুল ওদুদ মহাশয়ের, দেখুন. ওদুদ, কাজী আব্দুল, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ,* (সংকলন ও সম্পাদনা) মণ্ডল. বরেন্দু, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৪৫ – ২৫৫

১৭. আনিসুজ্জামান, 'বাঙালি মুসলমান লেখকদের ভাবজগৎ', দেখুন. *স্বরূপের সন্ধানে,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৪১৬, পৃ. ৭৪

১৮. রায়, বিনয়ভূষণ, *'শিক্ষাসার' থেকে 'বর্ণপরিচয়' – সমাজের সঙ্গে প্রাথমিক পাঠর বিবর্তন – বিদ্যাসাগরের ভূমিকা,* চিকিতুষী প্রকাশনী, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ২৬১ – ২৬২

১৯. রায়, বিনয়ভূষণ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ ২৬০

২০. আনিসুজ্জামান, 'বাঙালি মুসলমান লেখকদের ভাবজগৎ', ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৭৪

২১. আচার্য, পরমেশ, *বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৫০

২২. আচার্য, পরমেশ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৫১

২৩. আনিসুজ্জামান, 'বাঙালি মুসলমান লেখকদের ভাবজগৎ', ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৬৪

প্রথম অধ্যায়

উনিশ শতকের বাঙালির বিভাজিত শিক্ষাপদ্ধতি এবং মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস

১. উনিশ শতকের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবন

বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে উনিশ শতক এক তাৎপর্যপূর্ণ সময় ও বিবিধ বৈচিত্রের ভাঁড়ারঘর। শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্প, ধর্ম ও জাতি চিন্তার রদবদলের কাল এই শতক। সদ্য জেগে ওঠা মুদ্রণ ব্যবস্থাকে নির্ভর করে এই শতক যেমন মানুষের মধ্যে নিহিত প্রগতিশীল ভাবনাচিন্তাকে উস্কে দিয়ে বাংলার নবজাগৃতিকে আহ্বান করেছে তেমনভাবেই উজান স্রোতেও হেঁটেছেন কেউ কেউ। নতুন ঔপনিবেশিক শাসকের জমানায় বদলেছে শাসকের শাসনকেন্দ্র – রাজধানী। ফলে কেন্দ্র ও প্রান্ত নতুন চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ফলে গড়ে উঠেছে নতুন অর্থনৈতিক শ্রেণি। 'টাকা'কেন্দ্রিক নতুন এই শ্রেণির চাহিদা পূরণের জন্য বদলে গেছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, মূল্যবোধ ও প্রচলিত জীবন কাঠামো। গড়ে উঠেছে বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও নতুন নতুন বাজার।

অবশ্য আধুনিকতার আলো ঝলমলে পথে বাঙালি সংস্কৃতির যে সবটাই খোলনলচে বদলে গেলো এমনটি নয়, উনিশ শতকের কলকাতায় সাংস্কৃতিক গতিশীলতা দুটি স্বতন্ত্র্য ধারায় বিকশিত হয়েছে বলে অনেক সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'উনিশ শতকের কলকাতা ও সংস্কৃতির ইতর সন্তান' গ্রন্থে দেখিয়েছেন সর্বদেশে সংস্কৃতির 'রাজপথ' ও 'জনপথ' স্বতন্ত্র্য এই দুই ধারাই একসঙ্গে সচল থেকেছে।[১] এ প্রসঙ্গে তিনি Robert Redfield এর প্রাসঙ্গিক উক্তি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন –

> The great tradition is cultivated in school or temples; the little tradition works itself out and keep itself going in lives of the unlettered in their village communities.[২]

অর্থাৎ অভিজাত সংস্কৃতির চর্চা হয় বিদ্যালয় ও মন্দিরে; অখ্যাতজনের সংস্কৃতি নিজেকে তৈরি করে এবং চালু রাখে গ্রামীণ নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনকে অবলম্বন করে। স্বাভাবিকভাবেই

উনিশ শতকের যে বাঙালি সংস্কৃতি আমরা তার দুটি ধারা লক্ষ করবো। একটি ধারা রচিত হয়েছে পাশ্চাত্যের আলোকপ্রাপ্ত নাগরিক বৃত্তকে অবলম্বন করে এবং অপর ধারাটি রচিত হয়েছে গ্রামীণ নিরক্ষর মানুষদেরকে অবলম্বন করে। ফলে উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতির থরে থরে সজ্জিত হয়েছে নানা ধরণের স্ববিরোধ, বহুবিধ বিরুদ্ধ বচনে ভরপুর আমাদের আধুনিকতা তাই কোনো সামাজতাত্ত্বিক উনিশ শতকের স্বরূপ চিহ্নিত করতে রূপক ব্যবহার করেন এবং এই শতককে চিহ্নিত করেন 'শস্যের ভিতরে রৌদ্র' বলে।[৩] আবার কেউ কেউ এই শতকের নানাবিধ বিরুদ্ধ বচনের স্বরূপ লক্ষ করে এই যুগকে চিহ্নিত করেন 'উজান স্রোতের কাল'[৪] বলে।

অতঃপর উনিশ শতকের প্রত্যেকটি দশকে ঘটে যাওয়া নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাসমূহের প্রতি আমরা আলোকপাত করবো এবং বাঙালির জাতিসত্তা নির্মাণে এই সমস্ত ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করবো। প্রসঙ্গত, উনিশ শতকের শিক্ষার সামাজিক সাম্প্রদায়িক বিভাজন এবং মাদ্রাসা শিক্ষার গতিমুখ নির্ধারণে এই সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১.ক. ১৮০০ – ১৮১০

এই শতকের শুরুতেই আমরা দেখেছি ১৮০০ সালের ১৪ নভেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যার উদ্দেশ্য এদেশে ইংরেজ সিভিলিয়নদের দেশীয় সমাজ-সংস্কার-সাহিত্য বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দান। পাশাপাশি শ্রীরামপুর ব্যপটিস্ট মিশন ও শ্রীরামপুর পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা লক্ষ করবো ১৮০০ থেকে ১৮০৯ সাল পর্যন্ত শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত পঁচিশটি বাংলা বইয়ের মধ্যে দশটিই বাইবেল সংক্রান্ত বই। অর্থাৎ গদ্য চর্চার অছিলায় এদেশে খ্রিষ্টীয় চিন্তাভাবনা এবং খ্রিষ্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করবার ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠান দুটির অবদান বিস্মৃত হবার নয়। মনে রাখতে হবে এ'বছরেই কৃষ্ণচন্দ্র পাল নামে এক ছুতোরের ভাঙা হাতের চিকিৎসা ও সেবা করার মধ্যে দিয়ে প্রথম কোনো দেশীয়কে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় শাসকের মর্জি মোতাবেক ভৃত্যের উপকার ও তার সমর্থন আদায়ের সূচনা এখান থেকেই শুরু হলো। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভবতোষ মনে করেন যে, ঔপনিবেশিক শাসনের গোঁড়ায় মিশনারিদের হাত ধরে বাঙালিদের 'মন' গঠনের একটা প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ এতকাল ধরে নানা সংস্কার ও বিশ্বাসে গড়ে ওঠা মনের প্রকোষ্টগুলিকে বদল করে ঔপনিবেশিক প্রভুদের

নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার তাগিদ লক্ষ করা গেলো। প্রসঙ্গত অধ্যাপক শ্রী দত্ত তাঁর 'বাংলার জাগরণে মিশনারিদের অবদান' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন –

> যিশু জগতের পরিত্রাণের জন্যই আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর বাণী শোনাতে হবে – এই বিশ্বাসেই পাদ্রিরা ধর্ম প্রচার করতে বেরিয়েছিলেন। সোজাসুজি ধর্ম প্রচার করা ছাড়াও শিক্ষার সাহায্যে আমাদের প্রচলিত 'কুসংস্কার' দূর করে জনসাধারণের মনকে প্রস্তুত করে নেওয়া দরকার। আমাদের দেশেও এক শিক্ষানীতি চলে আসছিল। সেই শিক্ষানীতিতে আমরা টোলে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চা করেছি, মাদ্রাসায় ইসলামি শাস্ত্রের চর্চা করেছি। আর পাঠশালায় শিখেছি প্রাথমিক বাংলায় পুথি পড়া, পুথি লেখা এবং শুভঙ্করী গণিত। ... খ্রিস্টের বাণীকে গ্রহণ করতে হলে মনের অন্ধ সংস্কারকে সরিয়ে ফেলতে হবে। সেজন্য নতুন ধরণের বিদ্যার চর্চার হওয়া দরকার। মিশনারিরা তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে রেখে দেশীয় মানুষের মনের অন্ধতা কাটাতে নতুন বিদ্যার সূচনা করলেন। তাঁরা যে শিক্ষার সূচনা করলেন সেই শিক্ষা আমাদের চিরাগত শিক্ষার থেকে আলাদা।[৫]

এই 'আলাদা শিক্ষা' ব্যবস্থা এতটাই রমরমিয়ে বাজার দখল করলো যে, অচিরেই ভারতবর্ষের কেন্দ্র থেকে প্রান্ত মিশনারি শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সাধু সন্তদের নামাঙ্কিত স্কুল কলেজগুলি দেশে আদর্শ শিক্ষালয়ে পরিণত হয়ে উঠলো। পরিসংখ্যান থেকে আমরা জানতে পারছি যে -

> ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ন্যাশনাল ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিলের পরিচালনায় সারা ভারতবর্ষে ৪৬ টি কলেজ, ৪৪৮ টি উচ্চবিদ্যালয়, ৫৫৩ টি মাধ্যমিক স্কুল, ১০৩ টি শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ ছিল। আর ১৯৫১ সালে রোমান ক্যাথলিকদের ছিল ৪২ টি কলেজ, ৪৭৭৪ টি উচ্চবিদ্যালয় এবং ৪৩৬২ টি প্রাথমিক স্কুল।[৬]

অর্থাৎ জনশিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারিরা উনিশ শতক থেকেই বাংলার জনগণের মন দখল করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁরা যে সফল হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এভাবে বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার হাত ধরে যে ঔপনিবেশিক প্রভুরা আসলে মগজ মেরামতের অভিযানে নেমেছিলেন সে সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক বিনয় সরকার তাঁর 'মগজ মেরামতের হাতিয়ার' গ্রন্থে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন - মানুষের জীবন গঠনে পরিবার বড়ো নাকি পাঠশালা বড়ো? এই প্রশ্নে পাঠশালার ভূমিকা অপরিহার্য।[৭] আর পরিবার হোক বা পাঠশালা হোক দুটি ক্ষেত্রেই ধর্মের অনুপ্রবেশ খুবই সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে মানবচিত্তকে দখল করবার প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রও সমানভাবে উঠে পড়ে লাগে। তাই শিক্ষাব্যবস্থা

পরিচালনার মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র ও সংগঠিত ধর্মের যে সচতুর অভিসন্ধি পরিলক্ষিত হয় সে প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন –

> মানবগঠনে পাঠশালার অদ্বৈতশক্তি সমাজ বিজ্ঞান স্বীকার করিতে অসমর্থ। ... পুরুত ঠাকুরেরা অথবা পৌরহিত্য-বাদীরা পরিবার ও পাঠশালা উভয়ের সঙ্গেই ধর্মকর্মের, দেবদেবীর, মন্দিরতীর্থের আসন দাবী করিতে অভ্যস্ত। এমনকি তাঁহাদের বিবেচনায় ধর্মশক্তি মানবচিত্তকে এবং মানবমনকে যত বেশী নিয়ন্ত্রিত করে তত বেশী আর কোনো শক্তি করে না। এই ধরণের বাড়াবাড়ি চালাইয়া থাকেন রাষ্ট্রবাদীরাও। তাঁহারা বলিবেন – "পুলিশ, জেলখানা, আদালত, ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পরিবার, পাঠশালা, ধর্ম্মকর্ম্মর কোনোটার চেয়ে কম নয়"[৮]

সুতরাং শিশুজীবনের প্রারম্ভিক পর্যায় থেকেই তার উপর বিদ্যালয়, ধর্ম আর রাষ্ট্রের ব্যাপকতর প্রভাব অনিবার্য এবং অপ্রতিরোধ্য। মিশনারি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও তার কোনো ব্যত্যয় লক্ষ করা যায়নি।

উনিশ শতকের প্রথম দশকে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য ঘটনাগুলি হলো ১৮০২ সালে বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি আইন প্রণয়ন করে গঙ্গাসাগরে মানত করে শিশু সন্তান বিসর্জন দেবার কুৎসিত প্রথা রদ করেন। ১৮০৩ সালে সতীদাহ প্রথা বা সহমরণ নামক বর্বর প্রথা নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আলোচনার জন্য সভা ডাকা হয় এবং সতীদাহ প্রথা রদ করার স্বপক্ষে রায় ঘোষিত হয়। রামমোহন রায় তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য কলকাতায় আসেন কিন্তু পারিবারিক গোলযোগের কারণে তিনটি পৃথক শ্রাদ্ধ হয়। ১৮০৭ সালে খিদিরপুরে ভারতীয়দের মালিকানায় জনৈক ব্রাহ্মণ বাবুরামের পরিচালনায় প্রথম ছাপাখানা চালু হয়। এবছরেই খিদিরপুর ডক থেকে প্রথম বাস্প চালিত জাহাজ *জনসোর* যাত্রা শুরু করে। ভারতবর্ষে দাস ব্যবসা বন্ধ করার প্রচেষ্টাও শুরু হয় এবছর থেকেই। আমরা লক্ষ করবো ১৮০৭ সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে ফারসি ভাষায় একটি বই প্রকাশিত হবে যার প্রতিপাদ্য, ইসলামের চেয়ে খ্রিস্ট ধর্ম উন্নত। কিন্তু সমকালীন শাসক তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তারে এতটাই কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন যে ডেনমার্কের রাজার পরামর্শ নিয়ে আঠারোশো কপি বই বাজেয়াপ্ত করা হবে ও পুড়িয়ে ফেলা হবে। ১৮০৯ সালে কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের অনুমতিক্রমে লণ্ডনের ব্যঙ্ক পরিচালনার নিয়ম মেনে কলকাতায় প্রথম স্থাপিত হলো ব্যাঙ্ক ও বিমা সংস্থা – *দি ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল* যা পরবর্তীকালে *স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া* নামে সুখ্যাতি অর্জন করবে।

সব মিলিয়ে উনিশ শতকের একেবারে গোঁড়ায় ধর্ম, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালি জীবনে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সূচিত হলো। শিক্ষার আদর্শ নির্মাণে ঔপনিবেশিক প্রভুরা এতদূর সফল হলেন যে, সেকালের একদল মানুষের মনে ক্রমে ক্রমে এই বোধ জন্মাতে শুরু করবে যে, 'তথাকথিত মধ্যযুগ ছিল কুসংস্কার, বিশৃঙ্খলা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, হানাহানির যুগ; হিন্দু প্রজাদের উপর মুসলমান শাসকদের অত্যাচারের যুগ।'[৯]

অতঃপর সেই মুসলমানদের নানাদিক থেকে কোণঠাসা ও প্রান্তিক করে তোলবারও নানা অভিসন্ধি অভিপ্রায় লুকিয়ে থাকলো এই শতকের অলিন্দে।

১.খ. ১৮১১ – ১৮২০

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকটিও বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতিতে নানা দিক থেকে ব্যপক প্রভাব ফেলেছিল। এই দশকের গোঁড়াতেই আমরা লক্ষ করবো ১৮১১ সালের ৬ মার্চ লর্ড মিন্টো একটি চিঠিতে এদেশের মানুষের শিক্ষার অভাব লক্ষ করে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। বিলেতে একটি চিঠিতে তিনি লিখে পাঠান – 'শিক্ষার অভাবেই এদেশে চুরি ডাকাতি বেশি। শিক্ষা প্রচারই এদেশে চুরি ডাকাতি বন্ধ করবার প্রকৃত পন্থা।'[১০] অর্থাৎ এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা আমদানির ব্যাপারে একবারে বাস্তব যুক্তি উপস্থাপন করা হলো। আর এই বছরেই জুন মাসের প্রথম দিনে আমেরিকানরা মার্শম্যানকে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য 'ডক্টর অফ ডিভিনিটি' উপাধি দান করছে।

১৮১২ সাল নাগাদ সতীদাহ প্রথার মতো ঘৃণ্য প্রথা রদ করার জন্য সরকারের উপর রাজকর্মচারী ও মিশনারিদের চাপ বাড়ছিল। সতীদাহ প্রথা শাস্ত্রসিদ্ধ কিনা এবিষয়ে প্রশ্ন ও সংশয় বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পণ্ডিতদের পক্ষে ঘনশ্যাম শর্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নারীদের সহমৃতা হবার শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা দিলেও প্রমাণ করেন যে সদ্যবিধবাকে চৈতন্যলোপ করে বলপূর্বক সহমরণে বাধ্য করানো শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যেহেতু সেকালে সকল সহমরণই বলপূর্বক হত তাই ঘনশ্যাম শর্মার শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা বিশেষ নজর কাড়ে। তবে লক্ষ করবার বিষয় শাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ও সংশয় সৃজনও বিশেষভাবে এই দশকেই নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

১৮১৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এক সনদ দ্বারা এদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার হরণ করলে বাঙালিরা ইংরেজদের সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবসা করার সুযোগ পান।

এবছরই সুপ্রিম কোর্টের আদেশে কলকাতা শহরের সীমার মধ্যে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা হবে কিন্তু কিন্তু আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে 'ধর্মমতে' সতীদাহ বৃদ্ধি পেতেই থাকে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নির্দেশ মোতাবেক ভারতের প্রজাকূলের শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষা সনদ গড়ে তোলা হয় এবং প্রতিবছর ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা করে ব্যয় করার কথা ঘোষণা করা হয়। এদেশি সরকার অবশ্য ঐ টাকা কেবলমাত্র সংস্কৃত টোল ও মাদ্রাসার উন্নতিকল্পেই খরচ করলেন। ১৮১৩ সাল নাগাদ এদেশে খ্রিস্টান যাজকদের কলকাতায় আগমনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থেকে। উদ্দেশ্য কলকাতার বিধর্মী বা 'প্যাগান'দের ধর্মান্তরিত করে ঐশ রাজ্যে তাদের পৌঁছে দেওয়া। 'খ্রিস্টিয় দেবলোকে' বিধর্মীদের পাঠাবার সদুদ্দেশে তাঁরা নিজেরা প্রায়ই নানা বিবাদে জড়িয়ে পড়তেন। লক্ষ করবার বিষয় এই বছরেই ৭ অগাস্ট রামরাম বসুর মৃত্যু হয়। রামরাম নিজে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ না করলেও জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁর 'The Life and times of Carey, Marshman and Ward Vol – I' -এ খ্রিষ্টতত্ত্ব প্রচারে তাঁর দানকে স্বীকার করেছেন।[১১]

১৮১৪ খিস্টাব্দের ১৪ জুলাই থেকে রামমোহন রায় কলকাতায় বসবাস শুরু করেন এবং সমাজ সংস্কারের জন্য নানারকম চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এ'বছরই শ্রীরামপুরে কলেজ স্থাপিত হয়। এশিয়ার মধ্যে এখান থেকেই প্রথম খ্রিস্টান থিয়োলজির ওপর ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে কলকাতা মিউজিয়াম এটি এদেশের বৃহত্তম ও এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রাচীনতম জাদুঘর। ১৮১৫ সালে রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠা করলেন *আত্মীয়সভা* । হিন্দুধর্মের সত্যরূপ জনমানসের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অশেষ। এখানে পৌত্তলিকতার পাশাপাশি বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি কদর্য প্রথা নিরাময়ের জন্য আলোচনা হতো। এইবছরেই রামমোহন রায় *বেদান্ত গ্রন্থ* অনুবাদ ও ভাষ্যসহ প্রকাশ করলেন। উদ্দেশ্য একেশ্বরবাদের প্রচার। সরকারি নথি মতে এবছরই কলকাতায় 'সতী' হতে হয় ২৫৩ জনকে, ১৮১৬ সালে সংখ্যাটা দাঁড়াবে ৪৪২।

১৮১৬ সালে বাংলার প্রথম সচিত্র পুস্তক *অন্নদামঙ্গল* প্রকাশ করেন প্রথম বাঙালি প্রকাশক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। মিশনারিদের উদ্যোগে বহুসংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি এবছরই প্রথম *লিপিধারা* নামে বারো পৃষ্ঠার একটি বই অর্থাৎ প্রাইমার প্রকাশিত হল। হেদুয়ার কাছে শুঁড়িপাড়ায় রামমোহন রায় একটি ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। *একটি উন্নত বিদ্যালয়* (হিন্দু

কলেজ) প্রতিষ্ঠার জন্য সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি এডোয়ার্ড হাইড ইস্টের গৃহে কথাবার্তা শুরু হয়।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার ইংরেজ ও বাঙালি বিদগ্ধজনেরা কলেজটিকে স্থায়ী করতে আর্থিক সাহায্য করেন। গোঁড়া হিন্দুত্বের প্রতিভূ শোভাবাজার রাজবাড়ি কলেজের নির্মাণকার্যে সহযোগিতা করে। মনে করা হয় এই বাড়ির বিরোধিতাতেই রামমোহনকে সরে যেতে হয়। এতকাল বাংলায় যে পাঠ্যপুস্তকের অভাব ছিল তা পূরণের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা, বিক্রি ও প্রকাশের উদ্দেশে *কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি* গড়ে ওঠে এবছরই। সোসাইটির পক্ষ থেকে পরের বছর স্টুয়ার্ট লিখলেন বংভাষার দ্বিতীয় প্রাইমার – *বর্ণমালা*। এই বছরেই ২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় চার্চ মিশনারি সোসাইটি (C.M.S) -এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এঁরা কলকাতা ও অন্যন্য শহরে এবং গ্রামে বহু বিদ্যালয় স্থাপন করে।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ বাঙালি সংবাদিকতা ও প্রকাশনার জন্ম বছর। এপ্রিল মাসে জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রথম বাংলা মাসিক সাময়িকপত্র *দিগদর্শন* প্রকাশিত হয়। ১৫ মে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের *বঙ্গাল গেজেটি* দিয়ে শুরু হল বাঙালির সাংবাদিকতা। *সমাচার দর্পণ* সাপ্তাহিকটিও প্রকাশ শুরু হল এবছরেই – ২৩ মে থেকে। বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন প্রণালীতে ইংরাজি ও বাংলা শিক্ষার জন্য বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন ও *কলিকাতা স্কুল সোসাইটি* স্থাপিত হয়। এখান থেকে উত্তীর্ণ ছাত্ররা হিন্দু কলেজে ভর্তির সুযোগ পেতেন। ইওরোপের নতুন নতুন আবিষ্কার ও সৃষ্টির সংবাদ পরিবেশনের জন্য এবছরেই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে থাকল *ক্যালকাটা ক্রণিকল অফ পলিটিকাল, কমার্শিয়াল অ্যাণ্ড লিটেরারি গেজেট*। এটি ভারতের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। কাগজটি ভারতে ইংরেজ শাসনের সমালোচনা ছাপাতে খ্যাতি অর্জন করেছিল। লক্ষণীয় এবছরই ইংরেজ শাসকের সমালোচনার জন্য *বেঙ্গল হরকরা* র সম্পাদক চার্লস ম্যালকিনকে গ্রেপ্তার করে এদেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। এবছরই প্রথম বাংলা ভাষায় পঞ্জিকা প্রকাশিত হয় বটতলা থেকে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই বছরেই ঘুসুরিতে ভারতের প্রথম কাপড়কল প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮১৯ সালে কলকাতার হিন্দু নারীদের বিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষা দেবার জন্য গঠিত হল *ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি* । রাজা রাধাকান্ত দেব *স্ত্রী শিক্ষা* নামক পুস্তক রচনা করে

সোসাইটিকে উৎসাহিত করলেন। বাংলা ভাষার প্রথম কোষগ্রন্থ *বিদ্যাহারাবলী* প্রকাশিত হল ফেলিক্স কেরির সম্পাদনায়। *সমাচার দর্পণ* - এর ভাষ্য অনুযায়ী জনৈক যুবক মাহেশের রথযাত্রায় জুয়া খেলতে খেলতে সর্বস্ব হারিয়ে দশ টাকায় নিজের যুবতী স্ত্রীকে বিক্রি করলেন।

১৮২০ সালে সরকারি উদ্যোগে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতা মাদ্রাসার নতুন ভবন নির্মিত হল। ২০ অক্টোবর চাঁদনি চক অঞ্চলে দুর্গাপুজো ও মহরম উপলক্ষে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা। ফলে মুসলমান বাঈজিদেরকে দুর্গাপুজোর উৎসবে গান শোনাবার বরাত দিলেন না বাবুরা। মুসলমান বাঈজীদের প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে আদতে মুসলমানদেরকেই প্রত্যাখ্যানের এই বার্তা উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে পরখ করেছে বাঙালি মুসলমান সমাজ।

১.গ. ১৮২১ – ১৮৩০

উনিশ শতকের এই দশকটি নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন রায় সামাজিক নানা কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশে *ইউনিটারিয়ান কমিটি* গঠন করলেন। বিলেতের 'ব্রিটিশ অ্যণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি কিছু অর্থ সংগ্রহ করে মিস ম্যারি অ্যান কুককে এদেশে নারী শিক্ষার উন্নতিবিধানের জন্য প্রেরণ করেন। ১৮২১ সালেই শিশুদের প্রাথমিক বাংলা শেখাবার জন্য প্রকাশ করলেন *বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ*। এই বছরেই ২১ অগাস্ট ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৮২২ সালে কলকাতা থেকে প্রথম ফারসি পত্রিকা *মীরাৎ-উল–আকবর* প্রকাশিত হয় রামমোহন রায়ের সম্পাদনায়। এবছরই রামমোহন রায়ের উদ্যোগে *অ্যাংলো-হিন্দু-স্কুল* স্থাপিত হয় বাংলা ও ইংরাজি দুটি ভাষাকেই সম্যক রূপে শিক্ষা দেবার জন্য। এমনকি সংস্কৃত কলেজের অপ্রয়োজনীয়তা দর্শিয়ে আমহার্স্টকে ১৮২৩ সালে একটি চিঠিও পাঠাচ্ছেন রামমোহন। চিকিৎসা বিদ্যায় দেশীয়দের শিক্ষা দেবার জন্য *স্কুল ফর নেটিভ ডক্টরস* স্থাপিত হয় এবছরেই। ১৮২৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি হিন্দু ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা ও সমাজে সুনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য রামকমল সেনের উদ্যোগে হিন্দু কলেজ হলে রাত আটটায় স্থাপিত হল *গৌড়ীয় সমাজ*। কলকাতা ও নিকটবর্তী স্থানে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশে কোম্পানি *কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন* গড়ে তোলেন এই বছরেই। এ'বছরেই প্রকাশিত হয় প্যারীচরণ সরকারের ইংরাজি শিক্ষার প্রাথমিক ও জনপ্রিয়তম বই *ফার্স্ট*

বুক অফ ইংলিশ লিটারেচার। বাংলায় বিদ্যাসাগরের দুইখণ্ডে রচিত *বর্ণপরিচয়* - এর সঙ্গে তুলনীয় এই বই।

উনিশ শতকের শেষভাগের আগে পর্যন্ত এদেশে জাতীয়তার বোধ ছিল না একথা প্রমাণ করার জন্য কলকাতার দ্বিতীয় বিশপ হেবার ১৮২৪ সাল নাগাদ তাঁর উত্তর ভারত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা থেকে লিখছেন, উত্তর ভারতের লোকেরা বাঙালিদের ইংরেজদের মতোই বিদেশী মনে করে। হেবারের উদ্দেশ্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। এই বছরে ২৫ ফেব্রুয়ারি গোলদিঘির উত্তরে কলেজ স্কয়ারে ডেভিড হেয়ারের ৫ বিঘা ৭ কাঠা জমিতে হিন্দু স্কুল এবং সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার ১৫ মে মুসলমান বহুল কলিঙ্গা (বর্তমানে ওয়েলেসলী স্ট্রিটে) সরকয়ার কলকাতা মাদ্রাসার আরেকটি শাখার ভিত্তি স্তাপন করেন, ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এখানে পড়াশুনা শুরু হয়।

১৮২৫ সালে প্রকাশিত হচ্ছে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নববাবুবিলাস* ও *দূতীবিলাস*। সেকালের বাবু সমাজের সকল গোপনীয়তা লিপিবদ্ধ হয়েছে বই দুটিতে। মুসলমান প্রধান এন্টালি ও জানবাজারে *দ্য ক্যালকাটা লেডিস অ্যাসোসিয়েশন ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন* – এর উদ্যোগে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মুসলমানদের সক্রিয় সহযোগিতা লক্ষণীয়। এবছরই কলকাতায় বসন্ত ও ওলাওঠার প্রকোপ। স্বাস্থ্য বিষয়ে সরকারকে যা ভীষণ ভাবিয়ে তুলেছিল। ১৮২৬ সালে সংস্কৃত কলেজে *বৈদ্যক বিভাগ* খোলা হয় স্বাস্থ্য সুরক্ষার নামে। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ডিরোজিও হিন্দু কলেজে ইংরেজি ও ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।

১৮২৮ সালে রামমোহন রায় *ব্রাহ্মসমাজ* স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য – একেশ্বরবাদী আদর্শে জাতি, বর্ণ, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে এক সমাজে সমবেত করা। এবছরই প্রথম ভারতীয়রা এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যপদ পাবার জন্য অনুমোদন লাভ করে। ইংরাজি ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য গৌরমোহন আঢ্যের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হল *ওরিয়েন্টাল সেমিনারি*। কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও আধুনিক 'ক্যাপিটালিস্ট' প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮২৯ সালেই প্রতিষ্ঠা করলেন *ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক*। এই বছরের ৮ নভেম্বর লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ উচ্ছেদ বিষয়ে তাঁর ঐতিহাসিক মিনিট কাউন্সিলের সামনে পেশ করেন। ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর আইন প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে সতীদাহ-সহমরণ প্রথা নিষিদ্ধ হয়।

সতীদাহ ও সহমরণ নিষিদ্ধ করার অপরাধে রামমোহনকে ১৮৩০ সালে আরো একবার হত্যা করার চক্রান্ত হল। এইবছরই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিশুদ্ধ রীতিতে' প্রকাশ করলেন *শ্রীমদ্ভাগবত*। বিজ্ঞাপনে জানানো হলো – অক্ষর যোজন করবেন ব্রাহ্মণরা ও কালি তৈরি হবে গঙ্গাজল দিয়ে। অতঃপর বিজ্ঞাপনে লেখা হয় –

> চন্দ্রিকাযন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্য বিজ্ঞাপনমিদং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের অপ্রাপ্তি দূর করণার্থে ছাপা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুলাত কাগজে পাচীন ধাবামত পুস্তকের পাত করিয়া বড়ো অক্ষরে মূল ক্ষুদ্রাক্ষরে শ্রীধর স্বামীর টীকা এই প্রণালীতে সংশোধিত করিয়া চন্দ্রিকাযন্ত্রে ব্রাহ্মণ দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করাইব ... 'সমাচার দর্পণ', ২৫ আগস্ট ১৮২৭।[১২]

উক্ত বিজ্ঞাপন থেকে অতি সহজেই রক্ষণশীল হিন্দুর মনোজগতের পরিচয় লাভ করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে এই বছরেই হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্র কলকাতার মনুমেন্টের মাথায় 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতায়' উদ্দীপ্ত হয়ে ফরাসি বিপ্লবের তিনরঙা পতাকা উড়িয়ে তৎকালীন শাসককে সমঝে দেবার চেষ্টা করলেন। এবছরই রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ অসংযত ভাষায় হিন্দু ধর্মকে আক্রমন করলেন। তাঁর মতে জগতে যত মিথ্যা ধর্ম আছে হিন্দু ধর্ম তাদের অন্যতম এবং এখানে ভগবানের প্রচারিত সত্যের বিরোধী মত স্থান পেয়েছে। আমরা দেখবো ভবিষ্যতে হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা তাঁর যোগ্য জবাবদিহি করতে এগিয়ে আসবেন।

১.ঘ. ১৮৩১ -১৮৪০

এই দশকের শুরুতেই প্রসন্নকুমার ঠাকুরের শুঁড়ার বাগানবাড়িতে বাঙালির উদ্যোগে প্রথম নাট্যশালা স্থাপিত হয়। নাম – *হিন্দু থিয়েটার*। ২৮ জানুয়ারি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রকাশ করলেন বিখ্যাত সংবাদপত্র – *সংবাদ প্রভাকর*। এবছরই শেখ সালিমুল্লার সম্পাদনায় প্রকাশিত হবে সাপ্তাহিক পত্রিকা *সমাচার সভারাজেন্দ্র*। এটি কলকাতায় মুসলমান পরিচালিত প্রথম সাময়িকপত্র। হিন্দু কলেজের নব্যবঙ্গরা এই বছর তাদের অসহায়তা ভুলতে গোঁড়া হিন্দুদের বাড়িতে গো-হাড় নিক্ষেপ করে। ঘটনাটা বিচ্ছিন্ন হলেও সেই রাত্রেই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিবার ও প্রতিবেশীদের হুমকিতে গৃহত্যাগ করতে হয়। ৩১ ডিসেম্বর শিশুদের জন্য মাসিকপত্র *জ্ঞানোদয়* প্রকাশিত হতে আরম্ভ করলো।

১৮৩২ সালের অক্টোবর মাসে আলেকজাণ্ডার ডাফের কাছে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা নিলে হিন্দু সমাজ কাতর ও বিহ্বল হয়ে পড়ল। হিন্দু সমাজে যুগপৎ আতঙ্ক, ত্রাস ও ক্রোধের সঞ্চার হল। ডিসেম্বরে হিন্দু কলেজের আর এক মেধাবী ছাত্র গোপীনাথ নন্দী একই কাজের পুনরাবৃত্তি করলে হিন্দু সমাজে চরম হতাশা নেমে আসে। এইভাবে খ্রিষ্ট ধর্মে নাম লেখানো এবং মুসলমানদের বারবাড়ন্তে উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দু সমাজ যে ব্যাপক দুশ্চিন্তায় পড়েছিল তার নমুনা ধরা পড়বে U.N Mukherjee র 'Hindus : A Dying Race' শীর্ষক প্রবন্ধে।[১৩] যার ফলশ্রুতিতে আমরা লক্ষ করবো উনিশ শতকে মুসলমানকে 'অপর' বলয়ে দাগিয়ে দেওয়া হবে এবং হিন্দুরা পুনর্গঠিত হবার চেষ্টা করবে।

এই বছরেই ১৮৩৩ সালে ইংল্যাণ্ডের ব্রিস্টলে রামমোহন রায়ের মৃত্য হয়। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। ১৮৩৪ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল – *বিশ্ব প্রেমোদ্দীপনা সভা* । উদ্দেশ্য ধর্ম আন্দোলনের জন্য উদ্ভুত উগ্র সম্প্রদায়গত বৈরিতা দূরীকরণ এবং সমস্ত ধর্মের মধ্যে নিহিত মানবিক ও সমন্বয়ী বিষয়গুলির প্রসার ঘটানো। ১৮৩৫ সালে *মেকলে মিনিট* এ এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরাজিকে বাধ্যতামূলক করা হয়। লর্ড বেন্টিঙ্কও শিক্ষাখাতে শুধুমাত্র ইংরেজির জন্যই ব্যয় বরাদ্দ করতে মত পোষণ করলেন।

১৮৩৫ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বসু রচিত ***শব্দসার*** বেরোল। **এটিই বাঙালি রচিত প্রথম বাংলা প্রাইমার।** এই বছরেই জমিদারদের নিজস্ব সমিতি *ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি* স্থাপিত হয়। এটিই ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক সমাজ। ৬ অক্টোবর নবীন বসুর বাড়িতে *বিদ্যাসুন্দর* - এর সফল অভিনয় হয়। এই নাটকেই প্রথম স্ত্রীলোকের ভূমিকায় মহিলারা অভিনয় করলেন। রূপোপজীবী অবরোধবাসিনীরা সাংস্কৃতিক মঞ্চে যোগদান করে নজির গড়লেন। ১৮৩৬ সালে দর্শন, রাজনীতি ও সমাজসংস্কার-কল্পে স্থাপিত হল *বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা*। এই বছর জানুয়ারি মাসে মেডিকেল কলেজে পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্তের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ হয়। ১৮৩৭ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে ব্রিটেনের সিংহাসনে বসলেন মহারানি ভিক্টোরিয়া। পরের বছরেই জাতীয়তাবাদের প্রাণপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করলেন নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায়।

১৮৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৌত্তলিকতা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে *তত্ত্ববোধিনী সভা* প্রতিষ্ঠা করলেন। পরের বছর এঁরাই গড়ে তুলবেন *তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা*। ১৮৪০ সালে সরকারের

দশ নম্বরী আইন চালু হল। অতঃপর ইংরেজদের এদেশীয় লোকেদের পূজা-পার্বণে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ হল। হুগলির গুপ্তিপাড়ার বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পুজোর অনুসরণে কলকাতায় বারোয়ারি পুজো শুরু হল এবছর থেকে।

১.ঙ. ১৮৪১ – ১৮৫০

উনিশ শতকের পাঁচের দশক মূলত রামমোহনোত্তর বুদ্ধিজীবীদের কাল। এই শতক থেকেই বাংলার সাংস্কৃতিক ময়দানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগরদের কথা শোনা যাবে।

১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি দোষ নম্বর পার্কস্ট্রিটে সাঁ-সুসি নামে এক ইংরাজি নাট্যশালার উদ্বোধন হয়। প্রথম দিন অভিনীত নাটকের নাম 'দ্য ওয়াইফ'। ১৮৪২ সালে কলকাতায় টিপু সুলতান মসজিদ নির্মিত হয়। যার পেছনের ইতিহাস হলো, ১৮৪০ সালে টিপু সুলতানের উত্তরাধিকারী প্রিন্স গোলাম মহম্মদকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেকটরসভা তাঁর প্রাপ্য বকেয়া সব দিয়ে দেবার কথা ঘোষণা করে। এই ঘটনাকে 'আল্লার করুণা' বলে গ্রহণ করে গোলাম মহম্মদ ধর্মতলায় এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বছরেই ১০ জানুয়ারি শিক্ষা পরিচালনার জন্ত্য কাউন্সিল অফ এডুকেশন গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ১ জুন কলেরায় মারা জান ডেভিড হেয়ার। সেদিন ভারি দুর্যোগ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কফিনের সঙ্গে প্রায় সাত হাজার লোক শবযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন।

আমরা লক্ষ করবো ১৮৪৩ সালে দাস ব্যবসা, দাস রাখার প্রথা বন্ধের জন্য ভারতবর্ষের সর্বত্র দাসত্বপ্রথা আইনত নিষিদ্ধ করা হয়। এবছরেই জর্জ টমসন ও কয়েকজন ইয়ংবেঙ্গলির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় – *Bengal British India Society* এই সভার মাধ্যমেই প্রথম সর্বশ্রেণির মানুষের অধিকার ও স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। ২ জুলাই শিক্ষাবিদ লালবিহারী দে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। হিন্দু সমাজ আবারো বিমূঢ় হয়ে পড়ল। ২১ ডিসেম্বর থেকে *ব্রাহ্মধর্ম*–র সূচনা হল। এতকাল ব্রাহ্মসমাজ ছিল। বৈদিক অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ সহ ২১ জন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। বাঙালি হিন্দু সমাজের কাছে এই ঘটনাও খুব আনন্দের ছিল না। ১৮৪৪ সালে *হার্ডিঞ্জের ঘোষণাপত্রে* জনশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা বলা হয়। ১৮৪৫ সালের ২৫ অক্টোবর এডুকেশন কাউন্সিলের এক প্রস্তাবে 'কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বলা হয় এই বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হবে ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ক্ষমতাসম্পন্ন করে।

১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করতে শুরু করলেন *বিদ্যাকল্পদ্রুম* নামে বাংলা ভাষার প্রথম এনসাইক্লোপিডিয়া। পরের বছরে বারাসাতে শিক্ষাবিদ প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র ও নবীনকৃষ্ণ মিত্র কোনোরকম সরকারি সাহায্য ছড়াই একটি প্রকাশ্য নারীশিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। নাম – *বাঙালী বালিকা বিদ্যালয়* । উল্লেখ্য বেথুন সাহেব এই স্কুলটি পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হন এবং কলকাতাতে এটির অনুপ্রেরণায় ১৮৪৯ সালে *হিন্দু ফিমেল স্কুল* স্থাপন করলেন। লক্ষণীয় ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে অহিন্দু ছাত্রীদের প্রবেশাধিকার ছিলনা। এই বছরেই শিশুদের বর্ণমালা শিক্ষাদেবার জন্য মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সুপ্রসিদ্ধ *শিশুশিক্ষা* প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এটিই প্রথম প্রাইমার যেটি এদেশীয় বালিকাদের শিক্ষার জন্য রচিত হয়েছিল। ১৮৫০ সালে *সর্বশুভকরী পত্রিকার* প্রকাশ আরম্ভ হয়েই বছরেই ঐ পত্রিকায় মুসলমান শাসন ও ইংরেজ শাসনের তুলনামূলক আলোচনা করা হয় এবং বলা হয় যে 'দুশ্চরিত্র যবন জাতি'র অশুভ শাসন লুপ্ত হয়ে এখন শুভদিন পাওয়া গিয়েছে। অতঃপর বাঙালি লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য পুণরুদ্ধারে তৎপর। চলতি বছরেই বাংলাদেশে কোম্পানি রেলপথ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলে আটটি কোম্পানি টেণ্ডার জমা দেয়। উল্লেখ্য এর মধ্যে তিনটি কোম্পানি বাঙালি। এরই মধ্যে 'সংবাদ প্রভাকর' এদেশে ইংরেজ শাসনের হিত ও অহিত নিয়ে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপায়। তাতে সাহেবি শাসনের উপকারিতার দিকে পাল্লা ভারি। আমরা বুঝতে পারি বাঙালি সমাজ শাসকের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের রাস্তা আর বেছে নিতে চাইছেন না।

১.চ. ১৮৫১ – ১৮৬০

ছয়ের দশকের সূচনাতেই ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হল – *ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন*। উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের মানুষ ও সমাজের উন্নতিকল্পে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার তাগিদে মানুষের নানারকম দাবি দাওয়া ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করা। ২৫ মে ধর্মচ্যুত হিন্দুদের সমাজচ্যুত না করে তাদের হিন্দু সমাজের মুল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে প্রতিষ্ঠিত হল *পতিতোদ্ধার সভা*। বিবাদ ভুলে *ধর্মসভা* ও *ব্রাহ্মসমাজ* - এর প্রধানরাই এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই বছরই *ভার্ণাকুলার লিটারেরি সোসাইটি* প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা ভাষায় ইওরোপের বিখ্যাত গ্রন্থগুলি অনুবাদ ও বিক্রি করার উদ্দেশে। বাংলা

সমালোচনা সাহিত্যের পুরোধা *বিবিধার্থ সংগ্রহ* প্রকাশিত হচ্ছে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায়। অধ্যক্ষ হিসেবে বিদ্যাসাগর এই বছর থেকে সংস্কৃত কলেজের দ্বার ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া অন্যান্য হিন্দু ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। ১৮৫২ সালে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার সূচনা হল কলকাতায়। এই বছর থেকে সংস্কৃত কলেজে ইংরাজিকে অবশ্যপাঠ্য করলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৪ সালে ঐতিহাসিক *উডের ডেসপ্যাচ* প্রকাশিত হয়। যা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের *ম্যাগনাকার্টা* নামে পরিচিত। এর প্রেক্ষিতে সরকার *বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি* গঠন করেন। হিন্দু কলেজে হীরা বুলবুল নামের এক বারাঙ্গনার পুত্রকে ভর্তি করার জন্য উচ্চবর্ণের হিন্দুরা পৃথক কলেজের দাবিতে *হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ* স্থাপন করলেন ১৮৫৪ সালে। রাণি রাসমণি দান করলেন দশ হাজার টাকা। এই বছরেই প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার দেশি সহজ বাংলা ভাষা প্রচারের উদ্দেশে *মাসিক পত্রিকা* নামে একটি পত্রিকার প্রকাশ শুরু করলেন। *কুলীনকুলসর্বস্ব* লিখে রামনারায়ণ তর্করত্ন সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সামাজিক ইতিহাস নির্মাণের এক উজ্জ্বল নজির গড়ে তুললেন ১৮৫৪ সালে। এই বছরেই ভারতবর্ষে রেলপথের সূচনা। যে রেলপথ ভারতের জাতীয় চরিত্রকেই খোলনলচে বদলে দিতে সমর্থ হয়। ইতিহাসবিদ অনুরাধা রায়ের মতে, এই রেলপথ ভারতে ইংরেজের 'বশংবদতা', 'বিরোধিতা' ও 'আত্মস্থতার' প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।[১৪]

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে আদিবাসী সাঁওতালদের 'হুল' বা বিদ্রোহ কোম্পানি শাসনকে মুহূর্তের জন্য হলেও ভাবিয়ে তুলেছিল যে উচ্চবর্গের তারিফ পেলেও এদেশে তাঁদের সাম্রাজ্য এখনো সুরক্ষিত নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বছরেই *পরাশর সংহিতা* র বাচন ভাষ্য উদ্ধৃত করে করে লিখলেন *বিধবা বিবাহ প্রলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব*। এই সঙ্গে ৪ অক্টোবর ভারত সরকারের কাছে তিনি বিধবা বিবাহের সমর্থনে ৯৮৭ জনের স্বাক্ষর সংবলিত আবেদনপত্র পাঠাবেন। লেখাবাহুল্য পরের বছর তিনি ইতিবাচক সহযোহিতা পাবেন এবং তাঁরই উদ্যোগে কলকাতায় প্রথম বিধিসম্মত বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠান হবে ১৮৫৭ সালে। ১৮৫৫ সালেই অক্ষয়কুমার দত্ত কোম্পানি সরকারকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত বালকদের বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেবার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলেন। ১৮৫৬ সালের ২৬ জানুয়ারি অশ্লীলতা নিবারক আইন - *Obscene Books & Pictures Act* জারি হল কলকাতায়। উদ্দেশ্য আদিরসাত্মক বইপত্র ও ছবিসহ কামকলার আখ্যান, নিম্নরুচির গল্প কাহিনি প্রকাশনা বন্ধ করা। মজার ব্যাপার ঔপনিবেশিক সরকারের এই অতিসক্রিয়তা বিশ্বের মধ্যে কলকাতাতেই প্রথম। খোদ ইংল্যাণ্ডে এই আইন জারি হবে পরের

বছর। চলতি বছরেই প্রথম মহিলা কবি কৃষ্ণভামিনী দাসীর *চিত্তবিলাসিনী*র প্রকাশ এবং ***কলকাতা মহমেডান অ্যাসোসিয়েশন*** এর প্রতিষ্ঠা। লক্ষণীয় বিধবা বিবাহে উৎসাহের জন্য *বিদ্যোৎসাহিনী সভা*র পক্ষ থেকে এক হাজার টাকা দান করার সিদ্ধান্ত এই বছরেই। সৌজন্যে শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ। ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। একইসঙ্গে মাদ্রাজ ও বোম্বাইতেও বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু দেশীয়দের সবদিক থেকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হচ্ছিল না তাই কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে চলতি বছরেই ব্যারাকপুরের ৩৪ নম্বর রেজিমেন্টের সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডে সিপাহি বিদ্রোহের আগুন জ্বাললেন। ভারতের উত্তরপ্রান্তে তা দাবানলের আকার নিল। ৫ জুলাই কলকাতার রাস্তায় গ্যাসবাতি জ্বালানো শুরু হল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিসেব অনুযায়ী ১৮১৮ – ১৮৫৭ এই চল্লিশ বছরে ১৩৬ টি বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছে; পৃথিবীর ইতিহাসে যার কোনো তুলনা নেই।[১] ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ পরীক্ষার সূচনা। যদুনাথ বসু ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অকৃতকার্য হন কিন্তু ছয়টির মধ্যে পাঁচটি বিষয়ে পাশ করার জন্য তাঁদের দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হয়। ১৮৫৯ সালে বাংলায় নীলবিদ্রোহ আরেকবার নিম্নবর্গের মানুষদের মূলত কৃষকদের সংঘবদ্ধতা ও প্রতিরোধকে প্রমাণ করলো। এই বছরেই প্যারীচাঁদ মিত্র লিখলেন তাঁর সাড়া জাগানো 'শিক্ষামূলক প্রহসন' *মদ খাওয়ার বড় দায়, জাত রাখার কী উপায়* । ১৮৬০ সালে নীলবিদ্রোহের সমর্থনে, নীলচাষীদের ওপর নীলকরদের ভয়াবহ অত্যাচারের কাহিনি নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র লিখলেন 'নীলদর্পণ' নাটক। এদেশে তো বটেই বিদেশেও নাটকটি ঝড় তুলেছিল।

১.ছ. ১৮৬১ – ১৮৭০

দশকের সূচনাতেই মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ কাব্য* প্রকাশিত হল। ভারতীয় পুরাণ ও মিথকে নতুন ছাঁচে ঢেলে একেবারে বিপরীত মেরু থেকে দেখা হল এই মহাকাব্যে। বাঙালি মনন ও চিন্তনের প্রকৃত আধুনিকতা লক্ষ করা গেল এখান থেকে। এই বছরেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্ম নেবেন দুই শতকের শ্রেষ্ঠ চিন্তক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রেসিডেন্সি কলেজের হিন্দু ছাত্রদের জন্য হিন্দু হোস্টেল স্থাপন করা হয় ১৮৬১ সালে। পরের বছর শিয়ালদহ-ক্যানিং এবং শিয়ালদহ-কুষ্ঠিয়া রেলপথের দ্বারা বাংলাকে সংযুক্ত করা হয়। ১৮৬২ সালে সাহিত্যের ময়দানে এল মাইকেল মধুসূদন দত্তের *বীরাঙ্গনা* কাব্য। উনিশ শতকের কাব্যে

নবজাগ্রত চিন্তা চেতনার এটি একটি আদর্শ স্থানীয় নমুনা। উনিশ শতকের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সামাজিক নকশা কালীপ্রসন্ন সিংহ –এর *হুতোম প্যাঁচার নকশা* প্রকাশিত হল। বিদ্যাসাগরের কাছে 'বড়োই আবশ্যক' আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে 'অশ্লীল' এই বইটি সেকালের 'পয়সাওয়ালা'দের যাবতীয় দুষ্কর্মকে ফালা ফালা করে দেখিয়েছে। কথ্যভাষার ব্যবহার ঘটিয়ে এই বইটি সাহিত্যে অন্যতর মাত্রা সংযোজন করেছে। ১৩ এপ্রিল কেশবচন্দ্র সেন প্রথম বাঙালি কূলবধুকে রাজপথে আনলেন। প্রথা ভেঙে পালকি ডেকে সস্ত্রীক জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে যান তিনি। এই দিনই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্রকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য নিযুক্ত করেন এবং *ব্রহ্মানন্দ* উপাধি দান করেন। ২৯ অগস্ট কেশবচন্দ্র সহ তরুণ ব্রাহ্মদের উৎসাহে কলকাতায় প্রথম ব্রাহ্মরীতি অনুযায়ী অসবর্ণ বিবাহ হয়। ১৮৬৩ সালের ২ এপ্রিল কলকাতায় আব্দুল লতিফ খাঁর উৎসাহে তাঁরই ভবণে স্থাপিত হল *মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি*। প্যারীচরণ সরকার *The Bengal Temperance Society* বা মাদক নিবারণী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৫ সালে ঔপনিবেশিক 'নভেল'-এর মডেল অনুসরণ করে রচিত হল বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনী,* বাংলার প্রথম সার্থক উপন্যাস। পরের বছর ১৮৬৬ সালে কালীপ্রসন্ন সিং প্রকাশ করলেন মহাভারতের সুললিত বঙ্গানুবাদ। আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করে তিনি এই মহাগ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। অনেকের মতে এটিই আজ অবধি মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদ। এই বছরেই কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে এই প্রথম 'মাঘোৎসবে' পুরুষদের সঙ্গে মহিলারাও যোগ দিলেন। ১১ নভেম্বর এই প্রথম ব্রাহ্মসমাজ বিভাজিত হয়ে কেশবচন্দ্রের অনুগামীরা *ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ* গড়ে তুললেন।

১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে *হিন্দুমেলার* সূচনা হয়। উদ্দেশ্য সদ্য বিকশিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শকে বিস্তৃত করা এবং জনমানসে তার প্রচার ও প্রসার ঘটানো। সংক্রামক যৌন ব্যাধি নিবারণের জন্য এই বছর সরকারিভাবে একটি আইন জারি হয়; যার নাম – *চৌদ্দ আইন* । এর প্রতিক্রিয়ায় বটতলা থেকে *বদমাস জব্দ, বেশ্যা গাইড, বাহবা চৌদ্দ আইন* প্রভৃতি বেশ কিছু ব্যঙ্গ কৌতুক প্রকাশিত হয়। ১৮৬৮ সালে বাংলাদেশে আবার দুর্ভিক্ষ হয়। ফলে খাজনা দিতে না পারার জন্য একের পর এক জমিদারি নিলাম হতে থাকে। কলকাতার বাঙালি ব্যবসায়ীরা আবার জমিদারি কিনতে লাগলেন এবং ব্যবসার পতন ডেকে আনলেন। ১৮৬৯ সালে *অমৃতবাজার পত্রিকার* একটি প্রতিবেদন জানাচ্ছে কলকাতায় ছড়িয়ে থাকা পতিতালয়ে বারবনিতার সংখ্যা ত্রিশ

হাজারেরও বেশি। এদের নব্বই শতাংশই হিন্দু বিধবা।[১৫] বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিষময় ফল সুস্পষ্ট হতে থাকে। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭০ সালে ইংল্যান্ড যাত্রা করেন এবং সেখানে রানি ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভারতবর্ষের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। এই বছরেই অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতবর্ষের নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিবরণ, ক্রিয়াকলাপ ও কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস নিয়ে *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* প্রকাশ করেন। ১১ অগস্ট ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমস্ত পারিবারিক বিরুদ্ধতাকে সরিয়ে একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে এগারো বছরের বিধবা ভবসুন্দরীর বিবাহ দিলেন। ২৭ অগস্ট শ্রমিকদের উন্নয়ন ও স্বার্থরক্ষার জন্য ***শ্রমজীবী সঙ্ঘ*** নামে প্রথম কোনো সমিতি গড়ে তোলেন শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১.জ. ১৮৭১ – ১৮৮০

১৮৭১ সালের গোড়ায় একটি সরকারি প্রতিবেদন থেকে সেকালের সমাজের এক কুৎসিত ছবি স্পষ্ট হচ্ছে। প্রতিবেদনটি জানাচ্ছে – হুগলি জেলার তেত্রিশ জন কুলীন বিবাহ করেছেন দুহাজার একশো একান্ন জন স্ত্রীলোককে। স্ত্রীরা স্বামী সাক্ষাৎ বঞ্চিত হয়ে নিজ গৃহে অত্যন্ত দারিদ্র্যের সঙ্গে কালহরণ করতেন। উপরন্তু অর্থাভাব হলে স্বামী নিজে বা ভৃত্য পাঠিয়ে টাকা সংগ্রহ করতেন। ১৮৭২ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র '*Beef in Ancient India*' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখে তথ্য প্রমাণ সহ দেখালেন যে প্রাচীন ভারতে গোমাংস ভক্ষণের ব্যপক প্রচলন ছিল; ১৯৯৮ সালে ১২৬ বছর পর তাঁরই উক্ত প্রবন্ধের আদর্শে সুকুমারী ভট্টাচার্য লিখবেন *প্রাচীন ভারতে ক্ষুধা ও খাদ্য* শিরোনামে প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ। ১৮৭৩ সালে *Spirituous Drinks in ancient India* নামে অপর একটি প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রাচীন ভারতে সর্বস্তরে মদ্যপান প্রচলনের তথ্য-প্রমাণ হাজির করলেন। সেকালের রক্ষণশীল মনে ঝড় তোলবার ক্ষেত্রে তাঁর এই দুটি প্রবন্ধই যথেষ্ট ছিল। এই বছরের ৭ ডিসেম্বর চিৎপুরে মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে *ন্যাশানাল থিয়েটার* – এর উদ্বোধন হয়। এদের প্রথম অভিনীত নাটক *নীলদর্পণ*। ১৮৭৩ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় চালু হল ঘোড়ায় টানা ট্রাম। নাটক-উপন্যাস, নৃত্যে-ছবিতে অশ্লীলতা নিবারণ করার জন্য কলকাতায় *অশ্লীলতা নিবারণী সভা – The Society for the Suppression of Obscenity in India* প্রতিষ্ঠিত হয় এবছরেই। এবার অবশ্য সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হলেন সৈয়দ আমির আলি, মৌলনা আব্দুল লতিফ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। রাজনারায়ণ বসু *হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা* নামক একটি গ্রন্থ লিখে হিন্দুত্বের

শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে ধর্মান্তকরণ রুখতে চাইবেন ১৮৭৩ সালে। ১৮৭৪ সালে কলকাতার প্রথম পৌর বাজার বর্তমান নিউ মার্কেটের সূচনা।

১৮৭৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখলেন *বন্দেমাতরম গান* । জাতীয়তাবাদী নানা অনুষ্ঠানে এই গানটি ছিল অনিবার্য। পরের বছর ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ড. মহেন্দ্রলাল সরকারের উদ্যোগে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হল *ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সাইন্সেস*। বাঙালির বিজ্ঞান সাধনায় এই প্রতিষ্ঠানের মূল্য অপরিসীম। মধ্যবিত্ত বাঙালিদের রাজনৈতিক মঞ্চ *ভারতসভার* সূচনা হল এই বছর ২৬ জুলাই। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মেলার প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য সাধন ও রাজনৈতিক চেতনার উন্নতিকল্পে নবাব আমির আলি খান প্রতিষ্ঠা করেন – *National Muhammadan Association.* ১৮৭৮ সালে কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতিদেবীর সঙ্গে কোচবিহারের যুবরাজের বিবাহ। ব্রাহ্মসভার কজে দ্বিতীয়বার ভাঙন। ২৭ এপ্রিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম মহিলা হিসেবে কাদম্বরী বসু ও সরলা দাস প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন। এই প্রথম মেয়েদের পরীক্ষা দেবার অধিকার স্বীকৃত হল। এই বছরেই ১৪ মার্চ কুখ্যাত *Vernacular Press Act* পাশ হল। এই আইনের মাধ্যমে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রকাশককে সরাসরি দণ্ড দেবার অধিকার পেলেন সরকার। চারিদিকে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল। আমরা লক্ষ করব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সূচনা এই আইনের বিরুদ্ধতা থেকেই সৃষ্টি হবে। আবার এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ২১ মার্চ রাতারাতি *অমৃতবাজার পত্রিকা* ইংরাজি সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৮৭৯ সালে একমাত্র ছাত্রী কাদম্বিনী বসুকে নিয়ে বেথুন স্কুলে কলেজ বিভাগ খোলা হয়। এটিই কলকাতার প্রথম মহিলা কলেজ। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ৫ এপ্রিল শিবপুরে স্থাপিত হয় বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। কলেজের জমি দান করেন কাশিমবাজারের মহারানি স্বর্ণময়ী দেবী। এই বছরেই মহারানি ভিক্টোরিয়াকে 'ভারতসম্রাজ্ঞী' উপাধি প্রদান করা হয়। এই বছর *নববার্ষিকী* পত্রিকাতে *বাংলার লোকসংখ্যা* শিরোনামে একটি প্রবন্ধে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ হিন্দু জাতিকে বিলীয়মান ধরে নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করছেন। আমরা দেখব এই সময়ে অন্যান্য অনেক প্রবন্ধে একই আশঙ্কা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। যেমন *ভারতে মুসলমান (বান্ধব নবপর্যায়), ভারত রোদন (বান্ধব,* ১৮৭৫*), মহাত্মদের উত্তরাধিকার (বান্ধব,* ১৮৭৮) প্রভৃতি প্রবন্ধেই প্রতীকী উপস্থাপনায় প্রকাশ করা হয়েছে যে – হিন্দু একটি লুপ্তপ্রায়, মৃত্যুপথযাত্রী জাতি। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যুর পর আগ্রাসী যবনদের যে উত্থান তার জন্যই হিন্দু জাতি পতনের সম্মুখীন

বলে ধরে নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।[১৬] এই দশকের এই আশঙ্কাই যে পরবর্তী দশক জুড়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদের জোয়ার আনবে সে বিষয়ে আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

১.ঝ. ১৮৮১ – ১৮৯০

নতুন দশকের শুরুতে অবশ্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এরকম কোনো আশঙ্কায় জর্জরিত নয়। তাঁদের পক্ষ থেকে ১৮৮১ সালে সর্বধর্মসমন্বয়কারী *নববিধান* এর প্রবর্তন করলেন কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর মতে এই নববিধান সকল ধর্ম প্রবর্তক, সকল ধর্মশাস্ত্র ও সকল বিধানের এক অপূর্ব সঙ্গতি। চলতি বছরেই নববিধান ব্রাহ্মসমাজের তরফ থেকে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রথম বাংলায় *কোরান শরীফ* অনুবাদ করলেন। ১৮৮২ সালের ১৭ জুলাই বাংল ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে *কলিকাতা সারস্বত সমাজ* প্রতিষ্ঠিত হয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে বালক-বালিকাদের জন্য সচিত্র মাসিকপত্র *সখা* র সুচনা করেন প্রমদাচরণ সেন। এবছরের ৩ মে বিধান সভায় মহম্মদ ইউসুফ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নিয়ে এদেশি হিন্দুদের আন্দোলনকে শ্লেষাত্মক ভাষায় আক্রমণ করে জানান যে, 'অধিকাংশ স্থানে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ- সুতরাং সুংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য কিছু পদ সংরক্ষণ করা হোক'।[১৭] ১৮৮৪ সালের এপ্রিল মাসে স্বর্ণকুমারী দেবী *ভারতীর* সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। ইনিই ভারতের প্রথম মহিলা সম্পাদক। বাঙালি মুসলমান সমাজের 'বিদ্যাসাগর' হিসেবে পরিচিত মীর মোশাররফ হোসেনের *বিষাদ-সিন্ধু* ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই বছরেই জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং বোম্বাই শহরে প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রথম সভাপতি একজন বাঙালি; উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৮৬ সালে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল থেকে মৌলবি আবুল হামিদ খানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পাক্ষিক পত্রিকা *আহমদি*। পত্রিকাটির প্রচেষ্টা ছিল হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ বৃদ্ধি করা। ১৮৮৭ সালে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করলেন - *সীতারাম* উপন্যাস এবং রাজনারায়ন বসু লিখলেন *বৃদ্ধ হিন্দুর আশা* নামে একটি গ্রন্থ। এই বছর ৪ জানুয়ারি বড়লার্ট লর্ড ডাফরিন লণ্ডনে সেক্রেটারি অফ স্টেটকে উসকানি দিয়ে জানালেন যে, মুসলমানেরা কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেনি। তাঁরা বেশ বুঝেছে যে বাঙালির শাসনে তাঁদের অবস্থা আরো খারাপ হবে। ঠিক তাইই হল বছরের শেষে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনের প্রাক্কালে কংগ্রেসের কট্টর বিরোধী সৈয়দ আহমেদ খান মানুষকে বাঙালি কংগ্রেসের 'প্রভুত্ব' থেকে বাঁচবার জন্য পরামর্শ দিলেন।[১৮] কেননা জাতীয় কংগ্রেসকে তখন

বাঙালির দল হিসেবেই বিবেচনা করা হত। ১৮৮৯ সালে সেকালের বাঙালিদের ইংরেজ অনুকরণ-প্রিয়তা নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গাত্মক রচনা প্রকাশিত হয় *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায়। বারবার বাঙালিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় অনুকরণ মাত্রই উন্নতি নয়। এই বছরেই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* বাংলা কাব্যানুবাদ প্রকাশ করেন নবীনচন্দ্র সেন। ১৮৯০ সালে ২ জানুয়ারি সৈয়দ আমির আলি কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলমান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন। **উচ্চ প্রশাসনিক পদে এই প্রথম কোনো বাঙালি মুসলমানের অগ্রগন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হল।** এই বছরেই রেজাউদ্দিন আহমেদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক *সুধাকর* পত্রিকাটি। এটি ছিল এই দশকের একটি উল্লেখযোগ্য গোঁড়া মুসলমান পত্রিকা। সেকালে এটির প্রায় তিন হাজার গ্রাহক ছিল। পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে সমকালীন মুসলমানের কাছে গোঁড়ামির প্রশ্রয় ছিল কতটা।

১.ঞ. ১৮৯১ – ১৯০০

প্রথম বাঙালি মহিলা হিসেবে বিলাত থেকে ডাক্তারি পাশ করে আসেন কাদম্বিনী দেবী ১৮৯১ সালে। প্রতিক্রিয়ায় অভিনন্দন ও নিন্দা দুইই জুটল। এই বছর সহবাস সম্মতি সূচক আইন পেশ করা হয় ও পরের বছর তা পাশ হয়। ১৮৯৩ সালে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবনে *বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ লিটারেচার* স্থাপিত হয়। পরের বছর এটি *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ* নামে পরিচিত হয়। বাঙালির সারস্বত সাধনায় এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিহার্য। অবশ্য মহম্মদ শহিদুল্লা জানিয়েছেন 'সেখানে হিন্দু-মুসলমান কোনো ভেদ না থাকলেও আমরা [মুসলমানরা] বড়োলোকের ঘরে গরীব আত্মীয়ের মতন মন-মরা হয়ে তার সভায় যোগদান করতাম।'[১৯] অর্থাৎ মুসলমানেরা সেখানে অংশগ্রহণ করলেও পরিষৎ এর সঙ্গে কোথাও যেন তাঁদের একটি অস্বাভাবিক দূরত্ব কাজ করত। ফলে এই প্রতিষ্ঠানেরই বিকল্প হিসেবে মুসলমানরা ১৯১১ সালে স্থাপন করলেন ***বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি*** ।

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতায় একথা প্রমাণ করতে চাইলেন যে (ক) সুউচ্চ সংস্কৃতি এবং সভ্যতা সম্পন্ন ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হলেও তার সুউচ্চ সংস্কৃতি ও সভ্যতা এখনো নষ্ট হয়নি। (খ) মিশনারিদের কষ্ট করে ভারতে এসে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করার কোনো মানে হয় না, কারণ স্বধর্মই ভারতের সম্বল। সনাতন ধর্মেই ভারত মহিমান্বিত।[২০] এর ফল বেশ ভালোই হয়েছিল। উপযোগবাদী-সাম্রাজবাদী

ঐতিহাসিকদের মিথ্যে কথা মানুষ আর নির্বিচারে মেনে নিতে রাজি হল না। সেই সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদও অনুপ্রাণিত হল। বিদেশের মাটিতে ভারতের হয়ে কথা বলার একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি হল।

১৮৯৬ সালে কলকাতায় নিজস্ব গবেষণাগারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আবিষ্কার করলেন নতুন একটি যৌগ – মারকিউরাস নাইট্রেট। নতুন শতকের আগেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙালি তার প্রতিভার প্রমাণ দেওয়া শুরু করলো। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ২০ নভেম্বর স্যার রোনাল্ড রস কলকাতার পি.জি হাসপাতালে নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন যে, ম্যালেরিয়ার কারণ অ্যানোফিলিস মশার দংশনজনিত সংক্রমণ। এই বছরেই বরিশালের প্রসিদ্ধ নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে কংগ্রেসকে 'বছরে তিন দিনের তামাসা' বলে বিদ্রুপ করেন। এই বছরেই তিনি ভারতে গণতন্ত্রমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি আবেদনপত্র পাঠান। সেখানে চাষা, তাঁতি, ছুতোর, মুচি, কামার প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণির মানুষের পক্ষেই আবেদন ছিল। ১৯৯৮ সালে প্লেগ রোগ মহামারির আকার ধারণ করে। সাহেব ডাক্তাররা রোগ নির্ণয়ের জন্য মেয়েদের ঊরু ও কটির সন্ধিস্থল পরীক্ষা করবে জেনে জনগণ আতঙ্কিত হল। যুগপৎ আতঙ্কে লোক শহর ত্যাগ করতে লাগলো। রাতারাতি ছ্যাকরা গাড়ির ভাড়া পঞ্চাশগুণ বেড়ে গেল। ১৮৯৯ সালে প্লেগ মহামারী রোধে ভগিনী নিবেদিতা স্বেচ্ছাসেবকের দল গড়ে আর্তের সেবায় আত্ম নিয়োগ করলেন। এই বছরেই ব্রাহ্ম প্রচারক ও আচার্য, বৈষ্ণব সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বিষ প্রয়োগ করে পাণ্ডারা হত্যা করেন পুরীতে। ১৮৯৯ সালেই জন্ম নিলেন পরবর্তী শতকের দুই বিখ্যাত কবি জীবনানন্দ দাশ ও কাজী নজরুল ইসলাম।

১৯০০ সালে পশ্চিম ভারতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে ছয় কোটি মানুষের জীবন সংকট, ভারত শাসনের ভার নিলেন লর্ড কার্জন। জগদীশচন্দ্র বসু বেসনেট রেকর্ডার নির্মাণ করে উদ্ভিদের অনুভূতিক্ষমতা প্রমাণ করলেন আর পঞ্চানন রায়চৌধুরী এই বছরেই লিখলেন *কুল-কলঙ্কিনী বা কলকাতার গুপ্তকথা* নামে একটি প্রহসন।

২. উনিশ শতকের শিক্ষা

উনিশ শতকের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও অভিমুখ বিচার করে দীননাথ সেন তাঁর 'উনিশ শতকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন –

> উনিশ শতক এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্রান্তিকাল। ... এদেশে প্রচলিত শাসন, অর্থনীতি ও রাজনীতির পটপরিবর্তনের ফলে সমাজব্যবস্থায়ও দেখা দিল একটা প্রবল আলোড়ন। কলিকাতা নগরীর পত্তনে কেবল যে একটা বাণিজ্য আধিপত্যের সূচনা করলো তা নয়, সমগ্র বাংলার অগ্রগতির রথের রশিটি এসে গেল একটা বাণিজ্য কোম্পানির হাতে যার নাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই নতুন দখল করা উপনিবেশটিকে সরাসরি শাসন শোষণ করার আইন সম্মত অধিকার পেয়ে গেল কোম্পানি। এইদেশের শিক্ষার খোলনলচেও ঢেলে সাজবার তোরজোড় শুরু হয়ে গেল।[২১]

কিন্তু এই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা কি দেশের সাধারণ জনগণের মঙ্গল বা কল্যাণের উদ্দেশ্য রচিত হলো? এই প্রশ্নের উত্তরে সমাজতাত্ত্বিকের বক্তব্য –

> এর লক্ষ্য কিন্তু দেশের সমাজব্যবস্থার উন্নতি কিংবা দেশবাসীর সৃজন শক্তির উন্মেষসাধন নয়, এর লক্ষ্য ভারতের মতো বিরাট উপনিবেশের প্রশাসনে ও পরিচালনে মেধাশক্তি শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানো।[২২]

অর্থাৎ এতদিন ধরে প্রচলিত সাহিত্য সংস্কৃতির এক 'সুদীর্ঘ ও সুমহান ঐতিহ্য'কে কিছুমাত্র তোয়াক্কা না করে তাকে নির্মমভাবে অস্বীকার করে তার উপর এক নতুন শিক্ষা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার প্রসঙ্গে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য' গ্রন্থে জানিয়েছেন –

> ভারতসংস্কৃতিকে অমার্জনীয় কটাক্ষ করে জেম্‌স মিল (তিনি নাকি ভারত বিশেষজ্ঞ!) বলেছেন হিন্দুরা (অর্থাৎ ভারতবাসীরা) সভ্যতার এক আদিম সত্রে আঁটকে আছে। ... সভ্যতার তোলার দিকের কয়েকটা ধাপ পাড় হতে না হতেই উদ্যমের পুঁজি ফুরিয়ে গেছে। ... হিন্দু ইতিহাসের নথিপত্র না থাকাতে সাংঘাতিক কিছু খতিও হয়নি; পাষণ্ডদের, বর্বরদের ইতিহাস যত শীঘ্র লুপ্ত হয়, বিমস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায় ততই মঙ্গল। ... মোট কথা না ধর্ম, না কর্ম, না সংস্কৃতি – জীবনের একটি ক্ষেত্রেও হিন্দুদের আহামরি কোনো অবদান নেই; যা আছে সে মুছে গেলে হিন্দুরাই উপকৃত হবে।[২৩]

দেশীয় শিক্ষার প্রতি এই একই প্রকার মনোভাব অতি সহজেই সেকালের প্রায় প্রত্যেকটি শিক্ষিত মানুষের মনের মধ্যে চাড়িয়ে দেওয়া হলো। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* গ্রন্থে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রায় শূন্যতাভরা মন্তব্য করে লিখেছেন -

> যে জ্ঞানের দ্বারা হৃদয় মন সমুন্নত হয়, জগত ও মানবকে বুঝিবার সহায়তা হয়, এমন কোনো জ্ঞান দেশে বিদ্যমান ছিল না।[২৪]

অর্থাৎ সেকালের প্রচলিত শিক্ষার প্রতি একটু বিতৃষ্ণই যেন শিবনাথ শাস্ত্রী। এই বিতৃষ্ণা বিপুলভাবে রামমোহনের হৃদয়ে অনুভূত হয়েছিল তার নমুনা পাওয়া যাবে আর্মহার্স্ট সাহেবকে লেখা তার চিঠির বয়ান পর্যবেক্ষণ করলে।[২৫] ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে এব্যাপারে স্পষ্ট হওয়া যাবে যে এটা শুধুমাত্র ব্যক্তি শিবনাথের মত নয়, সেকালের দেশজ শিক্ষা যে মানুষের হৃদয় মন ও জাগতিক প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারেনি – এই আক্ষেপ সেকালের বহু মানুষের মধ্যে দেখা দিতে শুরু করেছে এবং তাঁরা বিদ্যা বা শিক্ষাকে অর্থ উপার্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবেই বেছে নিতে শুরু করেছেন। শুধুমাত্র বেছে নিয়েই ক্ষান্ত হয়ে থাকেননি, সেইসঙ্গে শিক্ষার 'অর্থক্রিয়াকারী লক্ষণ' এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 'অর্থহীন' বিদ্যাকে বর্জন করারও সাহস দেখাতে শুরু করেছেন। আর একারণেই লেখাপড়ার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে গাড়িঘোড়া চড়ার সামর্থ্য থেকে শুরু করে নানাবিধ সুখ, বিলাস প্রাপ্তির অনুষঙ্গ। শিশুপাঠ্য পুস্তকেও সেই উপযোগবাদী বার্তাই চাড়িয়ে দেওয়া শুরু করেছেন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতো লেখকেরা – 'লেখাপড়া করে যেই / গাড়িঘোড়া চড়ে সেই' ইত্যাদি। অর্থাৎ উনিশ শতকের গোঁড়া থেকেই শিক্ষাকে অর্থ উপার্জনের মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করলো উপনিবেশিত বাঙালিরা।[২৬] অথচ প্রাচীনকালে আমাদের দেশের শিক্ষা অর্থকরী ছিল না, তাই সেখানে বিদ্যার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ভয় থেকে অভয়ে নিয়ে যাওয়া, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাওয়া। দার্শনিক অরিন্দম চক্রবর্তী তাঁর 'কোন বিদ্যার আরাধনা' প্রবন্ধে আদিকালের বিদ্যার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'আত্মজ্ঞান' লাভের কথা বলেছেন।[২৭] উনিশ শতকে রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর বা শিবনাথ শাস্ত্রীরা আসলে 'আত্মজ্ঞান পূর্ণ' বিদ্যা অপেক্ষা 'অর্থপূর্ণ' বিদ্যার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করেছেন। তাই শিবনাথ শাস্ত্রী এখানে প্রচলিত দেশজ শিক্ষাকে নাকচ করতেই চাইছেন; কেননা, এতদিন ধরে প্রচলিত দেশজ শিক্ষার সর্বজনীনীকরণ তো দূরের কথা, পণ্ডিতমহলও যে সেই জ্ঞানের মূল শিকড়ে পৌঁছতে পারেনি এব্যাপারেও তিনি নিশ্চিত –

> এমনকি বেদ, বেদান্ত, গীতা পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থসকল পণ্ডিতগণের অজ্ঞাত ছিল।[২৮]

শিক্ষা সম্পর্কে যখন দেশের এই দুরবস্থা ও মানসিক শূন্যতা পরিলক্ষিত হচ্ছে ঠিক তখনই 'নানা কারণের সমাবেশে' দেশের লোক তাঁদের চিত্ত ও চিন্তার শূন্য কলস ভরিয়ে তোলবার জন্য শিক্ষার; মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সেই প্রয়োজনীয়তার বহর কতটা সুনিবিড় তা বোঝা যায় রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় ১৮৩০ সালের চ

নভেম্বর প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গ-কবিতায়। অনেক কিছুর সঙ্গে অর্থকরী বিদ্যা হিসেবে ফারসি ছেড়ে ইংরেজি আঁকড়ে ধরা সম্পর্কে সেখানে বলা হয়েছে –

... ধন বিনা মান নাই বিশেষ বুঝিয়া

কেমনে পাইবে ধন না পাই ভাবিয়া।।

পাইলাম উপদেশ পারশী পড়িতে।

বহুশ্রম করিলাম তদর্থ বুঝিতে।।

পড়ে দেখি এ বিদ্যায় নাহি হয় ধন।

শিক্ষিতে ইংরাজি বিদ্যা রত হল মন।।[২৯]

লক্ষ করবার বিষয় ১৮৩৭ সালে এক সরকারি ঘোষণায় আদালতের ভাষা হিসেবে ফারসি বর্জিত হয়। অর্থাৎ সরকারি ক্ষেত্রে ফারসি ভাষার ব্যবহারযোগ্যতা বাতিল করে তার জায়গায় ইংরাজি আসন লাভ করে। ফলে যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানরা ফারসি চর্চায় এতদিন বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন, তাঁরা তাঁদের মন বদলে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষাবলম্বন করলেন। ১৮৩০ সালের 'সমাচার চন্দ্রিকা'র ব্যঙ্গ কবিতাটি যেন সেই অবস্থার পূর্বাভাস দিয়ে যাচ্ছে।

৩. উনিশ শতকে প্রচলিত শিক্ষার ধারা :

এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থাকে এক ধারে রেখে আমরা যদি বাংলার দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ধারাগুলিকে পর্যবেক্ষণ করী তাহলে লক্ষ করবো সেখানে মূলত তিনটি ধাড়া প্রচলিত ছিল। *বাংলার দেশজ শিক্ষার ধারা* গ্রন্থে সমাজতাত্ত্বিক ও গবেষক পরমেশ আচার্য এই ধারা তিনটিকে চিহ্নিত করেছেন –

১. পাঠশালা ভিত্তিক শিক্ষা

২. সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার জন্য টোল

৩. মক্তব মাদ্রাসা ভিত্তিক শিক্ষা ।[৩০]

উনিশ শতকে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা জাঁকিয়ে বসার আগে বাংলায় দেশজ শিক্ষার প্রচলন ছিল চোখে পড়ার মতো। দেশজ শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি –

> দেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী নিজেরা নিজেদের জন্য যে নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং যা তার নিজস্ব পদ্ধতিতেই পরিচালনা করে।[৩১]

সেদিক থেকে বিচার করে বলা যায় এদেশে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে দেশীয় ঘরানায় যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল উনিশ শতকের ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ ও শাসকরা তাকেই দেশজ শিক্ষা বা Indigenous Education বলেছেন। দেশজ শিক্ষার মূলত দুটি আলাদা ধারা এদেশে প্রচলিত ছিল। একটি উচ্চবর্ণের ও উঁচুশ্রেণির গতর আয়েসী মানুষদের সংস্কৃত ও আরবি-ফার্সি শিক্ষাধারা। আর অন্যটি গতর খাটা মানুষদের লেখাপড়া আর অঙ্ক শেখার ধারা। প্রথমটিতে সংস্কৃত ও শাস্ত্রীয় শিক্ষার জন্য বহাল ছিল চতুষ্পাঠী আর আরবি-ফার্সি ইসলামি শিক্ষার জন্য ছিল মাদ্রাসা। দ্বিতীয় ধারাটি অর্থাৎ গতরখাটা সাধারণ মানুষদের শিক্ষাক্ষেত্র ছিল পাঠশালা আর মক্তব। অবশ্য এই দুইয়ের মধ্যে চরিত্রগত বিশেষ ব্যবধানও ছিল। ১৮৮৩ সালে ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে

> ...হিন্দুর প্রাথমিক পাঠশালায় সকল বর্ণের ছেলেরাই পড়তে পায়, তাছাড়া এই শিক্ষার বিষয়গুলির ব্যবহারিক উপযোগিতা এমন যে নিচু শ্রেণির লোকেদের বিভিন্ন পেশায় পারদর্শী হতে আর লেনদেনের ঠগ জুয়াচুরির হাত থেকে রেহাই পেতে তাঁদের সাহায্য করে। অন্যদিকে মুসলমানদের প্রাথমিক বিদ্যলয়গুলিতে ধর্মীয় শিক্ষার প্রাধান্য দেখা যায়, সেখানে অঙ্কের চাইতে কোরানের উপর জোর দেওয়া হয় বেশি।[৩২]

উনিশ শতকে প্রদত্ত শিক্ষা কমিশনের এই প্রতিবেদন থেকে দেশজ শিক্ষা সম্পর্কে যে ধারণা আমরা পাচ্ছি সেখানে একথা খুবই স্পষ্ট যে সেকালে দেশজ শিক্ষার একটা ক্ষুদ্র ব্যবহারিক দিক ছিল। সাধারণ মানুষ তাঁদের জীবন ও জীবিকাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই দেশজ শিক্ষার আশ্রয় নিতেন। সেখানে লেখাপড়া, আর অঙ্ক শেখানো ছাড়া উচ্চমার্গীয় জ্ঞানচর্চার কোনো সুযোগ ছিল না।

৩.ক উনিশ শতকে পাঠশালা ভিত্তিক শিক্ষার ধারা :

উইলিয়ম অ্যাডাম দেশজ পাঠশালা সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করে পরপর তিনটি প্রতিবেদন পেশ করেন ১৮৩৫, ১৮৩৬ ও ১৮৩৮ সালে। অ্যাডাম তাঁর প্রতিবেদনে জানাচ্ছেন যে, 'তখন বাংলা ও বিহারের বেশির ভাগ গ্রামেই একটি করে পাঠশালা ছিল।' অ্যাডামের প্রতিবেদন মোতাবেক তখন এক লক্ষ দেশজ পাঠশালায় গরিব শ্রেণির শিশুদের মাতৃভাষায় লেখাপড়া আর অঙ্ক শেখানো হত।[৩৩]

এইসব পাঠশালাগুলিতে সব ধর্ম ও বর্ণের শিশুরাই পড়তে আসত। শিক্ষকরাও ছিলেন সব বর্ণ ও ধর্মের। মীর মশাররফ হোসেনের তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনী'র 'বিদ্যাশিক্ষা' অধ্যায়ে পাঠশালা পাঠের এই অভিজ্ঞতা জানিয়ে লিখেছেন –

> চার বৎসর চার মাস চার দিন পর আমার হাতে তাক্তি (হাতে খড়ি) হইয়াছিল। গ্রাম্য শিক্ষক মুনসী ভিন পাশকরা মৌলভী আমাদের দেশে কেহ ছিল না। বিশেষ বিদ্যা চর্চা লিখাপড়ার চর্চাও অঞ্চলেই ছিল না। তবে কোন কোন গ্রামে গুরু মহাশয়ের পাঠশালা ছিল। মক্তব মাদ্রাসার নামও কেহ জানিত না। ফারসি আরবি কেহ পড়িত না। অভিভাবকরাও প্রয়োজন মনে করিতেন না। বাঙ্গালা বিদ্যা গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সীমাবদ্ধ ছিল। হাতে খড়ির পর ক খ গ ঘ মাটি আচড়ান সারা হইলে, কলাকপাতা ধরিতে হইত, কলাপাতার পরই তালপাতা। তালপাতা কাটিয়া গোবর আর জলে সিদ্ধ করিয়া, তাহাতেই ফলা বানান ঝট্‌কে, কোড়াকে নাম, নামতা লিখা হইত। সে সকল শিক্ষা হইলে কাগজ ধরিতে হইত। কাগজে পত্র তেরীজ, জমা ওয়াশীল বাকী – চিঠে পটে খতিয়ান লিখা হইলেই পাঠশালার বিদ্যা শেষ পাকা মহুরী উপাধী।[৩৪]

উপরের বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, মুসলমান সমাজেও পাঠশালা শিক্ষা প্রচলিত ছিল। সেইসঙ্গে এও জানা যাচ্ছে যে, শহরের মূল কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থিত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষা অধরাই ছিল। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ সম্প্রসারণের আগে পর্যন্ত দেশীয় শিক্ষাকে আমরা ধর্ম বর্ণ ও শ্রেণিগত দিক থেকে অবিভাজিত ও একপ্রকার সেক্যুলার শিক্ষাই বলতে পারি। পরমেশ আচার্য তাঁর *বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা* গ্রন্থে দেখিয়েছেন বর্ধমান ও বীরভূমের পাঠশালাগুলিতে কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, সদগোপ, আগুরি, বৈষ্ণব, তেলি, ভট্টা, গন্ধবণিক, কৈবর্ত, চণ্ডাল, কুমোর, নাপিত, সুবর্ণবণিক, গোয়ালা, বাগদি, নাগ, তাঁতি, দৈবজ্ঞ, বৈদ্য, যুগি, বাড়ুই, কামার, ময়রা, ধোপা, রাজপুত, কলু, খ্রিস্টান ও মুসলমান সব ধর্মের শিক্ষকরাই পড়াতেন। আবার শিক্ষার্থীরাও আসতেন সমাজের সর্বস্তর থেকে।[৩৫] অর্থাৎ পাঠশালাগুলি ধর্ম ও বর্ণগত দিক থেকে ছিল বহুবর্ণিল। অবশ্য সেখানে সংখ্যাগুরু কায়স্থদের আধিপত্য ছিল চোখে পড়ার মতো। সম্ভবত একারণেই সেকালে প্রবাদ বাক্য প্রচলিত হয়েছিল যে 'কলমে কায়স্থ চিনি গোঁফেতে রাজপুত'।

৩.ক.ক।। বাংলার পাঠশালা ও পাঠ্যবিষয়

উনিশ শতকে প্রচলিত এই দেশীয় শিক্ষা কাঠামোতে আধুনিক পাঠক্রমের কোনো ধারণা ছিল না। আধুনিক পাঠক্রমে যেখানে একটিমাত্র জাতীয় কার্যক্রম গঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের জাগরণ ঘটানো এবং শিক্ষার সামগ্রিক উপকরণ সরবরাহ করা হয়।[৩৬] পাঠশালা কিংবা টোল, মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষায় সেই অর্থে কোনো নির্দিষ্ট পাঠক্রম ছিল না।

উনিশ শতকের পাঠশালায় তাই পড়া ও শেখার বিষয় বলতে ছিল – পুঁথি, চৌত্রিশ অক্ষরের চৌতিশা। যেমন – রাধিকার চৌতিশা, কালকেতুর চৌতিশা, সুগন্ধার চৌতিশা ইত্যাদি। আর পাঠ্য ছিল 'স্যাখত' বা 'সেহাখত' অর্থাৎ হিসাবের নথিপত্র শেখানো। যেমন – জমিজমার হিসাব, টাকা পয়সার হিসাব রাখার নিয়ম ইত্যাদি। পাশাপাশি ছিল 'চিঠিপত্র লিখিবার ধারা' 'নাম লিখিবার ধারা', 'গ্রাম লিখিবার ধারা' প্রভৃতি। পাঠশালায় নানা বৃত্তির বা পেশার শিক্ষাও প্রচলিত ছিল। যেমন ঘর তৈরি, পুকুর কাটা, কুয়ো তৈরির মাপজোখ শেখানো। এমনকি লেখার কালি তৈরি পদ্ধতিও শেখানো হত।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* থেকে জানা যায় যে, ছাত্রদের প্রথমে অক্ষরজ্ঞান, পড়ে যুক্তবর্ণ ও বানান শেখানো হত। বানানের পড়ে ব্যাকরণ শেখানো হত। দ্বিজরামের *অভয়ামঙ্গল* থেকে জানা যায় যে, সেই সময়ে অবস্থাপন্ন লোকেরা গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করতো। অক্ষর, যুক্তবর্ণ, বানান ও ব্যাকরণ শিক্ষার শেষে ছাত্রদের জ্যোতির্বিদ্যা ও অলঙ্কার শেখানো হত। ঘনরাম চক্রবর্তীর *শ্রীধর্মমঙ্গল* কাব্য থেকে জানা যায় স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ হতে শুরু করে ক্রমে ক্রমে ব্যকরণ, কাব্য, অলঙ্কার ও মল্লবিদ্যা শেখানোর সংবাদ পাওয়া যায়। অনেক পুঁথিতে হাতের লেখা সুন্দর করার পদ্ধতির কথাও জানা যায়।

সেকালের পাঠশালায় প্রথানুসারে কিছু বিদ্যার চর্চা হলেও আসলে পাঠশালা ছিল তৎকালীন সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ এক সাধারণ শিক্ষাধারা। উচ্চ জ্ঞানচর্চার সঙ্গে এর কোনো যোগ না থাকলেও সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের নানা সমস্যা ও ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা মেটাবার উদ্দেশে এই পাঠচর্চা সাধারণ মানুষের পাশেই থেকেছে। কিন্তু উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালভিত্তিক দেশজ শিক্ষার ভিত খসে পড়তে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে দেশজ শিক্ষার দ্বন্দ্বের জায়গাটি

স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে সমাজতাত্ত্বিক ও গবেষক পরমেশ আচার্য তাঁর 'Bengali Bhadralok And Educational Development in Nineteenth Century Bengal' প্রবন্ধে লিখেছেন -

> উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষার ইতিহাস মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের আয়োজনে ব্রিটিশ আধিকারিক, যাজক ও বাঙালি ভদ্রলোকের অংশগ্রহণের ইতিহাস। এই ইতিহাসের পাত্রপাত্রী একদিকে যেমন ব্রিটিশ আধিকারিক ও যাজকরা অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনের দাক্ষিণ্যে গড়ে ওঠা কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি সমাজপতিরা। আর এই প্রক্রিয়ায় গতরখাটা সাধারণ মানুষের প্রায় কোনো ভূমিকায়ই নেই। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসারের যাবতীয় টানাপড়েনের বাইরে অবস্থান করেছেন। এমনকি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাধারণ মানুষের শিক্ষার প্রশ্ন যখন সরকারি কর্মসূচিতে কিছু জায়গা পেল, তখনো তার দায় ছিল মূলত কিছু ব্রিটিশ আধিকারিকের।[৩৭]

এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'বাঙালির শিক্ষাচিন্তা : ১' শীর্ষক প্রবন্ধে আরও লিখেছেন –

> সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, বঙ্কিমের ভাষায় রামা কৈবর্ত্য ও হাসিম শেখেরা এই প্রক্রিয়ায় বিষয় মাত্র, বিষয়ী কখনোই নয়। লক্ষ করার বিষয়, এই প্রক্রিয়ার ফলে উনিশ শতকের শেষের সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণের বাঙ্গাল পাঠশালা ব্যবস্থার নাভিশ্বাস উঠেছিল। বাংলা পাঠশালার প্রাইমারি স্কুলে পরিণতি ঘটেছিল এক হিসেবে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাই গতর আয়েসী উচ্চ ও মধ্যবিত্তের কায়েমী অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া হিসেবে।[৩৮]

কিন্তু এই পাঠশালা ব্যবস্থা যে বাঙালি জীবনে এক সুদূরপ্রসারী অবদান রেখে যেতে সমর্থ হয়েছিল সে প্রসঙ্গে মূল্যায়ন করে গবেষক শ্রী আচার্য তাঁর 'Indegenous Educations, Traditions and Problems' প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন যে –

> এই বিষয়ে সন্দেহ নেই আধুনিক একক গোটা শিক্ষা ধারার প্রবর্তন অচিরেই নিম্নতম বর্ণ ও সামাজিক শ্রেণীর মানুষকে শিক্ষার আঙ্গিনার বাইরে ঠেলে দিয়েছিল, যার জের এখনো চলছে। অথচ অ্যাডামের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিম্নতম বর্ণ ও সামাজিক শ্রেণীর লোকেরা ক্রমেই বেশি সংখ্যায় তৎকালীন বাংলা পাঠশালায় অংশ নিচ্ছিল পড়ুয়া হিসেবে, এমনকি শিক্ষক হিসেবেও।[৩৯]

পাঠশালার এই শিক্ষা ধারা অচিরে 'স্কুল' শিক্ষায় রূপান্তরিত হয়ে আধুনিক শিক্ষার অর্গল মুক্ত করে দিলেও তা যে সাম্প্রদায়িক ভেদচিহ্নমুক্ত থাকতে পারেনি, তার নানা নমুনা পাওয়া যায় এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচলিত পাঠক্রমের বয়ানগুলি বিশ্লেষণ করলে। এ প্রসঙ্গে শ্রী আচার্য তাঁর 'শিক্ষাচিন্তায় সাম্প্রদায়িক বিভাজন' প্রবন্ধে লিখেছেন –

> শিক্ষার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সম্পর্ক আপাতদৃষ্টিতে অসঙ্গত মনে হলেও বিশ শতকের অবিভক্ত বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদী সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিশেষভাবে লক্ষণীয়।... শিক্ষার সঙ্গে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তাই সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদেরও এক অন্যতম কারণ। এক হিসেবে এ হলো দুই সম্প্রদায়ের প্রভাবশীল অংশের ক্ষমতা দখলের লড়াই।[৪০]

অর্থাৎ পাঠশালার অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে বিবাদী সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরও প্রসার ঘটলো।

৩.খ. টোলের শিক্ষা ও তার পাঠ্যবিষয় :

ব্রিটিশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে গোটা ভারতে ১৬৩০ টি পুরনো বেসরকারি টোল বা চতষ্পাঠীর সন্ধান পাওয়া যায়। যদিও টোল ও চতুষ্পাঠী একই জিনিস নয়। মধ্যযুগে বাংলায় সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি টোল নামে পরিচিত। কিন্তু চতুষ্পাঠী কথার অর্থ চার বেদ পাঠের প্রতিষ্ঠান। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নদিয়ায় এরকম ৪৬ টি সংস্কৃত শিক্ষালয়ের কথা জানা যায় যেখানে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৮০ জন। উইলিয়ম ওয়ার্ডের হিসাব অনুযায়ী ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ১৮১৮ সালে নদিয়ায় এরকম ৩১ টি শিক্ষালয়ে ৭৪৭ জন ছাত্র পড়াশুনা করতো। ওয়ার্ড জানান যে, এইসব বিদ্যালয়ের ১৭টিতে প্রধানত ন্যায়শাস্ত্র পড়ানো হত। ১১ টিতে মূলত স্মৃতিশাস্ত্র আর ৩ টিতে কাব্য, জ্যোতিষ ও ব্যকরণ পড়ানো হত। বাংলায় যেসময়ে নব্যন্যায় চর্চা শুরু হয় সেইসময় বাংলায় মোট কত টোল বা চতুষ্পাঠী ছিল তা জানা না গেলেও ন্যায়, স্মৃতি ও আগম-শাস্ত্রের পণ্ডিতদের সংখ্যা থেকে এমন অনুমান করা চলে যে, সেকালে সংস্কৃত শাস্ত্রীয় শিক্ষা চর্চার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। এখন প্রশ্ন হল এই সমস্ত টোলগুলিতে কী পড়ানো হত বা কী ছিল টোলের পাঠ্য বিষয়?

অ্যাডামের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলায় সাধারণত তিন ধরণের টোল ছিল। কিছু টোলে প্রধনত ব্যকরণ, সেইসঙ্গে সাহিত্য, অলঙ্কার ও কখনো পৌরাণিক কাহিনি পড়ানো হত। দ্বিতীয় ধরণের টোলে সাধারণত স্মৃতি ও সেইসঙ্গে কখনো পৌরাণিক কাব্য পড়ানো হত। আর তৃতীয় ধারার টোলে ন্যায়শাস্ত্রই ছিল প্রধান পাঠ্য বিষয়।[৪১] আসলে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার জন্য সকল শিক্ষার্থীর পক্ষেই ব্যকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। তবে টোলগুলিতে

নান বিদ্যায় শিক্ষাবিশারদ হওয়ারও নানা ধাপ ছিল। সাধারণত কোনো বিশেষ টোলে কোনো একটি বিষয়েই উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া হত। কিন্তু প্রায় সব টোলেই ব্যকরণ ও অলঙ্কার পড়ানো হত। আবার ব্যকরণ অলঙ্কার ও কাব্যসাহিত্যে উচ্চতর বিশেষজ্ঞ শিক্ষার প্রচলন ছিল।

এখানেই শেষ নয়; বাংলার টোলের পাঠ্যবিষয়ের ভাঁড়ারে আর কিছু বাকি আছে। আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ ও তন্ত্রশাস্ত্রেও বিশেষজ্ঞ শিক্ষার প্রচলন ছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ শিক্ষা অন্তে কবিরত্ন এবং সর্বোচ্চ ভিষকশাস্ত্রী উপাধি দেওয়া হত।

টোলের পড়াশুনা প্রধানত বাচনিক ধারাতেই চলত। যদিও পুঁথির সাহায্য নেওয়া হত। শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষালাভে অগ্রসর হতেন। এমনকি পণ্ডিত সভায় বিতর্কে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অধিগত বিদ্যার পরীক্ষা হত। এক্ষেত্রে পুঁথির সাহায্য নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ছাত্রদের অধীতবিদ্যা কণ্ঠস্থ বা স্মৃতিতে গেঁথে রাখতে হত।

টোলের পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে ন্যায় ও স্মৃতি এই দুটির বিশেষজ্ঞ শিক্ষার চাহিদা ছিল বেশ ভালোরকম। তবে কাব্য, ব্যকরণ ও অলঙ্কার এই বিষয়গুলির জনপ্রিয়তা ছিল সর্বাধিক। উইলিয়ম ওয়ার্ডের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী উনিশ শতকের শুরুর দশকে, প্রতি এক হাজার ছাত্র যারা ব্যকরণ পাঠ শেষ করেছে তাদের চার বা পাঁচ শতাধিক ছাত্র 'কাব্যে'র কিছু অংশ পড়ে। চারশত ছাত্র 'স্মৃতি' পড়ে। তিনশত ছাত্র পড়ে 'ন্যায়', পাঁচ বা ছয়জন ছাত্র 'মীমাংসা', 'সাংখ্য' বা 'বেদান্ত' পাঠ করে। দশজন ছাত্র হয়তো 'তন্ত্র' আর দশজন 'জ্যোতিষ'। পঞ্চাশজন ছাত্র হয়ত 'ভাগবত' বা 'পুরাণ' পড়তে আগ্রহী হবে।[৪২]

এই ছিল মোটামুটি সেকালের টোলের শিক্ষাসুচি। এখানকার এই সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা বা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর আত্মিক উন্নতি সাধন হলেও এখান থেকেই শিক্ষার্থীর মনে ব্রাহ্মণ্যবাদেরও বীজ বপন করা হত। বর্ণভিত্তিক সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসকে লোকমানসে মান্যতা দিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতো এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। সেক্ষেত্রে জ্ঞানের একচেটিয়া অধিকার ও গ্রাম সমাজে স্বাভাবিক নেতৃত্ব হিসেবে ব্রাহ্মণ্যবাদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতেই টোলের শিক্ষাব্যবস্থা এগিয়ে এসেছিল বলে আমদের মনে হয়।

এই সব আয়োজন যতই অকিঞ্চিৎকর মনে হোক, তবু মনে রাখতে হবে যে সেকালের বাংলার শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। তবে এই সুযোগটুকুও সেকালের সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছতে পারেনি। দীননাথ সেন তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে অ্যাডামের রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন –

সে সময় বাংলা ও বিহারে পাঠশালার সংখ্যা লক্ষাধিক।

গড়ে প্রতি ৪০০ জন পিছু পাঠশালার সংখ্যা ১ টি।

শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা।

পড়ুয়াদের বেতন ছিল – ১ আনা থেকে ৪ আনা।

গুরুমহাশয়ের মাইনের উৎস ছিল পড়ুয়াদের প্রদেয় বেতন/জমিদারের বৃত্তি/ জমিদারের সিধা (টাকা পয়সার বদলে ভোজ্য দ্রব্য)

শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন হাড়ি/শুঁড়ি/ধোবা/ কলু/মুসলমান/ব্রাহ্মণ[৪৩]

৩.গ. মক্তব - মাদ্রাসার শিক্ষা

এখানে মনে রাখতে হবে পাঠশালার পড়ালেখা যেমন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবহারিক শিক্ষার আয়তন পেয়েছিল তেমনভাবে টোলের শিক্ষা ধর্মীয় চিন্তা ভাবনাকে পাশ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। একইরকমভাবে মাদ্রাসা ও মক্তব ছিল মুসলমানি শিক্ষার প্রধান প্রতিষ্ঠান। সেগুলি ছিল মূলত কোরান স্কুল। সৈয়দ আলাওল 'তোহফা' নামক তত্ত্ব-উপদেশমূলক রচনায় ইসলামি শিক্ষা সম্পর্কে লিখেছেন –

বিদ্যা বিনু যে রহে যুগল আঁখি অন্ধ।

যত্ন কর সর্ব হন্তে বিদ্যা পঠ ভাল।

না পড়িলে অনুশোচে গোয়াইব কাল।

সর্বশাস্ত্র শিখ আগে পড়িয়া কোরান।

ঈশ্বর চিনিতে বিদ্যা পঠ জন্মভর।

বিদ্যার নির্মল জ্যোতে চিনিব ঈশ্বর।[৪৪]

দেখা যাচ্ছে আলাওল আগে কোরাণ পাঠ ও পরে সর্বশাস্ত্র পড়ার কথা বলছেন। আর সারাজীবন পড়াশুনার মূল উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরকে চেনা বা জানা। আবার মালিক মুহম্মদ জায়সীর *পদ্মাবতী* কাব্যের ভূমিকায় কবি জানাচ্ছেন যে তাঁর চার বন্ধু মালিক ইউসুফ, সালার খাদিম, মিঞা সালোন ও শেখ বেদে পারদর্শী ছিলেন চার বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায় ও ধর্মশাস্ত্র এই চৌদ্দ বিদ্যায়।[৪৫]

আব্দুর রহিম তাঁর *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে ও দ্বিতীয় খণ্ডের দশম অধ্যায়ে মুসলমান সাসনামলে বাংলার শিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করেছে এবং লিখেছেন –

> বঙ্গদেশে মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যপক প্রসার ছিল... মুসলিম ছেলেমেয়েদের শিক্ষা শুরু হত মক্তবে। এসব মক্তব প্রতিটি মসজিদ এবং এমনকি ধনী ব্যক্তিদের বাড়ী সংলগ্ন ছিল।[৪৬]

মক্তবে মূল পাঠ্য ছিল কোরাণ আবৃত্তি ও লেখা শেখানো। গবেষক পরমেশ আচার্য মনে করেন মধ্যযুগে মূলত ধর্মান্তরিত শিশুদের শিক্ষার জন্যই বাংলায় মক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষা চালু হয়। কালে কালে হিন্দুরাও এখানে পড়াশুনা করতো এমন নজিরও আছে। বাংলায় ঠিক কবে মক্তব প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল সে সম্পর্কে নিখুঁত কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও বক্তিয়ার খিলজির আমলে বাংলায় প্রথম মাদ্রাসা স্থাপিত হয় সে প্রমাণ আছে। মনে করা হয় সেই সময়েই মক্তব শিক্ষাও চালু হয়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইসলামি শিক্ষার সম্পর্কে বিপ্রদাস পিপলাইয়ের *মনসা বিজয়* কাব্য থেকে কিছুটা ধারণা লাভ করা যেতে পারে। বিপ্রদাস লিখেছেন –

যতেক ছৈয়দ মোল্লা জপয়েত বিসমিল্লা

সদা মুখে কলিমা কেতাব

হিন্দুত কলিমা দিল মুছলমানি শিখাইল

তথা বৈসে জত মুছলমান

শিখাএ নামাজ অজু সদাই মক্তবে রজু

নিরন্তর খলিপা জোগান।[৪৭]

অর্থাৎ 'মনসা বিজয়' এর বর্ণনা মতে, মক্তবের সৈয়দ মোল্লারা কলমা কেতাবের পাশাপাশি হিন্দুদের ইসলামি আদব কায়দা শিক্ষা করতেন এবং সেইসঙ্গে নামাজ অজু শিক্ষা করতেন।

ষোড়শ শতকের কবি দ্বিজ মাধবের *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* - এ মক্তবের উল্লেখ না থাকলেও 'কিতাপ কোরাণ' আর 'নামাজ পড়ার' কথা পাই। ষোল – সতের শতকের কবি মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* এ মক্তবের পড়াশুনার কথা আছে।

যতশিশু মুছলমান তুলিল দলিজখান

মখদম পড়ান পড়না

অন্য একটি পাঠে আছে –

যত শিশু মুছলমান তুলিল মক্তবখান

মখদম পড়ায় পঠনা।[৪৮]

মনসা বিজয় ও *চণ্ডীমঙ্গল* – এর এই ছত্রগুলি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে মুসলমান অধিকারের পর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মতোই বাংলায়ও ধর্মান্তরিতদের ইসলামি আচার নামাজ-অজু শেখানোর ব্যাপারে মক্তব এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। এই কারণেই বাংলায় ইসলামি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার জরুরী হয়ে পড়েছিল। এই লক্ষ্যপূরণের জন্য যেমন অগণিত মসজিদ স্থাপিত হতে শুরু করে তেমনভাবেই সেগুলি কোরান হাদিসের শিক্ষাও প্রসার লাভ করতে থাকে। সঙ্গত কারণেই গবেষক পরমেশ আচার্য বলেছেন –

> ধর্মীয় তাগিদে গড়ে ওঠায় ইসলামি প্রাথমিক শিক্ষা ধর্মীয় আওতার বাইরে এসে 'সেক্যুলার' ব্যবহারিক শিক্ষায় পরিণত হতে পারে নি বলেই মনে হয়। ...মক্তব শিক্ষা কখনোই বাংলা পাঠশালার মতো সকল ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণির লোকের সাধারণ ব্যবহারিক শিক্ষার চাহিদা মেটাতে পারেনি। আঠারো উনিশ শতক নাগাদ দেখা যায় বেশিরভাগ মক্তবই আসলে কোরান স্কুল।[৪৯]

বাস্তবিক তাই ঘটেছিল উনিশ শতকের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এবং আরো স্পষ্টভাবে বললে বিশ শতকের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের আগে এদেশের মুসলমান সমাজ কোরাণ নির্ভরতাকে উপেক্ষা করতে পারেনি। আর একারণে সব ধরণের মক্তবেই ধর্মীয় জ্ঞানই ছিল প্রধান পাঠ্য।

অবশ্য মক্তবগুলিতে বাংলা শিক্ষা হত কিনা সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। আঠারো শতকের শেষ পাদের কবি শেখ মনোহর তাঁর *শমসের গাজীনামা* য় লিখেছেন –

তোলাব খানায় ছাত্র শতেক রাখিয়া
গাজী পালে সে সকলে অন্নবস্ত্র দিয়া।
সন্দ্বীপের অন্ধ এক হাফিজ আনিয়া
কোরান পড়াএ সবে পুণ্যের লাগিয়া।
হিন্দুস্তান হোইতে এক মৌলবী আনিল
আরবি এলেম ছাত্রগণে শিখাইল।
যুগদিয়া হৈতে এক গুরুবর আনি
শিখাইল ছাত্রগণে বাঙ্গালার বাণী।
ঢাকা হইতে মুনশী আনি ফারসি পড়াএ
হেনমতে নানা ভাষাএ এলেম শিখাএ।
দিনমধ্যে নিয়ম করিল হেন মতে
দশ দশ দণ্ড ধরি দুভাগে পড়িতে।
ভোর রাত্রি চারি দণ্ড আগাজে প্রহর
পাঠের সময় করে দিল গাজীবর।[৫০]

শামসের গাজীর এই সাক্ষ্য দেখে অনেকে অনুমান করেছেন যে, মক্তবে একাধিক ভাষা বিশেষ করে আরবি, ফার্সি ও বাংলা শেখানো হত। আব্দুল রহিমের সাক্ষ্য থেকেও আমরা জানতে পারি ধর্মীয় শিক্ষাদানই প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি ছিল। তবে তিনি এও লিখেছেন যে সেখানে আরবি ফার্সি ও বাংলা এই তিনটি ভাষা শিক্ষা করা হত।[৫১] তবে পাঠশালা বা মক্তবগুলিতে উনিশ শতকে এতসব ভাষা পড়ানো হত কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। এই বিতর্কের প্রামাণ্য সাবুদ মিলবে মীর মশাররফ হোসেনের বিবৃতি থেকে। ১৮৪৮ সালে জন্মেছিলেন তিনি। *আমার জীবনী*তে মীর সাহেব লিখছেন –

> চার বৎসর চার মাস চার দিন পর আমার হাতে তাক্তি (হাতে খড়ি) হইয়াছিল। ... কোন কোন গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ছিল। মক্তব মাদ্রসার নামও কেহ জানিত না। ফারসি আরবি কেহ পড়িত না...গ্রামে আরবি ফারসি পড়ার নিয়ম নেই, প্রয়োজনও বেশী নাই। পুণ্য জন্য আরবি শিক্ষা। কোরাণ শরীফ পাঠ। ...সে পড়া পড়িয়া যাওয়া মাত্র, আরবি কোরান শরীফের অর্থ কেহই আমাদের দেশে জানিতেন না। আমি নন্দী মহাশয়ের নিকট বাংলা অক্ষর শিক্ষা করিতে লাগিলাম। আরবি বর্ণমালা শিক্ষার অগ্রে বাঙ্গালার বর্ণমালা মুখস্থ হইল। তালপাতার অক্ষর লিখিতে শিখিলাম।[৫২]

মীর মশাররফ হোসেনের এই বয়ান থেকে স্পষ্ট যে, মীর সাহেবের শৈশব পর্যন্ত জাগতিক জীবনে আরবি ফারসি শিক্ষার অপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করে দিয়েছেন একদল সচেতন মুসলমান। প্রশ্ন এটাই যে এই উপলব্ধিটা কি সর্বস্তরের মুসলমানের? নাকি শুধুমাত্র সমাজের উঁচুতলার সচেতন শ্রেণিটিই এই বোধের আওতায় এলেন? মীর সাহেব জমিদার পরিবারের সন্তান তাঁর যেমন হিন্দুর পাঠশালায় পাঠচর্চার সুযোগ হয়েছিল সে সুযোগ সমকালের সকল মুসলমানের হয়েছিল কি? অ্যাডামের রিপোর্ট আমাদের হাত ধরে দেখিয়ে দিয়েছে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল না। যারা শিক্ষককে ও পাঠশালায় বেতন দেবার সামর্থ্য অর্জন করেছিলেন কেবলমাত্র তাঁরাই তাঁদের সন্তানদেরকে পাঠশালায় বিদ্যা চর্চার সুযোগ করে দিতে পারতেন।

আমরা জানি মুসলিম বিশ্বে শিক্ষা পদ্ধতি সমন্বয়হীন এবং অভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামি শিক্ষা দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে হালকাহ, মক্তব, প্রাথমিক বিদ্যালয়, বইয়ের দোকান, মসজিদ এবং মাদ্রাসা এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই একই ধরণের বিষয় পড়ানো হয়।[৫৩] এর মধ্যে 'মক্তব বা মুক্তুব' আরব বিশ্বে ইসলাম পূর্ব সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মক্তবের এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যায়ন করে আবুল বারকাত, রওশন আরা প্রমুখ শিক্ষাতাত্ত্বিক তাঁদের *বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি উৎস বিকাশ ও প্রভাব* গ্রন্থে জানিয়েছেন –

> ইসলামের আগমনের সাথে সাথে ঐ বিদ্যালয়গুলি (মক্তব) ইসলামি শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে উন্নীত হয়। শিক্ষার্থীরা যতটা সম্ভব নিখুঁতভাবে কোরান মুখস্থ করতো। কিছু কিছু বিদ্যালয়ে কবিতা, পাটিগণিত, নৈতিকতা এবং প্রাথমিক ব্যাকরণ শিখানো হতো। মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, সিসিলি এবং স্পেনের প্রায় সব শহর এবং গ্রামেই মক্তব স্কুল ছিল।[৫৪]

শিক্ষাপদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ও শ্রেণিস্বার্থের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে –

> যেহেতু মুসলমানের মৌলিক শিক্ষা স্কুল 'মক্তব' রাজকীয় পরিবারে সীমাবদ্ধ ছিল তাই সেখানে শিক্ষাপদ্ধতির নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল। তাদের পাঠ্যসূচি ছিল সীমিত; তারা সবসময় ভালো প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিতে পারত না। অবকাঠামো সুষ্ঠু পড়াশোনার জন্য সহায়ক ছিল না। ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বাসী লোকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল অমীমাংসিত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করতে পারতো না এবং যারা পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করত তাদের পর্যাপ্ত পড়ালেখার সুযোগ দিতে পারত না।[৫৫]

এই সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তির জন্যই উদ্ভব হলো 'নতুন একটি স্কুলের – যার নাম মাদ্রাসা। ... অর্থাৎ অষ্টম শতক থেকে যে মসজিদ কলেজ ছিল, মাদ্রাসা হলো তার একটা উন্নত রূপ।'[৫৬]

এই দিকটি বিচার করে আমরা বলতে পারি ইসলামি শিক্ষার জন্য তৈরি সমস্ত মক্তবই ছিল মাদ্রাসার ক্ষুদ্র সংস্করণ। মনে রাখতে হবে মক্তব, মসজিদ, মাদ্রাসা এই প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানেই ইসলামি শিক্ষা প্রদান করা হলেও ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের মাত্রাও ভিন্ন। প্রসঙ্গত এখন আমরা উনিশ শতকের মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করবো।

৩.গ.ক. মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস

'মাদ্রাসা' একটি আরবি শব্দ, যা যেকোনো 'স্কুল' ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মীয় (যেকোনো ধর্ম) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইংরেজি ভাষায় যেমন 'স্কুল' শব্দটি প্রযুক্ত হয়, তেমনই আরবিতে 'মাদ্রাসা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। হিব্রুতে বলা হয় 'মিদরাসা', যার অর্থ হলো যে স্থানে শিক্ষা দেওয়া হয়। অর্থাৎ এর সঙ্গে ধর্মের কোনো যোগ নেই।[৫৭] কিন্তু ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অচিরেই মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় অনুষঙ্গ যুক্ত হয়ে পড়ে।

৩.গ.খ. মাদ্রাসা : উদ্দেশ্য অভিমুখ অভিপ্রায়

ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক যুগে মাদ্রাসা প্রচলিত ছিল না। সেসময় মসজিদ থেকেই সব ধরণের ইসলামি কার্যক্রম পরিচালিত হতো। এই সময়ে লোকজন নির্দিষ্ট কিছু জ্ঞানী পণ্ডিত মুসলমানের কাছে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে আসতো। এসব পণ্ডিত বা শিক্ষকদের শায়েখ বলা হতো। এঁরা মসজিদে নিয়মিত শিক্ষা দান করতেন। ৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ফেজ শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় জামিয়াত আল

করাইন। যেটিকে মুসলিম বিশ্বের সবথেকে প্রাচীন মাদ্রাসা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রখ্যাত ধনী বণিক মোহাম্মদ আল ফিহরির কন্যা ফতেমা আল ফিহরি মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর আব্বাসীয় যুগের শেষের দিকে শেলজুক ভিজিয়ের নিজাম আল মুল্‌ক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম 'মাদ্রাসা নিজামিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৮] মধ্যপ্রাচ্যে মধ্যযুগে ফাতমি মামলুকের শাসনামলে এবং তাঁদের উত্তরসূরিরা ওয়াকাফ নামে ধর্মীয় বিষয়াবলী মাদ্রাসার মাধ্যমে প্রচলন করেন। আমাদের মনে হয় এখান থেকেই মাদ্রাসা শিক্ষা ধর্মীয় ও শ্রেণি স্বার্থে চালিত হতে শুরু করলো। এ প্রসঙ্গে আবুল বারকাত, রওশন আরা প্রমুখ শিক্ষাতাত্ত্বিক তাঁদের *বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি উৎস বিকাশ ও প্রভাব* গ্রন্থে স্পষ্টতই জানিয়েছেন –

> মাদ্রাসা শুধু পদমর্যাদার শক্তিশালী প্রতীক বহন করে না। এটি পরবর্তী উত্তরসূরিদের মাঝেও মর্যাদাবোধ এবং সম্পদশালী মনোভাব ধারণ করার মাধ্যমও।[৫৯]

ইসলামে মনে করা হয় ধর্ম ছাড়া শিক্ষা মুসলিমদের কাছে একটি অস্বাভাবিকতা বা অনিয়ম।[৬০] ইসলামের শিক্ষাতাত্ত্বিকরা মনে করেন ঐতিহ্যবাহী সমস্ত বই পুস্তকের মধ্যেই জ্ঞান আহরণের বিষয়টি বিদ্যমান কিন্তু সেইসমস্ত জ্ঞানের মূল লক্ষ্য হবে আল্লাহকে জানা এবং সেই জ্ঞানকে কোরানের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে হবে। এই জায়গা থেকেই আবুল বারকাত, রওশন আরা প্রমুখ শিক্ষাতাত্ত্বিক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন –

> ইসলামে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং এর বাইরে অন্য সব জ্ঞানকে নিষ্প্রয়োজন মনে করা হয় এমনকি বিপজ্জনক। ... মুসলিমদের মধ্যে সাধারণভাবে মনে করা হয়, বিজ্ঞান ও অন্যান্য আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য বিপজ্জনক এবং ধর্মীয়ভাবে একে অনুৎসাহিত করা হয়েছে...[৬১]

এখন আমরা যদি মাদ্রাসা শিক্ষা এবং ইসলামি শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম শিক্ষার অনিবার্য যোগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার অনাগ্রহ ও অনীহার দিকটি বিচার করি তাহলে এর মধ্যে এক প্রকার শ্রেণিস্বার্থে চালিত হওয়ার অভিসন্ধি লক্ষ করবো। এ প্রসঙ্গে আবুল বারকাত, রওশন আরা প্রমুখ গবেষক সমাজতাত্ত্বিক তাঁদের পূর্বোক্ত গ্রন্থে নিরপেক্ষতা ও সতর্কতার সঙ্গে জানিয়েছেন –

> কিছু মৌলবি আরবি পণ্ডিত বা বিশেষজ্ঞ হিসেবে অনেক খ্যাতির অধিকারী, কিন্তু সাধারণ জ্ঞান এবং তথ্য সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান খুবই অপর্যাপ্ত। আমরা যদি ভারত, পারস্য, মিশর বা তুরস্কের দিকে তাকাই, [তাহলে লক্ষ করবো] মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিতভাবেই আধুনিক শিক্ষা প্রসারের সরাসরি বিরুদ্ধে।

> ইসলামের প্রাথমিক যুগের দিকে তাকালে দেখা যায়, শিক্ষা ছিল মানব জাতির কল্যাণের জন্য কোরআন পড়তে শেখা এবং কোরআনের বার্তা মানুষের কাছে প্রচারের উপায়স্বরূপ এবং বিশ্বকে বুঝতে পারার উপায়। [এইভাবে] শিক্ষার উপায় এবং উদ্দেশ্য হয়ে যায় খুব সংকীর্ণ, অপ্রায়োগিক এবং শুধু ধর্মীয় মতবাদ প্রকাশের উপায়, অসহনশীল এবং মাঝে মাঝে সংঘাতপূর্ণ।[৬২]

ইসলামি শিক্ষার প্রাথমিক যুগের এই সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা উপেক্ষা আধুনিক শিক্ষার প্রচলন ও প্রাস ঘটে মধ্যযুগ এবং তার পরবর্তী সময়ে। কিন্তু উপরিউক্ত দেশগুলিতে গোঁড়া ও মৌলবাদী বাদশাহসহ প্রাদেশিক প্রধানদের রাজত্ব শুরু হলে রাষ্ট্রগুলি প্রাচীন গোঁড়া ও কোরাআনি শিক্ষা ও হাদিস ব্যবস্থায় ফিরে যায়। এক্ষেত্রে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার মধ্যে দিয়ে তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও আধিপত্য কায়েম করা –

> তারা ভেবেছিল, রক্ষণশীল ও কঠোর শরিআহ্ বা ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা অধিক শক্তিশালী বা নিরাপদ থাকবে এবং অনাধুনিক নাগরিকদের বশীভূত করার এটি একটি উপায়; এবং যৌক্তিক বা আধুনিক শিক্ষা তাদের রাজত্বের পথে হুমকিস্বরূপ হতে পারে।[৬৩]

এই কারণেই পশ্চিমা শক্তি মুসলিম দেশসমূহে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করার পর পরই ইসলামি শিক্ষার প্রসার মুসলিমরা নিজেরাই বন্ধ করে দেয়। পরিবর্তে রক্ষণশীল, সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ ইসলামি শিক্ষা কোনোরকম পরিবর্তন ছাড়াই এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হতে থাকে; যা আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও পরাভূত হয়ে মুসলমান সমাজকে 'পিছড়েবর্গে' ঠাঁই দিতে সচেষ্ট হয়েছে বলেই সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. শেখ মকবুল ইসলাম বিদ্যালয় শিক্ষার সমান্তরালে 'ইসলাম নির্ভর' মাদ্রাসা শিক্ষার অবস্থান বিচার করে এর কঠোর সমালোচনা করেছেন।[৬৪] সৈয়দ মাসুদুল হোসেন তাঁর 'শিক্ষা ও মুসলিম সমাজ' প্রবন্ধে একাধিক প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে এই সত্যে পৌঁছতে চেয়েছেন যে, ধর্মশিক্ষাকে অগ্রাধিকার অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে মুসলিম সমাজ কীভাবে সময়ের দাবী থেকে বহু যোজন দূরে সরে গেলো।[৬৫] খায়রুল বাসার তাঁর 'মাদ্রাসা শিক্ষা : সোনার পাথরবাটি' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন ধর্মের দ্বারা চালিত এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ধর্ম বিশেষকে জানা এবং অন্য ধর্মের তুলনায় আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করা। স্বাভাবিকভাবেই এই ধারার শিক্ষায়তনে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি পঠনপাঠনে উৎকর্ষ

ও সিদ্ধিলাভের প্রশ্নই ওঠে না। তাই মাদ্রাসা শিক্ষাকে তিনি সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে মূল্যায়ন করেছেন।[৬৬]

এখন এই পটভূমিকায় আমরা অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে কলকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা ও সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে তার বিকাশ-বিবর্তনের তরঙ্গে বাঙালি মুসলমান জীবনে তার প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

৪. কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা ও ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা

আজ থেকে ঠিক ২৪৩ বছর আগে ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ইতিপূর্বে বাংলায় যত মাদ্রাসা ছিল তার সবগুলিই ছিল একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে ওঠা বেসরকারি মাদ্রাসা। কিন্তু কোম্পানি আমলে সরকারের সহায়তায় ও অর্থানুকূল্যে গঠিত এই মাদ্রাসাটিই ছিল প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এর প্রায় ২০ বছর পর ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় সরকারি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং ৩৭ বছর পর ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বেসরকারি হিন্দু কলেজ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছিল সিভিলিয়নরা এবং হিন্দু কলেজে হিন্দু ভদ্র সন্তানরা লেখাপড়া করতেন। আর মুসলমান শরিফ সন্তানরা কলকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ ও বিদ্যাচর্চার সুযোগ পান।

৪.ক।। কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

১৭৮১ সালের ১৭ এপ্রিল ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপনের উপলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যখ্যা করে একটি 'মিনিট' বা মন্তব্যপত্র প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি বলেন যে –

> To promote the study of Arabic and Persian language and Mohammedan Law, with a view more especially to the production of qualified officers for the court of justice. [৬৭]

অর্থাৎ কলকাতা মাদ্রাসার লক্ষ্য ছিল। আরবি ফারসি ভাষায় মুসলমানি আইনচর্চা ও উপযুক্ত অফিসার গড়ে তোলা। এই লক্ষ্য ১৭৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার কিছু গণ্যমান্য ও পদস্থ মুসলমান তাঁর কাছে একটি লিখিত আবেদন পেশ করেন এবং দেশীয় যুবকদের মুসলিম আইন ও বিজ্ঞানাদি শিক্ষার লক্ষ্যে একটি মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য দাবি জানান। হেস্টিংস এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং মজউদ্দীন নামের একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে মাদ্রাসা খোলার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

১৭৮৫ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস আর একটি মিনিটে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাকে আরো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন এবং বলেন –

> To continue the administration of the criminal courts of juridicature, and many of the most important branhes of the police in the hands of Mohammedan officers. To discharge with credit the duties and fucntions annexed to those jurisdictions it is necessary that the persons who holds them should not only be endued with natural talents, but also that they should be possessed of a considerable degree of erudition in the Persian and Arabic languages, and in the implicated system of laws, founded on the tents of their religion.[৬৮]

অর্থাৎ ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর এই মিনিটে কলকাতা মাদ্রসা স্থাপনের ক্ষেত্রে শুধু কোম্পানির প্রয়োজনের দিকটি তুলে ধরেননি। কোম্পানির ক্ষমতালাভের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুসলমান সমাজের প্রয়োজন সম্পর্কেও আলোকপাত করেন। সেক্ষেত্রে কলকাতা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল অফিস আদালতের যোগ্য কর্মচারী ও আইনজীবী তৈরি করা, যোগ্য মানুষ গড়া নয়। কিন্তু 'যোগ্য মানুষ গড়া' দূরের কথা, সময়োপযোগী কর্মচারী কিংবা আইনজীবী তৈরিতে এই মাদ্রাসা কতদূর সফল ও কতটা ব্যর্থ সেই আলচনায় আসা যাক।

৪. খ. কলকাতা মাদ্রাসা : পরিচালনার ইতিহাস

মজউদ্দীনের হাত ধরে কলকাতা মাদ্রাসার যাত্রা শুরু হলেও শিক্ষক হিসেবে অচিরেই তাঁর ব্যর্থতা নজরে আসে। প্রথমে তিনি মাদ্রাসা পরিচালনার ব্যাপারে সুযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে নির্বাচিত হলেও ১৭৯২ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ রাজস্ব বোর্ডের পরামর্শে মজউদ্দীনকে অপসরণ করেন। বোর্ড তদন্ত করে মজউদ্দীনের 'অত্যন্ত অপরাধমূলক ও ত্রুটিপূর্ণ আচরণ' দেখতে পান। ১৭৮৫ সালের ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত হেস্টিংসের দ্বিতীয় মন্তব্যপত্রে দেখা গেছে মাদ্রাসার একমাত্র শিক্ষক মজউদ্দীন। ১৭৯১ সালের তদন্ত রিপোর্টে দেখা যায় মাদ্রাসায় মজউদ্দীন ছাড়া আরো ৪ জন সহকারী শিক্ষক ছিলেন। সেইসময়ে যাঁদের মাসিক বেতন কাঠামো ছিল নিম্নরূপ –

মজউদ্দীন ৪০০ টাকা, প্রথম সহকারী শিক্ষক ১০০ টাকা, দ্বিতীয় ৮০ টাকা, তৃতীয় ৬০ টাকা, চতুর্থ ৪০ টাকা। এছাড়া 'খতিব' ও 'মোয়াজ্জেম' নামে দুইজন অশিক্ষিত কর্মী ছিলেন, যাঁদের

মাসিক বেতন ছিল যথাক্রমে ২০ টাকা ও ১০ টাকা।[৬৯] খতিবের কাজ ছিল মাদ্রাসার মৌলবি ও সরকারি কর্তৃপক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করা।

১৮১২ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আরবি বিভাগের অধ্যক্ষ প্রফেসর লুমস্‌ডেন সাধারণভাবে মাদ্রাসাশিক্ষার বিরূপ সমালোচনা করেন এবং একজন ইউরোপীয় সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগের পরামর্শ দেন, যার প্রধান কাজ হবে শিক্ষকগণ ঠিক মতো কাজ করছেন কিনা তা তদারক করা এবং ছাত্রদের উন্নতি হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।

১৮১৭ সালে লুমসডেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আরবি বিভাগের রিপোর্ট লিখতে গিয়ে সামগ্রিকভাবে এদেশের আরবি শিক্ষার হীন চিত্র তুলে ধরেন। তাঁর মতে –

> দেশীয় মৌলবিদের ভাষাজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা অত্যন্ত নিম্নমানের ছিল। ... যাঁরা মৌলবি উপাধি ধারণ করেন তাঁদের অনেকে ছিলেন ভেকধারী, তাঁদের আরবি জ্ঞান ছিল যৎসামান্য। ... দেখা গেছে তারা যে সকল পুস্তক পড়েছেন, সেগুলির ব্যখ্যা করতে অসমর্থ হন। ... মৌলবিরা মেটাফিজিক্যাল বা অধিবিদ্যা বিষয়ে পড়াশুনা করেন, সামান্য গণিত, ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা, অলঙ্কারশাস্ত্র, আইন ও দর্শন পড়েন। ... আরবিতে আইন ধর্ম ও অধিবিদ্যা শিক্ষার জন্য আরবি চর্চা করেন। ... তাঁরা আরবি পড়েন, কিন্ত বুঝেন না কিছুই। ইতিহাস, কবিতা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁরা প্রায় অজ্ঞ।[৭০]

কলকাতা মাদ্রাসা ছিল এই ধরণের দেশীয় মৌলবিদের আঁতুড়ঘর। কাজে কাজেই সেখানেও যে বিদ্যার নামে 'অবিদ্যার' বহরই বাড়ন্ত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দেশীয় মৌলবিদের এই অক্ষমতার কথা মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'আমার জীবনী'র 'বিদ্যাশিক্ষা' অধ্যায়তেও উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতে –

> পুণ্য জন্য আরবি শিক্ষা কোরান শরিফ পাঠ। সে পাঠ বড়ই আশ্চর্য্য। ... সে পড়া পড়িয়া যাওয়া মাত্র, আরবি কোরান শরীফের অর্থ কেহই আমাদের দেশে জানিতেন না। এখন পর্যন্ত মোল্লার দল যাহারা কোরান শরীফ পড়িয়া পয়সা উপার্জন করে, তাহারা তো জানেই না। শুধু পড়িয়া যাওয়া তাহাদের শিক্ষা। ... আর কোরাণ শরীফ অর্থশূন্য ভাবে কণ্ঠস্থ করিতে পারিলে তাহার নাম গ্রাম দূরে থাকুক পরগণায় পরগণায় জারি হইল – অমুক গ্রামে অমুকে হাফেজ হইয়াছেন।[৭১]

মীর সাহেবের উপরিউক্ত বর্ণনায় সেকালের মুসলমান সমাজে অর্থহীন আরবি ফারসিসহ ধর্মীয় শিক্ষার অসারতার দিকটি সুস্পষ্ট।

লুমস্‌ডেন সাহেবের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৮১৯ সালে ক্যাপ্টেন আর্ভিংকে সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয় এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ৩৯ বছরের মাথায় দেশীয় পণ্ডিতদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো হয়। লক্ষ করবার বিষয় ১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্র ভিভিয়ান লুই ডিরোজিও ঐ কলেজেরই শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের জন্ম দেন আর ততদিনে ৪৫ বছর অতিক্রম করেও কলকাতা মাদ্রাসা একজন সমাজ প্রগতির নেতা সৃষ্টি করতে পারেনি।

এই সময়কার ইতিহাসের দিকে নজর দিলে আমরা লক্ষ করবো ১৮১৩ সালে কোম্পানি নতুন সনদে প্রতি বছর শিক্ষা খাতে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করবার অনুমতি পায়। যার বেশিরভাগটা ব্যয় হতে শুরু করে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের অনুকূলে। ১৮২৩ সালে 'জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন' নামে স্বতন্ত্র্য একটি শিক্ষা বিভাগ খোলা হয়। ১৮৩৫ সালে মেকলের বিখ্যাত 'মিনিট' প্রকাশিত হয়, যার ভিত্তিতে বড়লাট বেন্টিঙ্ক ১৮৩৭ সালে ফারসিকে বর্জন করে রাষ্ট্রভাষা বা সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রচলন করেন। দেশীয় ভাষাগুলিও অফিস আদালতের ভাষারূপে স্বীকৃত লাভ করে। ১৮৪৪ সালে হার্ডিঞ্জ তাঁর ঘোষণাপত্রে জানিয়ে দেন যে, এখন থেকে কেবলমাত্র ইংরেজি শিক্ষিত যুবকেরাই সরকারি চাকরি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। লক্ষ করবার বিষয় এই সময়পর্বে মুসলমানরা মাদ্রাসা শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরে একেবারে অচলাবস্থায় স্থিত হয়ে পড়ে।

আধুনিক শিক্ষার প্রচলন ও বিস্তারে মাদ্রাসা শিক্ষার টালবাহানা ছিল নজরকারা। ১৭৯১ সালে প্রথম মাদ্রাসায় তদন্তের সময় মি. চপম্যান মাদ্রাসার অভ্যন্তরে 'অত্যন্ত নোংরা ও বিশৃঙ্খল' অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। মাদ্রাসার খাতায় ছত্রদের কেবল নাম আছে, তারা বৃত্তির টাকা নেওয়ার সময় উপস্থিত হয়; লেখাপড়া বলতে কিছুই হতো না। মাদ্রাসার কোন এক উৎসবের দিনে ছাত্ররা শহরের একটি ধনী গৃহে ডাকাতি করে, তারও দৃষ্টান্ত আছে। ১৮২১ সালের পূর্বে মাদ্রাসায় কোনো পরীক্ষা পদ্ধতিও ছিল না। ঐ বছর পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করলে ছাত্র-শিক্ষক উভয় পক্ষ থেকেই বিরোধিতা করা হয়। ১৮২৩ সালে মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের কথা উঠলে একদল মানুষ তার বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগে সরব হন। অথচ ঐ বছরেই সংস্কৃত কলেজে প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার কথা উঠলে রামমোহন রায় তার প্রতিবাদ করে জানান যে, ইংরেজি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার অর্থ ছাত্রদের আধুনিক সুযোগ সুবিধা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। ড. ওয়াকিল আহমেদ মনে করেছেন

সেইসময় মুসলমান সমাজে একজন রামমোহনের মতো ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল যিনি সমাজকে সময়োপযোগী নেতৃত্ব দিতেন। কিন্তু মুসলমানদের জন্য এমন কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না, যেটি মুসলমানদের সামাজিক প্রগতির বলতে এগিয়ে আসবে। থাকার মধ্যে কলকাতা মাদ্রাসা তখন প্রগতির প্রশ্নে যুগ প্রবাহের উল্টোদিকে। যেখানে দেখা যায় ছাত্র শিক্ষকের শিক্ষানুরাগিতা ক্রমহ্রাসমান। শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যক্তি মুন্নাফার স্বার্থে শিক্ষকতার পাশাপাশি হেকিমি ব্যবসা করতেন। সমাজতাত্ত্বিক ও অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদে কলকাতা মাদ্রাসার এই ব্যর্থতার পেছনে শিক্ষক সমাজের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার দিকটি বিচার করেছেন।[৭২]

মাদ্রাসা শিক্ষায় নানাবিধ অসমাঞ্জস্যের মধ্যে আরেকটি ছিল বয়সের সমস্যা। এখানে পাঠরত ছাত্রদের বয়সের বালাই বলে কিছু ছিল না। ১৮৪৭ – ৪৮ সালের মাদ্রাসার রিপোর্ট দিতে গিয়ে শিক্ষা পরিষদের পরিচালক ডক্টর মোয়াট বলেন যে, বাংলা বিভাগে ২৫ থেকে ৩০ বছরের যুবকের সঙ্গে ১০ থেকে ১২ বছরের কিশোর একই শ্রেণিতে পড়ে। অনুরূপ অবস্থা ছিল ইংরেজি বিভাগের ক্ষেত্রেও। যেখানে তৃতীয় শ্রেণিতে অধিক বয়সের যুবকদের সাথে অল্প বয়সের শিশুদের একত্রে পড়তে হয়। 'যুবকরা শিশুদের পড়ায় বাধা দেয় ও তাদের নষ্ট করে।'[৭৩] এই সময়ে ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজে নানা ধরণের সংস্কারও গড়ে ওঠে। অধ্যাপক স্বপন বসু এরকম একটি সংস্কারের উল্লেখ করে বলেছেন -

> যে ছেলে ইংরাজি শিখবে তাঁর ভাগ্যে কোন না কোন বিপদ ঘটবে, এই ছিল মুসলমানসমাজের ধারণা। ঢাকা কলেজে একটি ইংরাজি পড়ুয়া ছেলের মৃত্যু হলে রটনা হয়, ইংরেজি শেখার জন্যই দুর্ঘটনা। ইংরেজি ক্লাসঘরের ভেতরে রোগ জীবাণু থিকথিক করছে – তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মুসলমান ছেলেরা তাগা তাবিজে সর্বাঙ্গ মুড়ে ক্লাসে আসতো। মুসলমান কোন ছাত্র সামান্য অসুস্থ হলে তাকে কলেজ ছাড়িয়ে নেওয়া হত।[৭৪]

ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমান সমাজের বিতৃষ্ণার এক বাস্তব ছবি এঁকেছেন মীর মশাররফ হোসেন তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনী'তে। মিরের আত্মীয় স্বজন ও গুরুজনদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে –

> ইংরেজি পরিলে পাপ তো আছেই। আর মরিবার সময় গিডিমিডি করিয়া মরিতে হইবে। আল্লাহ্ রসূলের নাম মুখে আসিবে না...ইংরেজি পড়িলে একরূপ ছোটখাটো শয়তান হয়। দাঁড়াইয়া প্রস্রাব

করে। সরাব খায়। জবাহ ঝটকার বিচার নাই। হালাল হারেমে প্রভেদ নাই। পাক না পাকের জ্ঞান থাকে না। নামাজ রোজায় ভক্তি করে না। আদব তমিজের ধার ধারে না।[৭৫]

এই রকম পরিস্থিতিতে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় ভাষার পরিবর্তন ও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন বা সংস্কারকে ছাত্ররা সহজে মেনে নেয়নি। তাঁরা বারংবার কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করেছে। ১৮৫০ সালে নতুন প্রিন্সিপাল ড. অ্যালায়াস স্প্রেঙ্গার মাদ্রাসার শিক্ষাসূচির সংস্কার করতে গিয়ে ছাত্রদের অসন্তোষের ভাগী হন। এক পর্যায়ে ছাত্ররা গোলযোগ করে তাঁর প্রতি ঢিল ও পচা আম নিক্ষেপ করে।

একটু সচেতনভাবে বিচার করলে আমার লক্ষ করবো শিক্ষার যে মৌলিক উদ্দেশ্য জ্ঞানদান ও জ্ঞানার্জন, চরিত্র গঠন ও মনুষ্যত্বের বিকাশ মাদ্রাসায় তা ঠিকঠাকভাবে হয়ে ওঠেনি। উপরন্তু চাকরির ক্ষেত্রেও ছাত্রদের বিশেষ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। তাই 'চিত্তবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের জন্য মাদ্রাসার ছাত্ররা অন্তর ও বাহির থেকে কোনো প্রেরণা অনুভব করেনি।'

এই অসাফল্যের জন্যই ১৮৯৯ সালে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় প্রথম নিখিল ভারত মহমেডান এডুকেশন কনফারেন্সের অধিবেশন হয়, তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার। সৈয়দ আমীর আলি ঐ অধিবেশনের সভাপতি হন। তিনি উদ্বোধনী ভাষণে কলকাতা মাদ্রাসাসহ বাংলার মাদ্রাসাশিক্ষার 'বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা' বলেন। তাঁর মতে, মাদ্রাসাগুলির শিক্ষাপদ্ধতি মোটেই সন্তোষজনক নয় সুতরাং পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাঁদের এই বৈপ্লবিক ঘোষণা বানচাল করতে এগিয়ে আসে আবদুল লতিফ প্রতিষ্ঠিত 'মহমেডান লিটারেরি সোসাইটি'। যারা ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের ৯ জুন একটি প্রতিবাদসভায় উক্ত পরিবর্তনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে 'প্রচারপত্র' বিলি করেন এবং উনিশ শতকের শেষবিন্দুতে দাঁড়িয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ করা হয়। ওয়াকিল আহমেদ আক্ষেপভরে লিখেছেন – 'কলিকাতা মাদ্রাসার ভাগ্য পরিবর্তন আর সম্ভব হয়নি।'[৭৬]

৪.গ. কলকাতা মাদ্রাসা : শিক্ষাসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

যে কলকাতা মাদ্রাসাকে অবলম্বন করে উনিশ শতকের মুসলমান বাঙালি সমাজ আভিজাত্যের অহমিকায় ও ঐতিহ্যের ভাবপ্রবণতায় মশগুল থেকেছে তার শিক্ষাসূচি ও পাঠ্যপুস্তক নিয়ে আগ্রহ স্বাভাবিক।

ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে যাঁরা মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য আবেদন করেছিলেন তাঁদের মতে, মাদ্রাসা শিক্ষার নির্ধারিত বিষয় ছিল 'মুসলিম আইন' এবং 'মুসলমানের বিদ্যালয়ে পঠিত বিজ্ঞানসমূহ'। কিন্তু হেস্টিংস তাঁর দ্বিতীয় 'মিনিটে' 'প্রাক্তন শাসক জাতির অনুকূলে জীবিকার সুবিধা সৃষ্টি করা'র উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার ছক কষেন। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, শিক্ষাগ্রহণকারী এবং শিক্ষাপ্রদানকারী কারুরই পরিকল্পনা ছিল না যে, মাদ্রাসা একটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক। বরং বলা চলে যে, বৈষয়িক প্রয়োজনে প্রাচ্য ভাষা ও বিদ্যাচর্চার প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে।

একেবারে গোঁড়ায় মাদ্রাসার শিক্ষাসূচিটি কী ছিল তা জানা যায় না। কিন্তু ১৭৯১ সালে রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক তদন্ত কমিটির সুপারিশে মাদ্রাসার পাঠ্যসূচির আভাস পাওয়া যায়। যেখানে অন্তর্ভুক্ত বিষয় ছিল –

> ১. দর্শন ২. ধর্মতত্ত্ব ৩. আইনশাস্ত্র ৪. জ্যোতিষশাস্ত্র ৫. জ্যামিতি ৬. গণিত ৭. তর্কবিদ্যা ৮. অলঙ্কারশাস্ত্র ৯. ব্যাকরণ।[৭৭]

এই তালিকায় কেবল ধর্মতত্ত্ব ছাড়া আর বাকি সবই ছিল ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়। সেদিক থেকে বিচার করে কলকাতা মাদ্রাসাকে ধর্মশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। কেননা ধর্মশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হলে মাদ্রাসায় হিন্দু ছাত্রেরা ভর্তি হতেন না। পরবর্তীকালে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসবে হিসেবে হিন্দু ও খ্রিষ্টান শিক্ষকও মাদ্রাসায় যোগ দিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাদ্রাসার ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বজায় রাখতে পারেননি। ১৮৩৩ সালে ফারসি বিভাগে হিন্দু ছাত্র ভর্তি রহিত করা হয় মুসলমান ছাত্রদের অধিক সুযোগ দেবার জন্য। ১৮৭১ সালে আবদুল লতিফ অ্যাংলো ফারসি বিভাগে কেবল মুসলমান শিক্ষক নিয়োগের পরামর্শ দেন। এভাবে কলকাতা মাদ্রাসা সাম্প্রদায়িক বর্ণ পেতে শুরু করে এবং ধর্মীয় শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ে। আমরা আমাদের গবেষণায় পরবর্তী অধ্যায়ে দেখাতে চেয়েছি যে, বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সাধনা শুরু হয় উনিশ শতকের

সাতের দশক থেকেই। স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি মুসলমানের হাতে রচিত সেই সাহিত্যে ধর্মীয় আধিপত্যের আখ্যানও খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলির জন্য মাদ্রাসা শিক্ষায় কোন কোন পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হবে তা ১৭৯১ সালের সরকারি বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। সেগুলি নিম্নরূপ –

১. হিকমত-ই-নজরি (দর্শন)

সদ্‌রা, শামস, বাজিগাহ, শারহি, ইশারাত – ১ম শ্রেণি

শারহি হিকমাতুল আইন, মায়বুদ্ধি – ২য় শ্রেণি

২. ইলম-ই-কালাম (ধর্মশাস্ত্র)

শারহি আকায়াদি মুল্লা জালাল, শারহি মুওয়াকিপ – ১ম শ্রেণি

শারহি আকায়াদি মুল্লা সাদউদ্দীন, শারহি তাওয়ালিন – ২য় শ্রেণি

৩. ইল্‌ম-ই-ফিকাহ আইন, হিদায়াই ফিকাহ – ১ম শ্রেণি

শারহি ওকায়াহ – ২য় শ্রেণি

৪. ইলম-ই-উসুল-ই-ফিকাহ, মুসাল্লাম, উজুদি ইত্যাদি – ১ম শ্রেণি

কান্‌জ, মুকতাসর ওকায়াহ্‌ - ৩য় শ্রেণি

৫. ইল্‌ম-ই-তাফসির (কোরানের ব্যখ্যা) – ১ম ও ২য় শ্রেণি

৬. ইল্‌ম-ই-হাদিস (ঐতিহ্য ভাষা) – ১ম ও ২য় শ্রেণি

৭. ইল্‌ম-ই-হায়াত (জ্যোতিষশাস্ত্র) – ১ম ও ২য় শ্রেণি

৮. ইল্‌ম-ই-হান্দাশাহ (ভূগোল)

ইউক্লিডের উপাদান – ১ম শ্রেণি, তামিম-উল-আশকাল – ২য় শ্রেণি

৯. ইল্‌ম-ই-হিসাব (পাটিগণিত) – ১ম ও ২য় শ্রেণি

১০. ইল্‌ম-ই-মনতিক (তর্কবিদ্যা) – ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণি

১১. ইল্‌ম-ই-বালাগাত (বাগ্মিতা) – ১ম ও ২য় শ্রেণি

১২. ইল্‌ম-ই-সরফ-উ-নুহু (ব্যাকরণ) – ৩য়, ৪র্থ, পঞ্চম শ্রেণি[৭৮]

উপরিউক্ত প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার সঙ্গে ইয়োরোপীয় বিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য মাদ্রাসা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৮২৬ সালে ইংরাজি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম দিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিশেষ উৎসাহ লক্ষ করা যায়। স্বপন বসুর তথ্য মোতাবেক ১৮২৯ – ১৮৩৯ এই ১১ বছরে মাদ্রাসার ইংরেজি ক্লাসের শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৯৭০। কিন্তু ১৮৪০ – ১৮৫০ এই ১১ বছরে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৭৭০ – এ।[৭৯] অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ছিল সেখানে ছাত্রসংখ্যা কমেছে। অর্থাৎ যুগধর্ম ও কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণে মাদ্রাসার মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষা অধিক সফলকাম হতে পারেনি।

ইংরেজি সফলকাম না হলেও আরবি ফারসি চর্চা নিয়ে কলকাতা মাদ্রাসায় বিশেষ উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। তাই শুরুতে মাদ্রাসায় আরবি ও ফারসি শিক্ষা দেবার জন্য একটিই বিভাগ থাকলেও অচিরে আরবি ও ফারসি নামে দুটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রথমে ইংরেজি একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে শুরু হয়েছিল কিন্তু ১৮৩১ থেকে ইংরেজিকে ফারসি বিভাগের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। তখন ঐ বিভাগের নাম হয় অ্যাংলো – ফারসি বিভাগ। আরবি বিভাগের ছাত্রদের ইংরেজি পড়ার সুযোগ করে দিতে পরে আরবি বিভাগের সঙ্গেও ইংরেজিকে যুক্ত করা হয়। ফলস্বরূপ ১৮৫৩ সাল থেকে 'আংলো-আরবি' বিভাগের নাম পাওয়া যায়। উল্লেখ্য ১৮৩৭ সালের পর থেকে মাদ্রাসায় মাতৃভাষা হিসেবে উর্দু ও বাংলা শিক্ষারও প্রচলন হয়। ফলে মাদ্রাসায় মোট পাঁচটি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হয় – আরবি, ফারসি, ইংরেজি, উর্দু ও বাংলা। অতঃপর প্রথমে ভাষা শিক্ষা ও তারপর ওইসব ভাষার বিদ্যা শিক্ষা, যার ফলে মাদ্রাসার ছাত্ররা দুরবহ চাপের সম্মুখীন হয়। ওয়াকিল আহমেদ আক্ষেপভরে মন্তব্য করেছেন – 'ফল যা হবার তাই হয়েছে; তাঁরা কোন ভাষাতেই দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। কলিকাতা মাদ্রাসা আলোচ্য পর্বে একজন সুপণ্ডিত অথবা একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি সৃজন করতে পারে পারেনি।'[৮০]

১৮৫৬ সালে মাদ্রাসার আরবি বিভাগে মোট পাঁচটি শ্রেণি ছিল। সেগুলির পাঠ্যসূচি নিম্নরূপ –

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্য : আরবি ভাষার সাহিত্য, আইন, তর্কবিদ্যা, অলঙ্কারশাস্ত্র

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্য : সাহিত্য, আইন, ব্যাকরণ

পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্য : ব্যাকরণ ও সহজ আরবি পাঠ শিক্ষা। [৮১]

১৮৬৯ সালের তদন্ত কমিটি রিপোর্টের ভিত্তিতে মাদ্রাসার শ্রেণিবিভাগ ও পাঠ্যসূচির সংস্কার ও পুনরবিন্যাস করা হয়। নতুন সংস্কারে আরবি বিভাগে ৮ টি শ্রেণির ব্যবস্থা করা হয় এবং শ্রেণি ভেদে নিম্নের পুস্তকগুলি পাঠ্য ছিল :

ক্রমিক নং	শ্রেণি	পাঠ্যপুস্তক
১	প্রথম	সলুম উল-উলুম, মুসল্লাম-উল-সবুত, সেফা-কাজি আয়াজ (প্রথমার্ধ), হেদাযা, মকামত-ই-হারিবি (প্রথমার্ধ), মুতাওয়াল।
২	দ্বিতীয়	মুতানব্বি (প্রথমার্ধ), মুকতাসার-উল-মা'নী (দ্বিতীয়ার্ধ), তাউজি, মীর-ই-কুতবি, তারিখ-উল-খোলাফা (দ্বিতীয়ার্ধ), হেদায়া।
৩	তৃতীয়	নূর-উল আনোয়ার (দ্বিতীয়ার্ধ), মুকতাসর-উল-মা'নী (প্রথমার্ধ), শরহ্-ই বেকায়া, কুতবি (দ্বিতীয়ার্ধ), সবা-ই-মুয়াল্লাকা, তারিখ-উল-খোলাফা (প্রথমার্ধ)।
৪	চতুর্থ	সিরাজি, শরহ্-ই মোল্লা জামী (দ্বিতীয়ার্ধ), নূর-উল-আনোয়ার (প্রথমার্ধ), শরহ্-ই-বেকায়া।
৫	পঞ্চম	শরহ্-ই তাহজিব, শরহ্-ই-মোল্লা জামী (প্রথমার্ধ), আনোয়ার-ই-সোহায়লী
৬	ষষ্ঠ	কাফিয়া, মিজান-ই মনতেক, ফসুল-ই আকবরী (দ্বিতীয়ার্ধ), নফহাতুল য়মন, আখলাক-ই-মহসিনী।
৭	সপ্তম	হেদায়াত-উন নহু, ফসুল-ই আকবরী (প্রথমার্ধ), নফহাতুল য়মন (প্রথমার্ধ), শরহ্-ই-মিয়া, গুলিস্তাঁ।
৮	অষ্টম	পাঠ্যসূচি পাওয়া যায়নি।

[তালিকাটি প্রস্তুত করা হল 'তারিখ-ই-আলিয়া মাদ্রাসা' এবং ড. ওয়াকিল আহমেদের 'বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী' গ্রন্থ থেকে।]

উপরের পাঠ্যপুস্তকগুলিকে বিষয় অনুসারে সাজালে এবং তাদের বাংলা তর্জমা করলে আমাদের সামনে আলিয়া মাদ্রাসার ১৮৬৯ সাল পরবর্তী পাঠ্যসূচিটি আরো স্পষ্ট হবে। উপরের তালিকাটি থেকে আমরা বলতে পারি আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্য বিষয়গুলি হলো – ১. ব্যাকরণ ২. তর্কশাস্ত্র ৩.

অলঙ্কারশাস্ত্র ৪. আইনশাস্ত্র ৫. আইন-নীতিমালা ৬. উত্তরাধিকারী আইন ৭. আরবি সাহিত্য ৮. ইতিহাস ৯. ফারসি সাহিত্য ইত্যাদি।

আলোচ্য তালিকাগুলি বিশ্লেষণ করলে মাদ্রাসার ছাত্রদের শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার পরিধি ও গভীরতা সম্পর্কে সহজেই আঁচ করা যায়। সমকাল, সমাজ ও জীবন, আধুনিক বিদ্যা ও চেতনা এবং বিচিত্র জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে এই পাঠ্যসূচির কোনো যোগ নেই। প্রাচীন ধারার প্রাচ্যবিদ্যাই ছিল তাঁদের অধিত জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে আমরা লক্ষ করবো ঐ সময়েই আধুনিক বিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে উন্নত ধরণের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা প্রচলিত ছিল। যার সুফল ভোগ করেছিল সেকালের বাঙালি হিন্দু সমাজ। তাঁরা সমাজের নানাদিকে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। উন্নত মানের আধুনিক শিক্ষাই তাঁদের চিত্ত-মনকে নির্মাণ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রতিভার বিচ্ছুরণে হিন্দুর সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি আলোকিত হয়েছে, সে বিষয় সন্দেহ নেই। অন্যদিকে মাদ্রাসার প্রাচীন ধারার শিক্ষা প্রণালী শিক্ষার্থীর মনকে মধ্যযুগীয় খোপে পুরে ফেলে এবং একটি জাতিকে সামাজিক প্রগতিশীলতার তরঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে অলস, নিষ্ক্রিয়, ধর্মভীরু এবং ঐতিহ্যমুখী ক'রে তোলে। তাই ওয়াকিল আহমেদ মাদ্রাসা পাঠ্যসূচির মূল্যায়ন করে যথার্থই বলেছেন –

> মাদ্রাসার ছাত্ররা জীবন সংগ্রামে পিছিয়ে পড়েছিল, তার প্রধান কারণ ছিল মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচি; তাঁদের মেধা, বৃত্তি অথবা নিষ্ঠার অভাব ছিল – এরূপ অভিযোগ করা চলে না।[৮২]

৫. মাদ্রাসা শিক্ষা : একটি মূল্যায়ন

কলকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বিগত শতাব্দী পর্যন্ত মাদ্রাসার ভাগ্যের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের ভাগ্য জড়িত ছিল। বিশেষত জাতির শিক্ষাচর্চা ও বিদ্যানুশীলনের সঙ্গে এই মাদ্রাসার এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আমরা দেখেছি মাদ্রাসা যেমন যুগের চাহিদা মেনে চলতে পারেনি, তেমনই যুগোপযোগী মানবসম্পদও উৎপাদন করতে পারেনি। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে সুদীর্ঘ ১২০ বছর দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাবিষয়ক প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হলেও কলকাতা মাদ্রাসা নীরব দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থেকেছে। আবদুল লতিফ, ওয়াহিদুন্নবীদের মতো সফল ছাত্র বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। এর পাশাপাশি বলা চলে মাদ্রাসায় আগত শিক্ষার্থীরা সমাজের সর্বস্তর থেকে আসেনি। বিশেষত সমাজের অভিজাত

ও টাকাওয়ালা শ্রেণির 'ভদ্রঘরের' ছেলেরাই মাদ্রাসায় পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে মাদ্রাসায় পাঠরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩৬.৫ % ছিল ভূমির করভোগী অভিজাত শ্রেণির সন্তান এবং বাকি ৬৩.৫% চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তের সন্তান।[৮৩] অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষা ছিল একপ্রকার 'এলিট ক্যাপচার'। এর দ্বারা বাংলার সাধারণ জনগণ কোনোরকমভাবে উপকৃত হয়নি। উল্লেখ্য ছাত্রদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক আসতো পূর্ববঙ্গ থেকে এবং বৃহৎ সংখ্যক ছাত্র আসতো বাংলার বাইরে থেকে। ফলে সেখানে সামগ্রিকভাবে বাঙালির উন্নয়নে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়।

উনিশ শতকের শিক্ষা ভাবনায় মুসলমানদের অগ্র-পশ্চাৎপদতার ছবিটি স্পষ্ট হয় নিচের পরিসংখ্যান[৮৪] থেকে

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা	মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা
সংস্কৃত কলেজ	১৮৯	--
হিন্দু কলেজ	৫১৬	--
কলকাতা মাদ্রাসা	--	১৫২
ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির স্কুল	৪৬৯	--
মেডিকেল কলেজ	৫৬	৩
হুগলি কলেজ	৫৯৮	২০৮
হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল	২৫২	৪৮
মেদিনীপুর স্কুল	১৩৬	৪
ঢাকা কলেজ	৩০১	২৪
কুমিল্লা স্কুল	১১৯	১৮
চট্টগ্রাম স্কুল	৭২	১৪
সিলেট স্কুল	৪৫	৩
যশোর স্কুল	৯৬	৪

[উপরের তালিকাটি তৈরি করতে তথ্য গৃহীত হয়েছে বসু. স্বপন, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস,* পুস্তক বিপণী, কলকাতা, অগাস্ট ২০১৬, পৃ. ১৯৩ – ১৯৪ গ্রন্থ থেকে]

এই তথ্যই জানিয়ে দেয় যে একমাত্র কলকাতা মাদ্রাসাকে বুকে নিয়েই বাঙালি মুসলমানের শিক্ষার স্বপ্ন রচিত হয়েছিল। এই কারণেই অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রদের উপস্থিতি তলানিতে নামলেও কলকাতা মাদ্রাসায় একমাত্র মুসলমানরাই তাঁদের একচ্ছত্র ঘাঁটি নির্মাণ করতে পেরেছিল। কিন্তু উনিশ শতকে অন্যনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হিন্দু সমাজের শিক্ষার্থীদের যেভাবে আধুনিক চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে যুগোপযোগী শিক্ষার পথ প্রশস্ত করেছিল, কলকাতা মাদ্রাসা তা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাই উনিশ শতকের শিক্ষার ইতিহাসে কলকাতা মাদ্রাসার অবদান মূল্যায়ন করে আমরা বলতে পারি –

> আলিগড় কলেজের ভূমিকা উত্তর প্রদেশের মুসলিম সমাজের জন্য ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ। হিন্দু কলেজ আলিগড় কলেজ দ্রুত উন্নতি সাধন করে স্ব স্ব 'স্কুল' গড়ে তোলে। কলিকাতা মাদ্রাসা স্বকীয় 'স্কুল' গড়ে তুলতে পারেনি। সেকুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্রমে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। প্রথমে মাদ্রাসার কাজ ছিল যোগ্য 'কর্মচারী' তৈরি করা, পরে তার কাজ হয় 'মোল্লা' তৈরি করা। কলিকাতা মাদ্রাসায় মুক্ত বুদ্ধির চর্চা কোন সময়ে হয়নি। তার স্বাধীন চিন্তার বিকাশের খাটা প্রায় শূন্য। তাই জাতির মানসিক উৎকর্ষ সাধনে মাদ্রাসার ভূমিকা নেই বললেই চলে। কলিকাতা মাদ্রাসা আজও টিকে আছে মুসলমান সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে নয় – সনাতন আবেগ ও মোহের প্রতিভূ হিসাবে।[৮৫]

এখানেই উনিশ শতকের মাদ্রাসা শিক্ষার সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিহাস নিহিত আছে বলে আমাদের মনে হয়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. বন্দ্যোপাধ্যায়. সুমন্ত, 'বাঙালি নাগরিক সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে', *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ১৬ – ১৭

২. Ananda K. Coomaraswamy, Vol. XI, No. 1, 1973, বন্দ্যোপাধ্যায়. সুমন্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৭

৩. পোদ্দার. অরবিন্দ, 'শস্যের ভিতরে রৌদ্র : অন্বিষ্টের সন্ধানে সমাজমানস', দেখুন. বসু. স্বপন, চৌধুরী. ইন্দ্রজিৎ (সম্পা.), *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি,* পুস্তক বিপণী, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ১৩

৪. রায়. অলোক, 'উজান স্রোতের কাল', দেখুন. বসু. স্বপন, চৌধুরী. ইন্দ্রজিৎ (সম্পা.), *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি,* পুস্তক বিপণী, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ১৮৮

৫. দত্ত. ভবতোষ, 'বাংলার জাগরণে মিশনারিদের অবদান', দেখুন. বসু. স্বপন, চৌধুরী. ইন্দ্রজিৎ (সম্পা.), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৯২

৬. দত্ত. ভবতোষ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৯২ – ৯৩

৭. সরকার. বিনয় 'ইস্কুল বনাম পরিবার, রাষ্ট্র ইত্যাদি', দেখুন. *মগজ মেরামতের হাতিয়ার,* সেরিবান, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ৯৮

৮. সরকার. বিনয়, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৯৮ – ৯৯

৯. রায়. অলোক, 'উনিশ শতক : জাগরণ, পরিবর্তন ও পরিণাম', দেখুন. রায়. অলোক, নিয়োগী. গৌতম (সম্পা.), *উনিশ শতকের বাংলা,* পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৩৮

১০. হাজরা. নীরদবরণ, *কলকাতা : ইতিহাসের দিনলিপি (প্রথম পর্ব),* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৫, পৃ. ২৫

১১. হাজরা. নীরদবরণ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২৬

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়. ব্রজেন্দ্রনাথ, *ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ – ফাল্গুন ১৩৬৬, পৃ. ৩৬

১৩. Datta. Pradip Kumar, 'Hindu Unity and the Communal Common Sense of the 'Dying Hindu', See. Datta. Pradip Kumar, *Carving Bolcs: Communal Ideology in Early Twentieth-Century Bengal,* Oxford University Press, New Delhi, 1999, pp.22

১৪. রায়. অনুরাধা, 'জাতির রেলযাত্রা ও তিনটি ষ্টেশন', দেখুন. *ইতিহাসের হরেক গেরো,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৫ – ৫৭

১৫. মুখোপাধ্যায়, শ্রীধর, *কলকাতা: উনিশ শতক ঘটনাক্রম,* মহাদিগন্ত, কলকাতা ২০০৮ পৃ. ১২১

১৬. চক্রবর্তী, অঞ্জন ও ধর, অনুপ, 'হিংস্রতার উদবর্তন, উদবর্তনের হিংস্রতা', *অবভাস প্রবন্ধ সংকলন জানুয়ারি – মার্চ ২০০৫,* পার্থ চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৬৪

১৭. মুখোপাধ্যায়, শ্রীধর, ঐ, ঐ, ঐ, উদ্ধৃত, পৃ. ১৪৬

১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়. শেখর, (অনুবাদ. রায়. কৃষ্ণেন্দু), *পলাশি থেকে পার্টিশন ও তারপর : আধুনিক ভারতের ইতিহাস,* ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, হায়দ্রাবাদ, দ্বিতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ ২০১৯, পৃ. ৩১৪ – ৩১৬

১৯. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৪১ - এ উদ্ধৃত।

২০. চক্রবর্তী, রমাকান্ত, 'তিন সংস্কারক', দেখুন. বসু. স্বপন, চৌধুরী. ইন্দ্রজিৎ (সম্পা), *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি,* পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৭৫

২১. সেন. দীননাথ, 'উনিশ শতকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার', দেখুন. রায়. অলোক, নিয়োগী. গৌতম (সম্পা.), *উনিশ শতকের বাংলা,* পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৯০

২২. সেন. দীননাথ, 'উনিশ শতকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার', ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৯০ – ৯১

২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়. শিবাজী, *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য,* কারিগর, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ৯৬ -৯৭

২৪. শাস্ত্রী. শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা), নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৪৯

২৫. Guha. Ramachandra, *Makers of Modern India,* Penguin Viking, New Delhi, 2016, p. 29

২৬. লাহিড়ী. কার্তিক, 'শিশুপাঠ্য পুস্তকের সমাজতত্ত্ব : ১, দেখুন. *কলকাতার গ্রাম্যতা ও বাঙালি বুদ্ধিজীবী,* প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৪২ – ৪৬

২৭. চক্রবর্তী. অরিন্দম, 'কোন বিদ্যার আরাধনা', দেখুন. *এ তনু ভরিয়া : দর্শন আপাদমস্তক,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২২, পৃ. ১৪২

২৮. শাস্ত্রী. শিবনাথ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪৯

২৯. চন্দ. পুলক, *ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা ষড়যন্ত্র,* লেখনী প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৩৬

৩০. আচার্য. পরমেশ, *বাংলার দেশজ শিক্ষার ধারা,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১০৮ – ১১৯

৩১. আচার্য. পরমেশ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১১১

৩২. Acharya. Paramesh, *Indigenous Vernacular Education in Pre-British Era: Traditions and Problems,* আচার্য. পরমেশ, পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৭

৩৩. আচার্য. পরমেশ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১১১ – ১১২

৩৪. হোসেন. শ্রী মীর মশাররফ, 'বিদ্যাশিক্ষা', দেখুন. *আমার জীবনী* প্রথম খণ্ড, কালিকা-যন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৩১৫ সাল, ১ লা আশ্বিন, পৃ. ৯১

৩৫. আচার্য. পরমেশ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১১১ – ১১২

৩৬. *জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫*, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, মার্চ ২০০৭, পৃ. ৪

৩৭. Acharya. Paramesh, 'Bengali Bhadralok And Educational Development in Nineteenth Century Bengal', See. Shukla. Sureshchandra and Kaul. Rekha (Ed.) *Education, Development and Understanding,* Sage Publication, Delhi, 1998

৩৮. আচার্য. পরমেশ, 'বাঙালির শিক্ষাচিন্তা : ১', দেখুন. *বাঙালির শিক্ষাচিন্তা,* দে'জ প্রকাশনী, কলকাতা, মে ২০১১, পৃ. ১৯

৩৯. আচার্য. পরমেশ, 'বাঙালির শিক্ষাচিন্তা : ১', দেখুন. *বাঙালির শিক্ষাচিন্তা,* দে'জ প্রকাশনী, কলকাতা, মে ২০১১, পৃ. ১৯ - ২০

৪০. আচার্য. পরমেশ, 'শিক্ষাচিন্তায় সাম্প্রদায়িক বিভাজন', দেখুন. *বাঙালির শিক্ষাচিন্তা,* দে'জ প্রকাশনী, কলকাতা, মে ২০১১, পৃ. ৯৬

৪১. আচার্য. পরমেশ, *বাংলার দেশজ শিক্ষার ধারা,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ২০০

৪২. আচার্য. পরমেশ, *বাংলার দেশজ শিক্ষার ধারা,* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২০২

৪৩. সেন. দীননাথ, 'উনিশ শতকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার', দেখুন. রায়. অলোক, নিয়োগী. গৌতম (সম্পা.), *উনিশ শতকের বাংলা,* পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১০৪

৪৪. আলাওল. সৈয়দ, *তোহফা,* আহমদ শরীফ (সম্পা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৫৮, পৃ. ১৪৭

৪৫. জায়সী. মালিক মুহাম্মদ, *পদ্মাবতী,* হাবিবী প্রেস, মেছুয়া বাজার, কলকাতা, ১৩৩৮, পৃ. ১৮ – ১৯

৪৬. আচার্য. পরমেশ, *বাংলার দেশজ শিক্ষার ধারা,* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৪৫

৪৭. সেন. সুকুমার (সম্পা.), *বিপ্রদাসের মনসাবিজয়,* দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৫৩, পৃ. ৬৭

৪৮. বন্দ্যোপাধ্যায়. শ্রীকুমার ও চৌধুরী. বিশ্বপতি (সম্পা), *কবিকঙ্কণ চণ্ডী,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৮, পৃ. ৭৪

৪৯. আচার্য. পরমেশ, *বাংলার দেশজ শিক্ষার ধারা,* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৫৬

৫০. আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ,* মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৪২৫

৫১. রহিম. মুহম্মদ আব্দুর, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২১৬

৫২. হোসেন. শ্রী মীর মশাররফ, 'বিদ্যাশিক্ষা', দেখুন. *আমার জীবনী* প্রথম খণ্ড, কালিকা-যন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৩১৫ সাল, ১ লা আশ্বিন, পৃ. ৯১ – ৯২

৫৩. বারকাত. আবুল, আরা. রওশন, উদ্দিন. এম. তাহের, জাহিদ. ফরিদ. এম, বদিউজ্জমান. মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি উৎস বিকাশ ও প্রভাব,* র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, জুলাই ২০১৭, পৃ. ৭৮

৫৪. বারকাত. আবুল, আরা. রওশন, উদ্দিন. এম. তাহের, জাহিদ. ফরিদ. এম, বদিউজ্জমান. মুহাম্মদ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৭৯

৫৫. বারকাত. আবুল, আরা. রওশন, উদ্দিন. এম. তাহের, জাহিদ. ফরিদ. এম, বদিউজ্জমান. মুহাম্মদ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৭৯

৫৬. বারকাত. আবুল, আরা. রওশন, উদ্দিন. এম. তাহের, জাহিদ. ফরিদ. এম, বদিউজ্জমান. মুহাম্মদ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৭৯

৫৭. বারকাত. আবুল, আরা. রওশন, উদ্দিন. এম. তাহের, জাহিদ. ফরিদ. এম, বদিউজ্জমান. মুহাম্মদ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৭৯ – ৮০

৫৮. বারকাত. আবুল, আরা. রওশন, উদ্দিন. এম. তাহের, জাহিদ. ফরিদ. এম, বদিউজ্জমান. মুহাম্মদ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৮০

৫৯. বারকাত. আবুল, আরা. রওশন, উদ্দিন. এম. তাহের, জাহিদ. ফরিদ. এম, বদিউজ্জমান. মুহাম্মদ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. – ৮০

৬০. রহিম. মুহাম্মদ আবদুর, 'ইসলামের শিক্ষা দর্শন', দেখুন. *শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৪, পৃ. ২২

৬১. বারকাত. আবুল, আরা. রওশন, উদ্দিন. এম. তাহের, জাহিদ. ফরিদ. এম, বদিউজ্জমান. মুহাম্মদ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৭৫ – ৭৬

৬২. বারকাত. আবুল, আরা. রওশন, উদ্দিন. এম. তাহের, জাহিদ. ফরিদ. এম, বদিউজ্জমান. মুহাম্মদ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৭৫ – ৭৬

৬৩. বারকাত. আবুল, আরা. রওশন, উদ্দিন. এম. তাহের, জাহিদ. ফরিদ. এম, বদিউজ্জমান. মুহাম্মদ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৭৬

৬৪. ইসলাম. শেখ মকবুল, 'মাদ্রাসার উন্নয়নকে ধালের মতো ব্যবহার করছে সিপিএম', দেখুন. *মুসলমান সমাজ : বঞ্চনা, অনুন্নয়ন ও সঙ্কট*, বুক্স ওয়ে, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১০, পৃ. ৩৪ – ৩৬

৬৫. হোসেন . সৈয়দ মাসুদুল, 'শিক্ষা ও মুসলিম সমাজ', দেখুন. *মুসলিম সমাজের পিছিয়ে থাকার পটভূমি ও সর্বনাশা চক্রান্ত*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃ. ২৪ – ৩৩

৬৬. বাসার. খায়রুল, 'মাদ্রাসা শিক্ষা : সোনার পাথরবাটি', দেখুন. *পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ,* মৃত্তিকা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৪৩০, পৃ. ৫৭ – ৬৪

৬৭. H. Sharp (Edited), Selections from Educational Records, 1781 – 1839, Part – 1, Page. 8. আলি. ড. সেখ রজব, ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় কলকাতা মাদ্রাসা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ. ২০১৩, পৃ. ৭৩ এ উদ্ধৃত

৬৮. *Selections from the Records of the Bengal Government, Papers Relating of the Establishment of the Presidency College of Bengal,* Bengal Military orphan Press, Calcutta, 1854, Appendix Series, page XXXVII.

৬৯. আহমেদ. ওয়াকিল, *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী (১৭৫৭ - ১৮৫৭),* বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ. জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ১৭৯ – ১৮০

৭০. আহমেদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৮১

৭১. হোসেন. শ্রী মীর মশাররফ, 'বিদ্যাশিক্ষা', দেখুন. *আমার জীবনী* প্রথম খণ্ড, কালিকা-যন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৩১৫ সাল, ১ লা আশ্বিন, পৃ. ৯১ – ৯২

৭২. আহমেদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৮৪

৭৩. আহমেদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৯৬

৭৪. বসু. স্বপন, 'মুসলমান সমাজের অবস্থা (১৮২৬ – ৫৬)' দেখুন. *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস,* পুস্তক বিপণী, কলকাতা, অগাস্ট ২০১৬, পৃ. ১৯১

৭৫. হোসেন. শ্রী মীর মশাররফ, 'বিদ্যাশিক্ষা', দেখুন. *আমার জীবনী* , ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১০৮

৭৬. আহমেদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৮৯

৭৭. আহমেদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৯৯ – ২০০

৭৮. আহমেদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২০০ - ২০১

৭৯. বসু. স্বপন, 'মুসলমান সমাজের অবস্থা (১৮২৬ – ৫৬)' ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৯৬

৮০. আহমেদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২০২ – ২০৩

৮১. আহমেদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২০৩

৮২. আহমেদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২০৫

৮৩. আহমেদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৯৩

৮৪. বসু. স্বপন, 'মুসলমান সমাজের অবস্থা (১৮২৬ – ৫৬)' ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৯৩ – ১৯৪

৮৫. আহমেদ. ওয়াকিল, *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী (১৭৫৭ - ১৮৫৭),* বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ. জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ২০৬ – ২০৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ - একুশ শতকের মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইসলামি প্রাইমার

ইসলামি শিক্ষার পৃথক ও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে বহু প্রাচীনকালের মাদ্রাসা শিক্ষা বিশ শতকে এসে ভিন্ন এক অবয়ব লাভ করে। পূর্বের অধ্যায়ে আমরা উনিশ শতকের শিক্ষা সংস্কৃতি ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিবর্তন প্রসঙ্গে দেখিয়েছি যে, মাদ্রাসা শিক্ষাকে অবলম্বন করে বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র আত্মচেতনা গড়ে ওঠে। যার ফলস্বরূপ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান একটা পৃথক সত্তা রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিতে এগিয়ে আসে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা বিশ শতকের সম্পূর্ণ জুড়ে এবং একুশ শতকের প্রথম দুটি দশকে মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিবৃত্ত আলোচনা করবো এবং প্রাসঙ্গিকভাবে আমাদের প্রকল্পিত সময়পর্বে ইসলামি প্রাইমারসমূহের পরিচয় জ্ঞাপন করবো। লেখাবাহুল্য এক্ষেত্রে আমরা মাদ্রাসা শিক্ষার বিবর্তনের ইতিহাসটি যেমন পর্যালোচনা করবো তেমনই ইসলামি শিক্ষাকে ভিত্তি করে রচিত পৃথক ও স্বতন্ত্র ধারার প্রাইমারগুলির চরিত্র বিচার করবো।

১.০০. বিশ শতকে মাদ্রাসা শিক্ষার বিন্যাস ও বিবর্তন

মাদ্রাসা শিক্ষার বৈচিত্র্য, বিরোধ এবং এই ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি আজ সকলের কাছেই সুপরিচিত । এ' সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে সাংবাদিক ও ইসলামি সমাজ-সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ মিলন দত্ত তাঁর 'আল্লার পাঠশালা : পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষা ও মুসলমান সমাজ' প্রবন্ধে বলেছেন –

> অন্তহীন ভাগাভাগি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায়। পশ্চিমবঙ্গে সম্ভবত মাদ্রাসাই একমাত্র শিক্ষাব্যবস্থা যা বিচিত্র রকমের ভাগভাগি নিয়ে বহু বছর ধরে টিকে রয়েছে। কেবল পাঠ্যক্রম বা পাঠের বিষয় নয়, পাঠ ও পঠনের প্রকরণ, পরীক্ষা ব্যবস্থা এমনকী শিক্ষা দর্শনেও নানারকম ফারাক এবং ভিন্নতা রয়েছে। মুসলমান সমাজের অতি আবশ্যক এই শিক্ষাব্যবস্থার এহেন ভাগাভাগি সমাজের ভিতরকার ছবিটিকে সামনে এনে দেয়। এমনকী প্রাচীন এই ধর্ম নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার অনুকূলেও মোট তৈরি হচ্ছে মুসলমান সমাজে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। ... অন্যদিকে এর মধ্যে দিয়ে মুসলমান সমাজে ধর্ম ও আধুনিকতার বিরোধ সমন্বয়ের টের পাওয়া যায়।[১]

প্রকৃতই বিরোধ, বিচ্ছিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে বাংলার মাদ্রাসা শিক্ষা বিবর্তিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষার যে কাঠামো চলে আসছিল বিশ শতকের গোঁড়ায় তার পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। আমরা দেখেছি, উনিশ শতকেই ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে

মাদ্রাসা শিক্ষায় বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। তবে বিশ শতকের গোড়াতে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষায় সংস্কার সাধনের তাগিদ লক্ষ করা গেল। ফলস্বরূপ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আদেশের পর 'মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি' গড়ে ওঠে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান শিক্ষা, ইংরাজি শিক্ষা, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষাকে যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়। ১৯১৪ সালে ব্রিটিশ সরকার 'New Scheme Madrasah Course' চালু করলেন এবং ফারসি শিক্ষাকে বাদ দিয়ে ইংরাজি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করলেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'Islamic Studies Department' চালু হয়। তার অধীনে নতুন মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমকে যুক্ত করা হলো। ১৯২৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই 'New Scheme Madrasah Course' কে স্বীকৃতি দেবার ফলে ছাত্রছাত্রীরা ঢাকা বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের সুযোগ পেলেন। ১৯৩০ সালে 'Muslim Education Committee' মাদ্রাসা শিক্ষার এই সংস্কারকে পুরোপুরি সম্মতি জানিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করলে মুসলিম জনগণের মধ্যেও ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি ইংরাজি শিক্ষার প্রতি ব্যাপক আগ্রহ বাড়লো। সমান্তরালভাবে আমরা লক্ষ করবো এই তিনের দশকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন শুরু হবে যা পরবর্তীকালে রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের ভিত নাড়িয়ে দেবে।

উল্লেখ করবার বিষয় ব্রিটিশ সরকার কলকাতা মাদ্রাসাকে এই 'New Scheme Madrasah Course' এর অন্তর্ভুক্ত করল না। ফলে কলকাতা ও তার অনুসরণকারী মাদ্রাসাগুলি 'Old Scheme Madrasah Course' এর আওতায় পড়লো। অন্যদিকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত বেশ কিছু মাদ্রাসা 'New Course' বা 'Old Course' কোনোটাই অনুসরণ না করে 'দরস – এ নিজামিয়া' পাঠক্রমকেই অনুসরণ করতে লাগলো। এই ধরণের মাদ্রাসাগুলিকে তখন বলা হত 'কাওয়ামি মাদ্রাসা' অর্থাৎ যা 'Community' বা কৌমের শিক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মিত। ভারতবর্ষে এই ধরণের মাদ্রাসা প্রথম গড়ে ওঠে উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দে; যার প্রভাব গোটা দেশে বিস্তৃত। এই ধরণের মাদ্রাসাগুলি দেওবন্দের পাঠক্রমকে অনুসরন করে পঠন-পাঠন চালাতে থাকে। ফলে একই দেশে মাদ্রাসা শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রম অনুসৃত হতে থাকে। ভিন্ন পাঠক্রমের উদ্দেশ্যই হল ভিন্ন ভিন্ন আদর্শকে শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়া। অর্থাৎ দেওবন্দের পাঠক্রমে শিক্ষার আদর্শ এক আর 'New Course' বা 'Old Course' এ শিক্ষার আদর্শ আর এক। পাঠক্রম ও শিক্ষাদর্শে এহেন হেরফেরের মধ্যেই নিহিত আছে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ। ব্রিটিশ যুগের শেষের দিকে ১৯৪০ – ৪২ সালের DM - এর রিপোর্ট থেকে দেখা

যায় অবিভক্ত বাংলায় বাংলা সরকার অনুমোদিত New Scheme মাদ্রাসার সংখ্যা ৭২৪ টি, ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৮০,৫৪০ এবং Old Scheme ধারা অর্থাৎ কলকাতা মাদ্রাসা ও তার অনুসরণকারী মাদ্রাসার সংখ্যা ৩০৯ টি এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২২২০৯। কাওয়ামি মাদ্রাসা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান ছিল না।[২] কেননা এই শ্রেণির মাদ্রাসার সবটাই গড়ে উঠেছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে। অর্থাৎ আমরা লক্ষ করছি সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসার সংখ্যা ও সেখানে পাঠরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা সরাকারি অননুমোদিত মাদ্রাসা ও সেখানকার পাঠরত শিক্ষার্থীর তুলনায় অনেক বেশি।

১.০১. বিবর্তনের ধারায় মাদ্রাসা শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৯১৫ সাল থেকে যে New Scheme Madrasah Course প্রচলিত হ'লো সেখানে ঢাকা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আবু নাসের ওয়াহিদের সুপারিশের ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠক্রম ও কাঠামোগত কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। এই ঘটনার ছয় বছরের মাথায় গঠিত হল 'East Bengal Secondray Education Board.' যার অধীনে সাধারণ শিক্ষাব্যস্থা চলতে থাকে। পরবর্তী বছরেই ১৯২২ সালে গঠিত হয় 'The Board of Islamic Intermediate and Secondary Education, Dacca.' এই বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হতে থাকে নতুন স্কিমের হাইমাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাটি। পুরনো স্কিমের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাটি পরিচালনার জন্য 'Central Madrasah Examination Board' গঠিত হয় ১৯২৭ সালে। এই পর্ষদের কাজ হল বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার মাদ্রাসা পরীক্ষা পরিচালনা করা। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মালিকানাধীন কিছু মাদ্রাসা এই বোর্ডের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। ১৯৪৬ সালে মোজামউদ্দীন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী 'Central Madrasah Examination Board'টি **মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ, বাংলা (Madrasa Education Board, Bengal)** তে রূপান্তরিত হয়। এই ছিল স্বাধীনতাপূর্ব অবিভক্ত বাংলার মাদ্রাসা শিক্ষার কাঠামো।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা ও দেশভাগের ফলে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষিত হল। ভারত ও পাকিস্তান দুটি পৃথক দেশ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলা দুটি পৃথক দেশের অন্তর্ভুক্ত হল। স্বাভাবিকভাবেই মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অভ্যন্তরেও বাঁটোয়ারা লক্ষ করা গেল। এই সময়ের একজন গবেষকের মতে, সে সময়ে এ বাংলা থেকে দলে দলে অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা ও বাংলায় চলে যান। যাওয়ার সময় অনেককিছু তাঁরা ফেলে যেতে বাধ্য হন কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার নথিপত্র নিতে ভোলেন না।[৩] ফলে কলকাতায় অবস্থিত মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের যাবতীয় নথিপত্র নিয়ে তাঁরা পূর্ব বাংলার ঢাকাতে চলে যান। আর এই বাংলায় পড়ে থাকে নথিহীন

মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের কাঠামোটি। স্বাধীনতার পর প্রায় দুই বছর কলকাতা মাদ্রাসা বন্ধই ছিল। অতঃপর ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে এই নথিপত্রবিহীন পর্ষদটি পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ নামে রূপান্তরিত হয়।

১৯৬৪ সালে এই বোর্ডকে পুনর্গঠিত করা হয়। ১৫ জন সদস্যকে নিয়ে একটি পরিচালন কমিটি গঠিত হয়। এদের না ছিল অফিস, না ছিল পরিকাঠামো। ১৯৭৩ সালে ১৫ জন মনোনীত সদস্যসহ ১ জন সভাপতি নিয়গ করা হল বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার চার বছরের মধ্যে স্থায়ী ঠিকানা পেল মাদ্রাসা বোর্ড। ১৯৮১ সালে ১৯ নং হাজী মহম্মদ স্কোয়ারে সরকারি জমিতে বোর্ডের দোতলা ভবন নির্মিত হলো। পাশাপাশি সল্টলেকে মাদ্রাসা বোর্ডের দ্বিতীয় প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হলো। অতঃপর বোর্ড নিজস্ব ওয়েবসাইট খুলল এবং ২০০১ সালের জুন মাস থেকে 'মাদ্রাসা দর্পণ' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করতে শুরু করলো।

১৯৯৪ সালে রাজ্যের তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার 'West Bengal Board of Mdrasah Education Act' নামে একটি নতুন আইন পাশ করলেন এবং রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ফলত ১৯৯৫ সালের ২৮ জুন সরকারিভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদকে স্বাশাসিত পর্ষদের মর্যাদা দান করা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সমতুল ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই পর্ষদ বিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে থেকে ব্যায়ভার নিরবাহ করতো। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে তৎকালীন সরকার 'Ministry of Minority Affairs and Madrasah Education' গঠন করলে মাদ্রাসা বোর্ড এই মন্ত্রকের অধীন হয়।

বর্তমান সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখলে আমরা দেখতে পাবো রাজ্যে তিন ধরণের মাদ্রাসা রয়েছে।[৪] একটি ছকের মাধ্যমে তা দেখানো হলো –

মাদ্রাসার প্রকার	মাদ্রাসার সংখ্যা
অনুমোদনপ্রাপ্ত ও সরকারি অনুদান প্রাপ্ত	৬৯১
অনুমোদন প্রাপ্ত কিন্তু সরকারি অনুদান বঞ্চিত	২৩৫
অনুমোদনবিহীন ও অনুদানবিহীন	প্রায় ৫০০০

উপরিউক্ত মাদ্রাসাগুলির পাঠক্রমের উপর পর্যবেক্ষণ করলে আমরা বিশেষ ধরণের বৈচিত্র্য খুঁজে পাবো।

প্রথম বর্গের মাদ্রাসায় পাঠক্রম মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুরূপ; শুধুমাত্র অতিরিক্ত 'ইসলাম পরিচয়' ও 'কম্পালসরি অ্যাডিশনাল' হিসেবে তৃতীয় ভাষা আরবি। হাইমাদ্রাসার পাঠক্রম উচ্চমাধ্যমিক সংসদের নিয়ন্ত্রাধীন। মাদ্রাসাশিক্ষা দফতর অনুমোদিত শিশুশিক্ষা কেন্দ্র (চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত) মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠক্রম অনুযায়ী চলে।

দ্বিতীয় বর্গের মাদ্রাসাগুলি মাদ্রাসা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং মাদ্রাসা পর্ষদের পাঠক্রম অনুযায়ী পরিচালিত হয়। অর্থাৎ এখানেও পাঠক্রম মূলত রাজ্যে প্রচলিত বিদ্যালয় শিক্ষার অনুসারী। ফলে কোনো বিভেদ নেই।

তৃতীয় বর্গের মাদ্রাসাগুলি অনুমোদনবিহীন ও অনুদানবিহীন; যার সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। এই মাদ্রাসাগুলি খারিজি মাদ্রাসা নামে পরিচিত। এঁদের উদ্দেশ্য হাফেজ, ইমাম ও মোয়াজ্জেম তৈরি করা। সংখ্যায় বেশি হওয়ার দরুন মুসলমান সমাজ এই মাদ্রাসাগুলির দ্বারা বেশি উপকৃত ও অপকৃত হয়। লক্ষ করবার বিষয় পাঠক্রমের ভেদাভেদটা এই মাদ্রাসাগুলিতেই এখনো জারি রয়েছে। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক আমলে যে দেওবন্দ বা সাহারানপুরের পাঠক্রম সরকার পোষিত মাদ্রাসার থেকে পৃথক পাঠক্রম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত বর্তমান সময়ের খারিজি মাদ্রাসার পাঠক্রম সেই ধারার অনুসারী।

এখন আমরা বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করবো এবং সেই ধারায় মাদ্রাসা শিক্ষার বিশেষত্ব মূল্যায়ন করবো।

১.০১. বিদ্যালয় শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা : একটি পর্যালোচনা

বাংলায় বর্তমানে দু'ধরণের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে – একটি বিদালয় শিক্ষাব্যবস্থা বা School Education এবং অপরটি হল মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা। এই দুই শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়াও বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা যেমন আছে, তেমনই বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাও প্রচলিত আছে। আমরা বর্তমান আলোচনায় প্রথম পর্যায়ে বিদ্যালয় শিক্ষার সমান্তরালে সরকার নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসা শিক্ষার চালচিত্র আলোচনা করবো এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে মাদ্রাসা শিক্ষা তা গড়ে ওঠবার উদ্দেশ্য ও অভিমুখ আলোচনা করবো।

গোড়াতেই আমরা একটি সারণীর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন পর্ব চিহ্নিত করবো এবং তার ভিত্তিতে বিষয়টির বিশ্লেষণ করবো।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা

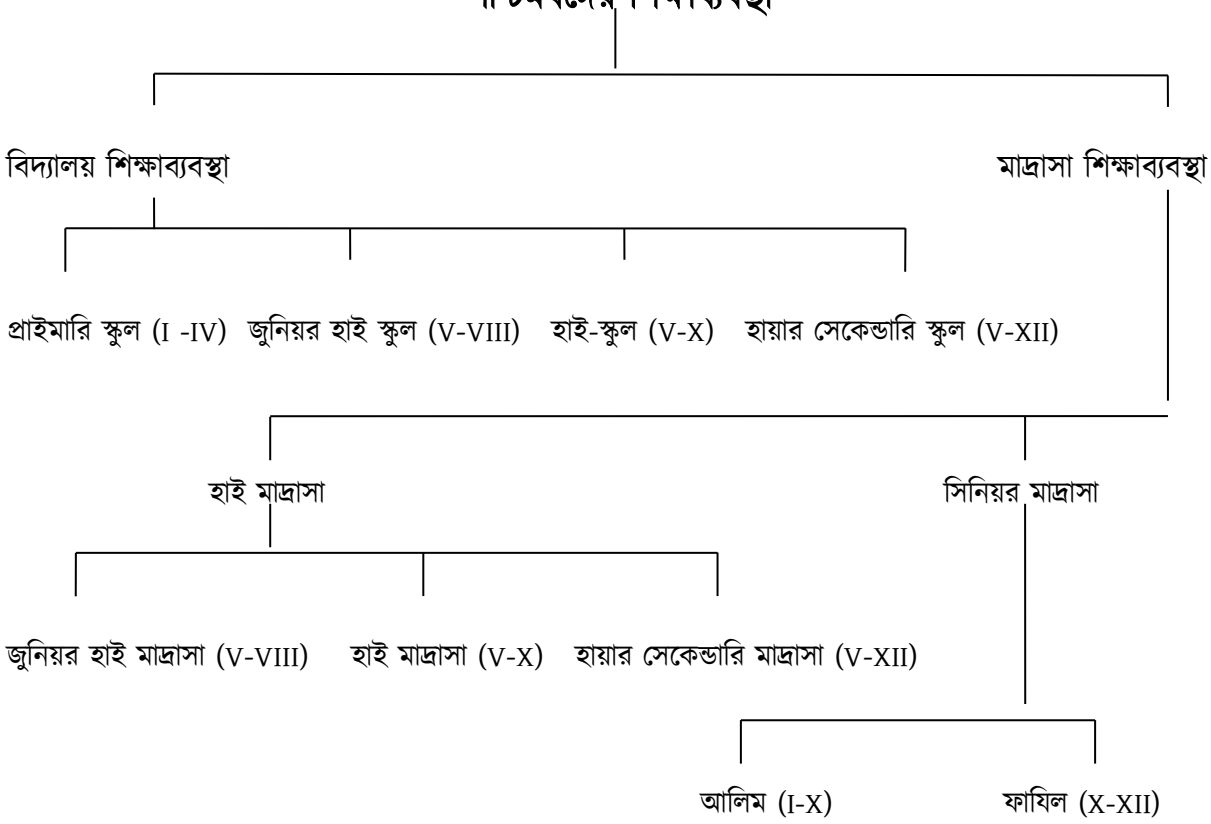

[সারণীটি প্রস্তুত করা হয়েছে সামসুর রহমান রচিত 'বাঙালী মুসলিম সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিবৃত্ত' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থ এবং মোহম্মদ রেফাতুল্লাহ রচিত 'রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষা – বিচার ও পুনর্বিচার' প্রবন্ধটি অবলম্বনে]

উপরের সারণীটি থেকে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, বাংলায় বিষয় অনুযায়ী সরাকারি মাদ্রাসার প্রধান দুটি শাখা। যথা –

ক. হাই মাদ্রাসা

খ. সিনিয়র মাদ্রাসা

হাই মাদ্রাসা হল বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার অনুরূপ। ফলে পাঠদানের সীমানার নিরিখে এই হাই মাদ্রাসা তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা –

ক.ক. জুনিয়র হাই মাদ্রাসা (পঞ্চম – অষ্টম শ্রেণি)

ক.খ. হাই মাদ্রাসা (পঞ্চম – দশম শ্রেণি)

ক.গ. হায়ার সেকেন্ডারি মাদ্রাসা (পঞ্চম – দ্বাদশ শ্রেণি)

সিনিয়র মাদ্রাসাগুলি সরকারি অনুমোদন ও অনুদান প্রাপ্ত বটে, তবে এদের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি বিদ্যালয় শিক্ষার অনুরূপ নয়। এই শ্রেণির মাদ্রাসার দুটি ভাগ। যথা –

খ.ক আলিম স্তর (দশম মান)

খ.খ ফাযিল স্তর (দ্বাদশ বা উচ্চমাধ্যমিক মান)

এখন আমরা বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার তুল্যমূল্য আলোচনা প্রসঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার এই প্রত্যেকটি ধারার পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ক.ক. জুনিয়র হাই মাদ্রাসা (পঞ্চম – অষ্টম শ্রেণি)

এই শ্রেণির মাদ্রাসাগুলিতে পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। মূলত জুনিয়ার হাই স্কুলের পাঠক্রমের সঙ্গে এই শ্রেণির মাদ্রাসার পাঠক্রমের কোনো তফাৎ নেই। অর্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষায় যেসমস্ত পাঠ্যপুস্তক যথা – সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল পাঠ্য এখানেও অনুরূপ পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসৃত হতে দেখা যায়। রাজ্যে বর্তমানে এই শ্রেণির মাদ্রাসার সংখ্যা ৮৯।

ক.খ. হাই মাদ্রাসা (পঞ্চম – দশম শ্রেণি)

হাই মাদ্রাসাগুলিতে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। রাজ্যে বর্তমানে এই শ্রেণির মাদ্রাসার সংখ্যা ৪২৩। এর পাঠক্রমও হাইস্কুলের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন। কেবলমাত্র যারা মাদ্রাসায় পড়ে তাদের ১০০ নম্বর অতিরিক্ত আরবি পড়তে হয়। অর্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত বিষয় পাঠ করে থাকেন যথা – বাংলা, ইংরাজি, অঙ্ক, জীবন বিজ্ঞান, ভৌত বিজ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাস এই সাতটি; সঙ্গে অতিরিক্ত ১০০ নম্বরের আরেকটি ঐচ্ছিক বিষয় পড়তে হয়। অনুরূপভাবে মাদ্রাসায় পাঠরত শিক্ষার্থীকেও উপরোক্ত সাতটি বিষয়ই পড়তে হয়। এর সঙ্গে আরবি ও ইসলাম পরিচয় এই দুটির মধ্যে একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে এবং অপরটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে পড়তে হয়। অর্থাৎ মাদ্রাসায় পাঠরত শিক্ষার্থী ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে দুটি বিষয় পড়ার সুযোগ পান – একটি বিদ্যালয় শিক্ষার অনুরূপ ঐচ্ছিক বিষয়, আর একটি আরবি বিষয়ের ঐচ্ছিক বিষয়। সুতরাং বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার মূলগত তফাতটা হল, বিদ্যালয় শিক্ষায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীকে ১০০ নম্বরের সাতটি ও সঙ্গে একটি ১০০ নম্বরের ঐচ্ছিক বিষয় পড়তে হচ্ছে। কিন্তু মাদ্রাসার শিক্ষার্থীকে ১০০ নম্বরের সাতটি ও সঙ্গে ১০০ নম্বরের

২ টি ঐচ্ছিক বিষয় পড়তে হচ্ছে, যেখানে আরবি ও ইসলাম পরিচয়ের মধ্যে একটিকে অবশ্যই রাখতে হবে। যেটি বিদ্যালয় শিক্ষায় অনুপস্থিত।

দ্বিতীয় আরেকটি ক্ষেত্রে সামান্য হেরফের আছে। সেটি হল ইতিহাসের পাঠ্যসূচি। বিদ্যালয় শিক্ষায় ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে ১০০ নম্বরের ভারতের ইতিহাস পাঠ্য, কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষায় ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে দুটি ভাগ। যথা – ভারতের ইতিহাস ৭০ নম্বর ও আরব বা ইসলামের ইতিহাস ৩০ নম্বর, মোট ১০০ নম্বর।

আরবি এবং ইসলাম পরিচয় যে দুটি পৃথক বিষয় মাদ্রাসাতে পড়ানো হয় তার পাঠ্যসূচির বিন্যাসটি নিম্নরূপ –

আরবি		**ইসলাম পরিচয়**	
পাঠ্য বিষয়	নম্বর বিভাজন	পাঠ্য বিষয়	পাঠ্য বিষয়
আরবি গদ্য	৩৫	কুরআন	২০
আরবি পদ্য	৩০	হাদিস	১০
আরবি ব্যাকরণ ও অনুবাদ	২৫	ফিকাহ	৩০
মৌখিক	১০	ফারায়েজ-ওয়ারিশগণের সম্পত্তির অংশ নির্ণয়	১০
মোট	১০০	মনীষীদের অবদান	২০
		মৌখিক	১০
		মোট	১০০

লক্ষ করবার বিষয় ‘আরবি’কে ভাষা হিসেবে গ্রহণ করলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে মোট ৩ টি ভাষা পাঠ করতে হচ্ছে, কেননা ইতিপূর্বে তার উপর প্রথম ভাষা বাংলা, দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি চেপে বসেছে; এক্ষেত্রে তৃতীয় ভাষা হিসেবে আরবিকে নিতে হচ্ছে। অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষার্থী তিনটি ভাষা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন, বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সুযোগ নেই বললেই চলে। আবার এই বিষয়টিকে অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেছেন যে বিদ্যালয় শিক্ষা অপেক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষার্থীকে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটু বেশিই চাপ বহন করতে হয়।

অন্যদিকে 'ইসলাম পরিচয়' বিষয়টিকে বাংলা ভাষাতেই পড়তে ও পরীক্ষায় উত্তর লিখতে হয়। ফলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী 'ইসলাম পরিচয়'কে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে নিয়ে 'আরবি'কে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রেখে পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করেন। ফলে বর্তমানে অনেকেই বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে সমান্তরাল তুলনা টেনে মাদ্রাসা শিক্ষায় এই অতিরিক্ত পাঠ্যবিষয়ের বোঝা হিসেবে 'আরবি' ও 'ইসলাম পরিচয়' বহন করে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন। খুবই স্বাভাবিক এই প্রশ্ন, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যখন পাঠ্যবস্তু লাঘব করার কথা বলা হচ্ছে সেখানে অতিরিক্ত ২০০ নম্বরের পাঠ সম্পাদন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের মেধার উপর কি অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে না? কেননা এই সমস্ত মাদ্রাসা থেকে পাঠ সমাপ্ত করে শিক্ষার্থীদেরকে উচ্চ মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় নামতে হয়, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপ যে তাঁদেরকে ভারাক্রান্ত করবে তা নিশ্চিত। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এটিও মনে রাখতে হবে যে, এই বিশেষ বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের জন্যই মাদ্রাসা শিক্ষা বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র। এগুলির বিলোপ ঘটলে মাদ্রাসা শিক্ষার বিশেষত্ব বলেও কিছু থাকবে না।

ক.গ. হায়ার সেকেন্ডারি মাদ্রাসা (পঞ্চম – দ্বাদশ শ্রেণি)

শেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১৮ – ২০১৯ সালে রাজ্যে এই শ্রেণির মাদ্রাসার সংখ্যা ২৬৫। এই শ্রেণির মাদ্রাসায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রবর্তিত ও পরিচালিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি চালু আছে। অর্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষার অনুরূপ পাঠক্রম ও পরীক্ষা ব্যবস্থা হায়ার সেকেন্ডারি মাদ্রাসা ব্যবস্থাকে অভিন্ন এক মর্যাদা দান করেছে। এগুলিতে বিদ্যালয় শিক্ষা ও কম্পিউটার শিক্ষারও বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রসঙ্গত এবারে আসা যাক সিনিয়র মাদ্রাসার বিষয় ও বৃত্তান্তে।

খ. সিনিয়র মাদ্রাসা

রাজ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বিতীয় প্রকারের শাখাটি হল সিনিয়র মাদ্রাসা। এটি Old Scheme Madrasah -র বর্গে পড়ে। এই শ্রেণির মাদ্রাসাগুলি প্রসঙ্গে উচ্চশিক্ষা কাউন্সিলের প্রাক্তন উপ-সচিব মোহাম্মদ রেফাতুল্লাহ বলেছেন – "মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকতা ও সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাযুজ্য আনার ব্যাপারে এইসব মাদ্রাসায় কিছু করণীয় আছে..."[৬] পত্রপত্রিকাগুলিতে এই শ্রেণির মাদ্রাসাগুলি সম্পর্কে মাঝে মধ্যেই সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে রব তোলা হয়। বর্তমানে রাজ্যে সিনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ১০২ টি।

খ.ক আলিম স্তর (দশম মান)

সিনিয়র মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার একটি অন্যতম স্তর হল আলিম স্তর। এই স্তরে মূলত মাধ্যমিক মানের পাঠদান করা হয়। শিক্ষার এই স্তরটির অভ্যন্তরে আবার দুটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগে লক্ষ করা যায় প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই সরকারি প্রাথমিক মাদ্রাসার কোনো ফারাক নেই। সরকারি সিনিয়র মাদ্রাসার সঙ্গে এই প্রাইমারি সেশন অবশ্য শুরু হয় ১৯৯১ সাল থেকে।

১৯৯০ সালের পূর্বে বর্তমান দশম মানের আলিম কোর্সের মেয়াদ ছিল আট বছরের। সেইসময় ক্লাসগুলির নাম ছিল যথাক্রমে – ১. আওয়াল ২. দুওম ৩. ছোম ৪. চাহারোম ৫. পাঞ্জম ৬. শষম ৭. আলিম আওয়াম ৮. আলিম দুওম । অর্থাৎ সিনয়র মাদ্রাসায় আট বছর পড়ালেখা করে একজন ছাত্র আলিম পাশ করছিল, অন্যদিকে সেখানে বিদ্যালয় শিক্ষায় প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত দশ বছরের পাঠ শেষে শিক্ষার্থী শংসাপত্র পাচ্ছে। এই কারণে আলিম পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের একাদশ শ্রেণি অথবা কলেজ স্তরে ভর্তিতে অসুবিধা হতো, তাই আলিম স্তরটিকে দশম মানে উন্নীত করা হয়।

এখন দেখে নেওয়া যাক পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির বৃত্তান্ত। এক্ষেত্রে আমরা ১৯৯০ এর পূর্বে এবং ১৯৯০ এর পরবর্তীকালের দুটি পাঠক্রমের রূপরেখা নিচের সারণিতে সজ্জিত করলাম।[৭]

১৯৯০ এর পূর্বে আলিম স্তরের কাঠামো			**১৯৯০ এর পরবর্তী আলিম স্তরের কাঠামো**		
	বিষয় বিন্যাস	**নম্বর বিভাজন**	**বিষয় বিন্যাস**	**নম্বর বিভাজন**	
বিভাগ -এ (২০০ নম্বর)	হাদিস	১০০	ভাষা (৩০০ নম্বর)	বাংলা	১০০
	তফসির	১০০		ইংরাজি	১০০
বিভাগ - বি (২০০ নম্বর)	ফেকা	১০০		আরবি	১০০
	উসুল	১০০			
বিভাগ - সি (৩০০ নম্বর)	আরবি কবিতা	৫০	বিজ্ঞান (২০০ নম্বর)	গণিত	১০০
	আরবি গল্প	৫০		ভৌত বিজ্ঞান	৫০
	আরবি অনুবাদ ও রচনা লিখন	৫০		জীবন বিজ্ঞান	৫০

	বালাগাত বা অলংকার শাস্ত্র	৫০	সমাজ বিজ্ঞান (১৫০ নম্বর)	ইতিহাস	১০০
	ইসলামিক ইতিহাস	১০০		ভূগোল	৫০
বিভাগ – ডি (২০০ নম্বর)	মানতিক	১০০	ইসলামি বিদ্যা	হাদিস	১০০
	হিকমত	১০০		তফসির	১০০
ইলেক্টিভ বিষয় (১০০)	ইংরাজি / ফারসি (যে কোনো একটি)	১০০		ফিকাহ	৫০
ঐচ্ছিক বিষয় (১০০)	উর্দু / বাংলা (যে কোনো একটি)	১০০	মোট	৯০০ নম্বর	
ঐচ্ছিক বাদ দিয়ে মোট	১০০০				

[সারণীটি প্রস্তুতিতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে রহমান. সামসুর, *বাঙালী মুসলিম সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিবৃত্ত,* মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০১৬, এবং রেফাতুল্লাহ. মোহম্মদ, রচিত 'রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষা – বিচার ও পুনর্বিচার', দেখুন. বসু. অরুণ কুমার (সম্পা.), *সারস্বত : বাংলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৮, গ্রন্থ দুটি থেকে]

এখন যদি আমরা ১৯৯০ এর পূর্ব এবং ১৯৯০ পরবর্তীকালের মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠক্রমের বিন্যাসটি বিশ্লেষণ করি তাহলে লক্ষ করবো এর মধ্যে বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৯০ এর আগের পাঠক্রমে ইংরেজি বা ফারসি ভাষা বাদে বাকি যা কিছু ছিল তার সবটাই হল ইসলামিক ধর্মীয় বিষয়। বাংলা বা উর্দু ছিল ঐচ্ছিক বিষয় ছাত্রছাত্রীরা নিতে বাধ্য নয়। ফলে আলিম পাশ করা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান পড়বার কোনো সুযোগই ছিল না। কাজে কাজেই আলেম পাশ করা মুসলমান সমাজে বিজ্ঞানবোধ ও বিজ্ঞান চেতনার বিরাট এক অভাব ছিল। বিজ্ঞান চেতনার ক্ষেত্রে এই শূন্যতা বাংলার মুসলমান সমাজকে এক গভীর সমস্যার মুখোমুখি করে তোলে। কারণ পরিসংখ্যানগতভাবে শিক্ষিত অথচ কোনো প্রকার বিজ্ঞানের পাঠহীন এই শ্রেণিটি মুসলমান সমাজে প্রগতির ক্ষেত্রে একটা বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

এই সমস্যাকে সামনে রেখেই ১৯৭৮ সালে প্রফেসর মোস্তাফা বিন কাশেমের সভাপতিত্বে 'রিভিউ কমিটি' গঠিত হয় এবং তারপর ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে ড. এ. আর কিদুয়াই এর সভাপতিত্বে

'মাদ্রাসা এডুকেশন কমিটি' নামে আরেকটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি প্রাইমারি থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত একটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসার জন্য একটি পাঠক্রম তৈরি করে দেন। এই সিলেবাসেই প্রথম উচ্চশিক্ষার সুযোগ, চাকরির সুযোগ ও সামাজিক সাম্য রক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে যেমন বাংলা ইংরাজিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তেমনই বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিষয়গুলিকেও সিনিয়র মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রসঙ্গত আমরা যদি সিনিয়র মাদ্রাসার আলিম স্তরের পাঠ্য বিষয় এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থায় তার নম্বর বিভাজনের সঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠ্যবিষয় ও নম্বর বিভাজনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করি তাহলে এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে বিস্তর ফারাক লক্ষ করবো। বিদ্যালয় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষার জন্য পড়তে হচ্ছে ৭০০ নম্বরের বিষয়, কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ১৯৯০ পর্যন্ত মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের পড়তে হয়েছে ঐচ্ছিক বাদ দিয়ে ১০০০ নম্বরের বিষয়। আবার এখন সেটি দাঁড়িয়েছে ৯০০ নম্বরে। এক্ষেত্রে তবুও আরবি সাহিত্য, হাদিস, ফিকাহ, তফসির নিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষার্থীকে অতিরিক্ত ৩৫০ নম্বরের বিষয় পড়তে হচ্ছে। যেটি শিক্ষার্থীকে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করছে বলেই আমাদের ধারণা। লক্ষ করবার বিষয় এইসমস্ত ইসলামি বিষয়গুলির ব্যবহারিকতা, প্রয়োজনীয়তাও আজকের ভারতীয় সমাজে নেই বললেই চলে।

খ.ক ফাযিল স্তর (উচ্চমাধ্যমিক মান)

হাই মাদ্রাসা থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পাশ করতে চাইলে তা পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অধীনে পাঠক্রম মেনে ও পরীক্ষায় বসে তা সম্পূর্ণ করতে হয়। কিন্তু সিনিয়র মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ফাযিল বা দ্বাদশ শ্রেণির সমতুল পড়াশুনা নিয়ন্ত্রিত হয় পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসাশিক্ষা পর্ষদের দ্বারা। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে এর প্রভূত পরিমাণ হেরফের আছে পাঠ্যবিষয় এবং পাঠক্রমের বিন্যাসে। এক্ষেত্রে সিনিয়র মাদ্রসায় ফাযিলের পাঠ্যসূচির দুটি পৃথক কাঠামো আমরা লক্ষ করেছি। ২০০৬ – ২০০৭ শিক্ষাবর্ষে ফাযিলের পাঠ্যসূচিতে বিশেষ পরিবর্তন আসে। সেই নিরিখে আমরা ফাযিল স্তরের পাঠ্যসূচিকে ২০০৬ এর পূর্ব এবং ২০০৬ এর পরবর্তী দুটি পৃথকভাগে রেখে তার বিন্যাসটা বোঝবার চেষ্টা করবো।

২০০৬ এর পূর্বে ফাযিল স্তরের কাঠামো		
	বিষয় বিন্যাস	**নম্বর বিভাজন**
বিভাগ - ক (২০০ নম্বর)	হাদিস	১০০
	তফসির	১০০
বিভাগ - খ (৩০০ নম্বর)	ফেকা	১০০
	উসুল	১০০
	কালাম	১০০
বিভাগ - গ (৩০০ নম্বর)	আরবি পদ্য	৫০
	আরবি গদ্য	৫০
	আরবি অনুবাদ ও রচনা লিখন	৫০
	বালাগাত বা অলংকার শাস্ত্র	৫০
	ইসলামিক ইতিহাস	১০০
বিভাগ – ঘ (২০০ নম্বর)	মানতিক	১০০
	হিকমত	১০০
ইলেক্টিভ বিষয় (১০০)	ইংরাজি / ফারসি (যে কোনো একটি)	১০০
ঐচ্ছিক বিষয় (১০০)	উর্দু / বাংলা (যে কোনো একটি)	১০০
ঐচ্ছিক বাদ দিয়ে মোট		১১০০

[সারণীটি প্রস্তুতিতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে রহমান. সামসুর, *বাঙালী মুসলিম সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিবৃত্ত,* মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০১৬, এবং রেফাতুল্লাহ. মোহম্মদ, রচিত 'রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষা – বিচার ও পুনর্বিচার', দেখুন. বসু. অরুণ কুমার (সম্পা.), *সারস্বত : বাংলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৮, গ্রন্থ দুটি থেকে]

উপরের কাঠামটি পর্যবেক্ষণ করলে খুব সহজেই বোঝা যাবে যে, আলিমের পাঠক্রমের সঙ্গে এর কোনো ভেদ নেই। একটিই কেবল তফাৎ তাহল, ঐচ্ছিক বিষয় বাদ দিয়ে আলিমের জন্য

নির্ধারিত ১০০০ নম্বর, কিন্তু ফাযিলের ক্ষেত্রে তা বর্ধিত হয়ে দাঁড়িয়েছে ১১০০ নম্বর এবং সেই ১০০ নম্বর এসেছে ধর্মীয় পাঠ্যবিষয় থেকে, যার নাম 'কালাম'।

এখন যদি আমরা ২০০৬ – ২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ফাযিল স্তরের পাঠ্যসূচির কাঠামো পর্যবেক্ষণ করি তাহলে লক্ষ করবো সেখানে কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ১৮.০৪.২০০৬ তারিখের সরকারি মেমো মোতাবেক মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ যে পাঠ্যসূচি খাড়া করেছে তা তিনটি Schedule – এ বিভক্ত। সেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের পছন্দ মতো বিষয় নিতে পারবে।

SHEDULE - 1			SHEDULE - 2		SHEDULE - 3			
বিষয়	**একাদশ শ্রেণি**	**দ্বাদশ শ্রেণি**	**একাদশ**	**দ্বাদশ**	**একাদশ**		**দ্বাদশ**	
English	100	100	100	100	অ্যাডভান্স বিভাগ	সাধারণ বিভাগ	অ্যাডভান্স বিভাগ	সাধারণ বিভাগ
Arabic	100	100	100	100	100 × 2= 200	100	100 × 2 = 200	100
Theology (Hadith, History of Hadith, Tafsir & History of tafsir	100	100	এই বর্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনো দুটি বিষয় পছন্দ করতে পারবে History, Islamic History, Islamic Study, Ploitical Science, Computer, Physicos, Chemistry, Mathemetics, Biology, Geography, Economics, Education,		'শিডিউল – ৩' এ মোট দুটি লেভেল। 'অ্যাডভান্স এবং সাধারণ' যারা সাধার বিভাগে পড়ে তারা 'optional elective subject' হিসেবে কোনো বিষয় নির্বাচন করতে পারে না, কিন্তু যারা 'অ্যাডভান্স বিভাগ' এ পড়ে তারা 'শিডিউল -২' তে যে বিষয়গুলি পছন্দ করেছে তার বাইরে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ থেকে আরো দুটি বিষয় পছন্দ করতে হয়। এই বিষয় দুটির ১০০ নম্বরের দুটি করে পত্র থাকে। অর্থাৎ অ্যাডভান্স এর শিক্ষার্থীদের একাদশ ও দ্বাদশে অ্যাডভান্স বাবদ আরো ২০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়।			

[সারণীটি প্রস্তুতিতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে রহমান. সামসুর, *বাঙালী মুসলিম সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিবৃত্ত,* মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০১৬ গ্রন্থটি থেকে]

উপরের সারণীটি পর্যবেক্ষণ করলে আমরা লক্ষ করবো ফাযিল স্তরের কাঠামো নির্মিত হয়েছে বিদ্যালয় শিক্ষার কাঠামো থেকে সামান্য একটু ভিন্ন উপায়ে। তবে এর পাঠ্যসূচি নির্মাণ করে

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ। এর তিনটি শিডিউল থেকে বিষয় পছন্দ করে শিক্ষার্থীকে তার কোর্স গড়ে নিতে হয়।

'শিডিউল – ১' থেকে ১০০ নম্বরের ইংরাজি, ১০০ নম্বরের আরবি এবং ১০০ নম্বরের ধর্মতত্ত্ব নিয়ে মোট ৩০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়।

'শিডিউল – ২' থেকে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের বিষয়গুলির মধ্যে ১০০ নম্বরের যে কোনো দুটি নিয়ে মোট ২০০ নম্বর পরীক্ষা দিতে হয়।

'শিডিউল – ৩' এ মোট দুটি লেভেল। 'অ্যাডভান্স এবং সাধারণ'। যারা সাধারণ বিভাগে পড়ে তারা 'optional elective subject' হিসেবে কোনো বিষয় নির্বাচন করতে পারে না, কিন্তু যারা 'অ্যাডভান্স বিভাগ' এ পড়ে তারা 'শিডিউল -২' তে যে বিষয়গুলি পছন্দ করেছে তার বাইরে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ থেকে আরো দুটি বিষয় পছন্দ করতে হয়। এই বিষয় দুটির ১০০ নম্বরের দুটি করে পত্র থাকে। অর্থাৎ অ্যাডভান্স এর শিক্ষার্থীদের একাদশ ও দ্বাদশে অ্যাডভান্স বাবদ আরো ২০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়।

এখন সামগ্রিকভাবে বিচার করলে আমরা লক্ষ করবো অ্যাডভান্স নিয়ে ফাযিল স্তর পাশ করা শিক্ষার্থীকে একাদশ ও দ্বাদশ মিলে দুই বছরে মোট ১৪০০ নম্বরের পাঠ্যসূচি পড়তে হয়, আর সে যদি সাধারণ বিভাগে পড়ে তাহলে তাকে ১২০০ নম্বরের পাঠ্যসূচি পড়তে হয়। এই দুটি বিভাগকে যদি আমরা বিদ্যালয় শিক্ষার একাদশ - দ্বাদশ মানের পরীক্ষার সঙ্গে তুলনা করি তাহলে লক্ষ করবো, বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে অ্যাডিশনাল বাদ দিয়ে শিক্ষার্থীদের দুই বছরে ১০০০ নম্বরের কোর্স পড়তে হয়, অ্যাডিশনাল যোগ হলে সেটি দাঁড়ায় ১২০০।

অতএব এই পরিসংখ্যানটি আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, ফাযিল পরীক্ষার ক্ষেত্রেও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় শিক্ষার্থী অপেক্ষা অধিক ভার বহন করতে হয়। অর্থাৎ যেখানে আধুনিক শিক্ষায় বিষয়ের ভার কমানোর কথা বারবার বলা হচ্ছে, এখানে সেই শর্তও লঙ্ঘিত হচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থী 'শিডিউল – ১' থেকে যে দুটি ভাষা শিক্ষা করার সুযোগ পাচ্ছে সেই দুটিই বিদেশি ভাষা অর্থাৎ আরবি পড়ার মোহে মাতৃভাষা চর্চা স্থগিত থাকছে। এর ফলে একদিকে পাঠ্য বিষয়ের চাপ বাড়ছে, আবার দুটি বিদেশি ভাষা শিখতে গিয়ে অতিরিক্ত শ্রমও স্বীকার করতে হচ্ছে। আধুনিক একজন গবেষক ও মাদ্রাসা শিক্ষকের মতে, মাদ্রাসা শিক্ষা এভাবে 'তাদের বাস্তব শিক্ষা জীবনে উপকারের বদলে অপকারই করে যাচ্ছে।'[৭] অতএব আধুনিক মন ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার

করে আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষার পুনর্মূল্যায়ন ও তাকে যুগোপযোগী করে তোলা উচিত বলে মনে করছেন এই সময়ের শিক্ষাবিদগণ।

১.০২. খারিজি মাদ্রাসা : আল্লার পাঠশালা ও বান্দার বন্দনা

এতক্ষণ ধরে আমরা যে সমস্ত মাদ্রাসাগুলির কথা বলেছি সেগুলি সবই সরকার অনুমোদিত এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত। পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষার দিকে নজর দিলে আমরা লক্ষ করবো এই বর্গের মাদ্রাসা সংখ্যায় যতখানি তার থেকে বহুগুণ বেশি মাদ্রাসা আছে সরকারি অনুদানহীন ও সরকারি অনুমোদনবিহীন। এই শ্রেণির মাদ্রাসা সংখ্যায় প্রায় পাঁচ হাজার।[৮] অর্থাৎ সরকার অনুমোদিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলির সংখ্যা যেখানে সবমিলিয়ে ৯২৬ টি, সেখানে ২০১৪ সালে সরকারি অনুমোদনহীন মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ৫০০০ টি, যা সরকার পোষিত মাদ্রাসাগুলির সংখ্যার থেকে প্রায় ছয়গুণ অধিক। এই শ্রেণির মাদ্রাসাই বাংলার সরকারি মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে অথচ এই শ্রেণির মাদ্রাসার সংখ্যাধিক্যই মুসলমান সমাজে এর জনপ্রিয়তা এবং এর চাহিদাকে বুঝিয়ে দিতে যথেষ্ট।

এই শ্রেণির মাদ্রাসাগুলিকে আমরা 'আল্লাহর পাঠশালা' বলেছি এই কারণে যে, এখানে মূল ধারার বিদ্যাচর্চার পরিবর্তে ধর্মীয় পাঠক্রমকে অধিক গুরত্ব দেওয়া হয়। আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পাঠই এর মূল পাঠক্রম। ফলে অজু, নামাজ, জাকাত, হজ, রমজান পালনের যাবতীয় তরিকা এখানে শুদ্ধভাবে শেখানো ও অনুশীলন করানো হয়। আর এই শ্রেণির মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীসহ সমাজের অধিকাংশ মানুষের মূল লক্ষ্য থাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ অর্থাৎ জান্নাত বা বেহেস্তের দরজায় পৌঁছে যাওয়া। স্বাভাবিকভাবেই খারিজি মাদ্রাসাগুলিকে উপলক্ষ্য করে মুসলমান বান্দা তার পারলৌকিক সুখের জন্য বন্দনা করে থাকেন। এই কারণে খারিজি মাদ্রাসাকে আমরা আল্লাহর পাঠশালা এবং বান্দার বন্দনার যোগ্য স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

মাদ্রাসা সৃষ্টির আদিতে যে সমস্ত মাদ্রাসাগুলি গড়ে উঠেছিল তার সবকটিই ছিল এই শ্রেণির মাদ্রাসা – হয় খারিজি অথবা কোরানীয়া। কোরানীয়া হল খারিজি মাদ্রাসারই এক বিশেষ প্রকরণ যেখানে কেবলমাত্র কোরান শিক্ষা হয়ে থাকে, তাই এর আরেক নাম 'ফোরকানিয়া মাদ্রাসা'। যেহেতু কোরানের অন্য নাম ফোরকান, তাই এরূপ নামকরণ। তবে খারিজি মাদ্রাসাগুলি 'নিজামিয়া মাদ্রাসা' নামেও পরচিত। এই মাদ্রাসাগুলি চলে সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে এবং সাধারণ মানুষের ধর্মীয় দানের টাকায়।

এই শ্রেণির মাদ্রাসার পঠনপাঠন বিদ্যালয় শিক্ষা ও সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসাশিক্ষার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে পরিচালিত হয়। এই মাদ্রাসাগুলিতে মোট আটটি শ্রেণি থাকে, সেগুলির নাম –

১. জামাতে উলা (প্রথম শ্রেণি)

২. জামাতে সানি (দ্বিতীয় শ্রেণি)

৩. জামাতে ছালেস (তৃতীয় শ্রেণি)

৪. জামাতে রাবে (চতুর্থ শ্রেণি)

৫. জামাতে খামিজ (পঞ্চম শ্রেণি)

৬. সাড়ে জামি

৭. মিশকাত এবং

৮. দাওরা হাদিস

প্রত্যেক শ্রেণিতে একাধিক বিষয় পাঠ্য থাকে এবং সবগুলি বিষয়ই ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত। অর্থাৎ এই শ্রেণির মাদ্রাসার পঠনপাঠন আবশ্যিকভাবে ইসলাম ধর্ম। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেকটি পাঠ্যবইকে সমান গুরুত্বের সঙ্গে পড়ানো হয়। কিন্তু ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এক একটি নির্দিষ্ট বইকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয়, এই কারণে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাসগুলির নাম দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট ঐ বইটির নামে। যেমন – ষষ্ঠ শ্রেণিতে প্রধান পাঠ্য ও শিখনীয় বিষয় সারে জামি, আবার সপ্তম শ্রেণিতে প্রধান শিখনীয় বিষয় মিশকাত হাদিস, অষ্টমে দাওরা হাদিস; তাই উক্ত শ্রেণিগুলির নামকরণ হয়েছে ঐ নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে।

খারিজি মাদ্রাসাগুলিতে পাঠ সম্পূর্ণ করে উচ্চশ্রেণিতে পাঠ গ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে পাঠ নিতে যেতে হয় বড়ো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, যেগুলিকে বলা হয় জামিয়া। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ খারিজি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা উচ্চশ্রেণিতে পাঠগ্রহণের জন্য উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দ অথবা সাহারানপুর বা মুরাদাবাদের শাহী অথবা মুম্বাইতে গিয়ে পাঠগ্রহণ করেন। সেই নিরিখে এ'রাজ্যে খারিজি মাদ্রাসার মোট ছয়টি ধারা প্রচলিত আছে। সেগুলি নিম্নরূপ –

ক. দার উল উলুম দেওবন্দ ধারা

খ. ফুরফুরা পিতৃতান্ত্রিক ধারা

গ. আলাম্মা রুহুল আমিন প্রবর্তিত বসিরহাট সিলসিলা ধারা

ঘ. আহলে হাদিস ধারা

ঙ. বেরেলি মতাদর্শের ধারা

চ. জামায়াতে ইসলামি পরিচালিত ঐ মতাদর্শের ধারা

উপরোক্ত ধারাগুলির মধ্যে এ'রাজ্যে দার উল উলুম দেওবন্দ ধারার মাদ্রাসার সংখ্যা সর্বাধিক। এই ধারার মাদ্রাসাগুলি আমাদের রাজ্যে দুটি পৃথক ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়। একটির নাম 'পশ্চিমবঙ্গ রাবেতায়ে মাদারিস ইসলামিয়া আরাবিয়া' যার অধীনে ৯৫০ টি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর একটি হল 'অল বেঙ্গল বিফাকুল মাদারিস আল ইসলামিয়া', যার নিয়ন্ত্রণে ৫৫০ মাদ্রাসা পরিচালিত হয়।[৯] সাংবাদিক মিলন দত্ত জানিয়েছেন -

> দার উল উলুম দেওবন্দ' ধারার সংখ্যা সব মিলিয়ে হাজার দেড়েক। বাকি চারটি ধারার অধীন খারিজি মাদ্রাসার সংখ্যা সবমিলিয়ে কোনোভাবেই হাজারে পৌঁছবে না। খানিকটা বাড়িয়ে হিসেব করলেও খারিজি মাদ্রাসার সংখ্যা কোনোভাবেই আড়াই হাজার পেরোবে না। কারণ এ নিয়ে সরকারি বা বেসরকারি কোন নির্ভরযোগ্য সমীক্ষা কখনো এ রাজ্যে হয়নি। কোনো অজ্ঞাত কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যে দশ হাজার খারিজি মাদ্রাসার একটা হিসেব দিয়ে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের খারিজি মাদ্রাসার হিসেব দিতে গিয়ে বহুবার দশ হাজার সংখ্যাটাই উল্লেখ করেছেন।[১০]

আবার ২১ অক্টোবর ২০১৪ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত কাজী মাসুম আখতার রচিত উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'মাদ্রাসা সম্পর্কে আগে জেনে নেওয়া ভাল' থেকে আমরা জানতে পারছি যে, এই রাজ্যে খারিজি মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার।[১১] অধ্যাপক নীলাঞ্জনা গুপ্ত তাঁর '*Reading With Alla : Madrasas in West Bengal*' শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থে বাংলায় মোট খারিজি মাদ্রাসার নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা উল্লেখ করেননি। তবে তিনি মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও হাওড়া এই তিনটি মুসলিম অধ্যুষিত জেলায় খারিজি মাদ্রাসাগুলির বিস্তারের রূপরেখা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত তিনি দেখিয়েছেন বড়ো অঙ্কের জনসংখ্যা বিশিষ্ট প্রত্যেকটি মুসলিম গ্রামেই অন্তত একটি করে খারিজি মাদ্রাসা আছে -

> In the less accessible areas of the three districts that were covered in more detail, almost every village with a sizeable Muslim population had at least one khareji madrasa[১২]

এক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলিতেই এই ধরণের মাদ্রাসার বিস্তার ঘটেছে বলে তিনি মনে করেছেন।

খারিজি মাদ্রাসা সম্পর্কে মিলন দত্ত তাঁর প্রবন্ধে আড়াই হাজার মাদ্রাসার কথা বললেও এই সময়ের আরেকজন গবেষক জানাচ্ছেন যে, খারিজি মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। সামসুর রহমান তাঁর 'বাঙালী মুসলিম সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে লিখেছেন –

> অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু বাঙালী মুসলিম সমাজ খেয়ে না খেয়ে পাঁচ হাজারের মতো খারিজী মাদ্রাসার ভরণ পোষণ নিজেরাই করছে। কেবলমাত্র আবেগ দিয়ে এটা চলছে না, আবেগ ক্ষণস্থায়ী। খারিজী দীর্ঘস্থায়ী হয়েই প্রমাণ দিয়েছে, মুসলিম সমাজের সাথে এর বন্ধন সহজে ছেঁড়ার নয়।[১৩]

অর্থাৎ সার্বিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে বাংলায় খারিজি মাদ্রাসার সংখ্যা কমবেশি পাঁচ হাজারের মধ্যেই হবে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার একটা যুক্তি এমন হতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গে মোট ৪০ হাজার গ্রাম, যার মধ্যে মুসলমানের বাস আছে ৩৭ হাজার গ্রামে। এই ৩৭ হাজার গ্রামের মোট মসজিদের সংখ্যা ৬০ হাজার।[১৪] নীলাঞ্জনা গুপ্ত দেখিয়েছেন বড়োমাপের প্রত্যেকটি গ্রামে অন্তত একটি করে খারিজি মাদ্রাসা আছে। এখন আমরা যদি প্রত্যেক দুটি গ্রাম পিছু একটি করে খারিজি মাদ্রাসার হিসেব ধরি তাহলেও সংখ্যাটা পনেরো হাজারের উপরের চলে যাবে। সেক্ষেত্রে আনুমানিক পাঁচ হাজার খারিজি মাদ্রাসার সংখ্যা কল্পনা অসম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী সম্ভবত এই বিপুল সংখ্যার কথা ভেবেই আনুমানিক দশ হাজার মাদ্রাসার কথা উল্লেখ করেছেন।

১.০২.০১ খারিজি মাদ্রাসা : শিক্ষার্থী ও শিখন প্রসঙ্গ

খারিজি মাদ্রাসা যেহেতু কেন্দ্রীয়ভাবে কোন সংস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তাই এই শিক্ষাব্যবস্থা কোনো অভিন্ন পাঠক্রম লক্ষিত হয় না। তবে সর্বত্রই বিশেষ কয়েকটি কোর্স পড়ানো হয়, যেমন – মৌলানা, হাফেজ, কারি, মুহাদ্দিস, মুফতি, তদবির-আল-আইমা ইত্যাদি। তবে এগুলির মধ্যে 'কোরান-এ হাফিজ' কোর্সটিই সর্বাধিক প্রচলিত। এরপরে মৌলানা কোর্স। সেদিক থেকে বলা চলে যে খারিজি মাদ্রাসার লক্ষ্য হাফেজ, মৌলানা, কারি ও মুহাদ্দিস ইত্যাদি তৈরি করা। যেহেতু এর শিক্ষাদর্শ বিদ্যালয় শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রত্যেকটি মুসলিম গ্রামেই এই ভিন্ন শিক্ষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাই আমরা এই কোর্সগুলির ভবিষ্যৎ ও প্রায়োগিকতা সম্পর্কে ভাবিত। এই কারণে এই কোর্সগুলির সামাজিক ও ধর্মীয় লক্ষ্যও আমাদের বিচার্য। প্রসঙ্গত প্রত্যেকটি কোর্স সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকাও জরুরী।

হাফেজ :

আরবি 'হিফ্‌জ' শব্দ থেকে 'হাফেজ' কথাটি এসেছে। 'হিফ্‌জ' শব্দের অর্থ হল – মুখস্থ বা কণ্ঠস্থ করা। সেদিক থেকে বলা চলে যে, যিনি সমগ্র কোরান মুখস্থ বা কণ্ঠস্থ করেন তিনিই হাফেজ। তিন থেকে চার বছরের এই কোর্সে কেবলই কোরান মুখস্থ করানো হয়। অবশ্য শিক্ষার্থী যা মুখস্থ করছে, তার অর্থ বা ভাব জানার কোনো দায় তার নেই। হাফিজ কোর্স পাশ করার পর মুসলিম বাড়িতে কোরান খতমের অনুষ্ঠানে কিংবা পারলৌকিক কাজকর্মে তাঁদের ডাক পড়ে। সেখান থেকেই তাঁদের সামান্য উপার্জন হয়। তবে মিশকাত হাদিসে বলা হয়েছে যে, কোনো সন্তানকে হাফিজ করতে পারলে বাবা মা অপার পুণ্য অর্জন করবেন এবং বেহেস্তবাসী হবেন, তাই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা জেনেও মুসলিম পিতামাতারা তাঁদের সন্তানদের কেবলমাত্র পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় 'হাফিজ' বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

কারি :

হাফেজের মতো প্রায় একই রকমের আরেকটি কোর্স হল – কারি। বিশুদ্ধ উচ্চারণে সুললিত সুরে যিনি কোরান তেলাওত বা কোরান পাঠ করতে পারেন তিনিই হলেন কারি। এই কোর্সেও শিক্ষার্থীকে হাফেজের মতোই দীর্ঘদিন ধরে কোরান মুখস্থ করতে হয়। ধর্মীয়ভাবে এই 'কারি'রা সম্মানিত হলেও পেশাগত দিক থেকে এঁদের বিশেষ কোনো নিরাপত্তা পরিলক্ষিত হয় না।

মৌলানা :

হাফিজের পরে সর্বাধিক প্রচলিত কোর্স হল এই মৌলানা। এই কোর্সের মেয়াদ মোটামুটি ১২ – ১৬ বছর। কোর্স সম্পূর্ণ হওয়ার পর একজন মৌলানা মসজিদের ইমাম হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন। দরিদ্র মুসলমান সমাজে ইমামতি পেশাগতভাবে খুব একটা লাভজনক পেশা নয়। গ্রামের মানুষের দেয় চাঁদা ও ভাতকাপড়ে তাঁদের দিন গুজরান করতে হয়।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ খারিজি মাদ্রাসা 'পশ্চিমবঙ্গ রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরাবিয়া' নামক একটি বেসরকারি সংস্থার অধীনে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এই সংস্থাটির সভাপতি হলেন 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ' এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার মূল কর্ণধার মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। এই সংস্থাটি মাদ্রাসার পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। ফলে

হাফেজ, কারি, মৌলানা কিংবা মুহাদ্দিস মুফ্‌তি বানানো মূল লক্ষ্য হলেও খারিজি মাদ্রাসাগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার জন্য স্বল্প পরিমাণে হলেও সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল এবং বিজ্ঞানের পাঠ দেওয়া হচ্ছে। সামসুর রহমান তাঁর গবেষণাগ্রন্থে জানিয়েছেন –

> দিন পাল্টেছে, পাঠ্য বিষয়কেও খারিজি মাদ্রাসা আধুনিকীকরণ করে নিয়েছে। আজ আর শুধু মাত্র ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানে বিশ্বাসী নয় তারা। ... সেই নিরিখে খারিজি মাদ্রাসায় পাঠ্য বিষয়গুলি : ১) বাংলা, ২) ইংরেজি, ৩) অঙ্ক, ৪) ইতিহাস, ৫) ভূগোল, ৬) বিজ্ঞান, ৭) উর্দু / ফার্সি/ আরবি (ভাষা ও সাহিত্য), ৮) হাদীস, ৯) তফসীর শাস্ত্র (পবিত্র কুরানের ভাষ্য), ১০) হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস ১১) উসূলে হাদীস ১২) তফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস ১৩) উসূলে তফসীর (বিজ্ঞানের আলোকে হাদীস), ১৪) ফেক্কাহ শাস্ত্র(ব্যবহার শাস্ত্র), ১৫) উসূলে ফেক্কাহ্‌ (বিজ্ঞানের আলোকে ফেক্কাহ্‌) ... ১৮) আরবী সাহিত্য ১৯) আরবি সাহিত্যের ইতিহাস ২০) ইসলামের ইতিহাস ২১) ইলমূল নাহ (বাক্য প্রকরণ) ২২) ইলমুস স্বরফ (শব্দ প্রকরণ), ২৩) ছন্দ প্রকরণ ২৪) ইলমূল বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র), ২৫) ইলমূল মানতিক (তর্ক শাস্ত্র), ২৬) ধ্বনি বিজ্ঞান, ২৭) ইলমূল উরুজ (দর্শন শাস্ত্র), ২৮) ইলমূল ফারায়েজ (মৃত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টন), ২৯) কারিগরি শিক্ষা, ৩০) কম্পিউটার শিক্ষা[১৫]

এখন প্রশ্ন হল সময়ের ক্রম বিবর্তনে খারিজি মাদ্রাসাগুলির পাঠ্য বিষয় যে সর্বত্র একইরকমভাবে অনুসৃত হচ্ছে এমনটি নয়। উপরের বিষয় তালিকাটির প্রতি লক্ষ রেখেই বলতে হয় যে, এখনো পর্যন্ত অধিকাংশ খারিজি মাদ্রাসা গণিত, বিজ্ঞান, কিংবা ভারতের ইতিহাস ও ভূগোলের পাঠদানে সম্পূর্ণ নীরব। কেননা এই সমস্ত মাদ্রাসার প্রধান লক্ষ্য মানুষের পারলৌকিক জীবনের সুখ ও শান্তি সুনিশ্চিত করা, তাই 'আখেরাতের কামিয়াব' – এর উদ্দেশ্যে ইহজীবনকে পরিচালিত করার লক্ষ্যেই নির্মিত হয় মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠক্রম। স্বাভাবিকভাবেই তা বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

লক্ষ্য করবার বিষয় মাদ্রাসাগুলিতে যে সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী উদ্যোগে বিজ্ঞান ও ইতিহাস ভূগোলের পাঠ দেওয়া হচ্ছে সেইসমস্ত ক্ষেত্রে বিদ্যালয় শিক্ষায় ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তক গৃহীত হচ্ছে কিন্তু খুবই অদ্ভুত ব্যাপার হল সাহিত্যের পাঠদানের ক্ষেত্রে তাঁরা বিদ্যালয় শিক্ষায় ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তকটি গ্রহণ করছেন না। কারণ এটি তাঁদের মনপসন্দ নয়। অতঃপর সাহিত্যের পাঠদানের ক্ষেত্রে বিকল্প পাঠ্যপুস্তক গৃহীত হচ্ছে, যেটি সম্পূর্ণভাবে ইসলামি চিন্তাভাবনার সংমিশ্রনে রচিত। এখন প্রশ্ন হল, মাদ্রাসাশিক্ষায় সাহিত্যের পাঠক্রম নির্মাণে কেন বিকল্প পুস্তকের উপর ভরসা রাখতে হচ্ছে? তবে কি সাহিত্যকেই ধর্মীয় দীক্ষিতকরণ কিংবা অভিভাবনের উপযুক্ত হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে? মাদ্রাসায় ব্যবহৃত সাহিত্যের পুস্তকগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখলেই এই প্রশ্নের সদুত্তর

পাওয়া যাবে। আমরা আমাদের গবেষণায় সেই দিকটিকেই ধরতে চেয়েছি এবং বিশেষ করে শিশুপাঠ্যপুস্তক হিসেবে প্রাইমার কীভাবে ইসলামি চিন্তাভাবনার ধারক ও বাহক হয়ে উঠছে সেদিকে আলো ফেলতে চেয়েছি।

১.০২.০২. বাঙালি মুসলমানের পুনর্গঠনের উদ্যোগ ও খারিজি মাদ্রাসা

এখন প্রশ্ন হল রাজ্যে হাই মাদ্রাসা ও সিনিয়র মাদ্রাসা এই দুই ধারায় সরকারি উদ্যোগে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হলেও খারিজি মাদ্রাসার এত বাড়বাড়ন্ত কেন? কেন খারিজি মাদ্রাসাকে বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেছে নিতে হল? অথবা বিদ্যালয় শিক্ষার ধারা এদেশে এত উন্নয়নশীল হওয়া সত্ত্বেও কেন মুসলিম সমাজে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে? তবে কি মুসলমান সমাজে ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্ম নির্ভর জীবনযাত্রার প্রতি ঝোঁক ক্রমবর্ধমান? সরকারি মাদ্রাসা অপেক্ষা খারিজি মাদ্রাসার বিপুল সংখ্যা আমাদের মনে এই প্রশ্ন উস্কে দেয়। একথা ঠিক যে, খারিজি মাদ্রাসার সঙ্গে মুসলমান সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে, যেটিকে আবেগ দিয়ে বিচার করা যাবে না কেবল; বরং তাঁদের অস্তিত্বের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে হবে। কিন্তু এই বাংলার সাংস্কৃতিক পরিসর হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সাধনায় রচিত। আবার এই বাংলার মুসলমানও প্রথমত বাঙালি তারপর মুসলমান, সেক্ষেত্রে তাঁদের বাঙালি জাতিসত্তা ধর্মীয় জাতিসত্তা অপেক্ষা অগ্রাধিকার দাবি করে। বিশ শতকের তিনের দশক থেকে বাঙালি মুসলমান সমাজে এই দাবিটিই জোরালো হয়ে উঠেছিল। 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' আমাদেরকে সেই ইতিহাস স্মরণ করায়। কিন্তু কোন সন্ধিক্ষণে তবে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনায় আবার বদল শুরু হলো? বাঙালি মুসলমান আবার বিস্মৃত হতে শুরু করলো তার প্রকৃত জাতিসত্তা? পরিবর্তে ধর্মীয় পরিচিতিসত্তা বড়ো হয়ে উঠতে থাকলো? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেয়েছেন নাসিম–এ-আলম তাঁর একটি প্রবন্ধে। ২০১৪ সালে বর্ধমানের খাগরাগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের প্রেক্ষিতে লেখা আনন্দবাজার পত্রিকার একটি উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে লিখেছেন –

> বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর মনে হচ্ছে দীর্ঘ শীতঘুমে ছিলাম সবাই। ঘুম ভেঙে হতবাক হয়ে চেয়ে আছি কুলকিনারাহীন অন্ধকারের দিকে। এত হিংসা, নির্মমতা – তাও পশ্চিমবঙ্গে! ভাবতে কষ্ট হচ্ছে, ভয় হচ্ছে আমরা ঠিক কতোখানি নিরাপদ।[১৬]

ঘটনা হলো ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন বর্ধমানের খাগড়াগড়ে একটি বাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। জেলা পুলিশ, সি.আই.ডি এবং অবশেষে এন. আই. এ তদন্তে নেমে জানতে পারে এর সঙ্গে বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদিন এর যোগ রয়েছে।

বর্ধমান, নদিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদসহ রাজ্যের বাইরেও মাদ্রাসার আড়ালেই তারা জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এই হিংসা নির্মমতা ও অন্ধকারাচ্ছন্নতায় বিপন্ন বাঙালি মুসলমান সমাজের দুর্দশার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই নাসিম–এ-আলম এর ইতিহাসকে আমাদের সামনে উন্মোচন করেন –

> পরিস্থিতি এমন ছিল না। আশির দশকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ধর্মের চেয়ে মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জীবনের প্রতিষ্ঠা। মুসলিম গ্রামগুলিতে শিক্ষার হার ছিল খুবই অল্প। তবু কৃষিকাজ করে, দূর রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করে গরিব মুসলমান পায়ের নীচে মাটি খুঁজতে শুরু করে। নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধ থেকে পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করে। তৎকালীন শাসকদলের কাছে ভোটই ছিল মুখ্য বিষয়। ... প্রশাসন ও সমাজকে ঠুঁটো বানিয়ে লকাল কমিটি ভিত্তিক এক সমাজ বামপন্থীরা প্রতিষ্ঠা করেছিল। অলিতে গলিতে খারিজি মাদ্রাসার গজিয়ে ওঠা তখন থেকেই। দেখতে দেখতে মেয়েদের বোরখার প্রচলন শুরু হল। পার্থিব জগৎ নাকি মূল্যহীন। সব সুখ পরকালে। পরকালে জান্নাত তথা স্বর্গ পাওয়াই একমাত্র লক্ষ্য। পৃথিবী তুচ্ছ একটি স্থান। বিজ্ঞান চর্চায অন্যায়। গান বাজনা চর্চা অধর্ম। এমন সব আজগুবি, যুক্তিহীন মনগড়া কথাবার্তার প্রচার শুরু করে মৌলবাদীরা। ...ডালপালা মেলতে থাকে মৌলবাদ। ... একটু একটু করে দিন অতিক্রান্ত হতে থাকে দু'হাজার পাঁচ -ছয় থেকে সমাজে আরো গভীরভাবে মৌলবাদী শিকড় প্রোথিত হয়।[১৭]

এই মৌলবাদ বাংলার গ্রাম জীবনের মৌল স্বভাবকেই দিল বদলে। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সাধনার ক্ষেত্রগুলিকে জনগণের মানসপট থেকে বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবিয়ে দিতে উদ্যোগী হলেন এঁরা –

> একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেছে গ্রামের দিকে পুরনো দিনে কবিগান নাটক যার আসর বসত। অনেক গ্রামীণ মৌলবাদী এসব বন্ধ করে দিয়েছে। এখন অধিকাংশ গ্রামেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন পালিত হয় না। সাতের দশক পর্যন্ত নজরুল যেভাবে সমাদৃত হতেন, আলাদা করে তার কবিতা গুণগুন করতে যুবসমাজ আজ সেই আবেগ স্তিমিত। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবুল বাশারের উপন্যাস যে গৃহে পৌঁছায়নি সেখানে সীমান্তে পেরিয়ে পৌঁছে গেছেন একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী দিলওয়ার সাইদি। দুপুর উজাড় করে তার বক্তৃতার ক্যাসেট শুনছেন মুসলমান সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। ... মোটের উপর উদারপন্থার ও সংস্কৃতি চর্চা প্রায় নিঃশেষিত।[১৮]

আর সংস্কৃতি চর্চার সেই মুক্ত প্রাঙ্গণ দখল করেছে ধর্ম -

> ...মুসলিম গ্রামগুলিতে ধর্মচর্চা যত বেড়েছে, সাংস্কৃতিক চর্চা এক্কেবারে কমে গেছে। এলাকার শিক্ষিত ও নিরীহ মানুষ আশির দশক থেকে সমানে রাজনৈতিক হিংসার শিকার হয়েছেন। পরে মৌলবাদী রক্তচক্ষু দেখতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলির একটা বড় অংশে মোল্লাতন্ত্র বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কোনও মনীষীর জন্মদিন পালন করা যাবে না এগুলি নাকি ধর্মবিরোধী কাজ।[১৯]

অতঃপর যা ধর্ম বিরোধী তা পরিত্যাগ করে নতুনভাবে বাঙালি মুসলমানকে পুনর্গঠিত করবার লক্ষ্যেই মোল্লাতন্ত্র চালিত খারিজি মাদ্রাসাগুলি ক্রমবর্ধমান হতে থাকলো। প্রসঙ্গত আমরা আমাদের গবেষণায় এই নব্বইয়ের দশক থেকে রচিত ইসলামি বাংলা প্রাইমারগুলিকেই বেছে নিয়েছি যেখানে নতুনভাবে বাঙালি মুসলমানকে পুনর্গঠনের একটা প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা লক্ষ করবো ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নব্বইয়ের দশক থেকে বাঙালি মুসলমানের যে পরিবর্তন সূচিত হল তা উক্ত প্রাইমারগুলিতে কীভাবে প্রবেশ করতে থাকলো। সেইসঙ্গে এটিও বিচার করে দেখবো, মুসলমান সমাজের সময়ের দাবি মেটাতে রচিত ইসলামি প্রাইমারগুলি কীভাবে ধর্মীয় ডিসকোর্স রচনায় সচেষ্ট হলো।

এখন আমরা আমাদের প্রস্তাবিত গবেষণায় বাংলা প্রাইমারের প্রসঙ্গ প্রকরণ তার ইতিহাস রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করবো। সেইসঙ্গে ইসলামি প্রাইমারের উদ্ভবের ইতিহাস ও তার উদ্দেশ্য আলোচনা করবো।

২. প্রাইমার : সংজ্ঞা ও স্বরূপ

প্রাইমার সম্পর্কে আলোচনায় প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে প্রাইমার বলতে আমরা কী বুঝি? ‘প্রাইমার’ শব্দটি ইংরাজি শব্দ। ল্যাটিন শব্দ ‘primaries’ বিবর্তিত হয়ে এসেছে ‘প্রাইমার’ কথাটি। বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে ‘প্রাথমিক শিক্ষণ গ্রন্থ’। বাংলা প্রাইমার চর্চার অন্যতম পুরোধা পবিত্র সরকার ‘প্রাইমার’ শব্দটির বাংলার্থ ব্যবহার করেছেন – ‘শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রথম বই’।[২০] অধ্যাপক ও গবেষক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ‘প্রাইমার’ শব্দটি ব্যবহার করতেই বেশি স্বচ্ছন্দ।[২১] এই ধারার আর এক খ্যাতনামা গবেষক আশিস খাস্তগীর ‘প্রাইমার’ বলতে ‘শিশু পাঠ্য বর্ণশিক্ষার গ্রন্থ’ বুঝিয়েছেন।[২২] গবেষক আবীর কর এই ‘প্রাথমিক শিক্ষণ গ্রন্থ’ শব্দটির আগে ‘বাংলা’ শব্দটি সংযুক্ত করে বলেছেন – ‘প্রাথমিক বাংলা শিক্ষণ গ্রন্থ’।[২৩] গবেষক কার্ত্তিক লাহিড়ী ‘শিশুপাঠ্য পুস্তক’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।[২৫] বিনয়ভূষণ রায় ‘প্রাইমার’ অর্থে ‘প্রাথমিক পাঠ্য’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।[২৫] গবেষক রাকিব তাঁর অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভে লিখেছেন-

> শিশুর বর্ণশিক্ষার বই হল প্রাইমার। ... এটি প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক যা অধ্যয়ন বিষয়ক ভূমিকা হিসেবে হিসেবে কাজ করে বা শিক্ষার্থীদের পড়তে শেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। শিশুশিক্ষার প্রথম পাঠকে প্রাইমার বলা যেতে পারে।[২৬]

এরপর তিনি 'প্রাইমার' আর 'ফলো - আপ' (Follow-Up)কে পৃথক বর্গে রেখে এই দুই শ্রেণির পুস্তকের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন –

> প্রাইমার মূলত ৪ – ৬ বছর বয়সী ভাষা তথা প্রাথমিক জ্ঞান শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ প্রাইমার বলতে আমরা সেইসমস্ত পাঠ্যপুস্তককে বুঝি - যা শিশুদের ভাষাশিক্ষার জন্য বা আরো বিস্তৃত করে বললে শিশুদের পড়তে শেখানোর জন্য রচিত একটি ছোটো প্রাথমিক বই। যাতে থাকবে নবজাতকের জন্য বর্ণ (Alphabet), আর অক্ষর (Letter) শেখানোর পড়া আর ছড়া। আর থাকবে বানান শেখানোর পাঠ। অর্থাৎ প্রাইমার হল প্রয়োজনের তাগিদে তৈরি ভাষাশিক্ষার বই।[২৭]

উপরোক্ত মন্তব্যগুলির প্রেক্ষিতে আমরা 'প্রাইমার' শব্দটির বাংলার্থ হিসেবে 'প্রাথমিক শিক্ষণ গ্রন্থ' কথাটিকেই ব্যবহার করবো। কেননা একটি প্রাইমারের মধ্যে দিয়ে কেবলমাত্র ভাষা কিংবা বর্ণ শিক্ষাই হয় না, তারমধ্যে দিয়ে শিশু শিক্ষার্থী সংখ্যা, সাল, তারিখ, মাস, বার ও অন্যান্য অনেক হিসেব-নিকেশ শিখে থাকে। আবার 'শিশু পাঠ্যপুস্তক' শব্দটিও সম্পূর্ণ নয়; কেননা গল্পের বইও শিশুপাঠ্য হতে পারে। তবে সেটি প্রাইমার নয়। একই বিচারে 'প্রাথমিক পাঠ্য' শব্দটিকেও গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে প্রাথমিক শ্রেণিতে পাঠ্য হলেই যে সেটি প্রাইমার হবে তার কোনো অর্থ নেই। প্রাথমিক শ্রেণির পাঠ্য ভূগোল প্রাইমার হতে পারে না। কিন্তু 'প্রাথমিক শিক্ষণ গ্রন্থ' কথাটির মধ্যে আছে প্রাথমিক স্তরে শিশু শিক্ষার্থীকে শিখিয়ে ও পড়িয়ে নেবার দ্যোতনা; তা বর্ণ, ভাষা, সংখ্যা, মাস, সাল, তারিখ, হিসেব–নিকেশ, আদব–কায়দা ও সহবত সব কিছুই হতে পারে। একারণে প্রাইমার বলতে আমরা বুঝবো 'প্রাথমিক শিক্ষণ গ্রন্থ'কেই। আর বাংলা প্রাইমার বলতে বাংলা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষণ গ্রন্থকে বুঝবো। তবে এখানে আলোচনার সুবিধার্থে 'প্রাইমার' শব্দটিকেই অধিক ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রায় প্রতিটি বাঙালি শিশু সাধারণত চার-পাঁচ বছর বয়সে বাংলা বর্ণের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে এই বয়সে অনুকরণ রীতি মেনে মৌখিক ভাবে সে অনেক শব্দ আয়ত্ত করতে থাকে। এমনকি শব্দ যগে নানান বাক্য প্রয়োগে সে তার মনের ভাব দিব্যি প্রকাশ করতে পারে। 'প্রাইমার' শিশুর শব্দ-বাক্য - এর মৌখিক শিক্ষণকে 'বর্ণ-শব্দ-বাক্য – এর ক্রম মেনে পাঠের বিন্যাস ঘটায়। একারণেই বলা যায় 'প্রাইমার' শুধুমাত্র শিশু শিক্ষার্থীর বর্ণপরিচয়ের গ্রন্থ নয়। প্রাইমার বর্ণ চেনানো, শব্দ শেখানো, বাক্য গঠনের পদ্ধতি শিক্ষণের পরও শিশু শিক্ষার্থীর প্রথম পাঠ নির্মাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কারণে সম্পূর্ণ শিক্ষণ পর্যায়টিকে অধিকাংশ প্রাইমার রচয়িতা দুই বা তার বেশি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। শিশু শিক্ষার্থীর প্রথম শ্রেণির প্রথম ভাগে বর্ণ সমূহকে পরিচয়

এবং অসংযুক্ত বর্ণ সহযোগে শব্দ – বাক্য – পাঠ এবং দ্বিতীয় শ্রেণি দ্বিতীয় ভাগে সংযুক্ত বর্ণ ও তার সহযোগে পাঠ।[২৮]

অধ্যাপক পবিত্র সরকারের মতে – শিশুর পাঠ্যবস্তুকে যদি বিদ্যালয়-বদ্ধ (in-school) এবং বিদ্যালয় – অতিরিক্ত (Out-of-school) – এই দুভাগে ভাগ করা হয় তবে তার প্রাইমার শিশুর প্রথম বিদ্যালয়-বদ্ধ পাঠ্য। সেইসঙ্গে প্রাইমারটিই শিশুর পরবর্তী সমস্ত বিদ্যালয়-বদ্ধ ও বিদ্যালয়-অতিরিক্ত পাঠ্যবিষয়ের প্রবেশদ্বার। দ্বিতীয়ত প্রাইমারটি একটি বিদ্যালয়পাঠ্য অর্থাৎ 'টেক্সট' হবার ফলে এর মধ্যে একটা বাধ্যতা আছে।[২৯] অর্থাৎ আনুগত্য আদায়ের একটি সহজ পথ যেন প্রাইমার তৈরি করে থাকে। জন্ম থেকে শিশু যে আনন্দদায়ক পরিবেশে তার শিক্ষা দীক্ষা নিয়েছে তা কার্যত দেখে শুনে অনিয়ন্ত্রিতভাবে। আর প্রাইমারের শুরুটা হল প্রণালীবদ্ধভাবে, কিছুটা সুপরিকল্পিত, পাকা হাতের নির্দেশিত পথে শিশুকে এগিয়ে দেবার চেষ্টা। সেইসঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তালিম দেবারও একটি উপযুক্ত মাধ্যম হল প্রাইমার। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে সভ্যতা – সংস্কৃতির প্রবাহন চলতে থাকে লিপিকে ভিত্তি করে। লিপির সূত্রেই শিশু তার শিক্ষার সমগ্রটা গ্রহণ করে তাই লিপির সঙ্গে পরিচয় করানোর প্রথম সূত্রপাত এই প্রাইমারে। ভাষা ব্যবহারের বৌদ্ধিক কাঠামোতে এই প্রথম শিশু শিক্ষার্থী পড়ে বোঝা এবং লেখা ও লিখে-বোঝানোর পর্যায়ে প্রবেশ করে।

এখন প্রশ্ন হল প্রাইমার কি শুধুমাত্র পড়ালেখা ও পড়াশুনা এই ধরণের বৌদ্ধিক কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাকি আরো ব্যপকতর কোনো উদ্দেশ্যকে ভেতরে ভেতরে লালন করে? প্রাইমার কী? এই প্রশ্ন যেমন জরুরী তেমনভাবেই প্রাইমার কেন বা এর উদ্দেশ্য কী এই প্রশ্নও কম জরুরী নয়। সুতরাং আমরা সেই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে অগ্রসর হবো।

২. ১. প্রাইমারের উদ্দেশ্য

প্রাইমারকে আমরা শিশু শিক্ষার্থীর কাছে বর্ণ যোগে শব্দ ও শব্দ যোগে বাক্য গঠনের কৌশল শিক্ষণের গ্রন্থ বললেও আক্ষরিক অর্থে ভাষা শিক্ষা দেওয়া প্রাইমারের একমাত্র লক্ষ্য নয়।[৩০] এই সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানের বিশেষ মতামত আছে। স্কুলে যে শিশু শিক্ষা নিতে আসে বয়সের ভিত্তিতে সেই শিশু নিজের মাতৃভাষাটি ইতিমধ্যে রপ্ত করে ফেলেছে সে, এমনকি সাড়ে তিন থেকে চার বছরের মধ্যে তার প্রথম ভাষার পুরো ব্যাকরণটিও তার মাথায় অন্তর্নিহিত হয়ে গেছে। সেইসঙ্গে জটিল বাক্যগঠন প্রক্রিয়াও তার আয়ত্তাধীন। ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন এই অবস্থায় শিশুরা প্রাইমারে

যা পড়ে তার চাইতে জটিল বাক্য ব্যবহারে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে পূর্বেই। সুতরাং প্রথম ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে প্রাইমারের কোনো দায়িত্ব নেই বলে মনে করেন বর্তমান ভাষাতত্ত্বের প্রধান পুরুষ নোয়াম চমস্কি।[৩১] তাহলে প্রাইমার কী দায়িত্ব পালন করবে? সে জবাবও ভাষাবিজ্ঞানীর প্রস্তুত। তিনি জানাচ্ছেন প্রাইমার শুধু ভাষাব্যবহারের আরেকটা রাস্তা শিখিয়ে দেয় শিশুকে – পড়া ও লেখার রাস্তা। যাকে ইংরাজিতে বলা যায় – language arts, - এই দুটি দক্ষতা শেখানোই প্রাইমারের প্রথম লক্ষ্য।[৩২]

বাংলা প্রাইমারে প্রথম বছরে কেবল অযুক্ত স্বর, অযুক্ত ব্যঞ্জন, স্বরের নানা ধরণের 'কার'-রূপ, বিশেষ বিশেষ ব্যঞ্জন ও স্বরের বিশিষ্ট যুক্তরূপ শেখানো হয়। যুক্ত ব্যঞ্জন শেখানো হয় দ্বিতীয় বছরে। প্রাইমারে এই প্রকার শেখানোর ব্যাপারে কোনো মান্য পদ্ধতি চালু নেই। বরং যে ভাষার বর্ণ সংগঠন যেমন তার উপর নির্ভর করে ভাষাটি শেখাবার কৃৎ কৌশল। বাংলা ভাষায় একটি শিশুকে স্বচ্ছন্দে লিখতে, পড়তে এবং শিখতে হলে অন্তত পাঁচশোর কাছাকাছি চিহ্নের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, ইংরাজির ক্ষেত্রে তা নয়। কাজে কাজেই বাংলা প্রাইমার ও ইংরাজি প্রাইমারের শিক্ষণ কৌশল একইরকম হবে না।

তবে এব্যাপারে আমরা নিশ্চিত যে শিশুর প্রথম পাঠ্য বইয়ের আদি লক্ষ্য হবে শিশুকে পড়তে এবং লিখতে শেখানো। পড়তে শেখাবার জন্য প্রথমেই লিপির অন্তর্গত যাবতীয় চিহ্নগুলিকে শিশুশিক্ষার্থীকে চিনিয়ে দিতে হবে। সেই সঙ্গে বর্ণের দৃশ্যরূপ এবং তার উচ্চারণও শেখাতে হবে। বানানের জটিলতাগুলিকে সামনে রেখে সে বিষয়ে নিয়ম সঙ্গত পরিচয় ঘটানোও প্রাইমারেই কাজ। অনেক্ষেত্রে হাতের লেখা সুন্দর করারও তালিম দিয়ে প্রাইমার শিশু শিক্ষার্থীকে গড়েপিঠে নেবার দায়িত্ব পালন করে। অর্থাৎ গঠনগত দিক থেকে বা ফর্মের দিক থেকে প্রাইমার সচরাচর যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে সেগুলি হল –

ক) লিপির অন্তর্গত চিহ্ন পরিচিতিকরণ

খ) স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের বিন্যাস চিহ্নিতকরণ ও পরিচিতিকরণ

গ) সম্ভব হলে ভাষার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কের সংখ্যারও পরিচিতিকরণ

ঘ) পাঠ দক্ষতা গঠন

ঙ) উচ্চারণ দক্ষতা গঠন

চ) লেখার দক্ষতা গঠন

ছ) বানান সম্পর্কে ধারণা গঠন

পড়ার ও লেখার আদব – কায়দা শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রাইমার আরো কিছু দায়িত্ব পালন করে থাকে। সেটি হল প্রাইমারের মধ্যে দিয়ে শিশুকে কোন খবর পৌঁছে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে বিচার করা হবে খবরের চরিত্র কী? খবরের বহর কতটা? এবং কোন সাংস্কৃতিক পরিবেশে সংস্কৃতির কোন বিশেষ বিশেষ দিকগুলি সর্বাগ্রে শিশুর নিকট পোঁছে দেওয়া হবে। এ নিয়ে যে বহু বিতর্ক ও নানা জনের নানা মত আছে তা প্রচলিত প্রাইমারগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই আমরা বুঝতে পারবো।

আমরা এর আগে যে প্রাইমারে 'ভাষা কলা' (language art) শেখানোর কথা উল্লেখ করেছি সেই মতাবলম্বীদের মতানুসারে ভাষার মধ্যে দিয়ে বিষয়বোধের ততখানি আবশ্যিকতা স্বীকার করা হয় না। তাঁরা মনে করেন ভাষা দক্ষতা গঠনের জন্য বিষয়বস্তুর সংযুক্তি খুব বেশি জরুরী নয় –

> In the development of language habits, the pupils should not be concerned too greatly with the thought content.[৩৩]

অন্য দিকে অপর একটি বিরুদ্ধ মতে মনে করা হয় প্রাথমিক স্তরেই প্রাইমারের মধ্যে দিয়ে শিশুর নিজের জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে – তার socio-sphere সম্বন্ধে কিছু খবর তাকে জনিয়ে দেওয়া দরকার। সেই অনুযায়ী তার শব্দভাণ্ডার বা 'ভোকাবিউলারি' বানিয়ে দিতে হবে এবং টেক্সট বা পাঠ্য অংশে সেই মোতাবেক বিষয় বিন্যাস করা হবে। এঁরা মনে করেন – "Language must be considered as a part of the total life of a child"[৩৪]

একথা সত্য যে বাস্তব ও জগত বিবিক্ত কোনো ভাষা বা ভাবনা হতে পারে না। পৃথিবীতে ভাষা, শব্দ ও নাম দেওয়ার কাজটি শুরু হয়েছিল কোনো না কোনো বস্তুকে ভালবাসা থেকে – তার প্রতি প্রেম থেকে। তাই প্রেমহীন শব্দপ্রয়োগ ছিন্নমূল; সখ্যহীন বাক্য বৃথা বলেই মনে করেন আধুনিক দার্শনিকরা।[৩৫] স্বাভাবিকভাবেই প্রাইমার নামক পাঠ্যপুস্তকেও ভাষাশিক্ষার পরিসরে রচয়িতা যে শাব্দিক জগৎ নির্মাণ করবেন তার ছত্রে ছত্রে ধরা থাকবে রচয়িতার আত্মভুবন। আতাই আমাদের মনে হয় বিষয়বস্তু ও বাস্তব জগৎ ব্যাতিরেকে ভাষার উন্নয়ন কতখানি সম্ভব সে বিষয়ে সংশয় আছে। এক্ষেত্রে শিশুর বাস্তবিক এবং মানসিক, স্পষ্ট ও কাল্পনিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠ্যবস্তুকে যুক্ত করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য প্রাইমারের এই ঘেরাটোপে ফেলার আগে সকলকেই

মনে রাখতে হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষণ গ্রন্থটিই শিশুর প্রথম বাধ্যতামূলক অধ্যয়নের উপকরণ। এই প্রথম শিক্ষার্থীকে খানিকটা নিয়ম শৃঙ্খলার আওতায় আনা হচ্ছে, তার ধৈর্য ও মনোযোগ আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। সুতরাং প্রাইমারকে শিশু শিক্ষার্থীর পক্ষে কৌতূহলদ্দীপক ও আকর্ষক করে তোলা জরুরী। শাসনহীন পথে প্রাইমার শিক্ষার্থীকে গড়েপিঠে নেবে। এটাই তার কার্যকরী পথ।

সেদিক থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সফল বাংলা প্রাইমারের বিষয়বস্তুগত উদ্দেশ্য হবে -

ক) শিশু শিক্ষার্থীর সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে পরিচয় দান

খ) ধর্ম ও বর্ণ নিরপেক্ষ সমাজ কাঠামোর ধারণা দান

গ) লিঙ্গ নিরপেক্ষ মানবতাবাদকে চিনিয়ে দেওয়া

ঘ) স্বাদেশিকতার পাশাপাশি বিশ্বাত্মা বোধের জাগরণ

ঙ) শৃঙ্খলিত নয়, বরং আনন্দদায়ক পাঠোপকরণ সরবরাহ

চ) অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার পরিমণ্ডল গঠন

ছ) অনুসাশন নয়; অনুপ্রেরণার উৎস চিহ্নিতকরণ

জ) নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ গঠন

এখন প্রশ্ন হল প্রাইমার কি শুধুমাত্র শিশুর শৈশবের পঠন পাঠনের শিক্ষণ গ্রন্থ হিসেবেই সীমাবদ্ধ পরিসরে কাজ করে নাকি? আরো কোন উদ্দেশ্য সে পালন করে? আমরা যদি খুব সাদা চোখেই পর্যবেক্ষণ করি উনিশ শতকের প্রাইমারগুলিকে তাহলে অন্তত আমাদের চোখে আসবে সেই প্রাইমারগুলির বিশেষ শ্রেণি ও সামাজিক চরিত্র। শিশুর প্রথম পাঠ্য গ্রন্থ হিসেবে সেগুলি যেমন শিশুকে বর্ণ, শব্দ, বাক্য গঠনের তালিম দেয় তেমনভাবেই শিশুকে শিখিয়ে দেয় নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অবশ্যই এক্ষেত্রে প্রাইমারগুলিতে শিশু শিক্ষার্থীকে 'অজ্ঞান' ও অগঠিত চিন্তা চেতনার উৎস হিসেবে ধরে নিয়ে তাকে গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে এই গড়ে তোলার ব্যবস্থায় (System) – শিক্ষার্থীকে হেয় করা হয় না তো? ব্যবস্থার আওতায় এনে নতুন একটি সম্ভাবনাকে ব্যবস্থার অনুকূলে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলে না তো? গোপাল সুবোধ তাই সে সমাজের আদর্শ আর রাখাল যাবতীয় শৃঙ্খল ও ব্যবস্থার দাস না হবার জন্য অবজ্ঞেয়। এর মধ্যে শুধু কি গোপাল সুলভ আচরণকেই সম্মানিত করা হচ্ছে নাকি ভেতরে ভেতরে দাসত্য ও আনুগত্যকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে ন্যুব্জ করে দেওয়া

হচ্ছে? এই সব সওয়াল অবশ্যই আলোচনা সাপেক্ষ। তাই প্রাইমারকে কেবলমাত্র বর্ণ শিক্ষার গ্রন্থ হিসেবে দেখা সম্ভব হয় না। প্রাইমার আসলে সমকালের সমাজ, তার ব্যবস্থা, প্রচলিত প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক, মানুষের মন, আনুগত্য চিন্তা, দুর্বলতা, সংস্কৃতি ও ভবিষ্যৎ ভাবনাকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে।

২.৩. বাংলা প্রাইমারের উদ্ভব ও বিকাশ

উনিশ শতকের শিশুপাঠ্য বর্ণ শিক্ষার গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পাঁচশোটি।[৩৬] অবশ্য বাংলা ভাষার প্রাইমার রচনার প্রচেষ্টা একটু বিলম্বিতভাবে হয়েছিল। শিশুপাঠ্য বর্ণ শিক্ষার গ্রন্থ রচনায় বাঙালিরা ১৮৩৫ সালের আগে হাত দিতে পারেননি। উনিশ শতকের সূচনায় পাশ্চাত্যের শিক্ষার আদর্শে ব্যাপক পরিমাণে 'স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে সেই স্কুলের প্রয়োজনে দরকার হয়ে পড়ল শিশুপাঠ্য বই। শিশুপাঠ্য বইগুলির জোগানে নানা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে। ১৮১৬ সালে শ্রীরামপুর মিশনারি থেকে বেরলো ১২ পাতার একটি বর্ণশিক্ষার বই। নাম *লিপিধারা* । এটিই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম প্রাইমার। লেখাবাহুল্য এর রচয়িতা কোনো বাঙালি নন।

১৮১৬ থেকে ১৮১৭ সালের মধ্যে মোট শতাধিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় যার ছাত্রসংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৭০০০ এর উপর। ১৮২৩ সালের মধ্যে ১৬০ টির বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হল।[৩৭] কাজে কাজেই বিদ্যালয় পাঠ্য শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। এটিই ছিল ঐতিহাসিকভাবে বাংলা প্রাইমার রচনার মোক্ষম কাল।

১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' ও ১৮১৮ সালে 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি। এই দুই সোসাইটি এদেশীয়দের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনায় উদ্যোগী হলেন। এবং তাদের ব্যবসা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এক বিস্তৃত চেহারা লাভ করে। এই স্কুল বুক সোসাইটির অধীনে ১৮১৮ সালে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট লিখলেন *বর্ণমালা* নামের একটি প্রাইমার। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ছাপার হরফে সেটিই বাংলা বর্ণমালা শিক্ষার প্রথম বই। কিন্তু না এই তথ্য সঠিক নয়। প্রথম প্রাইমার হল – *লিপিধারা* (১৮১৬)। ১৮৩৫ সালে উনিশ বছর পর ঈশ্বরচন্দ্র বসু প্রথম বাঙালি যিনি বাংলা ভাষার প্রাইমার লিখলেন। তাঁর প্রাইমারটির নাম – *শব্দসার।* বইটির বর্তমান অস্তিস্ব না থাকলেও লং সাহেব তাঁর তালিকায় লিখেছেন সেটি বর্ণমালা শিক্ষার বই। অর্থাৎ দেশীয় মানুষদের হাতে রচিত প্রথম প্রাইমার *শব্দসার*।

১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল আর একটিমাত্র প্রাইমার। নাম – *শিশুসেবধি*। এটি হিন্দু কলেজ পাঠশালাতে শিশুদের বর্ণ শিক্ষার জন্য লেখা হয়। *'শিশুসেবধি'* একটি সিরিজ। এর প্রথম লেখক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার জন্য ১৮৪০ সালে লেখা হয় *বর্ণমালা* (২ খণ্ড)। ১৮৪১ সালে ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি থেকে প্রকাশিত *জ্ঞানারুনোদয়* নামের একটি প্রাইমার। ১৮৪৬ সালে স্কুল বুক সোসাইটি নতুনভাবে বার করলেন *বর্ণমালার* দুটি খণ্ড।

বাংলা প্রাইমারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে ১৮৪৯ সালে। ঐ বছর প্রতিষ্ঠিত হয় বেথুনের ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল। স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় ১৫ জন বাঙালি তদের কন্যাদের স্কুলে পাঠিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কারও ছিলেন। তিনি সেখানে বিনা বেতনের শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা করেছেন আবার ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য গ্রন্থের অভাব মোচনের জন্য লিখেছেন শিশুশিক্ষা নামে বিখ্যাত প্রাইমার। এটিও একটি প্রাইমারের সিরিজ। মোট পাঁচ খণ্ডে রচিত এই প্রাইমারের প্রথম তিনটি খণ্ড লিখেছেন মদনমোহন (১৮৪৯, ১৮৫০, ১৮৫০), চতুর্থ খণ্ড লিখেছেন বিদ্যাসাগর (১৮৫১), পঞ্চম ভাগ লিখেছেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫১)। তৃতীয় ভাগের নাম *ঋজুপাঠ*, চতুর্থ ভাগের নাম *বোধোদয়* এবং পঞ্চম ভাগের নাম *নীতিবোধ*। শুধুমাত্র বালিকা বিদ্যালয় নয়, সকলের জন্যই *শিশুশিক্ষা* আদর্শশিক্ষা হতে পেরেছিল। এই পুস্তকেই প্রথম শিক্ষার্থীকে সমঝে দেওয়া হয় যে *'লেখাপড়া করে যেই।/ গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।'*

১৮৫০ – ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে বেশ কয়েকটি *বর্ণমালা* প্রকাশিত হয়। অজ্ঞাতনামা এই সব বর্ণমালা ছাপা হয়েছে সত্যার্ণব প্রেস, কবিতা রত্নাকর যন্ত্র, ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস প্রভৃতি জায়গা থেকে। এছাড়া বোমওয়েচ লিখেছেন *ধ্বনিধারা* (১৮৫৩), জে. ইয়ুল লিখেছেন *শিশুবোধোদয়* (১৮৫৪)।

১৮৪৯ সালের মতোই ১৮৫৫ সাল বাংলা প্রাইমারের আরএকটি মাইলফলক। সে বছর বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙালির মনের আশ মেটাতে বাজারে হাজির করলেন বর্ণপরিচয় – এর দুটি খণ্ড। লেখাবাহুল্য শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয় এই প্রাইমার দুটি জনপ্রিয়তায় এমন জায়গায় পৌঁছল যে পরবর্তীকালে এগুলি প্রাইমার রচনার আদর্শ হিসেবেই বাঙালি প্রাইমার লেখকদের কাছে অনুকরনীয় হয়ে উঠলো।

১৮৫৫ সালের পরবর্তী দশ বছর খান পঁচিশ বাংলা প্রাইমার বাজারে এসেছে। উল্লেখযোগ্য হল – সাতকড়ি দত্তের *প্রথমপাঠ* (১৮৬২), ও অন্য আরো তিনটি পাঠ।

১৮৬৬ – ১৮৭০ এই পাঁচ বছরে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, মথুরানাথ তর্করত্ন, মহঃ জুহুরুদ্দিন, হারানচন্দ্র রাহা,হীরালাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

১৮৭১ থেকে ১৮৭৫ সাল এই পাঁচ বছর বাংলা প্রাইমারের গতানুগতিকতার বছর। এই পাঁচ বছরে প্রায় ৫০ টির মতো প্রাইমার প্রকাশিত হয়েছে এবং পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ২৫ টি।[৩৮] তবে এই সব প্রাইমারে লেখকদের স্বকীয়তার কোনো ছাপ পাওয়া দুষ্কর; এগুলি মূলত মদনমোহন বা বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসারীণ এবং প্রধানত ব্যবসায়ী স্বার্থে রচিত।

১৮৭৬ – ১৮৮০ এই পাঁচ বছরে শিশুপাঠ্য বইয়ের ঢল নামে বাজারে। নতুন বই বেরই প্রায় ৭০ টি আর পুনর্মুদ্রিত বইয়ের সংখ্যা ৭৫ টি।[৩৯] উল্লেখযোগ্য লেখক অক্ষয়কুমার রায়, উদয়কৃষ্ণ দত্ত, উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, দুর্গাচরণ গুপ্ত, দ্বারকানাথ পাল, মদনমোহন সরকার, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী, রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরি, রামরূপ চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

এই পাঁচ বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বই *নব শিশুপাঠ* – ১। লেখক উদয়কৃষ্ণ দত্ত বইটিকে দৃষ্টি শোভন করে তোলবার জন্য একটি পৃষ্ঠায় একটিমাত্র বর্ণ বড়ো আকারে সাজিয়েছেন এবং দৃষ্টি শোভন করার জন্য বইয়ে অনেক পশুপাখির ছবি দিয়েছেন। শিশুদের মনোরঞ্জন করার আয়োজনটি লক্ষনীয়।

লক্ষ করবার বিষয় বিগত সববছর গুলির তুলনায় ১৮৮০ তে সর্বাধিক প্রাইমার ছাপা হয়েছে। সস্তা দামে বাজার ধরতে অনেকেই বিদ্যাসাগরের পথে হাঁটেন নি। আশিস খাস্তগীর লিখছেন আশির দশকে শ'দেড়েক প্রাইমার ছাপা হয়েছে। *শিশুশিক্ষা* ও *বর্ণপরিচয়*কে ভাঙিয়ে এই দুই বছর অনেকে ব্যবসাও করেছেন। ১৮৮৯ সালে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের হুবহু নকল করে বই বের করবার খবরের কথা জানা যায়। *অনুসন্ধান* পত্রিকায় ১২৯৬ সালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'জুয়াচোর গ্রন্থকারের' বর্ণনাসহ প্রতিবেদন বেরিয়েছিল –

> পাঁচ নং জুয়াচোর। শুনিতে পাই, দেখিতে পাই না। উদাহরণ, - শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় বহু সংখ্যক বিক্রিত হয়। জুয়াচোর গ্রন্থকারও বর্ণপরিচয় ছাপাইল।।[৪০]

উনিশ শতকের পাঠ্য পুস্তকের অনুকরণপ্রিয়তা ঠিক এমন জায়গাতেই পৌঁছেছিল। আর এই ধরণের অনুকরণে অবশ্য ব্যবসার মুনাফা ভালই হত।[৪১]

উনিশ শতকের আটের দশকে বাংলা প্রাইমারে বিশেষত্ব যোগ হল। এই প্রথম প্রাইমারের সঙ্গে চিত্রকে জুড়ে দেওয়া হল। এই পথের প্রথম পথিক সাতকড়ি দত্ত। তিনিই প্রথম ছয়ের দশকে সচিত্র প্রাইমারের নেতা। এরপর আটের দশকের সূচনায় উদয়কৃষ্ণ দত্তের *নবশিশুপাঠে* ছবির ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। বাদবাকি কুড়ি বছরে চিত্রময়তার আরো ব্যাপ্তি ঘটবে। এই সময় পরবে যেসকল বই আজারে আসে তাদের নামের সঙ্গে 'সচিত্র' শব্দটি লক্ষণীয়। যেমন – *সচিত্র শিশুশিক্ষা – ১, সচিত্র শিশুবোধ – ১, সচিত্র অক্ষরশিক্ষা – ১, সচিত্র প্রথম শিক্ষা, সচিত্র শিশু শিক্ষা – ১/২ সচিত্র হাতেখড়ি বর্ণবোধ, সচিত্র আদর্শলিপি ও ধারাপাত* প্রভৃতি। অর্থাৎ সহজেই অনুমান করা যায় বাংলা প্রাইমারের এই পর্বে চিত্রময়তার উপর বাঙালি অভিভাবকের বিশেষ মায়া পড়েছিল।

এই শতকের প্রাইমারগুলির অপর একটি বৈশিষ্ট্য খুব সহজেই চোখে পড়ে। তা হল এগুলির সঙ্গে সংযুক্ত 'সহজ' কিংবা 'সরল' শব্দটি। যেমন – রাখালদাস চক্রবর্তীর *সরল শিক্ষা,* মতিলাল দত্তের *সরল বর্ণশিক্ষা;* এছাড়াও অন্যান্য লেখকদের *সরল বর্ণবোধ, সহজ বর্ণপরিচয়, সরল বাল্যশিক্ষা, সহজ বাল্যশিক্ষা*। এমনকি বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *সহজপাঠ* তাও কার্যত এই আকর্ষণেরই ফল। আক্ষরিক অর্থ ধরে বিচার করলেই বোঝা যায় শিক্ষার্থীর প্রথম পাঠকে আরো সহজ ও সরল করার কাজেই নেমে পড়েছিলেন সেকালের প্রাইমার প্রণেতারা।

উনিশ শতকের শেষ দশকেও বাংলা প্রাইমার বেড়েছে একই হারে। 'দশ বছরে সোওয়া'শ'।[৪২] এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত প্রাইমারগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটিই তিন চারটি সংস্করণের মুখ দেখেছে। এই দশকের উল্লেখযোগ্য প্রাইমার লেখক হলেন - যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।

উনিশ শতকের শেষ দশকে (১৮৯১) সালে মারা যাচ্ছেন বিদ্যাসাগর। তাঁর মৃত্যুর আগেই বিস্ময়কর খবর হল ১৮৮৯ সালে পঞ্চান্ন বছরের মধ্যে *বর্ণপরিচয়ের* প্রথম ভাগ ১৫০ টি সংস্করণের মুখ দেখে ফেলেছে। ১৮৮৫ সালে ১৩৩ তম সংস্করণের পর থেকে *বর্ণপরিচয় – ১* পঞ্চাশ হাজার কপি করে ছাপা হয়েছে। যা বাংলা প্রাইমারের ইতিহাস দুর্ভেদ্য নজির। পাশাপাশি ১৮৯০ সালে *শিশুশিক্ষা – ১* এর ১৪৯ তম সংস্করণ, ৩ য় ভাগের ১৬০ তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তখন *শিশুশিক্ষা – ১* প্রতি সংস্করণে তিরিশ হাজার কপি করে মুদ্রিত হত। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর

শিশুশিক্ষার কপিরাইটের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় এবং এর পর থেকে বইটির জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উনিশ শতকের জনপ্রিয় প্রাইমার হিসেবে *বর্ণপরিচয়* ও *শিশুশিক্ষার* পাশাপাশি ছিল আরো দু একটি নাম। শিশুবোধক ও বাল্যশিক্ষা। শিশুবোধকের লেখকের নাম জানা যায় বিশ্বনাথ তর্কবাগীশ। বাল্যশিক্ষার প্রথম রচয়িতা রামসুন্দর বসাক। ১৮৮৭ সালে ১ আনা ৫ পাই দামের এই বইটি সুলভ প্রেস থেকে তিন হাজার কপি ছাপা হয়েছিল। ১৮৯৫ সালে এই বইটি ৬৩ তম সংস্করণে পৌঁছেছিল। মুদ্রণ সংখ্যা বাড়তে বাড়তে তখন পঁচিশ হাজার কপিতে পৌঁছেছিল। খুব সহজ ছিল না এই উত্তরণের পথ।

উনিশ শতকের বাংলা প্রাইমারের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল পুরুষকেন্দ্রিকতা। গত শতকের বিখ্যাত চিন্তক ও ফরাসি দার্শনিক জাক দেরিদার পরিভাষা ধার করে আমরা বলতে পারি 'ফ্যালাগোসেন্ট্রিজম' বা 'শিশ্নাক্ষরকেন্দ্রিকতাবাদ'।[৪৩] উনিশ শতকের প্রাইমারে বালকদের একাধিপত্য। 'শিশু' বলতে সেখানে বালকদেরই বোঝানো হত। তাই সেকালের প্রাইমারে বালিকাদের দেখা মেলা দুষ্কর ব্যাপার। উনিশ শতকের প্রাইমারে লিঙ্গ রাজনীতির এই প্রসঙ্গটি বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। আমরা স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে আলোচনা করবো। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে দুয়েকটি প্রাইমারের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যেখানে বালিকা বা স্ত্রীশিক্ষার নির্দেশ আছে। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয় অজ্ঞাত লেখকের *বালিকা বান্ধব।* ১৮৭৪ সালে ঢাকার গিরিশ প্রেস থেকে বেরিয়েছে অজ্ঞাত লেখকের *বালাবোধ* - ১। ১৮৭৯ সালে আর্মহার্স্ট স্ট্রিটের বাল্মীকি প্রেস ছাপিয়েছে দ্বারকানাথ বসুর *বালিকাশিক্ষা – ১।* এছাড়া বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী লিখেছেন *বালিকারঞ্জন – ১/২,* যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় *বালাবোধিনী,* সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী *বালিকাশিক্ষা – ১/২,* তারাকুমার কবিরত্ন *হিন্দু বালিকা শিক্ষা* প্রভৃতি।

বালিকাদের জন্য মহিলারাও প্রাইমার রচনা করেছেন। প্রতুল কুমারী দাসী লিখেছেন *বালিকা বোধিকা* (১৮৮৭), সরোজিনী দেবী লিখেছেন *বালিকা সোপান -১/২* (১৮৯৮), এছাড়া বালক ও বালিকাদের উভয়ের জন্য প্রাইমার রচনা করেছেন তিনজন মহিলা লেখক। ব্রহ্মময়ী রায় লিখেছেন *বর্ণবোধ – ১* (১৮৮৪), চারুবালা দেবীর *টুকটুকে বই* (১৯০০) এবং একমাত্র মুসলমান মহিলা লেখক হলিমন্নেষা খাতুন *সরল আদিশিক্ষা* (১৮৯৫)।

আপাতভাবে এই ছিল উনিশ শতকের প্রাইমারের উৎপত্তি ও বিকাশ পর্ব। দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাইমারেরও প্রসারমানতা তরান্বিত হয়েছে। শুরুতে বিদেশী লেখকরা প্রাইমারের হাতেখড়ি করলেও ধীরে ধীরে বাঙালি তা নিজের আওতায় এনেছেন এবং প্রাইমারকে নিয়ে উনিশ বিশ ও একুশ শতকেও ব্যাপক বাণিজ্য অব্যাহত থেকেছে। এই আলোচনা অংশে প্রাইমার রচনায় আর একটি ধারা; যেটি কার্যত ইসলামি লেখকদের হাতে শুরু হয়েছিল সেটি আমরা অনালোকিত রেখেছি সচেতনভাবে। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে মুসলমানি প্রাইমারের 'অপর' প্রাসঙ্গিক ধারাটিকে আমরা বিশ্লেষণ করবো।

৪. প্রাইমারের রাজনীতি:

প্রাইমার হল শিশু শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষণ গ্রন্থ। কিন্তু প্রাইমারের রাজনীতি বলতে আমরা কী বুঝবো এ'কথাটি আলোচনা সাপেক্ষ। রাজনীতি বলতে এখানে কোনো রাজনৈতিক দলের মতবাদ বা রাষ্ট্রের ও সরকারের সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টির সম্পর্ককে আমরা বুঝবো না। আধুনিক সমালোচনাতত্ত্বে বা সাংস্কৃতিক তত্ত্বালোচনায় রাজনীতি বলতে বোঝায় ক্ষমতা ব্যবহার, ক্ষমতা গঠন, ক্ষমতা অর্জনের পদ্ধতি, ক্ষমতা সংরক্ষণের উপায়, ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে কেমন করে সম্পর্ক তৈরি হয় মানুষে মানুষে, মানুষ ও প্রতিষ্ঠানে। কেমন করে মানুষের সমস্ত কর্মই ক্ষমতা অর্জন ও ব্যবহারের পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ইত্যাদি।[৪৪] প্রাইমার আদতে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ হলেও এর পরতে পরতে লুকিয়ে আছে ক্ষমতার ঘ্রাণ, আনুগত্য লাভ ও আধিপত্য কায়েমের সূক্ষ্ম বয়ান। 'স্কুল' নামক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা ব্যবস্থার জাঁতাকলে মানুষ তৈরির অদৃশ্য অস্ত্র বহন করে এই প্রাইমারগুলি। শৈশবেই শিক্ষার্থীকে সমঝে দেওয়া হয় কী তার করণীয় আর কী বা তার করা অনুচিত। ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের ছড়ি হাতে বসে প্রাইমার শিক্ষার্থীকে সর্বদা শাসিয়েই যায়। স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ক্ষমতা কাঠামোর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের তালিম দিয়ে শিশুকে গোপাল নামক সুবোধ প্রজাতিতে পরিণত করা হয়। গোপালদের অন্যান্য সম্ভাব্যতাকে খারিজ করে কেবলমাত্র দুধে ভাতে সুখী ভীতু নাগরিক হয়ে উঠতে সাহায্য করে প্রাইমারগুলি। কী হবে শিশুর আচরণ তার চাবিকাঠি হাতে নিয়ে তাকে পরিচালনার দায়িত্ব নেয় প্রাইমার। সেদিক থেকে ক্ষমতা ও শাসনতান্ত্রিকতার (Governmentality) বাইরে রাখা যায় না প্রাইমারগুলিকে।

মিশেল ফুকো তাঁর বিভিন্ন লেখায় 'governmentality'র সংজ্ঞা দিয়েছেন – 'Conduct of conduct' বলে; বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে 'আচরণের পরিচালনা'। অর্থাৎ গভর্নমেন্ট বলতে আমরা এমন এক কার্য প্রণালী বোঝাই যার উদ্দেশ্য হল মানুষের আচরণকে গড়ে পিঠে নেওয়া,

তাকে পরিচালনা ও প্রভাবিত করা। ফুকো বলবেন এই কার্যপ্রণালীর ক্ষেত্র বিস্তৃত - তা সেল্‌ফ বা আত্মনের সঙ্গে আত্মনের সম্পর্ক নিয়ে হতে পারে, প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত জীবনের নিয়ন্ত্রন নিয়ে হতে পারে, সর্বোপরি রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে।[৪৫] প্রাইমারের ক্ষেত্রে আমরা কার্যত শিশুর আচরণ গড়ে পিঠে নেবার প্রচেষ্টা লক্ষ করি এবং তা অনেকাংশেই রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কাজে কাজেই প্রাইমারের সঙ্গে রাজনীতির পারস্পরিকতাকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না।

এদেশে প্রাইমার রচনার ভিত যখন গড়ে তোলা হচ্ছে ততদিনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের ভিত বেশ পোক্ত হয়ে গিয়েছে, শুধুমাত্র ইমারতকে আরো দৃঢ় ও চিরস্থায়ী করার প্রক্রিয়া চলছে। সাম্রাজ্যের ইমারতকে স্থায়িত্ব দেবার জন্য সরকারকে তখন নিতে হয়েছিল নানা রকম নীতি বা পলিসি। যেগুলির মধ্যে শিক্ষা একটি অন্যতম। উনিশ শতকে অনুসৃত এই শিক্ষার চরিত্রই হল ঔপনিবেশিক শাসন পরিচালনার উপযোগী ও তাকে সুনিশ্চিত করবার মতো নাগরিক গড়ে তোলা। দেশজ শিক্ষা নয়; সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ নতুন আমদানি – পাশ্চাত্য শিক্ষা। তার রীতি, নীতি, পঠন – পাঠন কৌশল আগের থেকে নিশ্চয় আলাদা। প্রাচীনকালে ভারতের বিদ্যাশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল পারলৌকিক সুখ আর আধুনিক যুগের এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে গাড়ি-ঘোড়া চড়া - ইহজাগতিক সুখকে উপভোগ করা। ঔপনিবেশিক সময়ে চাকরি ভক্তির মধ্যে দিয়ে বাঙালির নতুন সত্তা কাঠামো নির্মাণের প্রচেষ্টা চললো। কলিযুগে এই চাকরি ভক্তি সৃষ্টিতে প্রাইমারগুলির অবদান কোনো অনহশে কম নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত বলেছিলেন – 'মন ! মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই; টাঁকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে।' বুঝতেই পারছি কমলাকান্তের এই মন উপনিবেশর কালো ছায়া পুরোপুরি ছেয়ে গেছে। কমলাকান্তের এই টাকামুখো ঔপনিবেশিক মনের সঙ্গে উনিশ শতকের মানুষের মনের কোনো ফারাক তো নেইই বরঞ্চ মিল বেশি। বিনয় ঘোষ তাঁর 'টাকা আর মন'[৪৬] প্রবন্ধে এবং সুমিত সরকার তার 'কলিজুগ চাকরি ভক্তি : রামকৃষ্ণ ও তাঁর সময়' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু টাকার প্রতি শুধু মন থাকলেই তো আর হবে না; দরকার টাকা রোজগারের কৌশল আয়ত্ত করা। উনিশ শতকের বাংলা প্রাইমার সেই কৌশলও বাতলে দিয়েছে। চিনিয়ে দিয়েছে অর্থ উপার্জনের ভদ্রস্থ পথ –

শিশুশিক্ষা :

১। সদা মন দিয়া পড়িবে; তাহা হইলে শেষে খুব সুখে থাকিবে।

২। লেখাপড়া করে যেই।

গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।।

লেখাপড়া যেই জানে।

সব লোকে তারে মানে।।

বাল্যশিক্ষা :

১। বিদ্যা অমূল্য ধন। বাল্যে বিদ্যাভ্যাস করিবে।...

২। দ্যাখো জগদীশ কেমন লেখাপড়া শিখিয়াছে। লেখাপড়ার গুণেই জগদীশ বড়োলোক হইয়াছে। এখন জগদীশ গাড়ি, ঘোড়া, ছড়িতেছে; কত লোকের উপকার করিতেছে। এখন তাহার কতই মান কতই আদর। দ্যাখো সুরেশ, লেখা পড়ায় কেমন গুণ। যদি মন দিয়া লেখাপড়া শেখো তবে তুমিও জগদীশের মতো বড়োলোক হইতে পারিবে।

হাসিখুশি :

১। বাপ ধন-ধন-ধনা

পুঁথি হাতে পড়বে মাণিক,

দুলবে কানে সোনা...

অর্থাৎ বিদ্যা অর্থের হাত ধরাধরি করে চলেছে। আমরা যদি প্রাইমারের এই সমস্ত বয়ানের সঙ্গে সেকালের কিছু প্রবাদ প্রবচনের সাদৃশ্য সন্ধান করি তাহলে স্পষ্ট হবে যে সেকালের জনচেতনায় 'টাকা পয়সার' প্রতি মানুষের আকর্ষণের জায়গাটি।

১। অবু তবু গিরি সুত

মায় বলে পড় পুত

পড়িলে শুনিলে দুধিভাতি

না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি। (নববাবু বিলাস)

২। মূর্খ ধমকায় পণ্ডিতেরে

যদি কড়ি থাকে।

নির্ধনের সত্য কথা

মিথ্যা হেন লাগে।।

৩। লেখাপড়া কাঁচকলা,

তবু তো টাকাওয়ালা।[৪৭]

অর্থ উপার্জন করলে মান্য হওয়া যায়, টাকা পয়সার মুখ দেখা যায়; শিক্ষার সঙ্গে এই সহজ বুদ্ধিটা পৌঁছে দিয়ে শিক্ষাকে সকলের দরবারে পৌঁছে দেবার তাগিদ লক্ষ করা গেল। সকলের বলার চাইতে বলা ভালো সেই বিশেষ শ্রেণিটির দরবারে যারা সরকার ও প্রশাসন চালাতে সহযোগিতা করবেন।

১৬৯৩ সালে লকের লেখা একটি বই প্রকাশিত হয়। নাম *Thoughts on Education.* শিশুদের চরিত্র গঠন ও আচার আচরণকেই সেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ তাঁর মতে একান্ত জরুরী। কারণ চরিত্রগঠন নিয়ে কোনোরকম টালবাহানা করতে তিনি অনিচ্ছুক। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল যৌন বাসনা ও ক্রোধ, দুঃখ ইত্যাদিকে ইচ্ছাধীন রাখা। আমরা যদি আমাদের দেশে প্রচলিত প্রাইমারের দিকে নজর রাখি তাহলে লক্ষ করবো যে সেখানেও কার্যত শিশুকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। তিথি ভট্টাচার্য তাঁর *Sentinels of culture : Class, Education, and the Colonial Intellectual in Bengal* গ্রন্থে ঔপনিবেশিক আমলে সংস্কৃতির প্রহরী হিসেবে সেকালের শিক্ষা ও বুদ্ধিচর্চার পরিসরকে আলোচনা করেছেন।[৪৮] আমাদের মনে হয়েছে এই সমস্ত প্রাইমারগুলি সেকালে এবং একালে শিশু শিক্ষার্থীর চেতনায় এক অদৃশ্য প্রহরীর মতোই কাজ করে যায় এবং এই প্রাইমারের মধ্যে দিয়েই লেখক তাঁর কাঙ্ক্ষিত জীবন ও মূল্যবোধকে প্রবিষ্ট করেন পাঠকের চিত্তে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৪২১ সংখ্যায় ইংরাজিতে লেখা 'যুক্তিযুক্ত অতি উৎকৃষ্ট' দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ 'অত্যন্ত আদরের' সঙ্গে ছাপা হয়েছিল। লেখকের নাম ছিল – 'এ ইয়াং হিন্দু' অর্থাৎ জনৈক হিন্দু। সেখানে লেখকের মৌল প্রতিপাদ্য ছিল –

ভারতের উপর ইংল্যান্ডের ন্যায়সংগত দাবিকে ভারতীয়রা যদি সর্বান্তকরণে মেনে না নেয় তাহলে দেশের জাতীয় জীবনে বিরাট ভাঙন ঘটবে; বাকসর্বস্ব বাঙালি বাবুরা যদি স্বাধীনতার ধুয়ো তুলে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করেন তাহলে অবশ্যম্ভাবী সেই ভাঙন। সময় মতো সাবধান না হলে অপরিণামদর্শী বাবুদের বাচালতা ও বাতুলতা ভারতকে এক সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেবে; কেননা; ক্ষমাশীল ইংল্যান্ডেরও ধৈর্যের সীমা আছে। অশক্তের পক্ষে শক্তিমানকে অপমানের পরিণাম যে কতখানি মারাত্মক হতে পারে ইতিহাসে তার অনেক নিদর্শন আছে। ভারতীয়রা যদি তাদের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে অকারণ অন্তরায় খাড়া করে, তাহলে ডোডো পাখির মতো বিলুপ্ত প্রাণীদের

কোঠাভুক্ত হতে তাদের খুব বেশি বিলম্ব হবে না। স্বাধীনতার যোগ্যতা অর্জন না করে স্বাধীনতাহীনতা নিয়ে আক্ষেপ করা একপ্রকারের নববাবুবিলাস – সে মূঢ়তা ঘুচিয়ে উদারমনস্ক ইংল্যান্ড থেকে খোলা মনে আধুনিকতার পাঠ নেওয়া উচিত।[৪৯]

জনৈক এই হিন্দু যুবার চোখে ভারতীয়রা 'অশক্ত', 'অপরিণামদর্শী', 'মূঢ়' 'বাচাল' ও 'বাতুল'। আর অন্যদিকে ইংরেজ 'প্রবল প্রাতাপশালী' 'ধৈর্যশীল' ও 'ক্ষমাপরায়ন' 'ন্যায়ের প্রতিভূ'। ইংরাজ তার নিজস্ব স্বভাব গুণে যেন প্রভু সত্তার অধিকারী আর কীটানুকীট ভারতীয়রা তাদের অনুগত ভৃত্য ছাড়া আর কিছু হওয়ার যোগ্য নয়। উনিশ শতকের এই শিক্ষিত হিন্দু যুবা তাঁর প্রবন্ধে যে দাবি উপস্থাপন করেছেন সে দাবি তাঁরও বহু বছর আগে বাঙালি শিশু পাঠকের বইয়ের পাতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

শিশুশিক্ষা (২) নির্বাচিত কিছু অংশ থেকে তার নমুনা দেওয়া গেল –

পরের গ্লানি করা বড় দোষ।

অসতের দুর্নাম ভয় নাই।

মূঢ়ের দিগ্বিদিক্ বোধ নাই।

দুর্ব্বলের বৃথা রোষ।

যথার্থ মিত্র অতি দুর্লভ।

অনুচিত প্রশ্ন করা অনুচিত।

মানি/মানীর অপমান শিরশ্ছেদনতুল্য।

কাহারও উপর খড়্গহস্ত হইও না।

আপন কাজে সত্বর হও।

রাজার রাজস্ব অবশ্য দেয়।

নির্ধনের আদর নাই।

আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই।

সকল বাঞ্ছা সফল হয় না। (নজরটান সংযোজিত)

নজরটান অংশ লক্ষণীয় এই কারণে যে এই সমস্ত পঙক্তির মধ্যে দিয়ে উপনিবেশের শিশুর কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বেশ কিছু বার্তা। এই সকল বার্তা সমকালের শাসক ও প্রজার সম্পর্ক কাঠামো নির্ধারণে যথেষ্ট। জনৈক হিন্দু যুবার মনের কথার সঙ্গে এই কথাগুলির স্পষ্টতই একটা যোগসাজশ আমরা খুঁজে বের করতে পারি। *রাজার রাজস্ব অবশ্য দেয়* - রাজার (ইংরেজ) প্রতি দায়িত্বসচেতনতা। মানীর অপমান শিরশ্ছেদনতুল্য – এখানে মানী হলেন ইংরেজ। তাঁর প্রতি অপমান গ্রাহ্য শুধু নয়, দণ্ডনীয় অপরাধ। এখানেই শেষ নয়; মদনমোহনের প্রাইমারে দাসত্যসূচক সবচেয়ে নির্লজ্জ আত্মঘোষণাও শোনা যাবে।

পাকা পান টাকা দান

বার মাস তার দাস

বার মাস কার দাস? একথা স্পষ্ট বলা নেই। পাকা পান আর টাকা দান করবে কাকে? এই সওয়ালেরও যোগ্য কোনো উত্তর নেই কিন্তু আমরা কি বুঝে নিতে পারি না একথা শাসকের উদ্দেশ্যে। যে মদনমোহন তাঁর বইয়ের সূচনা অংশে মহামনিব 'মহানুভব' বেথুনকে উদ্দেশ্য করে লেখেন –

> আপনি শিক্ষাসমাজের কর্তৃত্বভাবর গ্রহণ করিয়া আস্মদ্দেশস্থ লোকের বিদ্যা, বিষয়, আপনকার, শীল, সুনীতি সম্পাদনার্থে যেরূপ আন্তরিক যত্ন ও অশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, বিশেষতঃ এতদ্দেশের হতভাগ্য নারীগণের দুরবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া অজ্ঞানন্ধকূপ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার মানসে যে অশেষ প্রয়াস পাইতেছেন, আমি আপনকার সেই সমস্ত বিশুদ্ধ গুণে হইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আপনকার সুপ্রতিষ্ঠিত নাম সংযোজন সাহসে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে যদি আমি অনুযোজ্য হই, ভাবিয়াছি, আপনকার মহানুভব স্বভাব ও অলোকসামান্য গুণগ্রাম আমার পক্ষে সপক্ষতা করিবেক সন্দেহ নাই।[৫০]

এই প্রেক্ষিতে ইংরেজ প্রভুর প্রতি মদনমোহনের আনুগত্য সম্পর্কেও আমদের কোনো সন্দেহ নেই। মদনমোহন জানেন ইংরেজ শাসক মহানুভব ও দয়ার্দ্রচিত্ত; তাই তাঁর প্রতি অনুগত থাকাই উচিত; স্বাভাবিক। ইংরেজ বিশুদ্ধ গুণে অন্বিত তাই তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। মনিবের প্রতি এই কৃতজ্ঞতা থেকেই কি মদনমোহন তাঁর প্রাইমারের প্রথম খণ্ডেই লিখে ফেলেন *'বার মাস তার দাস'* অথবা *'রাজার রাজস্ব অবশ্য দেয়'* কিংবা *'মানীর অপমান শিরশ্ছেদনতুল্য'*? এখানে কি ক্ষমতা সম্পর্কের একটা বুনোট কাজ করছে না? যেখানে প্রভু – ভৃত্য সম্পর্ক কাঠামোর প্রভুর প্রবল নীতিবোধগুলি উলটে দিয়ে ভৃত্য গভীরতর করছে অপেক্ষাকৃত স্বশাসিত তাত্ত্বিক আয়তনকে।

নীৎশে তাঁর *জিনিওলজি অফ মরালস* – এ এই কথাকেই তো বাইরে এনেছিলেন। দেখিয়েছিলেন প্রভু শাসিত বিশ্বে ভৃত্য কীভাবে খুঁজে নিতে পারে অপেক্ষাকৃত স্বশাসিত তাত্ত্বিক আয়তন।[৫১] এটাকে আমরা অবশ্যই একধরণের 'হেজিমনি' বলবো। এবং যেহেতু এই হেজিমনি সরাসরি শাসকের কাছ থেকে আসছে না তার বদলে আসছে দেশীয় কোনো বুদ্ধিজীবীর হাতফেরতা হয়ে তাই একে হেজমনি না বলে *সিন্থেটিক হেজিমনি* বলা সঙ্গত।[৫২]

উপনিবেশের প্রেক্ষিতে যদি আমরা হেজিমনি ও বাংলা প্রাইমারকে দেখি তবে প্রাইমারের সঙ্গে তার রাজনৈতিক অভিসন্ধিগুলিকে খুব সহজেই চিহ্নিত করতে পারবো।

উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শাসনের পরিসরে ইংরেজ হল প্রভু আর দেশীয়রা হলেন ভৃত্য। প্রভু এবং ভৃত্য নিজেদের সম্পর্কিত করে ক্ষমতার ভাষায় প্রভুত্ব আর অধীনতায়। উনিশ শতকের প্রাইমারের পরতে পরতে প্রভু ও ভৃত্যের ভাষার বুনোট স্পষ্ট লক্ষণীয়। অজিত চৌধুরী তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে দেখাতে চেয়েছেন উপনিবেশের পরিবেশে শাসক সম্মতি আদায়ের নীতিগুলি বাইরে থেকে চাপায় এবং একটি সমসত্ত্ব জমি তৈরি করে। এক্ষেত্রে বাইরে থেকে সম্মতি আদায়ের জমি তৈরি করেছে প্রাইমার সমূহ। চৌধুরী একথাও বলেছেন যে 'সম্মতি আদায়ের নিয়মগুলো আসে বিভিন্ন বিরোধ দ্বারা অতিনির্ধারিত কোন সাংস্কৃতিক আয়তন (বয়ানজমি)-এর নির্মাণ থেকে, এই জন্যই তারা সতত পরিবর্তনশীল।'[৩২] লেখাবাহুল্য আমাদের আলোচনায় সাংস্কৃতিক সেই আয়তন বা বয়ানজমি অবশ্যই প্রাইমারগুলি এবং এও সত্য যে সময়ে সময়ে সে তার বয়ান পরিবর্তনও করেছে।

আসলে ঔপনিবেশিক শাসককে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য দরকার হয় এক সিন্থেটিক সাংস্কৃতিক আয়তন নির্মাণ যাতে সম্মতি আদায় ও সহযোগিতার নীতি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলা হবে। বাংলায় বিদ্যাসাগরের প্রাইমারের গোপালরা ঔপনিবেশিক শিক্ষায় প্রতিপালিত সুখী প্রজা, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের প্রাইমারের শিশু গাড়ি ঘোড়া চড়ার সুযোগ পায় একারণেই যে সে লেখাপড়া শেখে। অর্থাৎ শাসক যার থেকে সম্মতি আদায় করতে পারবেন, তিনিই সরকারের সহযোগ পাবেন - সুখ ও ঐশ্বর্যের সন্ধান পাবেন এই তত্ত্বটি কি এখানে স্পষ্ট নয়?

সম্মতি আদায়ের এই খেলায় প্রভুকে সর্বদা সক্রিয় থাকতে হয় তার দায়িত্ব সম্পর্কে। উচ্চবর্গের সম্মতি আদায় যদি নিম্নবর্গের সহযোগিতা টানতে ব্যর্থ হয় তবে তাকে জানতে হয় নিশ্চয় নিম্নবর্গের চেতনায় তার প্রতিবিম্ব তৈরি হয় নি। প্রভুর ভাষা বুঝতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। প্রভু তখন ভৃত্যের ভাষা, রীতি – নীতি টোটেম শেখে, বিকৃত করে, এবং নিজের সম্মতি আদায়ের নিয়ম বোঝাবার

জন্য তা থেকে তৈরি করে নতুন রীতিনীতি। ভৃত্য নতুন এক ভাষা বলতে শুরু করে – তার প্রভুর ভাষা – না জেনেই। নিজের বাসভূমিতে ভৃত্য ধীরে ধীরে উদ্‌বাস্তু হয়ে যায়।[৫৩]

বাংলা প্রাইমার রচনার সূচনালগ্নে শাসক আপন প্রচেষ্টায় ভৃত্যের ভাষা আয়ত্ত করা, নীতি উপদেশ ও আনুগত্য সহযোগে তার পুনর্নির্মাণ কোনোটা করতেই বিলম্ব করেনি। এবং পরবর্তীকালে এই পথেই ঔপনিবেশিক হেজিমনির সন্তানরা (দেশীয়রা) নতুন ভাষা বলতে শুরু করেছেন - শিশু শিক্ষার্থীকে সবদিক থেকে বেড়ি পরিয়ে শৃঙ্খলিত করার ভাষা আয়ত্ত করেছেন তাঁরা।

এখন প্রশ্ন হল আমাদের প্রকল্পিত ইসলামি প্রাইমারগুলিতেও কি প্রভু-ভৃত্য, শাসক-শাসিতের সম্পর্কের বিন্যাস পরিলক্ষিত হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে চাই, নিশ্চিতভাবে তাইই হবে। এখানে কে প্রভু আর কে ভৃত্য? কে শাসক কে শাসিত? তার সহজ জবাব কোরান হাদিসপ্রাজ্ঞ মোল্লাতন্ত্র এই প্রাইমারগুলির প্রভু – সমাজের চালক। আর তাঁদের নির্দেশ ও আনুগত্যবহনকারী হলেন সাধারণ মানুষ। ধর্মীয় নির্দেশ, আদেশ ও উপদেশের ঘেরাটোপে এঁরা মানব জীবনকে স্বহস্তে শাসন করারও দায়িত্ব পালন করে থাকেন। যে সমস্ত নির্দেশ ও আদেশের কথা আমাদের নির্বাচিত প্রাইমারগুলিতে আমরা লক্ষ করবো। এক্ষেত্রেও 'সিনথেটিক হেজিমনি' প্রযুক্ত হয়েছে ব্যাপকভাবে। কোরান ও হাদিসে বর্ণিত বিদেশী জীবন বিশেষত আরব পারস্যের মুসলমানের জীবন কাঠামোর ছকে ফেলে এদেশের শিশুর জীবন গড়ে তোলার তালিমও দেওয়া হয়েছে এই প্রাইমারগুলিতে এবং সেক্ষেত্রে জীবন গঠনের (অস্যার্থে শাসনের) পরামর্শগুলি কেবল শাস্ত্রীয় বিধি থেকেই গৃহীত হয়নি। বরং দেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ মুসলমান লেখক বুদ্ধিজীবী, মৌলবি কিংবা মৌলবাদী একটি গোষ্ঠীর মস্তিষ্ক থেকে তা নির্মিত হয়েছে। ফলে দেশীয় লেখকের হাতফেরতা এই প্রাইমারগুলি একটা 'সিনথেটিক হেজিমনি'ই গড়ে তুলেছে।

এই পর্বের পরিসমাপ্তিতে এসে আমরা বলতে চাইব বাঙালি লেখকদের প্রাইমারে গড়ে ওঠা যে হেজিমনি তা যেমন প্রত্যক্ষ বা সরাসরি প্রযুক্ত ব্রিটিশ হেজিমনি নয়, তেমনই মুসলমান লেখকদের হাতে রচিত ইসলামি বাংলা প্রাইমারগুলিতে প্রযুক্ত হেজিমনিও আরবীয় হেজিমনি নয়, তা আসলে একপ্রকার সিন্থেটিক হেজিমনি। কেননা তার অবয়ব রচিত হয়েছে দেশীয়দের হাতে। উনিশ ও বিশ কিংবা একুশ শতকের প্রাইমার অনেকাংশ জুড়ে প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব ফলাবার ময়দান। সেখানে লেখক শাসকের পক্ষেই বয়ান রচনা করেন এবং শিশুকে তাঁর আনুগত্য স্বীকার ও সহ্য করবার তালিম দিতে থাকেন।

আমরা বলতে চাই, প্রাইমারগুলিতে যেখানে শাসক কিংবা ধর্মীয় ক্ষমতাতন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি কল্পনায় কাউন্টার হেজিমনি গড়ে তুলে প্রভুর কর্তব্য, তার অর্ধসত্য (অতিকথা, বিজ্ঞান ও রূপক) – এর মুখোশ খুলে দেওয়া যেত অর্থাৎ শিশুপাঠকের চিত্তে সত্যানুসন্ধানী বিজ্ঞান বোধ জাগ্রত করে ক্ষমতা কাঠামোকে বিরোধিতা করবার সাহস জোগানো যেত এবং গোপানে জারি রাখতে পারতো কোনো এক অদৃশ্য যুদ্ধ; বাংলা ভাষার প্রাইমারগুলিতে আমরা তা দেখি না। হিন্দু বাঙালির হাতে রচিত মূল ধারার প্রাইমার এবং ইসলামি বাংলা প্রাইমার সর্বক্ষেত্রেই দেখি শিশুকে ক্ষমতাতন্ত্র ও ব্যবস্থার অনুকূলে *প্রশিক্ষিত ভৃত্য* হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। 'ফার্স্ট বয়দের দেশে' তাঁদের মেধা বা মেরিটকে গুরুত্ব দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে মেধাতন্ত্র (মেরিটোক্র্যাসি)। প্রাইমারগুলি বৃহৎক্ষেত্র জুড়ে সেই মেধাতন্ত্ররই আরাধনা করে এবং নতুন নতুন সংস্করণে গোপাল রফিক ও রমজানদের সৃজন করে। সেই মেধা হতে পারে পুঁথি নির্ভর, আবার হতে পারে ধর্ম নির্ভর। যাইহোক না কেন তাঁদের হাতেই আরোপিত হয় সমাজের, সম্প্রদায়ের ও দেশের শাসনদণ্ড এবং যুগ যুগ ধরেই তাঁরা নিজেদের শাসকশ্রেণির[৫৪] আসনটিকেও পাকা করবার প্রয়াস জারি রাখেন।

২.০০. উনিশ - বিশ – একুশ শতকের ইসলামি বাংলা প্রাইমার

আমাদের প্রস্তাবিত গবেষণায় আমরা বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা এবং মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে দুটি আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চেয়েছি। বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ সর্বজনীন শিক্ষার বাহন হলেও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ধর্মের পরোক্ষ প্রভাব থেকেই গেছে। সরকারি অনুমোদিত ও অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলিতেও বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রম কিছুটা গৃহীত হলেও তার কাঠামোর ভেতরেও ধর্মীয় অনুসঙ্গ এবং ইসলামের ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা আছে। বিশেষত এই বাংলার খারিজি মাদ্রাসা - যেগুলি মূলত সরকারি অনুমোদন ও অনুদানের বাইরে সেগুলি বিদ্যালয় শিক্ষার সমান্তরালে বিকল্প আরেকটি শিক্ষা কাঠামো গড়ে তুলেছে। খারিজি মাদ্রাসা ছাড়াও বর্তমানে বাংলায় মুসলমান পরিচালিত অসংখ্য আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মিশন স্কুল) গড়ে উঠেছে। নিঃসন্দেহে এই সমস্ত বেসরকারি মিশন স্কুলের উদ্যোগ শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতি দান করবে। কিন্তু মাদ্রাসাগুলিতে যেমন ধর্মীয় শিক্ষার জন্য বিশেষ ধরণের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে তেমনই গোড়া থেকে শিক্ষার্থীর ধর্মীয় পরিচিতি (আইডেনটিটি)কে মজবুত করার লক্ষ্যে পৃথক প্রাইমার প্রণীত হয়েছে। আবার এই সমস্ত প্রাইমারের প্রধান অভিপ্রায় হল ধর্মীয় মূল্যবোধ গড়ে তোলা এবং ইসলামের ভিত্তিকে আরো পোক্ত করা। লক্ষ করবার বিষয় উপরোক্ত প্রাইমারগুলি

শুধুমাত্র মাদ্রাসার চৌহদ্দির মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ নেই; ক্রমে ক্রমে তা মুসলমান পরিচালিত মিশন স্কুল, কিন্ডার গার্টেন স্কুল ও পারিবারিক শিক্ষায়তনিক পরিসরে জায়গা করে নিয়েছে।

উনিশ শতকেই প্রচলিত বাংলা প্রাইমারের বিকল্প হিসেবে গড়ে উঠেছিল ইসলামি বাংলা প্রাইমার। প্রচলিত বাংলা প্রাইমার যেখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিশুশিক্ষার পাশাপাশি হিন্দু এবং খ্রিষ্ট ধর্মের মহাত্ম্য প্রচারে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিল ইসলামি বাংলা প্রাইমার সেখানে অশ্রুত ও অবরুদ্ধ আরেকটি সমাজের কথা আমাদের সামনে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হয়েছিল। সেদিক থেকে বিরুদ্ধ স্বরের প্রতিনিধি হিসেবে ঐ সমস্ত বাংলা প্রাইমার রচনার উদ্দেশ্য ও অভিমুখ অনুসন্ধান বিশেষ চর্চার বিষয় হতে পারে। আমাদের মনে হয় ক্ষুদ্র অবয়বে রচিত ঐ সমস্ত শিশুপাঠ্য পুস্তকের শিক্ষাগত, ব্যবহারিক মূল্যের পাশাপাশি বিশেষ সামাজিক, ধর্মীয় মূল্যও আছে। অর্থাৎ কোনো একটি বিশেষ সমাজের বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত প্রাইমারের ভেতরে থেকে যায় ঐ সমাজের অজানা, অচেনা এবং অশ্রুত আখ্যান সমূহ; ধরা পড়ে ঐ সমাজের অভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং সমাজ নির্মাণের ইতিবৃত্ত। তাই বাংলা ভাষায় রচিত ইসলামি প্রাইমারগুলির মধ্যে আমরা বাংলার মুসলমান সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামাজিক অবস্থান, সাংস্কৃতিক রুচি, তাঁদের জীবন চেতনা, জাতি চিন্তা, লিঙ্গ চেতনা, এবং অবশ্যই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অস্মিতা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি।

উনিশ শতকের সাতের দশকে প্রচলিত বাংলা প্রাইমারের বিপরীতে বিকল্প স্বর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল মুসলমানের বাংলা প্রাইমার। অধ্যাপক গবেষক আশিস খাস্তগীর তাঁর *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫)* গ্রন্থে উনিশ শতকের কয়েকজন মুসলমান প্রাইমার লেখকের সন্ধানও দিয়েছেন জাতীয় গ্রন্থাগারের তালিকা অনুসন্ধান করে।

এই পর্যন্ত যতদূর জানা যাচ্ছে মুসলমানদের রচিত উক্ত প্রাইমারগুলির বর্তমানে আর কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। বোঝাই যায় জনপ্রিয়তার নিরিখে *শিশুসেবধি* কিংবা *শিশুশিক্ষা, বর্ণপরিচয়, বর্ণমালা, শিশুবোধক* প্রভৃতি প্রাইমারের কাছে এগুলির ভূমিকা কতটা নগন্য ছিল।

সংক্ষেপে বললে এই সমস্ত প্রাইমারের শিখনীয় বিষয় ছিল -

(১) স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ, বানান, ফলা, যুক্তাক্ষর, ত্র্যক্ষর চত্বরাক্ষর

(২) ভূগোল, ইতিহাস, নীতিকথা

(৩) উপাধি পদ্ধতির সঙ্গে মানুষের নাম। যেমন – কর্মকার, গন্ধকার, নাপিত, মোদক, গন্ধকার ইত্যাদি

(৪) বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, মাস , রাশি ,কাল নির্ণয়, ঋতু বর্ণন

(৫) বানানের নিয়ম ইত্যাদি।

লক্ষণীয় বিষয় বার তিথি রাশি প্রভৃতি বিষয় নির্ধারণে যেমন হিন্দু শাস্ত্র ও আচারের প্রভাব থাকত তেমনভাবেই নীতিশিক্ষা ও ধর্মবোধ জাগিয়ে তুলতেও হিন্দুত্বই ছিল 'একমেবঃ অদ্বিতীয়ম'। যেমন 'শিশুজ্ঞান চরিত্র' থেকে প্রাথমিক ও নৈতিক শিক্ষার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় – বাবা ও মা, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব এবং বড়ো ভাইকে ভক্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ব্রাহ্মণকে দেখে নমস্কার না করলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুর অংশ সুতরাং তাদের আশীর্বাদে কল্যাণ হয়। অর্থাৎ উনিশ শতকে প্রাইমারের এই প্রাঙ্গণটি সেক্যুলার কোনো সামাজিক প্রস্থান গড়ে তোলে নি। এমনকি লক্ষ করবার বিষয় বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্যান্য প্রাইমার লেখকদের অপেক্ষা মুক্তবুদ্ধি ও 'সেক্যুলার' হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রাইমারে গোপাল – রাখাল – গিরিশ – যাদবদের বিপ্রতীপে কোনো রহিম – করিম – মহিমরা আসেননি। স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক ও ভাবরাজ্যের দুনিয়ায় হিন্দুত্বের অংশীদার এই সকল প্রাইমারের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল সমকালীন হিন্দু বাঙালি সমাজে।

জ্ঞানরাজ্যের এই প্রচলিত কাঠামোর বিপ্রতীপেই মুসলমানের বাংলা প্রাইমারের আবির্ভাব। আমাদের মনে হয় প্রচলিত বয়ানের বিপরীত মেরুতে বিকল্প আর একটি বয়ান নির্মানে এই সমস্ত শিশুপাঠ্য গ্রন্থগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

উনিশ শতকের শেষার্ধে যে প্রচেষ্টার ছিল সূচনা বিশ শতকের গোটাটা জুড়ে সেই প্রাইমারের বিকাশ পর্ব সূচিত হয়েছে। আবার বিশ শতকের শেষ দশকে অর্থাৎ গোলকায়ন পর্ব থেকে তার পরবর্তীকাল জুড়ে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত রচিত বাংলা প্রাইমার সমূহ সেই পূর্বের অবস্থান থেকে সরে তো আসেইনি, বরং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন আরো অনেক মাত্রা, যুগের আরো অনেক নতুন নতুন চাহিদা। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নানাবিধ অনুষঙ্গের মিশেলে ইসলামি বাংলা প্রাইমার আজ নিজেই এক স্বশাসিত, স্বতন্ত্র বয়ানজমি নির্মাণ করেছে। প্রসঙ্গত আমরা এ'কালে প্রচলিত ইসলামি বাংলা প্রাইমারের পরিচয়

দান করবো। এক্ষেত্রে আমরা গত শতকের ন'য়ের দশক থেকে এই শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত প্রচলিত প্রায় তিরিশটির অধিক বাংলা প্রাইমারের ভেতর ও বাইরের কথা আলোচনা করবো।

উনিশ শতকের মুসলমান লেখক রচিত বাংলা প্রাইমারের তালিকা (নির্বাচিত)

ক্রমিক নং	প্রাইমারের নাম	রচয়িতা	প্রকাশকাল	প্রকাশক	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১	জ্ঞানশিক্ষা (প্রথম ভাগ)	মহম্মদ জুহুরুদ্দিন	১৮৬৯	সুলভ প্রেস	১২ পৃষ্ঠা
২	পদ্যমালা	মৌলা বক্স	১৮৭৬	--------	-------
৩	কবিতা কুসুমাঙ্কুর (প্রথম ভাগ)	মৈনুদ্দিন আহমেদ	১৮৭৬	------	-----
৪	পদ্যমালা	ওয়াইদুল	১৮৭৬	----	-------
৫	প্রথম শিক্ষা	মুন্সি কাজিমুদ্দিন	১৮৮৫	চারু প্রেস	----
৬	প্রথম ভাগ বর্ণবোধ	মজহরুল্লা কাজি	১৮৮৬	চন্দ্রশেখর প্রেস	------
৭	বর্ণশিক্ষা প্রথম ভাগ	মহঃ আবদুল মজিদ সরদার	১৮৮৮	----	----
৮	অক্ষর পরিচয়-১	ফতে মণ্ডল	১৮৮৮		
৯	অক্ষর পরিচয়-২	ফতে মণ্ডল	১৮৮৯		
১০	সরল শিক্ষা	ওয়াজুদ্দিন আহমদে	১৮৮৯	নোয়াখালি থেকে প্রকাশিত	
১১	নব বর্ণপরিচয়	রহিমুদ্দিন সরকার	১৮৯৩		
১২	নব শিশুশিক্ষা	মালেকউদ্দিন আহমেদ	১৮৯৩		

১৩	সচিত্র শিশুশিক্ষা – ১	মুন্‌সি জমারত হুসেন	১৮৯৭		
১৪	সচিত্র শিশুশিক্ষা – ২	মুন্‌সি জমারত হুসেন	১৮৯৭		
১৫	নব বর্ণশিক্ষা	অর্পণ-উল-মুন্‌সি	১৮৯৭	চৌধুরী প্রেস	

- উপরোক্ত তালিকাটি প্রস্তুত হয়েছে আশিস খাস্তগীর সম্পাদিত ‘বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫)’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে।

আমাদের প্রকল্পিত সময়পর্বে (১৯৯০ – ২০২০) রচিত ইসলামি প্রাইমার ও ফলো-আপের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রাইমারের নাম	রচয়িতা	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশক	মুদ্রিত মূল্য	আয়তন (পৃষ্ঠা)
১	আমাদের প্রিয় নবী	আবদুল মাবুদ	১৯৮৪	বাংলা ইসলামি প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা	২৮ টাকা	৪৮ পৃষ্ঠা
২	ছোটদের দুআ	নিযাম উদ্দীন মোল্লা	১৯৮৫	বাংলা ইসলামি প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা	২০ টাকা	৫৫ পৃষ্ঠা
৩	সালাফী বর্ণ পরিচয় (প্রথম ভাগ)	অধ্যাপক মাওলানা হাফেয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী	১৯৮৭, কালার অফসেট ২০১৯	সূফিয়া প্রকাশনী, কলকাতা	৫৫ টাকা	৩২ পৃষ্ঠা
৪	সালাফী বর্ণ পরিচয় (দ্বিতীয় ভাগ)	অধ্যাপক মাওলানা হাফেয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী	১৯৮৭, কালার অফসেট ২০১৯	সূফিয়া প্রকাশনী, কলকাতা	৫৫ টাকা	৩২ পৃষ্ঠা
৫	সালাফী সাহিত্য বীথি (দ্রুত পঠন)	অধ্যাপক মাওলানা হাফেয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী	১৯৯০	সূফিয়া প্রকাশনী, কলকাতা	৫৫ টাকা	৮৮ পৃষ্ঠা

৬	তালীমুল ইসলাম - ১	হযরত মুফতী মোঃ কেফায়াতুল্লাহ	১৯৯২	আহমদ পাবলিকেশন্স, কলকাতা	৩০ টাকা	২০ পৃষ্ঠা
৭	তালীমুল ইসলাম - ২	হযরত মুফতী মোঃ কেফায়াতুল্লাহ	১৯৯২	আহমদ পাবলিকেশন্স, কলকাতা	৩০ টাকা	২০ পৃষ্ঠা
৮	তালীমুল ইসলাম - ৩	হযরত মুফতী মোঃ কেফায়াতুল্লাহ	১৯৯২	আহমদ পাবলিকেশন্স, কলকাতা	৬০ টাকা	৫৬ পৃষ্ঠা
৯	তালীমুল ইসলাম - ৪	হযরত মুফতী মোঃ কেফায়াতুল্লাহ	১৯৯২	আহমদ পাবলিকেশন্স, কলকাতা	৬৬ টাকা	৭২ পৃষ্ঠা
১০	কচিকাঁচা – ১	মশিয়ার রহমান মোল্লা	১৯৯৯	পুস্তক ভারতী, হাওড়া	১০০ টাকা	৪০ পৃষ্ঠা
১১	কিশোর মনে ভাবনা জাগে	অধ্যাপক গোলাম আযম	২০০২	বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা	২৫ টাকা	২৪ পৃষ্ঠা
১২	ফুল্লকুঁড়িদের অ আ ক খ	মুহাম্মদ নূরুদ্দীন		ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা	২০ টাকা	৮ পৃষ্ঠা
১৩	ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ১	মুহাম্মদ নূরুদ্দীন	২০০৬	ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা	৫২ টাকা	৩২ পৃষ্ঠা
১৪	ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২	মুহাম্মদ নূরুদ্দীন	১৯৯৭	ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা	৬০ টাকা	৪০ পৃষ্ঠা
১৫	ফুলকুঁড়ি (প্রথম পাঠ)	মুহাম্মদ নূরুদ্দীন	২০০৬	ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা	৪৬ টাকা	৫৬ পৃষ্ঠা
১৬	ফুলকুঁড়ি (দ্বিতীয় পাঠ)	মুহাম্মদ নূরুদ্দীন ও শেখ নাসিরউদ্দীন আহমেদ	২০০১	ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা	৮৫ টাকা	৫৬ পৃষ্ঠা

১৭	ফুলকুঁড়ি (তৃতীয় পাঠ)	মুহাম্মদ নূরুদ্দীন	২০০১	ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা	৮৫ টাকা	৮০ পৃষ্ঠা
১৮	ফুলকুঁড়ি (চতুর্থ পাঠ)	মুহাম্মদ নূরুদ্দীন	১৯৯৭	ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা	৮০ টাকা	৯২ পৃষ্ঠা
১৯	এসো জীবন গড়ি	আবদুল মাবুদ	২০০৩	বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা	৩২ টাকা	৬৪ পৃষ্ঠা
২০	আমাদের ছড়া – ১	শেখ ফজলুর রহমান	২০০৪	ছাত্রবন্ধু প্রকাশনী, কলকাতা	৪২ টাকা	২৪ পৃষ্ঠা
২১	আমাদের ছড়া – ২	সংকলক – মুহাম্মদ নূরুদ্দীন	২০০১	ছাত্রবন্ধু প্রকাশনী, কলকাতা	৪০ টাকা	৩২ পৃষ্ঠা
২২	এসো পড়তে শিখি	মহম্মদ আলাউদ্দীন	সংশোধিত নতুন সংস্করণ – ২০০০৫	বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা	১৬ টাকা	৩২ পৃষ্ঠা
২৩	ইসলাম শিক্ষা	আফযাল হোসেন ও আবদুল মাবুদ	২০০৬	বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা	৩২ টাকা	৬৪ পৃষ্ঠা
২৪	ছোটদের ইসলাম শিক্ষা – ১	মুহাম্মদ নূরুদ্দীন	২০০৬	ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা	৩৮ টাকা	৫৬ পৃষ্ঠা
২৫	ছোটদের ইসলাম শিক্ষা – ২	মুহাম্মদ নূরুদ্দীন	২০০৬	ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা	৪৫ টাকা	৭২ পৃষ্ঠা
২৬	ছোটদের ইসলাম শিক্ষা – ৩	মুহাম্মদ নূরুদ্দীন	২০০৬	ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা	৪২ টাকা	৮০ পৃষ্ঠা
২৭	ছোটদের ইসলাম শিক্ষা – ৪	মুহাম্মদ নূরুদ্দীন	২০১৬	ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা	৫০ টাকা	৮৭ পৃষ্ঠা
২৮	পরিবেশ পরিচিতি	মো. আলাউদ্দীন	২০০৭	বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা	২০ টাকা	৬৪ পৃষ্ঠা

২৯	ছড়া ও রাইম্‌স্‌	ছড়ার সংকলন। লেখকের নাম অনুল্লিখিত	২০১৭	ছাত্রবন্ধু প্রকাশনী, কলকাতা	৬০ টাকা	২৪ পৃষ্ঠা
৩০	শিশুকথা প্রবেশিকা	জামান মুস্তাফিজুর রহমান	প্রকাশকাল অনুল্লিখিত	আদর্শ প্রকাশনী, কলকাতা	৭০ টাকা	৪০ পৃষ্ঠা
৩১	শিশুকথা প্রথম ভাগ	জামান মুস্তাফিজুর রহমান	প্রকাশকাল অনুল্লিখিত	আদর্শ প্রকাশনী, কলকাতা	৯০ টাকা	৬৮ পৃষ্ঠা
৩২	শিশুকথা দ্বিতীয় ভাগ	জামান মুস্তাফিজুর রহমান	প্রকাশকাল অনুল্লিখিত	আদর্শ প্রকাশনী, কলকাতা	৯০ টাকা	৫৬ পৃষ্ঠা
৩৩	শিশুকথা তৃতীয় ভাগ	জামান মুস্তাফিজুর রহমান	প্রকাশকাল অনুল্লিখিত	আদর্শ প্রকাশনী, কলকাতা	৯৫ টাকা	৬৪ পৃষ্ঠা
৩৪	শিশুকথা চতুর্থ ভাগ	মোহাম্মদ হাদীউজ্জামান	প্রকাশকাল অনুল্লিখিত	আদর্শ প্রকাশনী, কলকাতা	১২০ টাকা	৯৬ পৃষ্ঠা
৩৫	ইসলামী বর্ণ পরিচয়	------	প্রকাশকাল অনুল্লিখিত	নাজ বুক ডিপোম কলকাতা	১৫ টাকা	৮ পৃষ্ঠা
৩৬	ছড়া ছবিতে একের ভিতর তিন (ইসলামী কায়দায়)	অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল ইসলাম	প্রকাশকাল অনুল্লিখিত	নিউ লেখা প্রকাশনী	৪০ টাকা	২৪ পৃষ্ঠা
৩৭	ইসলামী সাহিত্য পাঠ - দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ	অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল ইসলাম	প্রকাশকাল অনুল্লিখিত	নিউ লেখা প্রকাশনী	৩৫ টাকা	৪৪ পৃষ্ঠা
৩৮	ইসলামী সাহিত্য পাঠ – পঞ্চম শ্রেণির পাঠ	অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল ইসলাম	প্রকাশকাল অনুল্লিখিত	নিউ লেখা প্রকাশনী	৩৫ টাকা	৪৮ পৃষ্ঠা

[উপরের তালিকাটি আমাদের প্রকল্পিত গবেষণায় সংগৃহীত প্রাইমারগুলির ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছে। বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে]

উপরোক্ত তালিকাটিতে আমরা আমাদের প্রকল্পিত সময়পর্বে (১৯৯০ – ২০২০) রচিত প্রাইমার ও ফলো-আপগুলিকেই কেবলমাত্র গ্রহণ করেছি। এক্ষেত্রে এই সমস্ত শিশুপাঠ্যপুস্তকগুলিতে আমরা

যে বানান লক্ষ করেছি তালিকায় সেই বানানই অবিকৃত রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা চলে যে, উপরোক্ত প্রাইমারগুলিতে সময়ের দাবি মেনে যেমন বিষয়বস্তুগত নানা পরিবর্তন এসেছে, তেমনই তাদের আঙ্গিক বিন্যাসের ক্ষেত্রেও বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। প্রাইমারের মুখ্য উদ্দেশ্য যেখানে বর্ণ, অক্ষর, বাক্য পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে ভাষা শিখন; সেখানে এই প্রাইমারগুলিতে কেবলমাত্র ভাষা শিক্ষাই অন্বিষ্ট হয়ে থাকেনি। বরং ইসলামের অতীত ইতিহাস, গৌরবগাথা, সুমহান ঐতিহ্য এবং সমান্তরালভাবে ধর্মীয় রীতিনীতি মূল্যবোধ ও প্রাত্যহিকের যাবতীয় নির্দেশ পাঠকের মগজে গুঁজে দেবার চেষ্টা হয়েছে। আমরা লক্ষ করেছি প্রাইমারগুলি ইসলামি স্বাতন্ত্র রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট এবং এক্ষেত্রে তারা পূর্ব প্রচলিত বাংলা প্রাইমারের বিষয়বস্তুর বিন্যাসকে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে স্বসমাজ ও স্বধর্মের পাঠকের জন্য একটা বিকল্প ডিসকোর্স গড়ে তুলতে চেয়েছে। আমাদের মনে হয়েছে এক্ষেত্রে প্রাইমারগুলিতে প্রায় একই বিষয়ের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে।

বর্তমান গবেষণায় আমাদের মূল লক্ষ্য বাংলা ভাষার প্রচলিত প্রাইমারগুলির সঙ্গে বাংলা ভাষায় রচিত ইসলামি প্রাইমারগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ। সেক্ষেত্রে আমরা ইসলামি প্রাইমারগুলির স্বরূপ এবং প্রকৃতি বিচারে অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু বর্তমান অধ্যায়ে উপরোক্ত তালিকায় আমরা আমাদের প্রকল্পিত সময়পর্বে রচিত ইসলামি প্রাইমারগুলির সঙ্গে বিভিন্ন ফলো-আপেরও উল্লেখ করেছি। তার কারণ আমাদের মনে হয়েছে উল্লিখিত প্রাইমারগুলির সঙ্গে এই ফলো-আপগুলিরও এক অন্তর্নিহিত সম্পর্ক আছে। প্রাইমারে যে ভাবনা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে ফলো-আপগুলিতে সেই ভাবনার পূর্ণ রূপ পরিলক্ষিত হয়েছে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাইমারগুলির পরিপূরক পাঠ হিসেবেও এই বইগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বর্তমান আলোচনায় আমরা প্রাইমারগুলির পাশাপাশি পরিপূরক শিশুপাঠ্য পুস্তক হিসেবে এগুলিরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করবো এবং উক্ত বইগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক মূল্যায়নের চেষ্টা করবো।

২.০১. ইসলামি বাংলা প্রাইমার: প্রসঙ্গ ও পরিচয় (১৯৯০ – ২০২০)

২.০১.০১।। আমাদের প্রিয় নবী :

আমাদের প্রিয় নবী পাঠ্যপুস্তকটির রচয়িতা হলেন আব্দুল মাবুদ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে। প্রকাশক বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত পুস্তকটির মোট নটি প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়েছে। শিশু পাঠ্যপুস্তক হিসেবে মুসলমান সমাজে এই পুস্তকটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। এটি ভাষা শিক্ষার জন্য প্রণীত কোনো প্রাইমার নয়, তবে প্রাথমিক

স্তরে শিশু শিক্ষার্থীদের প্রাইমারের পরিপূরক গ্রন্থ হিসেবেই এটি ব্যবহৃত হয়। গ্রন্থটির ভূমিকা অংশে লেখক এই পুস্তকের প্রাসঙ্গিকতা জাহির করে জানিয়েছেন -

> প্রিয় নবীর জীবন কথার চাইতে ভালো উপহার কচি কিশোরদের জন্য আর কি হতে পারে ! জীবন গঠনের জন্য প্রিয় নবীর জীবনের চাইতে ভালো আদর্শ আর কি হতে পারে! বাংলায় শিশুদের উপযোগী করে লেখা প্রিয় নবীর জীবন কথার যথার্থ অভাব রয়েছে। এ অভাব পূরণ করার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা
>
> এ জীবন কথা পড়ে দুটি কচি কিশোর ও যদি সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়, দুটি কচি কিশোরও যদি এ জীবন কথায় বিবৃত যথার্থ নবী চরিত্রে নিজেদেরকে রঞ্জিত করতে পারে তাতেই এর সার্থকতা।[৫৬]

গ্রন্থকারের উপরোক্ত মন্তব্যটি থেকে স্পষ্ট যে, এই গ্রন্থ তিনি 'কচি কিশোর' অর্থাৎ শিশু পাঠকদের উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য 'সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে' শিশু-কিশোরদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। অবশ্যই যে সত্য ও ন্যায়ের পথে তিনি তার শিক্ষার্থীদের চালিত করতে চান তিনি হলেন নবীজি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ।

লক্ষ করবার বিষয় গোড়া থেকেই এই পুস্তকটির মুখ্য উদ্দেশ্য শিশু শিক্ষার্থীকে ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত করা। অতঃপর এই পুস্তকের বিষয় বিন্যাসকে যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে লক্ষ করব এটিতে মোট ১৪ টি অধ্যায়ে আগাগোড়া নবীজির জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য বিষয় নবীজির জন্ম ও শৈশবকাল, তার বড় হওয়ার আখ্যান এবং তার নবিয়ৎ প্রাপ্তি। এই প্রত্যেকটি ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ দান করে শিশু পাঠককে যেন তাদের জীবনের আদর্শ চরিত্র হিসেবে নবীকে গ্রহণ করবার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। সাদা কালো ছবি ও অক্ষরে বিন্যস্ত পুস্তকটির সামগ্রিক পরিসর জুড়ে বর্ণ বা অক্ষর পরিচয়ের কোনো জায়গা নেই। সরাসরি এটি গল্পের ছলে মোহাম্মদের আদর্শকেই প্রতিষ্ঠা করেছে। সেদিক থেকে বলা চলে যে এই পুস্তকের অন্বিষ্ঠ পাঠক অক্ষর জ্ঞান ও পাঠ ক্ষমতা সম্পন্ন শিশু পাঠক যাকে গল্পের ছলে ধর্মীয় আদর্শে অটুট থাকতে উৎসাহ জোগানো হয়েছে। তাই এটাকে আমরা প্রাইমারের বর্গে না রাখলেও প্রাইমারের পরিপূরক পাঠ হিসেবে এই পুস্তকটিকে আমরা গ্রহণ করব।

২.১.২।। ছোটদের দুআ

পুস্তকটির রচয়িতা নিজাম উদ্দিন মোল্লা। এটিও প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ইসলামিক প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা থেকে। প্রকাশকাল ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ। পুস্তকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে আমরা জানতে পারছি ২০১৯ সাল পর্যন্ত পঞ্চমবারের জন্য প্রকাশিত হয়েছে এটি।

এটিও বর্ণ ও অক্ষর শিক্ষার জন্য রচিত কোনো প্রাইমার নয়, তবে আমরা লক্ষ করেছি প্রাইমারের পরিপূরক পাঠ হিসেবে এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই পুস্তকে শিশু পাঠকদের ধর্ম সম্পর্কে দরকারি দুয়া সমূহকে একত্রিত করা হয়েছে এবং মুসলমান শিশুকে ধর্মবোধে জাগ্রত করে তাদেরকে ধর্মীয় পথে পরিচালিত করবার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পুস্তকটির মুখবন্ধ অংশে মোহাম্মদ ইয়াকুব ঘোলায়ী লিখেছেন -

> এই দোয়া গুলির সচেতন অধ্যয়নের ছোটরা যেমন খোদাগত প্রাণ হয়ে গড়ে উঠবে, সেইসঙ্গে বড়োরা ও কম উপকৃত হবেন না। এই পুস্তকটি একদিকে যেমন প্রতিটি বালক বালিকার হাতে যাওয়া অপরিহার্য তেমনি প্রতিটি মুসলিম গৃহে সমাদৃত হবে সর্বান্তকরণে এই কামনা করি।[৫৭]

অর্থাৎ মুখবন্ধ থেকেই স্পষ্ট যে মুসলমান সমাজে এই ধরনের শিশু পাঠ্যপুস্তকের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে শিশুদেরকে 'খোদাগত প্রাণ' হিসেবে গড়ে তোলবার প্রয়াসে লেখকের এই প্রচেষ্টা। সে দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে শিশু শিক্ষার্থীকে ধর্মীয় পথে অগ্রসর করতে ও তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে শৈশব থেকেই সুদৃঢ় করতে এই শিশু পাঠ্যপুস্তকটির বিশেষ ভূমিকা আছে।

পুস্তকটিতে কোন ছবি ও বর্ণ অক্ষর শেখবার পরিসর নেই এই পুস্তকের পাঠকদের সম্পর্কে লেখক ভূমিকা অংশে জানিয়েছেন, এতে ৩৬ টি শিরোনামতে ছোট বড় মোট ৮০ টি দোয়া সন্নিবেশিত হয়েছে। সংকলকের বিশ্বাস এটি তাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে এবং এইসব দোয়ার মাধ্যমে তারা আল্লাহর নিকটবর্তী হবে ও সফলতা লাভ করবে। বলাবাহুল্য ইসলাম ধর্মে দোয়া সর্ব অবস্থায় সকল মুমিনের জন্য প্রয়োজনীয় তবে এখানে এসব ছোটদের উপযোগী করে সংকলিত হয়েছে মাত্র।[৫৮] গ্রন্থকারের উক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে এটিও শিশুর পরিপূরক পাঠ হিসেবে প্রণীত হয়েছে যার মূল লক্ষ্য শিশুকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে আখেরাত অর্থাৎ পরলোকে তার সাফল্য অর্জনে সহায়তা করা।

অতঃপর এই পুস্তকটিতে যে সমস্ত দোয়ার সন্নিবেশ হয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঘুমানোর সময়ের দোয়া, ঘুম থেকে উঠে পড়ার দোয়া, প্রস্রাব পায়খানা থেকে বের হবার দোয়া, ওযুর দোয়া, মসজিদের দোয়া, বিপদের সময় দোয়া, সব সময় পড়ার দোয়া ইত্যাদি। এককথায়

প্রতিমুহূর্তে শিক্ষার্থীকে আল্লাহর প্রতি অনুগত এবং বাধ্য থাকবার জন্য যাবতীয় কৃৎকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে এই সমস্ত দুয়া সংকলনের মধ্যে দিয়ে। সে দিক থেকে আমরা বলতে পারি এই গ্রন্থে আনন্দময় পাঠদানের কোনো ব্যবস্থা নেই, পরিবর্তে শিশু শিক্ষার্থীকে শৃঙ্খলিত করবার অজস্র আয়োজন রাখা হয়েছে।

২.১.৩। সালাফী বর্ণপরিচয়

'সালাফী বর্ণপরিচয়' হল ইসলামী প্রাইমারগুলির মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় একটি প্রাইমার সিরিজ। মোট তিনটি পর্বে বিন্যস্ত এই প্রাইমারটির প্রথম পর্ব 'সালাফী বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ' দ্বিতীয় পর্ব 'সালাফী বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ' এবং তৃতীয় পর্ব 'সালাফী সাহিত্যবিথী'। সংক্ষেপে এই সিরিজটির পরিচয় দেওয়া হলো।

২.১.৩. ক।। সালাফী বর্ণপরিচয় (প্রথম ভাগ)

এই প্রাইমারিটি ইসলামী শিশু পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাইমার। নামকরণের মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট যে এটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়' - এর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব বহন করে চলে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় যেখানে কেবল 'বর্ণপরিচয়' সেখানে মুসলমান শিশুর প্রয়োজনে এটি সালাফি বর্ণ পরিচয়। সালাফী শব্দটির মধ্যে দিয়েই এই প্রাইমারটির বিশেষত্ব সুস্পষ্ট। 'সালাফি' শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হল – ইসলামের প্রথমযুগের মানুষগণ। যাঁদের সম্পর্কে নবী মোহাম্মদ বলে গিয়েছেন, তাঁরা হলেন সমস্ত মানবকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ 'সালাফী বর্ণপরিচয়ের' নিহিত উদ্দেশ্য হলো পূর্বপুরুষদের অনুসরণে শ্রেষ্ঠ মুসলমান নির্মাণ করা।

প্রাইমারটির ভূমিকায় 'প্রসঙ্গকথা' অংশে লেখক এটি রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানাচ্ছেন -

> ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় কতিপয় বর্ণপরিচয় লেখা হয়েছে কিন্তু তার অধিকাংশ আল্লাহ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ভাবে বিবর্জিত। এমতাবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ জমায়েতে আহলে হাদিসের উদ্যোগে আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়াচসহ ইসলামিক শিক্ষার সমন্বয়মূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ... প্রিয় নবীর পূর্বনির্দেশিত পথপ্রদর্শন অনুযায়ী বাংলা ভাষায় কিছু পাঠ্যপুস্তক তৈরির প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। তাই এই প্রয়োজনের ফলশ্রুতি হিসেবে শিশু ও প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য রূপে সালাফী বর্ণ পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হল। বই দুটি পাঠ করে কচিকাঁচা শিশুরা যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর ভাবধারায় উজ্জীবিত হয় তাহলে আমাদের মেহনত সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।[৫৯]

অর্থাৎ রচয়িতার মন্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে এই গ্রন্থটি প্রণয়নের পেছনেও আল্লাহ এবং তার নবীর ভাবাদর্শ প্রচার এবং শিশু মনে তা প্রতিষ্ঠা করবার প্রেরণা প্রবল। সেদিক থেকে বলা চলে যে ভাষা শিক্ষা অপেক্ষা ধর্মীয় চিন্তা চেতনার জাগরণই এই পুস্তকটির মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের মনে হয় ভাষা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে কার্যত আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং ইসলামী নিয়ম শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত করায় এই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য। স্বাভাবিকভাবেই পুস্তকটির বর্ণ পরিচয় এবং শব্দ গঠন অংশে ইসলামিক চিন্তাভাবনার ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। নিচে কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল।

অ – অযূ করে পাক হও

আ – আল্লার নাম লও

ই – ইসলাম-কে আঁকড়ে ধরো

ঈ – ঈমানকে মযবুত কর [বানান অবিকৃত]

প্রাইমারটিতে ৯ বর্ণসহ মোট ১২ টি স্বরবর্ণ বিন্যস্ত হয়েছে যার মধ্যে আটটি স্বরবর্ণ শিখনের সময় ধর্মীয় প্রসঙ্গ বিশেষত ইসলামী বিধি নিষেধ ও জীবনাচরণের প্রয়োগ ঘটনা হয়েছে।

অনুরূপভাবে ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয় অংশ ইসলামি চিন্তাভাবনার প্রচার লক্ষ করবার মতো। যেমন –

ক - কুরআন পড়ো সাঁঝ সকালে হতে

খ - খোদার রহম পাবে তাহলে

গ - গুনে গুনে তসবিহ পড়ো

ঘ - ঘরে সুন্নত পড়া ভালো।

আবার

ধ – ধনীর ঘরে যাকাত ফরয

ন – নামায সবার তরে ফরয

হ – হজ্জ করা হয় মক্কাতে

এখানেও প্রায় প্রতিটি বর্ণের সঙ্গেই ইসলামের অনুসঙ্গ বিশেষত ধর্মীয় অনুষঙ্গকে সংযুক্ত করে শিশু শিক্ষার্থীকে যেন ধর্মের পাঠেই দীক্ষিত করবার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ছবি

সংযুক্ত হয়েছে যেমন ক - বর্ণে কুরআনের ছবি, গ - বর্ণে তসবিহর ছবি, ট – বর্ণে টুপির ছবি ইত্যাদি।

বর্ণপরিচয় অংশের পরে এই পুস্তকে এসেছে বর্ণযোগে শব্দ পরিচয় প্রসঙ্গ সেক্ষেত্রেও ধর্মীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে আকছার। যেমন –

বর্ণ – যোগে শব্দ	শব্দের নমুনা
অ	রহমত, জমজম, বরকত, গজব, ফরয, নফল, কবর
আ	আব্বা, আযান, সালাম, নামায, কাবা, রমাযান
ই	মসজিদ, মগরিব, আমিনা, হিযরত, সিজদা
ঈ	হাদীস, সাহাবী, গাযী, মদীনা শরীফ
উ	রসুল, দরুদ, মুসলিম, মুজাহিদ, নজরুল, ফুরকান, জুম্মা

অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে ইসলামী জীবনাচরণ এবং কুরআন হাদীসের পরিচয়বাহী নানা শব্দ শব্দের সঙ্গে পরিচয় করা হয়েছে। এই প্রাইমারির শেষে কতগুলি ছড়া সংযোজিত হয়েছে যার মধ্যে গোলাম মোস্তফা, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ এবং রচয়িতা শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভীর কবিতা সংযুক্ত হয়েছে।

২.১.৩.খ সালাফী বর্ণপরিচয় (দ্বিতীয় ভাগ)

এই প্রাইমারটির প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। একাদশ প্রকাশ ২০১৯ সালে যেখানে এর পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ কালার অফসেটে ছাপা হয়েছে।

পুস্তকটির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ‘প্রাসঙ্গিক বক্তব্য’ অংশে লেখক জানিয়েছেন –

> শিশুদের স্মরণ শক্তি বয়স্কদের তুলনায় বেশি। ওই সময় শিশুরা যা মুখস্থ করে তা তাদের মনের মণিকোঠায় পাথরের মত দাগ কাটে। যেমন মহানবী (সাঃ) বলেন শিশু ও কিশোরদের মুখস্তকরণ পাথরের দাগ কাটার মতো। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা পরোক্ষভাবে বোঝা যায় যে শিশুদের শিশু মনে পাথরের দাগ কাটার মতো যে শিক্ষা দেয়া হবে তা যেন ইসলামী বুনিয়াদী শিক্ষা অবশ্যই হয়।[৬০]

লেখকের এই বক্তব্যের মধ্যে থেকে পরিষ্কার অনুমান করা যায় যে শিশুর শূন্য চিত্ত (Tabula Rasa) কে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে আনবার জন্য এবং তার মস্তিষ্ককে ইসলামিক চিন্তা ও হাদিসের নির্দেশ দ্বারা পূর্ণ করবার অভিপ্রায়ে এই প্রাইমার রচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লেখক আরো মনে করেন –

> দুঃখের বিষয় যে, ইতিপূর্বে বাংলাভাষী শিশুদের মানুষপটে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে যে শিক্ষা পাথরের মত দাগ কেটেছে তার অধিকাংশই ছিল তওহীদ বিরোধী শিক্ষা। তাই যারা প্রিয় নবীর (সঃ) মনোবিজ্ঞান প্রসূত উক্ত ফরমানটির প্রতি অগাধ আস্থা রাখে তারা মাতৃভাষা বাংলায় তাওহীদবাদী বই রচনা করাকে ঈমানের তাগিদ বলে মনে করে। ... সম্প্রতি কিছু বই ইসলামী ভাবধারায় রচিত হয়েছে। কিন্তু ঐ বইগুলার রচিয়তাগণ কোরআন ও হাদীসের অভিজ্ঞ আলেম নন বলে তাঁদের অজান্তে তাঁদের বইয়ে কিছু ইসলাম বিরোধী বেদআতী ভাবধারাও স্থান পেয়েছে। তাই সালাফি ভাবধারার নতুনভাবে বই তৈরীর প্রয়োজন ও গুরুত্ব আরো বেড়েছে।[৬১]

আমরা জানি 'বেদাত' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল 'নবসৃজন'। সেদিক থেকে বলা চলে যে, এমন কোনো উদ্ভাবিত বিষয় বা বস্তু যা কোরান ও হাদিসে নেই তাইই হলো 'বেদাত'। লক্ষ করবার বিষয় এখানে নতুনভাবে সৃষ্টির কোনো জায়গা নেই। অর্থাৎ শিশুচিত্তকে কোরান হাদিসের ভাবনা চিন্তার খোপে পুরে তাকে ধর্ম ও সমাজের প্রতি অনুগত এবং বাধ্য করাই যেন এই সমস্ত প্রাইমারের লক্ষ্য। এই কারণে প্রচলিত মূলধারার বাংলা প্রাইমারগুলিকে 'সালাফী' পরিত্যাজ্য বলে মনে করে। এখানেই 'সালাফী'র একাধিপত্য প্রমাণিত হয়। এই পুস্তকে লেখক সচেতনভাবেই আরবি ফারসি সমৃদ্ধ অসংখ্য শব্দের যেমন প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তেমনি কোরআন ও হাদিসের অনুসারে রচিত হয়েছে 'সাচ্চা মুসলমান' নির্মাণের ন্যারেটিভ।

'সালাফী বর্ণপরিচয়' এর দ্বিতীয় ভাগ শুরু হয়েছে সংযুক্ত বর্ণ যোগে শব্দ ও বাক্য গঠনের মধ্যে দিয়ে। এই পরিসরেও প্রত্যেকটি শব্দ এবং বাক্যে ইসলামিক প্রসঙ্গকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যেমন য-ফলা যোগে শব্দ গঠন অংশে বলা হয়েছে –

> অত্যাচারীকে অন্যায় থেকে বিরত রাখবে। তাহলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। ইসলাম কখনো মিথ্যা ও বৈষম্য চায় না। পুণ্য ও নেকির কাজে অন্যকে সাহায্য করবে। যে বড়োদের মান্য করে না সে মুসলমান হতে পারে না।[৬২] [নিম্নরেখ সংযোজিত]

আবার শব্দ ও বাক্য গঠন অংশেও ইসলাম ও আল্লহর কথাই প্রধান দ্রষ্টব্য। যথা –

> র- ফলা যোগে বাক্য : সর্বদা আল্লাহর আশ্রয় নাও
>
> রেফ – যোগে বাক্য : ইসলাম সবাইকে ধর্ম ও কর্ম শেখায়
>
> ল – ফলা যোগে বাক্য : মুসলিম সেই হয়, যে কাউকে হাত ও মুখ দিয়ে ক্লেশ দেয় না।
>
> ম – ফলা যোগে বাক্য : আমরা শেষ নবীর উম্মত

আবার সংযুক্ত বর্ণ ও বাক্য সহযোগে গদ্য পাঠ অংশে বলা হয়েছে – 'রোজা ও ঈদের ব্যাপারে পঞ্জিকার উপর ভরসা করা যাবে না। ... খাঁটি মুসলমান সর্বদা ইসলামের কট্টর সমর্থক।"

লক্ষ করবার বিষয় শৈশব থেকেই মুসলমানের নিজস্ব আয়তন সম্পর্কে জ্ঞান ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার জ্ঞান দানও যেন প্রাইমারসমূহের লক্ষ্য।

প্রসঙ্গত এই পুস্তকে কয়েকটি ছড়া সংকলিত হয়েছে যথা প্রার্থনা ঈশ্বর গুপ্তের 'বড় কে?' আব্দুর রাজ্জাক রচিত 'নামাজ'। এ ছাড়া গদ্যের সংকলন অংশে আমরা লক্ষ করবো গল্পের ছলে ইসলামী নীতি শিক্ষার প্রয়োগ ঘটনা হয়েছে। এরকম কয়েকটি গল্পের নাম 'আল্লাহ ভীতি ও তার পরিণতি', 'কচিকাঁচাদের রোজার অভ্যাস', 'একটি ইসলামী আদব', 'হিংসার কুফল', 'সত্য বলার শুভ পরিণতি', 'মিথ্যা বলার শাস্তি' ইত্যাদি। প্রাসঙ্গিকভাবে মুসলিম সমাজে নারী প্রতিনিধি হিসেবে রোকেয়ার অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তার জীবনকথা সম্বলিত একটি গদ্য রচনা আলোচ্য প্রাইমারিতে সংকলিত হয়েছে।

২.১.৩. গ.।। সালাফী সাহিত্যবিথী

এটি প্রাইমার না হলেও 'সালাফী বর্ণপরিচয়' পরবর্তী পরিপূরক পাঠ হিসেবে এই পুস্তকের বিশেষ তাৎপর্য আছে। অর্থাৎ 'সালাফী বর্ণপরিচয়' যেখানে শেষ হয় 'সালাফী সাহিত্যবিধি'র সূচনা তার পর থেকে। বর্ণ ও অক্ষর জ্ঞান সম্পূর্ণ হওয়ার পর শিশু শিক্ষার্থীর চিত্তে ইসলামিক চিন্তাভাবনাকে প্রবল ভাবে প্রতিষ্ঠা দেবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তকটিতে কবিতা ও গল্পের সংকলন করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য কবিতা 'নবীর শোকে', 'শিশুর কথা', 'খোকার নামাজ', 'নবীজির শিক্ষা' ইত্যাদি। আবার উল্লেখযোগ্য গদ্য 'আল্লাহ ও ফেরেশতাদের প্রশ্নোত্তর', 'মুসলমানের ওয়াদা', 'আল্লাহর প্রিয় বান্দা,' 'ইহুদীর ইসলাম গ্রহণ', 'মহানবীর মহিমা'।

২.১.৪।। তালিমুল ইসলাম বা ইসলাম শিক্ষা

প্রাইমারটির মোট চারটি ভাগ। এই প্রাইমারটির মূল রচয়িতা হযরত মুফতী মোহাম্মদ কেফায়েতুল্লাহ। প্রাইমারটির অনুবাদক মোঃ মাসরুর আহমেদ। প্রকাশক আহমেদ পাবলিকেশনস, কলকাতা।

২.১.৪. ক।। তালিমুল ইসলাম বা ইসলাম শিক্ষা (প্রথম ভাগ)

তালিমুল ইসলামের প্রথম ভাগ কোনোরকম অক্ষর কিংবা বর্ণপরিচয় দিয়ে শুরু হয়নি। প্রথম ভাগের বিষয়বস্তু মুসলমান হিসেবে শিশু পাঠকের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা এবং তার পরিচিতিকে পোক্ত করা। একমাত্র ধর্মীয় পরিচয়কে প্রাধান্য দিতে প্রথম ১০ টি পৃষ্ঠা জুড়ে প্রশ্ন উত্তর পর্ব চলতে থাকে যার মধ্যে দিয়ে নামাজ ওযু আজান ইবাদাত প্রকৃতি বিষয়ের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়।

২.১.৪. খ।। তালিমুল ইসলাম বা ইসলাম শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ)

তালিমুল ইসলাম দ্বিতীয় ভাগ প্রথম ভাগের অনুসরণে রচিত। তবে এখানে প্রশ্ন ও উত্তরের ভিত্তিতে ইসলামের বিভিন্ন ভিত্তি যেমন - নামাজ, রোজা, কালিমা প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়েছে। সেইসঙ্গে পাঁচটি কালেমার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত বিভিন্ন ইসলামিক কিতাব অর্থাৎ ইসলামিক ধর্মগ্রন্থগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পূর্ণ পরিচয় করানো হয়েছে। সেই সঙ্গে নামাজ ওযু গোসল এবং খাদ্যের হলাম হারাম হালাল প্রসঙ্গ বিচার করা হয়েছে।

২.১.৪. গ।। তালিমুল ইসলাম বা ইসলাম শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ)

তালিমুল ইসলাম তৃতীয় ভাগের দিকে লক্ষ রাখলে আমরা বুঝতে পারবো এখানে শিক্ষার্থীর তালিম আরও নিবিড় এবং পাকাপোক্ত হয়েছে। অর্থাৎ ঈমানদার বান্দা নির্মাণের অভিপ্রায়ে নামাজ, রোজা, নিয়ত প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান দান করা হয়েছে। গোসল বা স্নান, অজু প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান দান করা হয়েছে।

এটির প্রথম অধ্যায় তালিমুল ইমান বা ইসলামী আকাইদ তাওহীদ বা ঈশ্বরের একত্ববাদ। যেখানে বাংলা ভাষায় শিক্ষার্থীর মধ্যে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং সে সম্পর্কে কুরআন থেকে উদ্ধৃতি সহ বিভিন্ন তথ্য দান করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরকান শিক্ষা বা ইসলামী আমল ওযুর মাসালা অর্থাৎ অজুর বিশেষত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বিচার করে আমরা বলতে পারি তালিমুল ইসলাম পরিপূর্ণভাবে ধার্মিক মুসলমান নির্মাণের পথেই শিক্ষার্থীকে চালিত করেছে।

২.১.৪. ঘ।। তালিমুল ইসলাম বা ইসলাম শিক্ষা (চতুর্থ ভাগ)

তালিমুল ইসলাম চতুর্থ ভাগ বিভিন্ন ধরণের ইসলামিক রীতিনীতি যথা - নামাজের সুন্নত, নফল রোজা, ভাঙ্গা রোজার নিয়ত প্রভৃতি ধর্মীয় বিষয়কে গুরুত্বসহ আলোচনা করেছে। সেই সঙ্গে যাকাত এবং সাদকা প্রদানের ধর্মীয় নির্দেশ সমূহ কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.১.৫।। কচিকাঁচা

মশিয়ার রহমান মোল্লা রচিত কচিকাঁচা প্রাইমারির প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রাইমারটির উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে রচয়িতা এই প্রাইমারের ভূমিকা অর্থাৎ 'আরজ' অংশে একটি ছড়া উপস্থাপন করেছেন সেখান থেকে আমরা এই প্রাইমারের মূল উদ্দেশ্যগুলি লিপিবদ্ধ করতে পারি -

১. এক ওহীর আলোয় বর্ণ শেখা এবং শিশু শিক্ষার্থীদের জ্ঞানী বানানো

২. সরল সঠিক উপায়ে খোদার পথ চিনিয়ে দেওয়া

৩. সকলের মনে ঈমান আনয়ন করা

স্বাভাবিকভাবেই এই প্রাইমারটির বর্ণপরিচয় থেকে শব্দ পরিচয় এবং বাক্য পরিচয় অংশ পর্যন্ত সর্বত্র ছবি এবং উপদেশের ভঙ্গিতে ইসলামিক চিন্তাভাবনার প্রচার এবং প্রসার ঘটানোর প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বর্ণপরিচয় অংশে আদ্যতা নীতি অনুসারে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণেরএবিন্যাস লক্ষণীয়।

স্বরবর্ণ অংশে ইসলামী প্রসঙ্গ

অ - অহী এলো হেরার গুহায়
আ - আল্লাহ দিলেন হুকুম ধরায়
ই - ইমাম ঐ খুৎবা পড়ে
ঈ - ঈমান আনো খোদার তরে
এ - একরা হলো প্রথম ওহী
ঐ - ঐশী বিধান খুবই সহি
ও - ওমর ফারুক সেরা বীর
ঔ - ঔরঙ্গজেব জিন্দা পীর

ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয় অংশে ইসলামি প্রসঙ্গ

ক - কোরআন হলো খোদার বাণী
খ - খোদার সবার মালিক জানি
চ - চার খলিফা চির মহান
ছ - ছয়টি ঋতু খোদার দান। ইত্যাদি

শব্দ পরিচয় অংশেও পূর্ববর্তী প্রাইমারগুলির অনুরূপ ইসলামি প্রসঙ্গ ও ধর্মীয় পরিচিতিজ্ঞাপক শব্দের অবতারণা করা হয়েছে। যথা – আল্লা, নামাজ, রহমত, ফেরেস্তা ইত্যাদি।

বর্ণ ও শব্দ পরিচয় অংশের শেষে ছড়া এবং গদ্য সংযোজিত হয়েছে সেখানেও ঐতিহ্য মেনে ইসলামি আদর্শ অনুসরণের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কুরআন হাদিস পাঠের পাশাপাশি 'আমাদের পড়া' অংশে বই পড়ার উপকারিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কবিতা অংশগুলি ধর্মীয় ভাবাবেগ প্রসূত। দশম পাঠের বিষয়বস্তু ভারতের ভূপ্রকৃতি ও ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং স্বদেশপ্রেম। নবম পাঠে এসেছে হুগলি নদীতে বান এবং কৃষিজীবী মানুষের দুঃখ বিপর্যয়ের কথা। প্রাসঙ্গিকভাবে এই প্রাইমারটিতে সাম্প্রতিক কালের করোনার প্রভাব জায়গা পেয়েছে -

> হাসানের হাতে এক পয়সাও নেই বাজারে অনেক দেনা। কি করবে ভেবে কুল পায় না। কাজের খোঁজে সে দৌড়ঝাঁপ করে। কাল থেকে আবার লকডাউন। শহরে যাবার বাস ও রেলগাড়ি নেই। বাড়ির উঠোনে চুপচাপ বসে থাকে হাসান। তার মা বলল দুঃখের সময় ভেঙ্গে পড়তে নেই। খোদার উপর ভরসা করতে হয়। গাঁয়ের লোকেরা ফিতরার টাকা তুলছে। সেই টাকা পেয়ে হাসান হাটে গেল। আমিনাকে কিনে দিল বই খাতা ও একজোড়া সালোয়ার কামিজ তাই আমিনা খুব খুশি।[৬৩]

উক্ত প্রসঙ্গটির অবতারণার মধ্যে দিয়ে লেখকের সাম্প্রতিক বিষয়ে সমাজ সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কচিকাঁচার দশম পাঠে এসেছে গোপালের অনুরূপ মুসলমান আদর্শ বালকের প্রতিচ্ছবি। লেখক এখানে রফিককে গোপালের অনুরূপ গড়ে তুলেছেন। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' যেভাবে সুবোধ বালকের চরিত্র নির্মাণ করেছিল মুসলমান সমাজেও রফিককে তারই খাঁচায় পুরে ফেলা হয়েছে। অবশ্য দু'একটি ক্ষেত্রে তাদের অমিল লক্ষ করা যাবে। অতঃপর গোপাল ও রফিকের মিল – অমিলের জায়গাটি তুলে ধরা হলো। প্রসঙ্গত গোপাল ও রফিকের মিল-অমিলের জায়গাটি চিহ্নিত করা হ'লো।

সাদৃশ্য :

'বর্ণপরিচয়'-এর গোপাল	'কচিকাঁচা'র রফিক
১. গোপাল বড়ো সুবোধ।	১. রফিক খুব সুবোধ বালক ।
২. তার বাপ মা যখন যা বলেন, সে তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভাল খাব, ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না।	২. রফিকের মা যখন যা কিছু খেতে দেয়, সে তাই খায়। খেতে বসে এটা খাব ওটা খাবো বলে সে উৎপাত করে না। ৩. বাড়ি ফিরে ভাই-বোনদের সাথে পড়তে বসে। সে ভাই-বোনদের সাথে মারামারি করে না।

৩. গোপাল আপনার ছোটো ভাই ভগিনীগুলিকে বড় ভাল বাসে। সে কখনও তাদের সহিত ঝগড়া করে না, তাদের গায়ে হাত তুলে না। ৪. এ কারণে তার পিতামাতা অতিশয় ভাল বাসেন। ৫. গোপাল যখন পড়িতে যায় পথে খেলা করে না। সকলের আগে পাঠশালায় যায়। পাঠশালায় গিয়া, আপনার জায়গায় বসে। আপনার জায়গায় বসিয়া, বই খুলিয়া পড়িতে থাকে, যখন গুরু মহাশয় নূতন পড়া দেন, মন দিয়া শুনে। ৬. খেলিবার ছুটি হইলে, যখন সকল বালক খেলিতে থাকে, গোপালও খেলা করে। আর আর বালকেরা খেলিবার সময়, ঝগড়া করে, মারামারি করে। গোপাল তেমন নয়। সে একদিনও কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করে না। ৭. গোপালকে যে দেখে, সেই ভাল বাসে। সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত।[৬৩]	৪. সে সদা পিতা-মাতার কথা শোনে। তাই তার পিতা-মাতা তাকে খুব ভালবাসে। ৫. সে রোজ বেলা দশটার সময় অপর বালকদের সাথে পড়তে যায়। যাবার সময় পথে খেলা করে না । কোনদিনও পড়া কামাই করে না। না বলে কারো জিনিসের হাত দেয় না । টিফিনের ছুটি হলে নিজের জায়গায় বসে পুরানো পড়াগুলো দেখতে থাকে। পড়ার ছুটি হলে সে হইচই করে ছোটাছুটি করে না । বই খাতা গুছিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ি ফেরে। হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসে। ৬. বৈকালে অপর বালকদের সাথে খেলা করে। খেলার সময় কাউকে গালি দেয় না। ৭. সকলে রফিককে অতিশয় ভালোবাসে। [৬৪]

[নিম্নরেখ সংযোজিত]

বৈসাদৃশ্য :

'বর্ণপরিচয়'-এর গোপাল	'কচিকাঁচা'র রফিক
১. ধর্ম চর্চার কথা নেই ২. সকলের আগে পাঠশালায় যায়। পাঠশালায় গিয়া, আপনার জায়গায় বসে। আপনার জায়গায় বসিয়া, বই খুলিয়া পড়িতে থাকে, যখন গুরু মহাশয় নূতন পড়া দেন, মন দিয়া শুনে। । ৩. সে পাঠশালায় যাহা পড়িয়া আইসে, বাড়িতে তাহা ভাল করে পড়ে; পুরাণ পড়া গুলি দুবেলা আগা গোড়া দেখে।[৬৩]	১. সে রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে। ফজরের নামাজ শেষে কিছু সময় মসজিদে বসে। ২. ইমাম সাহেবের কাছে আরবি পড়া শেখে। ৩. মাগরিবের আজান হলে নামাজ সেরে তাড়াতাড়ি পড়তে বসে। রাতে সব পড়া সারা হয়ে গেলে, সে ঘুমাতে যায়। পরিবারের কেউ পীড়িত হলে তার সেবা করে। সে জানে, দুঃখী মানুষের সেবা করলে নেকী হয়। [৬৪]

২.১.৬ ।। কিশোর মনে ভাবনা জাগে

২০০২ সালে প্রথম প্রকাশিত এই পুস্তকটি অক্ষর কিংবা বর্ণ পরিচয়ের জন্য রচিত কোন প্রাইমার নয় তবে শিশু পাঠ্যপুস্তকের পরিপূরক একটি ফলোআপ। এটির রচয়িতা অধ্যাপক গোলাম আযম। তিনি মুসলমান বালকের আত্মাকে ইসলামিক তরিকায় সুগঠিত করবার উদ্দেশ্যে রচিত আলোচ্য পুস্তকটির গোঁড়াতেই জানিয়েছেন মুসলমান বালকের আদর্শ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা -

> ... আমরা মানুষ। আমরা কি ভালো হতে চাই না? কিন্তু শুধু চাইলেই ভালো হওয়া যায় না। যদি এমন কোন আদর্শ মানুষ পাওয়া যায় যিনি সবচেয়ে ভালো মানুষ, তাহলে তাকে দেখে দেখে নিশ্চয়ই ভালো হওয়া যাবে। এমন নমুনার মানুষ কোথায় পাওয়া যাবে?[৬৫]

এই প্রশ্নের উত্তরে এই বই সেই আদর্শ মানুষের কথা পাড়ে -

> যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৈরি করেছেন তিনি আমাদের জন্য আদর্শ মানুষও পাঠিয়েছেন। ওই আদর্শ মানুষদেরই নবী বা রাসূল বলা হয়। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় আদর্শ। ভালো মানুষ হতে গেলে তাকেই ভালো করে অনুকরণ করতে হবে।[৬৬]

অতঃপর সমগ্র পুস্তক জুড়ে মুসলমান শিশুর আদর্শ মানুষ হিসেবে তাদের প্রিয় নবীর জীবনকথা, কোরান, হাদিস, ফিকাহ্, নামাজ, রোজা, মসজিদ, কাবা ঘর প্রভৃতি ইসলামি বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে বিশ্ব মুসলমানের ঐতিহ্যের কথা ব্যাখ্যা করে শিশু পাঠককে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে।

২.১.৭ ।। ফুলকুঁড়ি সিরিজ

ইসলামী বাংলা প্রাইমারগুলির মধ্যে বহু প্রচলিত একটি প্রাইমার হল ফুলকুড়ি সিরিজ। এই প্রাইমারটি মোট সাতটি পর্যায়ে রচিত হয়েছে। নিচে সংক্ষেপে এগুলির পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হলো।

২.১.৭. ক।। ফুলকুঁড়িদের অ আ ক খ

এই প্রাইমারটি প্রকাশিত হয়েছে ছাত্রবন্ধু প্রকাশনী থেকে। রচয়িতা মুহাম্মদ নূরুদ্দিন। প্রকাশকাল অনুল্লিখিত। তবে এই প্রাইমারটিকে 'ফুলকুঁড়ি' সিরিজের প্রথম পর্যায় বলে আমাদের মনে হয়। প্রাইমারটি বর্ণ ও শব্দ শিক্ষার উদ্দেশ্যে মাত্র ৮ পৃষ্ঠার অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে রচিত হয়েছে।

ফুলকুঁড়ি অ আ ক খ -তে ইসলামি প্রসঙ্গ :

অ – অজু, আ – আযান, ই – ইজতেমা, ঈ – ঈদ

আবার ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয় অংশে পাই –

ক – কুরআন, ম – মসজিদ ইত্যাদি।

প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায় শব্দ শিক্ষার পাশাপাশি দুটি করে ছড়া সংযোজিত হয়েছে। সেখানেও প্রকৃতি প্রেমের কথা যেমন উচ্চারিত হয়েছে তেমনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে যেমন-

আল্লাহ হলেন সবার বড়

তারপরও কেউ নাই

আমরা সবাই মুমিন শিশু

তার গুনগান গাই।[৬৭]

লক্ষ করবার বিষয় পাঠের গোঁড়াতেই 'মুমিন শিশুদের' কথা উল্লেখ করে শিশু পাঠকদের মনেও যেন 'মুমিন' বালকের আদর্শ খাড়া করবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

২.১.৭. খ।। ফুলকুড়ি প্রবেশিকা – ১

এই প্রাইমারটির আখ্যাপত্রে রচয়িতা মুহাম্মদ নূরুদ্দীন জানিয়েছেন 'নার্সারি স্কুল, শিশু মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক শিশু শ্রেণীর (লোয়ার নার্সারী) উপযোগী বর্ণপরিচয়'। এখানেও 'ফুলকুঁড়িদের অ আ ক খ' প্রাইমারটির অনুরূপ শব্দ এবং বর্ণ বিন্যস্ত হয়েছ।

শব্দ পরিচয় অংশে ইসলামী শ্রেষ্ঠত্বের নমুনা রয়েছে। যেমন – হেলাল, বেলাল, আলিম, হাফেজ ইত্যাদি। আবার ছবির অংশে আমরা লক্ষ করছি আদর্শ মানুষ হিসেবে ড. জাকির নায়েকের ছবি সন্নিবেশিত হয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে মুসলমান সমাজের শিশুদের কাছে আদর্শ মানুষের একটা প্রতিরূপ খাড়া করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

২.১.৭. গ।। ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২

মুহাম্মদ নূরুদ্দীন ও শেখ নাসির উদ্দিন আহমেদ রচিত এই প্রাইমারটিতে বর্ণের আদ্যতা নীতি মেনে রচিত হয়েছে। এটি 'নার্সারি স্কুল, শিশু মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণীর (আপার নার্সারী) উপযোগী বর্ণপরিচয়'। এখানেও প্রথমে স্বরবর্ণ পরিচয় পরে ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয় সন্নিবেশিত হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই ইসলামিক প্রসঙ্গই আধিক্য পেয়েছে। যথা -

স্বরবর্ণ পরিচয় অংশে ইসলামি প্রসঙ্গ

অ - অজু করে পড়ো নামাজ

আ- আদম হতে মানব সমাজ

ই - ইসলাম হল সঠিক পথ

ঈ - ঈদের দিনে মিলাও হাত

এ - এশার নামাজ রাতের বেলা ইত্যাদি

ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয় অংশে ইসলামী প্রসঙ্গ

ক - কুরআন হলো জীবন বিধান

খ - খোদার এ - যে মহান দান

গ - গুনাহ হলে তওবা কর

ঘ – ঘরে ঘরে কুরআন পড়

ঙ - রাঙা ভোরের আগে জাগো / ফজর কালে রহম মাগো

ণ - মরণ সবার হবেই জানি / কুরআন হাদিস সঠিক মানি

ত - তালিম নাও মাদ্রাসায়

থ - থান পূজাতে শির্ক হয়

শ - শরীয়তের বিধান চায় / খোদার পথে চলবো ভাই। ইত্যাদি

উপরোক্ত বাক্যগুলিতে পূর্ববর্তী প্রাইমারগুলির মতোই ইসলামি অনুষঙ্গ এসেছে। লক্ষণীয় শিক্ষার ব্যাপারে মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব ঘোষিত হয়েছে এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সতর্কতা ঘোষিত হয়েছে। এই প্রাইমারটিতেও বর্ণ যোগে শব্দপরিচয় অংশে ইসলামি অনুষঙ্গ অগ্রাধিকার পেয়েছে। যেমন – বরকত, জমজম, ফজর, ওমর, রহম, কাওসার, রহমত, জামাত, জাকাত, নামাজ, সাহাবা, মাদ্রাসা, ইফতার, কারবালা ইত্যাদি।

ছড়া আকারে ইসলামী অনুসঙ্গ এসেছে। যথা – মসজিদ করা চাই / তিরমিজি পড়া চাই। বেলাল আযান দেয় ঐদুর মিনারে / ঘর ছেড়ে বের হও অলসতা নাহি রে।

ছড়াটির স্পষ্ট উদ্দেশ্য সহজেই অনুমান করা যায়, মুসলমান বালকের কর্তব্য হল – মসজিদ নির্মাণ, তিরমিজি হাদিস পাঠ এবং অলসতা ত্যাগ করে সকাল সকাল মসজিদমুখী হওয়া। লক্ষ করবার বিষয় শৈশব থেকেই মসজিদ ও ধর্মমুখী পাঠ আলোচ্য প্রাইমারটির মূল লক্ষ্য।

২.১.৭. ঘ।। ফুলকুঁড়ি - প্রথম পাঠ

'ফুলকুঁড়ি প্রথম পাঠে'র রচয়িতা মুহাম্মদ নূরুদ্দীন। প্রাইমারটির আখ্যাপত্রে বলা হয়েছে – 'সমস্ত নার্সারি স্কুল শিশু মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য'। ফুলকুঁড়ির 'প্রবেশিকা'তে বর্ণ ও শব্দগঠনের পাঠদানের পর প্রাইমারটিতে শুরু হয়েছে সুদীর্ঘ বাক্য পরিচয় অংশ। আলোচ্য প্রাইমারটি অনেকখানি বিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত প্রাইমার 'কিশলয়' এর আদলে রচিত হয়েছে। এই কারণে শব্দ গঠন অংশে এই প্রাইমারটি অনেক বেশি পূর্ববর্তী প্রাইমারগুলি অপেক্ষা ধর্মনিরপেক্ষ এবং সংস্কৃতিক বহুত্ববাদে বিশ্বাসী। তবে ইসলামি প্রসঙ্গই মূল অন্বিষ্ট। যেমন –

> এখন সকাল।
>
> ফজর নামাজ হলো । এবার মাদ্রাসা চল।
>
> বই নাও, খাতা নাও, আর কলম নাও ।
>
> এবার পড়ায় মন লাগাও।[৬৮]

লক্ষ করবার বিষয় সকাল হওয়ার অনুষঙ্গে প্রথমেই আসছে নামাজের কথা, আর পড়ার অনুষঙ্গে আসছে মাদ্রাসায় পাঠ গ্রহণের কথা। অর্থাৎ মুসলমান বালককে নামাজ ও মাদ্রাসামুখী করার প্রসঙ্গে 'ফুলকুঁড়ি' সদা জাগ্রত। পাঠটির পাশে একজন পাঞ্জাবি ও ফেজ টুপি পরিহিতি শিশুর ছবি লক্ষ করা যায়, যার মধ্যে দিয়ে মুসলমান বালকের পোশাকের সংকেত পাঠকের গোচরে আনা হয়েছে।

চতুর্থ পাঠে আমরা লক্ষ্য করি পাঠ্যবস্তুর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সেখানে বলা বলা হয় নবীর কথা হলো হাদিস। হাদিসে আমির গরিব সবাই সমান। হাদিস পড়া দরকার। বুখারী শরীফ একটি হাদিস সংকলন।[৬৯]

দশম পাঠে আমরা দেখি একজন ছোট্ট বালক যার নাম খোকন, সে রোজা রাখবে বলে বায়না ধরেছে। লেখক এখানে রোজা রাখার কর্তব্যবিধি সমঝে দেবার পাশাপাশি রোজার প্রকৃত সংজ্ঞা এবং তা পালনের পথও বাতলে দিয়েছেন। সুকৌশলে যেন সকল বালককে খকনের মতো হয়ে ওঠবার পরামর্শ ধ্বনিত হয়েছে।

২.১.৭. ঙ।। ফুলকুঁড়ি – দ্বিতীয় পাঠ

ফুলকুঁড়ি দ্বিতীয় পাঠ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'সমস্ত কিন্ডার গার্ডেন স্কুল, শিশু মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালযয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যক্রম অনুযায়ী রচিত'। রচয়িতা মুহাম্মদ নূরুদ্দীন ও শেখ নাসিরউদ্দীন আহমদ।

'ফুলকুঁড়ি দ্বিতীয় পাঠ' রচিত হয়েছে খানিকটা 'সহজ পাঠে' আদর্শ অনুসরণ করে। অবশ্যই তার সঙ্গে ইসলামিক চিন্তাভাবনার যথোপযুক্ত প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। যেমন প্রতিটি পাঠে কোরান হাদিসের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়, তেমনই প্রাত্যহিক জীবনে কোরানের বাণী প্রয়োগের নির্দেশও বর্ষিত হয়েছে। 'আল্লাহ মহান' নামক প্রথম কবিতাটিতে আল্লাহর গুণকীর্তন গাওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় পাঠের আমিনা নামক একটি বালিকার পড়াশোনা কথা স্থান পেয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষার ছবিটি ধরা পড়ে। তবে মনে রাখতে হবে আমিনার পাঠ্য বিষয় প্রথমে কুরআন তারপর বই। প্রাইমারটির বর্ণনা অনুসারে –

> আমি আমীনা, আমি রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠি। মুখ ধুই। ওজু করি। তারপর নামাজ পড়ে পড়তে বসি। কুরআন পড়ি। বই পড়ি।[৭০]

লক্ষ করবার বিষয় আমিনা প্রথমে যেটি পড়ে তা হল – 'কুরআন'। তারপরে 'বই'। এর মধ্যে দিয়ে যেন বালিকার প্রথম পছন্দ হিসেবে কুরআনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। জ্ঞানানুশীলনের থাকবন্দি বিন্যাসে ধর্মীয় পাঠই প্রথম ও প্রধান – ঠারেঠোরে এই তত্ত্বই যেন প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। আবার উক্ত পাঠটিতেই পাই –

> হাসান ওই আসছে। পারভীন ও আসলাম আগে চলে গেছে। আজ মাওলানা সাহেব কুরআন পড়াবেন। আমি মন দিয়ে পড়ি, পড়া শিখি। ছুটি হলে আমরা সবাই একসাথে বাড়ি ফিরি। দাদাজি রোজ কত কাহিনী বলেন। কুরআনের কাহিনী। আদম হাওয়া আর ইউনুস (আঃ) কাহিনী।[৭১]

আমরা জানি প্রচলিত বাংলা প্রাইমারে মুসলমান জীবনের অভাব লক্ষ করেই উনিশ শতকে ইসলামি বাংলা প্রাইমার রচিত হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, হিন্দু বাঙালির সাহিত্যে মুসমান বালক বালিকাদের পাঠ করবার মতো কোনো উপকরণ নেই। তাইই বিকল্প প্রাইমারের সূচনা। লক্ষ্য করবার বিষয় এখানে বালক বালিকাদের আনন্দদানের জন্য রামায়ণ-মহাভারত কিংবা হিতোপদেশ কথামালার গল্প নয় কুরআনের গল্পকেই গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমান বালক বালিকার পাঠ

নির্ধারিত হয় কঠোরভাবে ধর্মীয় পরিসরেই। সে নিজে ঠিক করে না, সে কী পড়বে। বড়োদের নির্বাচনেই বার বার ঘুরে ফিরে আসে কোরান ও হাদিসের পাঠ।

অনুরূপ পাঠ –

> মাদ্রাসাতে যাবে খোকন / পড়বে খোদার কালাম। / গুরুজনের করবে সেবা / দেবে সবার সালাম। / শিখবে কত কুরআন হাদিস / জানবে ইতিহাস / কোথায় কেমন মানুষ ছিল / কেমন তাদের বাস / ভূগোল পড়ে জানবে খোকন কেমন চাঁদের মাটি / কোনটি আসল কোনটি নকল / কোনটি চরম খাঁটি।"[৭২] (খোকার পড়া)

খোকার পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে এখানে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও ভাষা শিক্ষার কথা বলা হলেও প্রথমেই এসেছে কোরান ও হাদিসের কথা। আর তার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পূর্ব নির্ধারিত; আর তা হল – মাদ্রাসা।

২.১.৮।। এসো জীবন গড়ি

বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'এসো জীবন গড়ি' প্রাইমারের পরিপূরক পাঠ। এই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'প্রথম কথা' অংশে রচয়িতা আব্দুল মাবুদ জানিয়েছেন –

> কচি কিশোরদের কচি থাকাতেই গড়ে তুলতে হবে। এজন্য ইসলামের আদর্শই সবচাইতে উপযোগী। চরিত্র গঠনের এর চাইতে ভালো উপাদান আর কোন আদর্শেই পাওয়া যাবে না। ইসলাম মানুষকে যেভাবে গড়ে তুলতে চায়, তাকে যে সমস্ত সদগুণের আধারে দেখতে চায়, তাকে যেভাবে আল্লাহর বান্দা, মানুষের সেবক ও দুনিয়ার পরিচালক রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সে সব দিকে দৃষ্টি রেখেই কচি কিশোরদের জন্য এই বই তৈরি করা হয়েছে।[৭৩]

প্রসঙ্গত লেখক বর্তমান সময়ের শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত বইপত্রকে সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর এই পুস্তক প্রণয়নের অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন -

> অধুনা কিশোরদের নিছক হাসিখুশি দু'চারটে উপাদান দিয়েই এগিয়ে দেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ পদ্ধতি কিশোরদের যথার্থ মানুষ রূপে গড়ে তোলা তো দূরের কথা তাদের মধ্যে কোন আধুনিক সভ্য দেশের সচেতন ও উন্নত নাগরিকের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। আধুনিক সমাজকে এ সংকট থেকে মুক্ত করার জন্যই এই প্রচেষ্টা।[৭৪]

লেখকের বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট যে, শিশুশিক্ষার জন্য আনন্দময় পাঠ্যপুস্তক তাঁর অভিপ্রেত নয়। বরং আনন্দময় হাসিখুশির উপকরণ সম্বলিত বই তাঁর কাছে সভ্য ও সচেতন নাগরিক গড়ে

তোলার বাধাস্বরূপ। অতঃপর তিনি গোঁড়া থেকে শিশুর পাঠকে তত্ত্ব, উপদেশ ও নানাবিধ অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে চালিত করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ইসলামের ইতিহাস থেকে সেই সমস্ত অতীত ঐতিহ্যকে সংকলন করে শিক্ষার্থীর পাঠ ও জীবনকে শৃঙ্খলিত করছেন বলে আমাদের মনে হয়।

২.১.৯।। আমাদের ছড়া

শেখ ফজলুর রহমান রচিত 'আমাদের ছড়া' বর্ণ কিংবা অক্ষর শিক্ষার বই নয়। প্রাথমিক স্তরে ভাষা শিক্ষার জন্য রচিত এটি একটি ছড়ার বই। বইটি মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত।

২.১.৯.ক।। আমাদের ছড়া – ১

পুস্তকটির নামকরণের মধ্যে দিয়েই 'আমরা – ওরা' সূক্ষ্ম রাজনীতি সুস্পষ্ট। কে বা কারা এই বইতে আমরা? এই প্রশ্নের সহজ জবাব মিলবে দু'চারটি ছড়া পাঠ করলেই। এমনকি সমস্ত ছড়াগুলিতেই এই 'আমরা'ই মূল আলোচ্য বিষয়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংকলিত ছড়াগুলির মধ্যে দিয়ে ইসলামি অস্মিতার এক আগ্রাসী বিন্যাস লক্ষ করা যায়। কেননা এখানে 'শিশু' তার সর্বজনীন ও সর্বকালীন পরিচিতিসত্তার পরিবর্তে একমাত্রিক ধর্মীয় পরিচয়ে সীমায়িত, সে – 'মুসলমান'। তাই প্রথম ছড়াতেই ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুকথক বিচলিত, তাই ধর্মীয় বোধের জায়গা থেকে সে বলে -

রাত পোহালো ফজর হলো
ডাকছে মুয়াজ্‌জিন।
ঘুমের চেয়ে নামায ভালো,
কায়েম করো দ্বীন।[৭৫]

দ্বিতীয় ছড়া

অজু করে কাপড় প'রে
মসজিদেতে যাই।
আল্লাহ হলেন সবার বড়ো।
তার বড় কেউ নাই।[৭৬]

এখানে যেমন সকাল সকাল নামাজ এবং মসজিদ গমনের আদেশ বর্ষিত হয়েছে তেমন বাকি ছড়াগুলিতে এক ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা ও ভক্তি ভাব প্রদর্শিত হয়েছে।

সমগ্র পুস্তকটি জুড়ে ধর্মীয় আদেশ নির্দেশ এবং অনুষঙ্গ এতটাই প্রবলভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছে যে নামাজ, ইবাদত, রোজা এবং প্রাত্যহিক ধর্ম পালনের বাইরে আনন্দময় এই প্রকৃতি ও বৈচিত্র্যময় বিশ্বজগতের কোন বর্ণনা নেই।

২.১.৯.খ।। আমাদের ছড়া – ২

'আমাদের ছড়া – ২' সংকলনটির সংকলক মুহম্মদ নূরুদ্দীন। এখানে যে ছড়াগুলি সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে ধর্মীয় অনুষঙ্গের বাইরে শিশু শিক্ষার্থীকে প্রকৃতির সঙ্গে কম বেশি পরিচয় করানো হয়েছে। প্রসঙ্গত এখানে সুকুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রীতিভূষণ চাকি, দেবিকা রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অমিতাভ চৌধুরী, শেখ নাসির উদ্দিন, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, আজিজুল হক, মহসিন মল্লিক প্রমুখের বিভিন্ন ছড়া সংকলিত হয়েছে।

২.১.১০।। এসো পড়তে শিখি

বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য প্রাইমার 'এসো পড়তে শিখি' রচয়িতা মোহাম্মদ আলাউদ্দিন। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন –

> শিশুদের জন্য বাজারে বইয়ের অভাব নেই। কিন্তু শিশুদের মনের উপযোগী বই সত্যিই খুব কম। সাধারণত শিশুরা আশেপাশের জিনিস বা পরিচিত শব্দ মাধ্যমে ভালোভাবে বুঝতে শিখতে পারে। যে পরিবেশের মাঝে একটি শিশু গড়ে ওঠে সেখানকার প্রচলিত রীতি নীতি আচার ব্যবহার ও কথাবার্তা সহজেই শিশু মনকে নাড়া দেয়। শিশুদের প্রাথমিক পাঠাভ্যাসের সময় তাই একান্ত পরিচিত শব্দ ব্যবহার হওয়ায় বাঞ্ছনীয়।[৭৭]

লেখকের এই খোদোক্তি থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, প্রচলিত বাংলা প্রাইমারে মুসলমান বালকের পরিচিত শব্দের অভাব তাকে পাঠ্য বিষয়ের থেকে এক বিরাট ব্যবধানে সরিয়ে রেখেছিল। লেখক বর্তমান প্রাইমারে সেই সমস্যা থেকে উদ্ধারের জন্য পরিচিত শব্দ ও পরিচিত জগতের সমন্বয়ে 'মুসলমান বালকের অনুকূল' প্রাইমার রচনা করেছেন। এ'প্রসঙ্গে লেখক আরো জানিয়েছেন - "যথাসম্ভব শিশুদের পরিচিত শব্দের গণ্ডির মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে। তবে কিছু এমন নতুন শব্দের ব্যবহার শেখানো হয়েছে পরবর্তীতে যেগুলির সম্মুখে তাদের অহরহ আসতে হবে।"[৭৮]

স্বাভাবিকভাবেই এই পুস্তকে যে সমস্ত শব্দ বিন্যস্ত হয়েছে সেখানে ধর্মীয় অনুষঙ্গের প্রাবল্য লক্ষণীয়। যেমন -

> আমার রব / তোমার রব / সবার রব/ সবের রব / নীল আসমান / সারা জাহান / মেহেরবান / রবের দান[৭৯]

অন্যান্য প্রাইমারের মতো এই প্রাইমারটিতেও বৃহত্তর ক্ষেত্র জুড়ে ইসলামি প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। যথা –

> ক. "আমরা হযরত মহম্মদ সাল্লাল্লহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম – এর উম্মত। তিনি আমাদের নবী। আমরা তার সুন্নাত মেনে চলি। আর কারো নয়।"
>
> খ. "বই উত্তম সঙ্গী। যে পড়াশোনা করে না সে অজ্ঞ। আর যে কুরআন পড়ে না ও শুনেনা সে আল্লাহর হেদায়েত থেকে বঞ্চিত। আমরা কখনো সীমালংঘন করব না"
>
> গ. "মসজিদ শ্রেষ্ঠ স্থান। মসজিদ হলো আল্ললাহর ঘর। আর নিকৃষ্ট ও খারাপ জায়গা হলো বাজার। দুষ্টু লোকেরা মসজিদে যায় না।"
>
> ঘ. "সব প্রশংসা আল্লাহর। তিনি অতি পবিত্র। ... আমরা সকলে তার আশ্রয় চাই। তিনি আমাদের একমাত্র মিত্র।"
>
> ঙ. "পারভীন আমার ছোট ভগ্নি। লেখাপড়ায় সে অধিক যত্নবান। ... জান্নাত কেমন, জাহান্নামে আগুন ভরা কেন – এইসব প্রশ্ন তার মনে। ... বাড়ির মধ্যেও সে পর্দা মেনে চলতো।"

উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে আমরা মুসলমানের আদর্শ, করণীয় এবং নারীর পর্দাপ্রথার সমর্থনের নমুনা পাচ্ছি।

২.১.১০।। ইসলাম শিক্ষা

আলোচ্য শিশু পুস্তকটি অক্ষরবর্ণ কিংবা ভাষা শিক্ষার জন্য রচিত হয়নি। বরং শিশু শিক্ষার্থীর মনে ইসলামী শিক্ষাকে পরিপক্কতা দানের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। এই পুস্তকের 'প্রথম কথা' অংশে রচয়িতা পুস্তকটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন -

> বাংলায়... শিশুদের উপযোগী করে লেখা বইয়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ইসলামের সমস্ত আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-আমলগুলিকে শিশুদের মনের মতো করে পরিবেশন করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে এগুলো এমনভাবে পেশ করা প্রয়োজন যার ফলে শিশু মন তার অনেক জিজ্ঞাসার জবাব পেয়ে যায় এবং এগুলোকে নিজের মনের কথা বলে মেনে নিতে পারে। শিশু অবস্থাতেই যদি ইসলামের সমস্ত আকীদা ও আমল শিশু মনে গভীর রেখাপাত করতে পারে তাহলে পরিণত বয়সেও সে তার প্রভাব এড়াতে পারবেনা। তার জীবন একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়ে উঠবে। তার জীবনধারা একটা বিশেষ খাতে প্রবাহিত হবে। এই শিশুই হবে একটি সুখী শান্তিময় সমাজের পরিগঠক।... শিশুদের এভাবে গড়ে তোলার জন্য আমরা ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা আকীদা বিশ্বাস ইবাদাত ও আমল কে প্রাঞ্জল ভাষায় সহজবোদ্ধ করে পেশ করার চেষ্টা করেছি।[৮০]

উপরিউক্ত ভূমিকা থেকে একথা স্পষ্ট যে বইটির মূল উদ্দেশ্য শৈশব থেকে শিশু মনে ইসলামের শিক্ষা ও সংস্কারকে দৃঢ়বদ্ধ করা এবং সেই শিক্ষার আওতায় শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তার জীবনের নিয়ন্ত্রণ কব্জা করা। তাই এই পুস্তকে শিশুকে 'দ্বীনের জন্য প্রাণ উৎসর্গ' থেকে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম তালিম করার পাঠ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত 'নামাজ কেন পড়বো?' তার শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদান করে শিশু পাঠককে নামাজের আওতায় আনা হয়েছে। 'মুসলিম ছেলের চরিত্র' শীর্ষক অংশে মুসলমান বালকদের করণীয় সম্পর্কে - আল্লাহ ভীতি, সত্য বাক্য, সদাচার পালন, ছোটদের ভালোবাসা ও বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

২.১.১১।। ছোটদের ইসলাম শিক্ষা

এটি বাংলা ভাষায় রচিত ইসলামি প্রাইমারের একটি জনপ্রিয় সিরিজ 'ছোটদের ইসলামি শিক্ষা'। এটিতে বর্ণ, অক্ষর কিংবা শব্দ, বাক্য শিক্ষার কোনো আয়োজন নেই। তবে ইসলামি তরিকায় শিশুকে শিক্ষাদান ও বড়ো ক'রে তোলবার ব্যাপারে এই প্রাইমারটির প্রচেষ্টা স্পষ্ট। প্রাইমারটির মোট চারটি ভাগ –

ক. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা – ১

খ. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা – ২

গ. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা – ৩

ঘ. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা – ৪

প্রাইমারটির আখ্যাপত্রে বলা হয়েছে – 'সমস্ত নার্সারি স্কুল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু মাদ্রাসার উপযোগী ইসলাম শিক্ষার প্রথম পাঠ'। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ভাগে দ্বিতীয় পাঠ, তৃতীয় ভাগে তৃতীয় পাঠ ও চতুর্থ ভাগে চতুর্থ পাঠ বলা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগগুলিকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্য হিসেবেই পরিকল্পনা করা হয়েছে। চারটি ভাগে রচিত 'ইসলাম শিক্ষা'র রচয়িতা মুহাম্ময়াদ নূরুদ্দীন।

প্রাইমারটির 'প্রাক কথন' অংশে বলা হয়েছে

> শিশুদের উপযোগী ইসলাম শিক্ষার বইয়ের একান্ত অভাব। ... এই অভাব পূরণ করার জন্য ধারাবাহিকভাবে ইসলাম শিক্ষা প্রকাশে আমরা হাত দিয়েছি। প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত চারটি ভাগে ইসলাম শিক্ষাকে ভাগ করা হয়েছে প্রতিটি শ্রেণীতে ইসলাম শিক্ষাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।[৮১]

পুস্তকটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখকের স্পষ্ট ঘোষণা –

> ইসলামের আকিদা, কুরআন, হাদিস, ইবাদত, নবী রাসূলদের জীবনী সাহাবাদের কথা সহ মুসলিম ঐতিহ্যের সম্পর্কে কিছু কিছু কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাঝে মাঝে দেওয়া হয়েছে কিছু দোয়া দরুদ ও সুন্নাত – এ - রাসুলের আদর্শ।[৮২]

সোজাকথায় এই শিশুপাঠ্য পুস্তকটিও পূর্ববর্তী পুস্তকগুলির পথে হেঁটেছে এবং ইসলামি ঐতিহ্যের সঙ্গে শিশু পাঠকের পরিচয় সাধনের মধ্যে দিয়ে তার ধর্মীয় পরিচিতিসত্তাকে মজবুত করতে প্রয়াসী হয়েছে।

অতঃপর 'ইসলাম শিক্ষা' *প্রথম খন্ডের* মূল বর্ণিত বিষয় ইসলামের সংজ্ঞা, কুরআনের উৎপত্তি ও মানব জীবনে তার প্রাসঙ্গিকতা সেইসঙ্গে কিছু অলৌকিক ঘটনা সহযোগে বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনের প্রচেষ্টা।

'ইসলাম শিক্ষা' দ্বিতীয় খন্ডের পাঠ্য বিষয় ঈমান। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়া। ইসলামের পাঁচটি অঙ্গের সঙ্গে পরিচয় এবং নবী ও তার সাহাবাদের জীবন কথা বর্ণনা।

'ইসলাম শিক্ষা' তৃতীয় খন্ড সমস্ত নার্সারি স্কুল প্রাথমিক বিদ্যালয় শিশু মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণীর উপযোগী করে রচিত। এই গ্রন্থটির পাঠ্য বিষয় আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ব প্রতিষ্ঠা। সেইসঙ্গে অজুর পদ্ধতি ও প্রকরণ, আজানের অর্থ এবং আজান শেষের দোয়া, নামাজের বিস্তারিত বিবরণ।

বিশেষ বিশেষ নামাজ পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা। সবশেষে ইসলামি পোশাকের নমুনা, আচার ব্যবহারে ইসলামি চিহ্নের ব্যবহার ইত্যাদি প্রসঙ্গে তালিম দান।

'ইসলাম শিক্ষা' চতুর্থ খন্ডটি রচিত হয়েছে সমস্ত নার্সারি স্কুল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু মাদ্রাসার চতুর্থ শ্রেণীর উপযোগী করে। এই খণ্ডটিতে আলোচ্য বিষয় ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সমূহ। যথা - সালাত, বেনামাজির বিবরণ। পবিত্রতা অর্জনের নানান উপায়, নামাজ আদায়ের ধারাবাহিক পদ্ধতি এবং বিভিন্ন প্রকারের নামাজের বিস্তারিত বিবরণ। প্রসঙ্গত দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের অবদান ও অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত।

২.১.১২।। ছড়া ও রাইমস

ধর্মের উপর ভিত্তি করে শিশু পাঠকের জন্য যে পৃথক ছড়া সংকলন গড়ে তোলা সম্ভব তার আদর্শ নমুনা 'ছড়া ও রাইমস'। এই পুস্তকটির সংকলকের নাম অনুল্লিখিত। এটির প্রথম প্রকাশ ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে। পুস্তকটির আখ্যাপত্রে বলা হয়েছে – 'সমস্ত শিশু মাদ্রাসা নার্সারি ও কেজি স্কুলের শিশু শ্রেণীর জন্য আদর্শ ছড়ার বই'।

ছাত্রবন্ধু প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত এই ছড়ার সংকলনটিতে প্রথম দশটি পৃষ্ঠা জুড়ে ১৪ টি বাংলা ছড়া সংকলিত হয়েছে। পরবর্তী চৌদ্দটি পৃষ্ঠা জুড়ে মোট ১৫ টি ইংরেজি ছড়া সংকলিত হয়েছে। প্রকৃতিগত দিক থেকে পূর্ববর্তী ছড়া সংকলন থেকে এটি একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র সংকলন। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বর গুপ্ত, সুকুমার রায়ের ছড়া যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি জসীমউদ্দীন, শামসুর রহমান, আল মাহমুদ, ফারুক আহমেদ, বিভাবতী সেন ও কাজী নজরুল ইসলামের ছড়া স্থান করে নিয়েছে।

২.১.১৩।। শিশুকথা

৯/এইচ/৪, শরীফ লেন, কলকাতা – ১৬, আদর্শ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে ইসলামি বাংলা প্রাইমারের একটি গুচ্ছ। আদর্শ প্রকাশনী প্রকাশিত এই প্রাইমারগুচ্ছে আছে মোট পাঁচটি শিশুপাঠ্য পুস্তক। 'শিশুকথা' নামেই যেগুলির আবির্ভাব। এই প্রাইমারগুলির প্রথম প্রকাশের নির্দিষ্ট কোনো সাল তারিখ উল্লেখ করা নেই পুস্তকগুলিতে। তবে অনুমান করা চলে যে, এই পাঠ্যপুস্তকগুলি ২০১৭ সালের পূর্ববর্তী নয়।[৮৩] পুস্তকগুলির রচয়িতা হিসেবে জামান মুস্তাফিজুর রহমান, সম্পাদক – জামান মুস্তাফিজুর রহমান এবং পরিকল্পনায় – এস. এম. শরফুদ্দীনের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

'শিশুকথা' মোট পাঁচ খণ্ডে আলাদা আলাদা পাঠ এবং আলাদা আলাদা আখ্যান অথচ প্রায় একই উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়েছে। *'শিশুকথা'* পাঠ্যপুস্তকগুচ্ছের প্রথম অংশ হল *'শিশুকথা'* (প্রবেশিকা)। পুস্তকের নামকরণের মধ্যে দিয়েই অনুমান করা যায় যে, 'শিশুকথা'র আখ্যান ভুবনে প্রবেশের চাবিকাঠি এই প্রথম বইটি। এরপর পুস্তকটির ভাবনার পরম্পরা সূত্রে একে একে বাজারে এসেছে 'শিশুকথা' (প্রথম ভাগ), 'শিশুকথা' (দ্বিতীয় ভাগ), 'শিশুকথা' (তৃতীয় ভাগ) এবং 'শিশুকথা' (চতুর্থ ভাগ)।

'শিশুকথা'র প্রবেশিকা থেকে চতুর্থ ভাগ পর্যন্ত প্রত্যেকটি পুস্তকের ভূমিকা অংশে এই বইয়ের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে 'দু-চার কথা' বলা হয়েছে। বইয়ের উদ্দেশ্য কী? অথবা এই বইয়ের 'টার্গেট রিডার' কে বা কারা? উনিশ শতকের প্রখ্যাত লেখক মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) রচিত 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা' বা এ'কালে প্রকাশিত অন্যান্য প্রতিনিধি স্থানীয় ইসলামি প্রাইমারে তার 'টার্গেট রিডার' সম্পর্কে যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে 'শিশুকথা'তে সে'রকম কোনো নির্দিষ্ট পাঠকের কথা উল্লেখিত না হলেও 'দু-চার কথা' অংশে একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে 'শিশুকথা'র শিশুরা সর্বজনীন শিশু নয় – তা হল এক বিশেষ গোষ্ঠীর শিশু। আর তাঁরা হলেন 'মুসলমান'। এই গ্রন্থের মোটামুটি পাঁচটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য পাওয়া যাচ্ছে –

ক. মাতৃভাষা প্রীতি প্রদর্শন

খ. শিশুর মনের অধিকার কায়েম করা

গ. 'শিশুকথা'র বিকল্পাত্মক দিকটি চিহ্নিত করণ ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইসলামি আদর্শ প্রচার করা

ঘ. বাংলা বর্ণ সম্পর্কে পরিচয় দান করা

লক্ষ করবার বিষয় হল প্রাইমারের প্রাথমিক উদ্দেশ্যই হল বর্ণ ও সংখ্যা শিক্ষা এবং এরই পাশাপাশি সেখানে নৈতিক জ্ঞান ও ধর্মীয় চেতনা জাগানো হয়েছে চিরকাল। কিন্তু এখানে বর্ণপরিচয় একেবারে শেষ উদ্দেশ্য।

২.১.১৩.ক।। শিশুকথা প্রবেশিকা

'শিশুকথা' প্রবেশিকার রচয়িতা জামান মোস্তাফিজুর রহমান প্রাইমারির উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে দু চার কথা অংশে রচয়িতা জানিয়েছেন –

> ... শিশুরা কচি মনের অধিকারী। তাদের সেই কচি মনে গেঁথে যাওয়া কথা চিরকাল মনে থাকে। সেই শিশু মনের কথা ভেবে আমাদের নবতম প্রয়াস "শিশুকথা" যা বাজারে প্রচলিত অন্যান্য বইয়ের তুলনায় একটু অন্য ধাঁচের।[৮৪]

লেখকের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, শিশু মনের অধিকার কায়েম করবার উদ্দেশ্যেই অন্যান্য প্রাইমারের মতোই এটিরও বাজারে আবির্ভাব হয়েছে। তবে বইটির বিশেষত্ব সম্পর্কে লেখক যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। তাই তিনি অন্যান্য বই অপেক্ষা এই বইয়ের বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করতেও ভোলেন না। তার মতে সেই অন্য ধাঁচটি হল –

> বইটি বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবে, শিশুদের উপযোগী করে পর্যাপ্ত চিত্র-অনুশীলন সহ ইসলামী আদর্শকে অনুসরণ করে লেখা হয়েছে। পাঠ্যান্তে ইসলামি সম্পর্কে জানার পাশাপাশি শিশুরা ছড়ার আকারে বর্ণপরিচয় ঘটাতে পারবে বলে মনে করি।[৮৫]

লেখকের কৈফিয়ত থেকে একথা স্পষ্ট যে, এই পুস্তকের প্রথম লক্ষ্য ইসলামি আদর্শের প্রতিষ্ঠা, তারপর আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে যেন 'পাশাপাশি ছড়ার আকারে বর্ণ পরিচয়' ঘটবে।

অতঃপর ধর্মীয় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই শুরু হয় প্রবেশিকার পাঠদান। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ শিক্ষার দুটি অংশ জুড়েই ইসলামি জীবনাচরণের বাড়বাড়ন্ত সচেতন পাঠককে বিস্মিত করবে। নিচে কয়েকটি নমুনা পেশ করা হল :

স্বরবর্ণ পরিচয় অংশে ইসলামি প্রসঙ্গ

বর্ণ	ইসলামি প্রসঙ্গ
অ	অজুর শুরুতে বিসমিল্লা বলি
আ	আল ক্বুরআনের পথে চলি
ই	ইসলামে আছে পাঁচটি খুঁটি
ঈ	ঈদের সময় সিমাই কাটি

ঊ	ঊষাকালে ক্বুরাআন পড়ো
এ	এক আল্লাহর ইবাদত করি

ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয় অংশে ইসলামি প্রসঙ্গ

বর্ণ	ইসলামি প্রসঙ্গ
ক	কা'বা আছে ধরার মাঝে
গ	গাছেরাও সব তাসবীহ পড়ে
জ	জমজমের পানি দাঁড়িয়ে খাও
ঝ	ঝড় হলে দোয়া পড়ি
ণ	স্মরণ করো আল্লাহর নাম
ত	তাসবীহ পড়া নিজের কাম
দ	দরজা বন্ধে বিসমিল্লাহ্ বলো
ধ	ধন হলে যাকাত দাও
ন	নবীজীর কথা মেনে নাও
ফ	ফজর ভোরে সবার জানা
ম	মসজিদ হল আল্লাহর ঘর
র	রোজা করতে সাহরী খাও
শ	শান্তি পেতে ক্বুরআন পড়ো
স	সহীহ হাদীস সবাই মানো

সংখ্যা শিখনের ক্ষেত্রে পরিচতি '১ – এ চন্দ্র, ২ – এ পক্ষ' – এর পরিবর্তে ইসলামি তরিকায় সংখ্যা শিক্ষা করানো হয়েছে। যেমন –

১ – এ এক আল্লাহ

২ – এ দুই ঈদ

৩ – এ তিন মসজিদ[৮৬]

৪ – এ চার কিতাব[৮৭]

৫ – এ পাঁচ ভিত্তি[৮৮]

৬ – এ ছয় হাদীস

৭ – এ সাত দোজখ

৮ – এ আট বেহেশ্‌ত

৯ – এ নয় নসীহত

১০ – দশ স্বভাব ইত্যাদি

প্রাইমারটিতে শেষ অংশে মোট ছ'টি ছড়া সংকলিত হয়েছে। সেখানে নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথের ছড়া যেমন সংকলিত হয়েছে, তেমনই প্রাইমারটির পরিকল্পক এস.এফ শরফুদ্দীন রচিত একটি ছড়াও জায়গা পেয়ছে। 'খোকা খুকুর কথা' প্রাসঙ্গিক ছড়াটিতে বলা হয়েছে –

লেখা পড়া শিখব মাগো
কিনবো নাকো গাড়ী,
গড়বোনাকো মস্ত বড়ো
আকাশ ছোঁয়া বাড়ী।
সবার সুখে হাসবো আমি
কাঁদব সবার দুঃখে,
নিজের খাবার বিলিয়ে দেবো
অনাহারীর মুখে।

লক্ষ করবার বিষয় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ‘শিশুশিক্ষা’য় ছিল ‘লেখাপড়া করে যেই / গাড়িঘোড়া চড়ে সেই’। আর ইসলামি ‘শিশুকথা’ শিক্ষাকে উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না। তাই এখানে গাড়ি বাড়ি ও আকাশছোঁয়া যশ প্রত্যাখ্যান করে উচ্চ মানবাদর্শকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সামাজ ভিত্তিক সাম্য প্রতিষ্ঠাই যেন এই প্রাইমারের নিহিত লক্ষ্য।

২.১.১৩.খ।। শিশুকথা প্রথম ভাগ

‘শিশুকথা’ প্রথম ভাগের রচয়িতা জামান মুস্তাফিজুর রহমান। প্রাইমারটিতে বর্ণ ও শব্দ শেখানোর কৌশল গৃহীত হয়েছে আদ্যতা নীতি গ্রহণ করে।

‘শব্দ থেকে বাক্যগঠন’ অংশগুলিতে ইসলামি প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন –

বর্ণ -	বর্ণ যোগে শব্দ ও বাক্যের নমুনা
অ	ফযর পড়। নফল পড়। জমজম বরকতময়। উমমত একমত।
আ	আযান দাও। যাকাত দাও। ঈমান আন। সালাম কর। হালাল খাও। জামায়াত ধর। পরকাল যান। কারবালা জান।
ই	আমি জিকির করি। মসজিদ চলো। হিজরত কর। মনযিল পড়।
ঈ	নবী জানি। হাদিস পড়ি। মদীনা যাব। সাহাবী মানি। তাবলীগ কর। তাশরীফ আন। শরীয়তি বিধান। তাফসীর পড়ি।
উ	কুরআন পড়ো। অজু কর। ফুরকান মানো। সুননাত মানো।
ঊ	রসূল মান।
এ	কলেমা শেখো।
ও	দোযোখ বড়ো কঠিন জায়গা

উপরোক্ত নমুনাগুলিতে আমরা স্পষ্টতই ইসলামি শব্দ ও অনুষঙ্গের ব্যাপকতা লক্ষ করছি। এই প্রাইমারে 'অভ্যাস পাঠ' অংশগুলিতে পাঠককে সরস গদ্যের মধ্যে দিয়ে ইসলামি ভাবনা চিন্তার অভিভাবন করা হয়েছে।

'অভ্যাস পাঠ – ১' এ বালকের পাঠের জন্য আযান দিয়ে জামাত ধরার কথা বলা হয়েছে। এটাই তার সবক। আবার 'অভ্যাস পাঠ – ২' এ শিশু শিক্ষার্থীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে – 'দৈনিক কুরআন পড়। শৈশবে নামায পড়।' শিক্ষার্থী যেন এই নিয়মের লঙ্ঘন না করে তাই তাকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য পরের বাক্য মোক্ষম বিধান দেওয়া হয়েছে – 'কাঁধে দুই ফেরেস্তা।' অদৃশ্য এই ফেরস্তার ভয় দেখিয়ে যেন শিশুর কাছ থেকে কাজ হাসিল করে নিতে চেয়েছে এই প্রাইমার।

২.১.১৩.গ।। শিশুকথা দ্বিতীয় ভাগ

'শিশুকথা' দ্বিতীয় ভাগ প্রাইমারটিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন সহযোগে বাক্য গঠনের নমুনা উপস্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী ধারা মেনে প্রত্যেকটি অধ্যায়ে ইসলামি প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত হয়েছে। নিচে কয়েকটি নমুনা দেওয়া হলো।

নমুনা – ১ : য – ফলা যোগে বাক্য গঠন

> পবিত্র কুরআনের মহান আল্লাহ বলেছেন, তোমরা আনুগত্য কর তাঁর এবং আনুগত্য করো তার রসুলের। আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের আনুগত্য ব্যতীত অন্যের আনুগত্য করলে সেই ব্যক্তি হবে জাহান্নামী। আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে সাফল্য। আর সেটাই কাম্য।[৯০]

আলোচ্য বাক্যটিতে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে আল্লাহ ও তাঁর নবীর উপর আনুগত্য প্রতিষ্ঠার জ্ঞান যেমন বর্ষিত, তেমনই মানুষের আনুগত্য গ্রহণের পরিণতি সম্পর্কেও পাঠককে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

নমুনা – ২ : র – ফলা যোগে বাক্য গঠন

> সবরকম প্রশংসা একমাত্র সত্য মাবুদ আল্লাহর জন্য। ... সদা রবের আশ্রয় চাও। প্রথম মানব আদম (আঃ)। আমরা তাঁরই বংশধর।[৯১]

নমুনা – ৩ : ল – ফলা এবং ব - ফলা যোগে বাক্য গঠন

> আল্লহকে এক জান। আলাহ অদ্বিতীয়। কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলো। নামাজ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে নামাজীকে দূরে রাখে। ... আল্লহর নাম জপ করো।[৯২]

এখানে আল্লাহর একত্ববাদ যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তেমনই নামাজের ব্যবহারিক মূল্যের কথাও ঘোষিত হয়েছে। পঞ্চম পাঠে আমরা একটি অভিনব শিক্ষার কথা জানতে পারবো, যেখানে নারীর সমান্তরালে পুরুষেরও পর্দা প্রথা পালনের কথা বলা হয়েছে :

> পর্দা নারীর ভূষণ। আল-কুরাআনে ছেলেদেরকেও পর্দা করার কথা বলা হয়েছে। ছেলেরা রাস্তায় চলার সময় তাদের দৃষ্টি (নজর)কে সংযত রাখবে। মেয়েরা মায়ে চাদর ঝুলিয়ে নেবে। পর্দা কুনজর থেকে নারীদের রক্ষা করে।[৯৩]

এই পাঠেই শিশুর ধর্মীয় পরিচিতিকে গোঁড়া থেকেই মজবুত করবার জন্য জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে অমোঘ সেই বাণী –

> আমরা মুসলিম। আমাদের ধর্ম ইসলাম। ইসলাম মানুষকে ধর্ম এবং কর্ম দুইই শিক্ষা দেয়। ধর্ম সঠিকভাবে পালন করলে পরকালে জান্নাত লাভের আশা করা যায়।[৯৪]

এখানে শিশুর জান্নাত লাভের বাসনাকে উস্কে দিয়ে ধর্মাচরণে যেমন প্রেরণা জোগানো হয়েছে, তেমনই ইসলামি স্বাতন্ত্রকে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে।

ইসলামি প্রাইমারে ধর্মনিষ্ঠ, আবেগহীন, দায়িত্ব পরায়ণ শিশুপাঠক শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ মান্য করতে করতে অল্প বয়সেই হয়ে পড়ে হাসি-আনন্দহীন জড়বস্তু। তাই তার কাছে গল্প, আড্ডা, আনন্দময় পরিবেশ অসহ্য মনে হয়। সেইরকম এক নিরানন্দ শিশুর স্বরূপ ফুটে উঠেছে 'শিশুকথা দ্বিতীয় ভাগ' এর সপ্তম পাঠে :

> আমি ছোট্ট শিশু। খাঁটি মুসলিম হওয়াই আমার উদ্দেশ্য। তাই আমি ঠাট্টা ভালোবাসি না। অট্টহাসি হাসি না। আড্ডা দিয়ে সময় অপচয় করি না। সদা সর্বদা আল্ললাহর ধ্যানে মত্ত থাকি। পিতামাতা ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা করি। সুন্দর কিছু দেখলে আলহামদুলিল্লাহ্ পড়ি। ভালো কাজে বিলম্ব করি না। দম্ভ প্রকাশ করে নিজের পরকালকে পণ্ড করতে চাই না।[৯৫]

এই পাঠের 'খাঁটি মুসলিম' বালকটি পূর্বের রফিকের যোগ্য উত্তরসূরি। ধর্ম ও শাস্ত্রের শৃঙ্খলিত জগতের মধ্যেই তার চলাফেরা। তাই হাসি-আড্ডা এহ বাহ্য, সময়ের জ্ঞানও তার প্রবল। শিশুসুলভ

কোনো সারল্য তাকে কব্জা করতে পারেনি, তাই পরকালপ্রেমিক এই বালকের ইহজাগতিক যাবতীয় কর্ম পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় জান্নাত প্রাপ্তিকে সামনে রেখেই। আলোচ্য প্রাইমারের এই বালকই মুসলমান শিশুর আদর্শ। যা তাকে আধুনিক জীবনযাত্রা ও আনন্দময় পরিসর থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছে বলেই আমাদের মনে হয়।

‘শিশুকথা’ ২.১.১৩.ঘ।। শিশুকথা তৃতীয় ভাগ

‘শিশুশিক্ষা’ তৃতীয় ভাগ রচিত হয়েছে পূর্ববর্তী ভাগগুলির ভাবনা চিন্তাকে আরও ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা দেবার উদ্দেশ্যে। তাই এখানে শব্দ ও বর্ণ শিক্ষা কিংবা বাক্য পরিচয় নয়, সরাসরি ভিন্ন ভিন্ন গদ্যপাঠ অংশে ইসলামি আদর্শ, অতীত ইতিহাস, ধর্মীয় স্বাজাত্যবোধ প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষা দান করা হয়েছে। অতঃপর তৃতীয় পাঠে সংকলিত বিষয় হল - আদব শিক্ষা, মহান বীর, প্রকৃত বন্ধু, প্রকৃত শাসক, মাতৃভক্তি, নবী ও ভিখারী ইত্যাদি। এই পাঠগুলির মধ্যে দিয়ে মুসলমান বালকের আদব কায়দা পালনের পদ্ধতি, প্রকৃত শাসকের আদর্শ, ইসলামের ইতিহাস থেকে আদর্শ বীরের নমুনা পেশ করা হয়েছে।

২.১.১৩.ঙ।। শিশুকথা চতুর্থ ভাগ

এই পুস্তকটি পূর্ববর্তী প্রাইমারগুলির ধারা অনুসরণ করে সেগুলির ভাব জগতকে আরও বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যেই রচিত। তবে এটির উৎসর্গপত্রটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। যেখানে বলা হয়েছে – ‘বিশ্বের সমস্ত অত্যাচারিত মানব তথা মুসলমানের মুক্তি ও শান্তি কামনায় এবং পরকালে তাদের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত হলো।’[৯৬] একটু তলিয়ে ভাবলে আমরা এই উৎসর্গপত্রে বর্ণিত বন্দী মুসলমানদের স্বরূপ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হবো। আমরা জানি রাজনৈতিকভাবে বিশ ও একুশ শতকের বিশ্বের মুসলমান নানা দিক থেকে অসুরক্ষিত ও অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছে। দীর্ঘদিন দিন ইরাকে মার্কিনী শাসন জারি থেকেছে, আফগানিস্থানেও অনুরূপভাবে বন্দী থেকেছে স্বদেশীরা। তাই বিশ্বের মুসলমানের জন্য প্রাণ কেঁদেছে এই প্রাইমার রচয়িতার।

অতঃপর এই প্রাইমারটিতে নীতিশিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে গল্প ও কবিতা সংকলিত হয়েছে। ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়, সালামের বরকত কিংবা নবীর শিক্ষা প্রভৃতি পাঠের মাধ্যমে শিশু

শিক্ষার্থীকে ধর্মীয় পরিসরেই আঁটকে রাখা হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রাইমারের কবিতাকেও এখানে জায়গা দেওয়া হয়েছে।

২.১.১৪।। ইসলামী বর্ণ পরিচয়

বিদ্যাসাগরের বহুজনপ্রিয়, উনিশ ও বিশ শতকের সর্বাগ্রগণ্য বাংলা প্রাইমার 'বর্ণপরিচয়' (১৮৫৫) – এ কি কোনো মুসলমান শিশুর কথা আছে? গোপাল রাখালদের মতো কি কোনো মসুলমান বালক অথবা বালিকা সেখানে স্থান পেয়েছে? সহজ উত্তর – না, পাওয়া যায় না। আর এই বঞ্চনাবোধ থেকেই রচিত হয়েছে 'ইসলামী বর্ণ পরিচয়'। বিদ্যাসাগর যে 'বর্ণপরিচয়' রচনা করেছিলেন মুসলমান সমাজে তা ছিল গুরুত্বশূন্য এবং পরিতাপের কারণ। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

> আমাদের (পড়ুন মুসলমানদের) শিশুগণকে প্রথমেই রাম শ্যাম গোপালের গল্প পড়িতে হয়। সে পড়ে গোপাল বড়ো ভালো ছেলে। কাসেম বা আবদুল্লা কেমন ছেলে সে তাহা পড়িতে পায় না। এখান হইতেই তাহার সর্বনাশের বীজ বপিত হয়। তারপর সে পাঠ্যপুস্তকে রামলক্ষ্মণের কথা, কৃষ্ণার্জুনের কথা, সীতাসাবিত্রীর কথা, বিদ্যাসাগরের কথা, কৃষ্ণকান্তের কথা ইত্যাদি হিন্দু মহাজনদিগের আখ্যান পড়িতে থাকে। স্বভাবতই তাহার ধারণা জন্মিয়া যায় যে, আমরা মুসলমান ছোটো জাতি, আমাদের মধ্যে বড়ো লোক নাই। হিন্দু বালকগণ ঐ সকল পুস্তক পড়িয়া মনে করে আমাদের অপেক্ষা বড়ো কেহ নয়। মুসলমানরা নিতান্ত ছোটো জাতি। তাহাদের মধ্যে ভালো লোক জন্মিতে পারে না।"[৯৬]

'আল-এসলাম' পত্রিকায় একথা লিখছেন ভাষাবিদ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি সবার নিচে সবার পিছে ও সবহারা মুসলমানকে এবার ঘুরে দাঁড়াতে হলে গড়ে তুলতে হবে বিকল্প বয়ান – প্রয়োজন বিকল্প প্রাইমার থেকে বিকল্প পাঠ্যপুস্তক। রাম, শ্যাম, গোপালের সমান্তরালে কাসেম ও আবদুল্লাদের আখ্যান হয়ে উঠলো জরুরী। সেই ধারাতেই এই প্রাইমারটির আবির্ভাব।

'ইসলামী বর্ণপরিচয়' এমনই একটি প্রাইমার গ্রন্থ যার বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে একজন 'সাচ্চা মুসলমানের' সমস্ত দাবিগুলি অনায়াসেই মিটবে। ছোট্ট এই পুস্তিকাটি পরিকল্পিত হয়েছে দুটি ভাগে। প্রথম ভাগে আছে স্বরবর্ণ পরিচয়। দ্বিতীয় ভাগে আছে ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয়। ১১ টি স্বরবর্ণ এবং ৪০ টি ব্যঞ্জনবর্ণ জুড়ে আছে নির্ভেজাল শাস্ত্রীয় নির্দেশ এবং 'পরম করুণাময় আল্লহতআলার' গুণকীর্তণ ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা।

এই পুস্তিকার শিখনীয় বিষয়গুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে –

ক. নীতিশিক্ষা

খ. আল্লাহর গুণকীর্তন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

গ. শিষ্টাচার ও সহবত শিক্ষা

ঘ. দেশপ্রেম

ঙ. বিস্ময়, আনন্দ, শিক্ষা ও অন্যান্য

উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর সংক্ষেপে দৃষ্টিপাত করলে আমরা বুঝে নিতে পারবো এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য ও অভিমুখ কতটা স্পষ্ট।

ক. নীতিশিক্ষা : পূর্বাপর অন্যান্য প্রাইমারের মতো 'ইসলামী বর্ণপরিচয়ের'ও এর বৃহৎ অংশ জুড়ে ধর্মীয় নীতিকথা আলোচিত হয়েছে। স্বরবর্ণ শিক্ষার জায়গায় ১১ টি স্বরবর্ণের মধ্যে ৯ টিতে ছড়া আকারে নীতিশিক্ষা উপস্থাপন করা হয়েছে। 'অ' – অজগর আসছে তেড়ে, 'আ' – আমটি আমি খাবো পেড়ে এই সমস্ত 'বেয়াদবি'[৯৭] ছড়ার পরিবর্তে শুরুতেই আছে ইসলামের সহবৎ শিক্ষার নিদান। যেমন –

অ – অজু করে নামাজ পড় / ঈমান আমাল শক্ত কর।

আ – আজান শোনার সাথে সাথে / ধরো জামাত দিনে রাতে

ই – ইলমে দ্বীন শিক্ষা কর / দ্বীন ইসলামের খেদমত কর।

ঈ – ঈমান আমাল নিজের হয় / ঘর বাড়ি সব ছাড়তে হয়।

উ – উঠ উঠ মুসলমান / ফজরের ঐ হয় আজান।

ঊ – ঊষাকালে ওজু করে / কোরআন পড় মধুর সুরে।

এ – এ পুলতো কিছুই নয় / পুল সেরাতই আসল ভয়।

ঐ – ঐশীবাণী পাক কোরআন / আঁকড়ে ধর ভাই মুসলমান।

ও – ওজনেতে দিলে ফাঁকি / হতে হবে মহা পাপী ।

ঔ – ঔষধে ভেজাল মহাপাপ / পাবে সবার অভিশাপ।

লক্ষণীয় বিষয় এখানে ১০ টি স্বরবর্ণের সঙ্গেই নীতিশিক্ষা যুক্ত আছে। তাঁর মধ্যে আটটিতে সরাসরি ধর্মীয় নীতিশিক্ষা। আর দুটি যেমন 'ও – ওজনেতে দিলে ফাঁকি / হতে হবে মহা পাপী।' 'ঔ – ঔষধে ভেজাল মহাপাপ / পাবে সবার অভিশাপ।' এই দুটিতে অসাম্প্রদায়িক নীতিশিক্ষার কথা বলা হয়েছে। 'ঋ' বর্ণ শেখার সময় শিশুকে আল্লাহর ক্ষমতা ও দয়া সম্পর্কে আমাদের জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে –'ঋতু ছয়টি সবাই জানে / এই বৈচিত্র্য আল্লার দানে'। সুতরাং আমাদের উচিত আল্লাহর অনুগত হওয়া।

ব্যঞ্জনবর্ণ বিভাগেও এরকম অনেকগুলি নীতিশিক্ষার অবতারণা করা হয়েছে। যেমন –

ক – কোরআন পড় দিনে রাতে / সাফায়াত পাবে আখেরাতে।

খ – খানা পিনা হালাল খাও / মাকরুহ গুলি এড়িয়ে যাও।

ঘ – ঘুমিয়ে নামাজ করলে কাযা / পেতে হবে কঠিন সাজা।

ঝ - ঝগড়া ফ্যাসাদ ত্যাগ কর / আল্লার হুকুম মান্য করো।

ট – টাকা পয়সা করলে দান / আল্লার কাছে পাবে প্রতিদান।

ত – তালিম নাও মাদ্রাসাতে / সঠিক জ্ঞান পাবে তাতে।

য – যতনে ধন বৃদ্ধি পায় / যাকাত দিলে আরো হয়।

র – রাসুল নামে দরুদ সালাম / মেনে চলো হালাল হারাম।

হ – হাদিস কোরআন কেতাব পড় / নবির সুন্নত হয় বড়।

য় – আয়ু যখন শেষ হবে / আমলই তোমার সঙ্গী রবে।

ঃ – দুখী জনের পাশে দাঁড়াও / ইসলামী আদর্শ ভুলে না যাও।

খ. আল্লাহর গুণকীর্তণ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন: একেশ্বরবাদী ইসলাম ধর্মে আল্লাহই প্রথম এবং শেষ কথা। তাই শৈশব থেকে তাঁর প্রতি নিষ্ঠাসহকারে ভক্তি প্রদর্শন করাই হল দস্তুর। তাই বর্ণ শিক্ষার ফাঁকে ফোঁকরে শিশুকে সেই নিদান সম্পর্কে সমঝে দেওয়া হয়েছে। যেমন –

ঋ –'ঋতু ছয়টি সবাই জানে / এই বৈচিত্র্য আল্লার দানে'

ধ – ধন দৌলত সোনার ফসল / আল্লার রহমতে হয় সকল।

ফ – ফল ফুল ও ক্ষেতের ধান / সবই আল্লাহ তোমার দান।

ল – লাঙ্গল চালান চাষী ভাই / আল্লার রহমতে ফসল পাই।

ষ – আষাঢ় মাসে বৃষ্টি ধারা / সবই আল্লার রহমতে ভরা।

গ. শিষ্টাচার ও সহবত শিক্ষা : ইসলাম ধর্ম কেন পৃথিবীর সকল ধর্মই নিজের আওতায় অনুগত প্রভুভক্ত প্রজা প্রত্যাশা করে এসেছে। এই প্রভুভক্ত প্রজা উৎপাদন ও প্রতিপালনে ধর্মীয় শিষ্টাচার এবং সহবত শিক্ষা জরুরী কাজ। তাই শৈশব থেকেই সে সম্পর্কে তালিম দেওয়া হয়েছে প্রাইমারটিতে।

খ – খানা পিনা হালাল খাও / মাকরুহ গুলি এড়িয়ে যাও।

ঝ – ঝগড়া ফ্যাসাদ ত্যাগ কর / আল্লার হুকুম মান্য করো।

র – রাসুল নামে দরুদ সালাম / মেনে চলো হালাল হারাম।

স – সাক্ষাৎ হলে সালাম কর / ভালোমন্দ জিজ্ঞাসা কর।

ড় – ঝগড়া ফ্যাসাদ আর ফেতনা / কতল করার চাইতে গোনা।

ৎ - সৎ পথে তুমি চললে ভাই / বিপদ তোমার কোথাও (কোথাও) নাই।

ং – বংশ গৌরব ও বড়াই / কখনো করো না ভাই।

ঃ – দুঃখী জনের পাশে দাঁড়াও / ইসলামী আদর্শ ভুলে না যাও।

ঘ. দেশপ্রেম : ইসলামে দেশপ্রেম খুব বড়ো ব্যাপার। অবশ্যই দেশ মানে স্বদেশ। হজরত মহম্মদ (সা.) বলেছেন – স্বদেশপ্রেম ইমানের এবং ইসলামের অঙ্গ। কিন্তু এদেশে দীর্ঘকাল মুসলমানকে

স্বদেশপ্রেমের প্রমাণ দিতে হয়েছে নানাভাবে। এই শিশুপাঠ্য গ্রন্থ তাই ধর্মীয় নীতি উপদেশের পাশাপাশি স্বদেশপ্রেমকে জোরালো গুরুত্ব দিয়েছে। তাই স্বদেশের ভাবকে আরো স্পষ্ট বুঝিয়ে তুলতে নিজের দেশের মানচিত্র সংযুক্ত হয়েছে।

দ - দেশের ম্যাপ বুঝে নাও / যেথায় যাও মিলিয়ে নাও (পাশে ভারতের মানচিত্রের ছবি সংযুক্ত)

প – পতাকা হল দেশের মান / রক্ষা করবো এর সম্মান। (পাশে ভারতের মানচিত্রের ছবি সংযুক্ত)

ঙ. বিস্ময়, আনন্দ, শিক্ষা ও অন্যান্য : আয়তনে ক্ষুদ্র এই প্রাইমারে বিস্ময়, কল্পনা ও আনন্দ প্রকাশের জায়গা কম। যে দুয়েকটি জায়গায় আছে সেখানেও ধর্মীয়ের অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে নানাভাবে।

গ – গম্বুজ হল মসজিদের শোভা / টুপি হল ইসলামের শোভা । (সৌন্দর্যবোধ, সঙ্গে ধর্মপ্রাণতা)

জ – জাহাজে নেমে সাগর পাড়ি / জেদ্দায় নেমে চড়বো গাড়ি। (আনন্দ, সঙ্গে ধর্মবোধ। কেননা, উদ্দেশ্য হজ)

ঢ – ঢেঁড়স তাজা দারুণ মজা / ভাজা ঢেঁড়স আরো মজা। (নির্ভেজাল আনন্দ)

ন – নতুন চাঁদ ঐ নীল আকাশে / ঈদের খুশিতে সবাই হাসে। (ধর্মীয় উৎসবের আনন্দ)

ব – বই পুস্তক পড়তে হবে / সফল আমায় হতেই হবে (একমাত্র এখানেই পড়াশুনার উদ্দেশ্য হিসেবে জাগতিক সাফল্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে)

ঁ – চাঁদের আলো তোমার দান / আল্লাহ তোমারি যত গুণগান[৯৮] (সৌন্দর্যচিন্তা, আল্লাহর আনুগত্য)

সচেতন পাঠক এবং শিক্ষিত অভিভাবক মাত্রই জানে যে, উপরোক্ত বর্ণ শিক্ষার কৌশলে ঠিক কতোখানি বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। শিশুর প্রথম পাঠেই স্বরবর্ণ শিক্ষার নামে যুক্তব্যঞ্জনের যে বাছবিচারহীন ব্যবহার করা হয়েছে তাতে শুরুতেই প্রশ্ন উঠবে যে, এই শিক্ষা শিশুর কতদূর অধিগত হতে পারে? দ্বিতীয়ত, আরবি উর্দু শব্দের যেভাবে বলপূর্বক প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে তাতে কি সত্যিই শিশুকে বাংলা শব্দের সঙ্গে পরিচয় করানো হচ্ছে বলে আমাদের হয়? এখানেও সেই একই প্রশ্ন আরো একবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে না যে, তাহলে কি এ বাংলার মুসলমান এখনো তাঁদের ভাব প্রকাশের জন্য জাতীয় ভাষা হিসেবে আরবি উর্দুকেই স্বীকার করেন?

২.১.১৫।। ছড়া ছবিতে একের ভিতর তিন

আলোচ্য প্রাইমারটির রচয়িতা অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল ইসলাম। প্রকাশক নিউ লেখা প্রকাশনী। প্রকাশকাল অনুল্লিখিত। পুস্তকটির শিরোনাম থেকে স্পষ্ট যে, এখানে ছড়া ও ছবিতে একটি বইয়ের মধ্যে দিয়েই তিনটি ভাষা শিক্ষার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যথা বাংলা আরবি এবং ইংরাজি ভাষা। আমাদের আলোচ্য বাংলা ভাষা শিক্ষা অংশটি।

আলোচ্য প্রাইমারটি ছড়া ও ছবির মাধ্যমে কেবলমাত্র বর্ণ শিক্ষার জন্য রচিত হয়েছে। ৯ বাদ দিয়ে মোট ১১ টি স্বরবর্ণ এবং মোট ৪০ টি ব্যঞ্জনবর্ণ সন্নিবেশিত হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই ধর্মীয় প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে এসেছে। যেমন –

স্বরবর্ণ পরিচয় অংশে ইসলামি প্রসঙ্গ :

অ – অযু করে জামাত ধরো / অলস হলে দুঃখ বড়ো।

আ – আল্লাহ আল্লাহ বলো ভাই / আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নাই।

ই – ইসলাম ধর্ম মেনে চলো / কোরআন হাদিসের সমাজ গড়ো

ঈ – ঈদের দিনে খোশ কালাম / ঈদ মোবারক আস্‌সালাম।

ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয় অংশে ইসলামি প্রসঙ্গ :

ক – কলেম পড়ো ঈমান আনো / আল্লাহ এক সবাই জানো।

খ – খোদার বানী আল কোরআন / পড়লে সওয়াব বারবে মান।

ঘ – ঘণ্টা বাজে ঘড়িতে / নামাজ পড়ো জামাতে।

ছ – ছালাম কর জনে জনে / সবার দুয়া তনার সনে

ণ – পণ করেছি পড়বো নামাজ / সেই নিয়মে গড়বো সমাজ।

ধ – ধন দৌলত আল্লাহর দান / দিলে যাকাত বারবে মান।

প – পাঞ্জাবী পোশাক পররে ভাই / ইসলামী পোশাক সেরা তাই।

য – যাকাত দিলে খুশি মনে / পুণ্য পাবে জনে জনে

হ – হাদিস মেনে চললে পরে / সধান্তি আসবে ঘরে ঘরে।

এভাবে যদি আমরা প্রত্যেকটি বর্ণের সঙ্গে পরিচিত হই তাহলে লক্ষ করবো প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই ইসলামি শিক্ষাই মূল অন্বিষ্ট। প্রসঙ্গত আল্লাহ, কোরআন, হাদিস এবং নবীর শ্রেষ্ঠত্ব সূচক ঘোষণা যেমন রয়েছে তেমনই মুসলমানের মাহাত্ম্য, তার পোশাক আশাকের গুণকীর্তনও বিশেষভাবে জায়গা পেয়েছে।

উপপত্তি : ইসলামি বাংলা প্রাইমার : খাতে ও প্রত্যাঘাতে

বিদ্যাসাগরের জন্মের দুশো বছর সম্পূর্ণ হয়েছে সম্প্রতি। বাংলার বিদ্বৎসমাজে তাঁকে নিয়ে গভীর নিরীক্ষা ও গবেষণা বিশেষ মাত্রা পেয়েছে এই সময় পর্বে। এই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাত ধরেই বাংলা ভাষার প্রাইমার এক বিশেষ উচ্চতায় পৌঁছে যায়। কিন্তু তাঁর রচিত প্রাইমারে মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় কোনো চরিত্রের দেখা মেলে না, এমনকি বিদ্যাসাগরকৃত সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারেও মুসলমান সমাজ কোনোরকম উপকৃত হয়নি বলেই মুসলমান সমাজের অভিমানও বিপুল। আমাদের মনে হয় এই অভিমান থেকেই ভাংলা ভাষায় ইসলামি প্রাইমারসমূহের সূত্রপাত। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রেও বিচ্ছিন্ন বিকল্প বয়ান নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার অনুভব।

১৮৮৬ সালে প্রকাশিত ‘এডুকেশন গেজেট’ পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে মুসলমান সমাজের সংস্কারের অভাব এবং সংস্কারকের অভাব প্রসঙ্গে হতাশা প্রকাশ করা হয়েছে। হিন্দুদের মতোই সেকালের মুসলিম সমাজ কুসংস্কার আচ্ছন্ন - বহুবিবাহ বাল্যবিবাহ প্রথার মতো কুপ্রথায় অবরুদ্ধ, বিধবাবিবাহ প্রথা মুসলিম সমাজে অনুমোদিত থাকলেও হিন্দু আচারের প্রভাবে সেটিও প্রায় লুপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাই হতাশার সুরে বলা হয়েছে – “কিন্তু কৈ? কোনো সংস্কারক মুসলমান তো ঐ দোষের প্রতিবিধান করিবার জন্য বক্তৃতাও করেন না, আর রাজসহায়তাতেও আইনজারির চেষ্টা পান না”[৯৯] মুসলমান সমাজে সৈয়দ আহমদ খান, আব্দুল লতিফ খাঁ বাহাদুর এবং আমীর আলি, সৈয়দ হোসেন খাঁ বাহাদুর প্রমুখ বিত্তবান ও বুদ্ধিমান মানুষ থাকলেও তাঁরা সমাজ সংস্কারের পথে হাঁটেন না – “ঐ মহাত্মারা কেন স্বজাতীয়দিগের সামাজিক সংস্কারের নিমিত্ত কোনো উচ্চাবাচ্য

করেন না। ... মুসলমান জাতীয় বড়লোকেরা এইরূপ। উহারা স্বজাতীয় ধর্ম্মে ভক্তিমান হইয়া সসম্প্রদায়ের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করেন। উহারা সমাজ সংস্কারের বদ্ধ পরিকর নহেন।"[৩]

প্রতিবেদনের শেষ বাক্যদুটি লক্ষ করলেই আমরা বুঝতে পারবো সংস্কারের অভাবজনিত আক্ষেপ ঠিক কতখানি ঘনীভূত হয়েছে। মুসলমান বড়োলোক ও উচ্চপদস্থ মানুষদের প্রশ্নহীন ধর্মীয় জীবনাচরণ এবং সংস্কার বিমুখ মানসিকতাই মুসলমান সমাজকে কয়েক দশক পিছিয়ে দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে প্রকৃত সংস্কারকের অভাবজনিত এই আক্ষেপ থেকে আমরা অনুভব করতে পারি যে, মুসলমান সমাজেও একজন বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই বিদ্যাসাগর মুসলমানের কতোখানি ছিলেন?

খুব সহজ দৃষ্টিতে দেখলেই বোঝা যাবে যে, মুসলিম সমাজে বিদ্যাসাগরের যে অবস্থান তা অনেকটাই ভূমিকাশূন্য এবং আদর্শ বিরোধী অবস্থান। কেননা –

১. বিদ্যাসাগর প্রচলিত বিধবাবিবাহ মুসলমান সমাজে আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। ফলে তিনি মুসলমান সমাজে নজর কাড়ার মতো এমন কিছু আধুনিকতা আনতে পারেননি।

২. মুসলামান সমাজে বহুবিবাহ স্বীকৃত ও জনপ্রিয় ছিল। বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করে অনেকের চক্ষুশূল হয়েছিলেন।

৩. বিদ্যাসাগর প্রচলিত স্ত্রী শিক্ষার সুবিধা মুসলমান সমাজ সেভাবে পেয়ে ওঠেনি। কেননা, তখনো পর্যন্ত মুসলিম সমাজ আরবি, উর্দু ও ফার্সি ভাষার মোহে যেভাবে নিমজ্জিত ছিল সেখানে স্ত্রী লোকের দেশীয় ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ অবান্তর বলে মনে হয়েছিল।

৪. বিদ্যাসাগরের বহুপাঠ্য ও সর্বজনপ্রিয় শিশুপাঠ্যপুস্তক (প্রাইমার) 'বর্ণপরিচয়' – এ একটিও মুসলমান চরিত্র উপস্থিত নেই। নেই মুসলমান সমাজের কথা। তাই এই বই কার্যত হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির (গোপাল, রাখাল, যাদব, মাধবদের) প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং মুসলমান সমাজে এই প্রাইমারের আক্ষরিক অর্থেই কোনো মূল্য নেই। ইসলামি মূল্যবোধশূন্য, ইসলামি প্রতিনিধিশূন্য এই শিশুপাঠ্য পুস্তক তাই অনেকের চোখেই মুসলিম আদর্শ বিরোধী।

উপরোক্ত এই চার ধরণের বিপ্রতীপ অবস্থান থেকে বিদ্যাসাগর বাঙালি মুসলমান সমাজে যেভাবে সমালোচিত ও চর্চিত হন, অন্যদিকে ততখানি নন।

অতএব উনিশ শতকের 'বালকের শিক্ষার আদি যুগে' বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন অপ্রতিরোধ্য এবং দুর্দমনীয় মুসলিম সমাজে তিনি তখন সঙ্গত কারণেই পরিত্যাজ্য। কেননা ততদিনে বাংলার মুসলিম সমাজে 'প্যান ইসলামইজম' এর ঢেউ এসেছে এবং পুরনো ইসলামি আদর্শকে আঁকড়ে বাঁচবার এক অদ্ভুত বাসনা জেগে উঠেছে। সে এক আত্মঘাতের কাল। আমাদের মতে সেই 'আত্মঘাতী কাল'কে ওয়াকিল আহমেদ ব্যাখ্যা করে বলেছেন –

> মুসলমান সমাজের সামনে যখন কোনো আশার আলো নেই, তখন অনিবার্যভাবেই তাঁরা ধর্মের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েন। মুসলমান এমনিই ধর্মনিষ্ঠ, কিন্তু উনিশ শতকে তার ধর্মনিষ্ঠা সব নজির ছাড়িয়ে যায়। এর কারণও ছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে মুসলমান সমাজ হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তায় ভুগছিলেন, বাহুবল ও মনোবল হারিয়ে তাঁরা ক্রমশ ধর্মনির্ভর ও ঐতিহ্যমুখী হয়ে পড়েন। অধার্মিকতা ও নীতিজ্ঞানহীনতাকে সমাজের পতন ও জাতির দুর্গতির কারণ হিসাবে তাঁরা ব্যাখ্যা করেন। মুসলমানদের ধর্মবোধ ও নৈতিক জ্ঞানদ্বারা তাঁদের উদ্বুদ্ধ না করলে সমাজের জাগরণ ও উন্নতি সম্ভব নয়"[৪] –

কাজে কাজেই 'ধর্মবোধ ও নৈতিক জ্ঞান'কে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে মুসলমান সমাজ যুগোপযোগী শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়েছে। এই সময়েই বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষাকে হাতিয়ার করে মানুষের মন থেকে কুসংস্কার দূর করে সুস্থ মানবিকবোধ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করে বাংলা শিক্ষার বনিয়াদকে রচনা করতে চেষ্টা করছেন।[১০০] শিশুশিক্ষার জন্য তাঁর 'বর্ণপরিচয়' তাঁর প্রয়াণের (১৮৯১) দুই বছর আগেই অর্থাৎ ১৮৮৯ সালের সেপ্টেম্বরে ১৫০তম সংস্করণের সৌভাগ্য লাভ করেছে এবং ১৮৮৫ সাল থেকে ৫০,০০০ কপি করে ছাপা হচ্ছিল।[১০১] বর্ণপরিচয়ের এই ব্যাপক প্রচার ও বিক্রি প্রমাণ করে যে প্রাইমারটি সেকালের সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। আমাদের মনে হয় বর্ণপরিচয়ের হাত ধরে বিদ্যাসাগর মুসলমান সমাজে যেভাবে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন আর অন্য কোনো রচনার মধ্যে দিয়ে ততখানি নয়। কেননা মুসলমানদের সেই ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের যুগেও বর্ণপরিচয় যে তাঁদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ হল মুসলমান লেখকদের হাতেই বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের অনুসরণে প্রাইমার রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। যেমন – বিদ্যাসাগরের

অনুসরণে এই সময়ে রহিমুদ্দিন সরকার লেখেন 'নব বর্ণপরিচয়' (১৮৯৩), অর্পণ-উল-মুন্সি লেখেন *'নববর্ণশিক্ষা'* (১৮৯৭),মহ. আবদুল মজিদ সরদার – *বর্ণশিক্ষা প্রথম ভাগ* (১৮৮৮), ইত্যাদি প্রাইমার।

কিন্তু বিদ্যাসাগর যে 'বর্ণপরিচয়' রচনা করলেন, মুসলমান সমাজের কাছে তা ছিল গুরুত্বশূন্য এবং পরিতাপের কারণ। কেননা –

> আমাদের (পড়ুন মুসলমানদের) শিশুগণকে প্রথমেই রাম শ্যাম গোপালের গল্প পড়িতে হয়। সে পড়ে গোপাল বড়ো ভালো ছেলে। কাসেম বা আবদুল্লা কেমন ছেলে সে তাহা পড়িতে পায় না। এখান হইতেই তাহার সর্বনাশের বীজ বপিত হয়। তারপর সে পাঠ্যপুস্তকে রামলক্ষ্মণের কথা, কৃষ্ণার্জুনের কথা, সীতাসাবিত্রীর কথা, বিদ্যাসাগরের কথা, কৃষ্ণকান্তের কথা ইত্যাদি হিন্দু মহাজনদিগের আখ্যান পড়িতে থাকে। স্বভাবতই তাহার ধারণা জন্মিয়া যায় যে, আমরা মুসলমান ছোটো জাতি, আমাদের মধ্যে বড়ো লোক নাই। হিন্দু বালকগণ ঐ সকল পুস্তক পড়িয়া মনে করে আমাদের অপেক্ষা বড়ো কেহ নয়। মুসলমানরা নিতান্ত ছোটো জাতি। তাহাদের মধ্যে ভালো লোক জন্মিতে পারে না।[১০২]

এ প্রসঙ্গে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বাংলার প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ 'আল-এসলাম' পত্রিকায় আক্ষেপভরে লিখেছেন –

> মক্তবে ও মুসলমান বালিকা বিদ্যালয়েও আমাদের শিশুগণকে হিন্দুর লিখিত পুস্তক পড়িতে হয়, তদপেক্ষা আর কি কলঙ্কের কথা আছে? আমরা কি এতই মুর্খ যে তাহাদের জন্য পুস্তক রচনা করিতে পারি না? ... মূল পাঠ্য ইতিহাসে হিন্দু রাজাদের সম্বন্ধে অগৌরবজনক কথা প্রায় ঢাকিয়া ফেলা হয়। আর মুসলমানদিগের বেলায় ঢাকঢোল বাজাইয়া প্রকাশ করা হয়। গুণের কথা বর একটা উল্লখিত হয় না। ফল দাঁড়ায় এই, ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িয়া ছাত্ররা বুঝিল, মুসলমান নিতান্তই অপদার্থ অবিশ্বাসী এবং নিষ্ঠুর জাতি। পৃথিবীর মধ্যে তাহাদের লোপ হওয়াই প্রয়োজন।[১০৩]

মোহম্মদ ফকিরউদ্দিন সরকার ১৩১৬ বঙ্গাব্দে 'বাসনা' পত্রিকার দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যায় আরো স্পষ্টভাবে পাঠ্য পুস্তকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সমস্যার কথা তুলে ধরলেন। লিখলেন –

> প্রথম বর্ণ পরিচয় কাল হইতেই আমাদের বালকগণ রামের গল্প, শ্যামের কথা, হরির কাহিনি, কৃষ্ণের চরিত্র ইত্যাদি পড়িতে থাকে। যদু-মধু, শিব-ব্রহ্মা, রাম-হরি ইত্যাদি নামের পাঠ আরম্ভ করিতে হয়। কাজেই আমাদের সরলমতি কোমলপ্রকৃতি শিশুগণ বিদ্যালয় পঠিত হিন্দুগণের উল্লিখিত বিষয়গুলির

প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং আমাদের জাতীয় পবিত্র শাস্ত্র ও ইতিহাস উপাদান ধর্মকর্মাদির বিষয় অপরিজ্ঞাত হইয়া থাকে।[১০৪]

উপরিউক্ত খেদোক্তি থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি যে, মুসলমান সমাজের জন্য পৃথক প্রাইমার রচনা কতটা জরুরী হয়ে পড়েছিল।

অতএব মুসলমানের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের প্রাথমিক শর্ত ও প্রয়োজনীয়তাগুলি হল –

১. মুসলমানের অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যকে পৃথিবী এবং মানবের মন থেকে লোপের হাত থেকে রক্ষা করা।

২. ইসলাম ধর্মের গৌরব ও গুণের কথা প্রকাশ করা

৩. মুসলমানের 'জাতীয় পবিত্র শাস্ত্র ও ইতিহাস উপাদান ধর্মকর্মাদির বিষয়' সম্পর্কে অবগত করা।

কাজে কাজেই উনিশ শতকে মীর মশাররফ হোসেন যেমন লিখেছেন 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা' তেমনই বিশ শতক পেরিয়ে একুশ শতকেও মুসলমানের বর্ণ শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হয়েছে স্বধর্মাবলম্বী মানুষকেই।

শুধুমাত্র যে উনিশ শতকেই বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'কে সামনে রেখে মুসলমান লেখকগোষ্ঠী দলে দলে প্রাইমার রচনায় অগ্রসর হয়েছেন তা নয়। বিশ শতক পেরিয়ে একুশ শতকেও সেই একই ধারা চলেছে। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে লক্ষ রাখি তাহলে দেখবো উনিশ শতকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পূর্বপক্ষ ভেবে নিয়ে মুসলমানরা উত্তরপক্ষে নিজেদের প্রাইমার নিয়ে আসেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ইসলামি বাংলা প্রাইমারও প্রতিযোগিতায় নামে। ফলে প্রচলিত প্রাইমারের বিরুদ্ধ বর্গে পূর্বোক্ত ইসলামি বাংলা প্রাইমারগুলি রচিত হয়। ২০০৮ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের বাজারে আসে মুহাম্মদ নূরুদ্দীন ও শেখ নাসিরুদ্দিন আহমেদ রচিত 'ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২' (ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়, ঢোলাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা), হায়দার আলী রচিত 'ইসলামী সহজপাঠ প্রথম ভাগ' নামে প্রাইমার (প্রকাশক – ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়)। এগুলিরই পাশাপাশি ২০০৯ সাল নাগাদ অবতীর্ণ হয় 'ইসলামী বর্ণপরিচয়' (নাজ বুক ডিপো, কলকাতা থেকে প্রকাশিত)। আমাদের উল্লিখিত শেষ প্রাইমারটির নামকরণে দৃষ্টি রাখলে আমরা বুঝতে পারবো যে, বিদ্যাসাগর

এখানেও সঙ্গ ছাড়েননি। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'কে স্মরণে রেখেও 'ইসলামী বর্ণপরিচয়' দ্বারা কি তার বিস্মরণের চেষ্টা চলছে না? 'ইসলামী বর্ণপরিচয়' কিংবা 'ইসলামী সহজপাঠ' এই প্রাইমারগুলির উদ্দেশ্য শিশুকে বর্ণমালার পাশাপাশি ইসলামি পাঠ দান করা। কেন এই এই উদ্দেশ্যে তাঁরা এগিয়েছেন? এই বিষয়ে একজন শিক্ষক মুসার্‌রফ হোসেনের বক্তব্য –

> শিশুদের মধ্যে আল্লাহর ভয় জাগিয়ে তুলতেই নীতিশিক্ষার পাঠ দেওয়া হচ্ছে শিশুকাল থেকে। তাছাড়া অভিভাবকরাও চাইছেন লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা শিশুকাল থেকে কিছুটা ইসলামি শিক্ষার তালিম পাক।[১০৫]

সিরাজুল ইসলাম নামের আর একজন শিক্ষকের বক্তব্য –

> ইসলামি সংস্কৃতি মুসলমান ভুলে গিয়েছে। ইসলামি সংস্কৃতি শেখাতে গেলে ছোটবেলা থেকে ইসলামি শিক্ষা দিতে হবে। তাই আমাদের স্কুলে ছোটবেলা থেকেই ইসলামি শিক্ষার ব্যবস্থা।[১০৬]

যে বাঙালি মুসলমান সমাজ বিদ্যাসাগরকে জানতেন, জানতেন তাঁর 'বর্ণপরিচয়ের' কথা, সেখানে 'বর্ণপরিচয়ে'র বিকল্প ও বিরোধী ভুবন নির্মাণ করে ভুলভুলাইয়া সৃষ্টি করা হচ্ছে। শৈশবেই বালকের হাতে 'ইসলামী বর্ণপরিচয়' পৌঁছলে তার শূন্যপট (Tabula Rasa) – এ ইসলামই জায়গা পাবে আড়ে-দিঘে। বিকল্প বয়ানের নামে এই আগ্রাসন কি আমাদের সাংস্কৃতিক ব্যবধানকে ক্রমশ বৃদ্ধি করছে না? সুপরিকল্পিত এই অনন্বয় শেষ পর্যন্ত আমাদের যৌথ সাধনার পরিসরকে কত'টা অক্ষত রাখবে সেই প্রশ্ন আজ বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. দত্ত. মিলন, *মুসলিম জাহান,* কারিগর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১১৪

২. হক. সেখ সাইদুল, 'রাজ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিবৃত্ত পিছন ফেরা ও সামনে দেখা', *শারদ দেশহিতৈষী,* অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) ১৪২৪, পৃ. ৩০০ – ৩০১

৩. রহমান. সামসুর, *বাঙালী মুসলিম সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিবৃত্ত,* মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১২০

৪. আখতার. কাজী মাসুম, *মাদ্রাসা সম্পর্কে আগে জেনে নেওয়া ভাল,* আনন্দবাজার পত্রিকা, উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ, ২১ অক্টোবর ২০১৪

৫. রেফাতুল্লাহ. মোহম্মদ, 'রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষা – বিচার ও পুনর্বিচার', দেখুন. বসু. অরুণ কুমার (সম্পা.), *সারস্বত : বাংলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৪৫২ – ৪৫৮

৬. রেফাতুল্লাহ. মোহম্মদ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪৫৩

৭. রহমান. সামসুর, বাঙালী মুসলিম সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিবৃত্ত, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১২০

৮. আখতার. কাজী মাসুম, 'মাদ্রাসা সম্পর্কে আগে জেনে নেওয়া ভাল', *আনন্দবাজার পত্রিকা,* উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ, ২১ অক্টোবর ২০১৪

৯. দত্ত. মিলন, *ইসলাম,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ১১৪ – ১১৫

১০. দত্ত. মিলন, *ইসলাম,* ঐ, ঐ, পৃ. ১১৫

১১. আখতার. কাজী মাসুম, ঐ, ঐ

১২. Gupta, Nilanjana, *Reading With Alla : Madrasas in West Bengal,* Routledge, New Delhi, First published 2009, P.P 83

১৩. রহমান. সামসুর, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৪৫

১৪. দত্ত. মিলন, *মুসলিম জাহান,* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১১৮

১৫. রহমান. সামসুর, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৫২ – ১৫৩

১৬. নাসিম-এ-আলম, 'সন্ত্রাসের এই জাল এক দিনে তৈরি হয়নি', *আনন্দবাজার পত্রিকা,* উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ, ২৭ নভেম্বর ২০১৪.

১৭. নাসিম-এ-আলম, পূর্বোক্ত

১৮. নাসিম-এ-আলম, পূর্বোক্ত

১৯. নাসিম-এ-আলম, পূর্বোক্ত

২০. সরকার. পবিত্র, 'বর্ণপরিচয় থেকে কিশলয়: বাংলা প্রাইমারের নানা দিক', *ভাষা দেশ কাল,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪২২

২১. খাস্তগীর. আশিস (সম্পা), *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬ – ১৮৫৪),* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬

২২. বন্দ্যোপাধ্যায়. শিবাজী, *গোপাল – রাখাল দ্বন্দ্বসমাস উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য,* কারিগর, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৫

২৩. কর. আবীর, *উনিশ শতকের বিস্মৃত বাংলা প্রাইমার,* পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা, মাঘ ১৪২০

২৪. লাহিড়ী. কার্তিক, *কলকাতার গ্রাম্যতা ও বাঙালি বুদ্ধিজীবী,* প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯

২৫. রায়. বিনয়ভূষণ, *শিক্ষাসার থেকে বর্ণপরিচয় – সমাজের সঙ্গে প্রাথমিক পাঠের বিবর্তন – বিদ্যাসাগরের ভূমিকা,* চিকিতুষী প্রকাশনী, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১১

২৬. রাকিব, *মাদ্রাসা শিক্ষায় প্রচলিত বাংলা প্রাইমার : ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ,* পি এইচ. ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত অপ্রকাশিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৪৭

২৭. রাকিব, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪৭

২৮. কর. আবীর, ঐ, ঐ, ঐ পৃ. ১১

২৯. সরকার. পবিত্র, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১০২

৩০. সরকার. পবিত্র, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১০৩

৩১. সরকার. পবিত্র, ঐ, ঐ, ঐ

১২. সরকার. পবিত্র, ঐ, ঐ, ঐ

৩৩. সরকার. পবিত্র, ঐ, ঐ, ঐ গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১০৫

৩৪. সরকার. পবিত্র, ঐ, ঐ, ঐ ঐ, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১০৫

৩৫. চক্রবর্তী. অরিন্দম, *দেহ গেহ বন্ধুত্ব ছটি শারীরক তর্ক,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, জুন ২০১১, পৃ. ৭০

৩৬. খাস্তগীর. আশিস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৩৭. খাস্তগীর. আশিস, 'উনিশ শতকের বাংলা বই', স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পা), *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি,* পুস্তক বিপনি, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৩৪৫

৩৮. ঐ, পৃ. ৩৪৭

৩৯. ঐ

৪০. কর. আবীর, 'ঈশ্বরের নামে জালিয়াতি', *বইয়ের দেশ,* কলকাতা (সম্পাদক) সুমন সেনগুপ্ত, জুলাই – সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ১১৬

৪১. রায়. গোপালচন্দ্র, 'বাংলা বইয়ের ব্যবসা', বন্দ্যোপাধ্যায়. চিত্তরঞ্জন (সম্পা), *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮১, পৃ. ৩৫১ – ৩৬৩

৪২. খাস্তগীর. আশিস 'উনিশ শতকের বাংলা বই', স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পা), *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি,* পুস্তক বিপণী, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৩৪৯

৪৩. গ্রীক 'লোগোস'-এর চলতি অনুবাদ ওয়ার্ড / শব্দ। তবে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বে 'লোগোস' এর বিস্তার বহুধাব্যাপ্ত – Word of God . 'সেন্ট্রিজম' হল কেন্দ্রিকতাবাদী মতবাদ। কেন্দ্রিকতার অন্যতম প্রধান পুরুষতান্ত্রিকতা। 'ফ্যালাস' অর্থে পুংচিহ্ন ও শিশ্ন-র সমবায়িক ব্যবস্থাপনা। একারণেই যৌথ ও বিভিন্ন সামাজিক ক্ষমতার যৌগিকতাকে পরিভাষা জোগাতে গিয়ে ফরাসি ভাবুক জাক দেরিদা উদ্ভাবন করেছেন আনকোরা এই শব্দ – 'ফ্যালাগোসেন্ট্রিজম'। যার মূলে রয়েছে Phallus ও Logo-centrism কথা দুটি। ফ্যালাস = শিশ্ন = পৌরুষ = ক্ষমতা। আর

লোগোসেন্ট্রিজম = অক্ষরকেন্দ্রিকতা, ব্যাপকার্থে শব্দকেন্দ্রিকতা। বাংলায় শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় এর তর্জমা করেছেন 'শিশ্নাক্ষরকেন্দ্রিকতাবাদ'। উনিশ শতকের প্রাইমারে বালক শিশুদের আধিপত্যকে মাথায় রেখে তাই একথাটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৪৪. দাশ, শিশির কুমার, *ফুলের ফসল: সংকলনের রাজনীতি,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, পৃ. ১২

৪৫. বসু. প্রদীপ, *রাজনীতির তত্ত্ব তত্ত্বের রাজনীতি*, চর্চাপদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃ. ৭০

৪৬. ঘোষ, বিনয়, *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ*, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৩ – ২৪

৪৭. কার্তিক লাহিড়ী, 'শিশুপাঠ্য পুস্তকের সমাজতত্ত্ব : ১' পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪ – ৪৬

৪৮. Bhattacharya. Tithi, *Sentinels of Culture: Class, Education, and the Colonial Intellectual in Bengal,* Oxford university Press, New Delhi, 2005

৪৯. ঘোষ. বিনয় (সম্পা), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমজচিত্র,* চতুর্থ খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৩০৯ – ৩২৩

৫০. তর্কালঙ্কার, মদনমোহন, *শিশুশিক্ষা,* আশিস খাস্তগীর (সম্পা), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৫৪

৫১. চৌধুরি. অজিত, উপনিবেশের হিজিমনি : বাদামি প্রাচ্যবাদের সমালোচনার দিকে, *অবভাস প্রবন্ধ সংকলন জানুয়ারি – মার্চ ২০০৪,* পার্থ চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা, মার্চ ২০০৪, পৃ. ২

৫২. ঐ

৫৩. ঐ, পৃ. ৩

৫৪. ঐ, পৃ. ৫

৫৫. প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য : রুদ্র, অশোক, 'বুদ্ধিজীবী একটি শাসকশ্রেণী', *সমাজে নারী পুরুষ ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃ. ১১৩ – ১২৫

৫৬. মাবুদ. আবদুল, *আমাদের প্রিয় নবী,* বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ৪

৫৭. মোল্লা, নিযামুদ্দীন, *ছোটদের দো'আ,* বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯, পৃ. ৩

৫৮. মোল্লা, নিযামুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

৫৯. আলিয়াভী. মাওলানা হাফেয শাইখ আইনুল বারী, *সালাফী বর্ণপরিচয়* (প্রথম ভাগ), সূফিয়া প্রকাশনী, কলকাতা, মে ২০১৯, পৃ. ১

৬০. আলিয়াভী. মাওলানা হাফেয শাইখ আইনুল বারী, *সালাফী বর্ণপরিচয়* (দ্বিতীয় ভাগ), সূফিয়া প্রকাশনী, কলকাতা, মে ২০১৯, পৃ. ২

৬১. আলিয়াভী. মাওলানা হাফেয শাইখ আইনুল বারী, ঐ, ঐ, পৃ. ২

৬২. আলিয়াভী. মাওলানা হাফেয শাইখ আইনুল বারী, ঐ, ঐ, পৃ. ৩

৬৩. বিদ্যাসাগর. শ্রীঈশ্বরচন্দ্র, *বর্ণপরিচয় (প্রথম ভাগ),* দ্বিষষ্টিতম সংস্করণ, সংস্কৃত প্রেস, কলকাতা, ১৮৭৬, পৃ. ৩২ – ৩৪

৬৪. মোল্লা. মশিয়ার রহমান, *কচিকাঁচা (১),* পুস্তক ভারতী, হাওড়া, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২১, পৃ. ৩৮

৬৫. আযম. গোলাম, *কিশোর মনে ভাবনা জাগে,* বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, এপ্রিল. ২০২১, পৃ. ৪

৬৬. আযম. গোলাম, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৫

৬৭. নূরুদ্দীন. মুহাম্মদ, *ফুলকুঁড়িদের অ আ ক খ,* ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৪

৬৮. নূরুদ্দীন. মুহাম্মদ, *ফুলকুঁড়ি প্রথম পাঠ,* ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ৬

৬৯. নূরুদ্দীন. মুহাম্মদ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১২

৭০. নূরুদ্দীন. মুহাম্মদ, ও আহমদ. নাসিরুদ্দিন শেখ, *ফুলকুঁড়ি দ্বিতীয় পাঠ,* ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ৬

৭১. নূরুদ্দীন. মুহাম্মদ, ও আহমদ. নাসিরুদ্দিন শেখ, ঐ, ঐ ,ঐ, পৃ. ৬

৭২. নূরুদ্দীন. মুহাম্মদ, ও আহমদ. নাসিরুদ্দিন শেখ, ঐ, ঐ ,ঐ, পৃ. ৪৩

৭৩. মাবুদ. আবদুল, *এসো জীবন গড়ি,* বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, জুলাই ২০২১, পৃ. ৩

৭৪. মাবুদ. আবদুল, ঐ, ঐ, পৃ. ৩

৭৫. রহমান. শেখ ফজলুর, *আমাদের ছড়া – ১,* ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ৩

৭৬. পূর্বোক্ত

৭৭. আলাউদ্দীন. মহম্মদ, *এসো পড়তে শিখি (দ্বিতীয় ভাগ),* বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৫, পৃ. ১

৭৮. আলাউদ্দীন. মহম্মদ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১

৭৯. আলাউদ্দীন. মহম্মদ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪

৮০. হোসেন. আফযাল ও মাবুদ. আবদুল, *ইসলাম শিক্ষা,* বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ৩

৮১. নূরুদ্দীন. মুহাম্মদ, ইসলাম শিক্ষা – ১, ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ৩

৮২. ঐ, ঐ, ঐ , পৃ. ৩

৮৩. এই অনুমানের সঙ্গত কারণ আছে। কেননা, পাঠ্য পুস্তকের বর্ণপরিচয় অংশে ছড়া ও ছবিতে শিক্ষার্থীর বর্ণপরিচয় করা হয়েছে। সেখানে ভারতীয় মুদ্রা (টাকা)র যে ছবি আছে তা ২০১৭ সালের নতুন মুদ্রার ছবি। কাজে কাজেই অনুমান করা চলে যে এই শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি ২০১৭ সালের পূর্ববর্তী নয়।

৮৪. রহমান, জামান মুস্তাফিজুর, *শিশুকথা* (প্রবেশিকা), আদর্শ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ২

৮৫. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২

৮৬. মসজিদুল আকসা, মসজিদুল হারাম, ও মুসজিদুন নববী

৮৭. তাওরাত, ইঞ্জিল, জবুর, ও ক্বুরআন মাজীদ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা শরীফ

৮৮. কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত।

৮৯. রহমান, জামান মুস্তাফিজুর, *শিশুকথা* (প্রথম ভাগ), আদর্শ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩৯

৯০. রহমান, জামান মুস্তাফিজুর, *শিশুকথা* (দ্বিতীয় ভাগ), আদর্শ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৬

৯১. রহমান, জামান মুস্তাফিজুর, *শিশুকথা* (দ্বিতীয় ভাগ), ঐ, ঐ, পৃ. ১১

৯২. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৬

৯৩. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২৭

৯৪. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২৭

৯৫. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৭

৯৬. ইসলাম. মুস্তাফা নূরউল, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ২৪-২৫

৯৭. 'বেয়াদবি' এই কারণে যে, 'আমটি আমি খাবো পেড়ে' - শৈশব থেকেই এমন শিক্ষা পেলে শিশু চুরিবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠবে বলে মনে করেন এক মাদ্রাসা শিক্ষক। তাই তাঁদের শুরুতেই ইসলামি আদব কায়দার অনুশীলন শিখতে হবে। অতএব 'ইসলামী বর্ণপরিচয়'ই পারে সেই পথ দেখাতে।

৯৮. দেখুন. *ইসলামী বর্ণ পরিচয়,* নাজ বুক ডিপো, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত

৯৯. বসু. স্বপন, *সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ,* বুকস স্পেস, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯, পৃ. ২৫৫

১০০. রায়. বিনয়ভূষণ, 'বিদ্যাসাগরের শিশুশিক্ষা', দেখুন. বসু. বিমান (সম্পা.) *প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর,* বঙ্গীয় স্বাক্ষরতা প্রসার সমিতি, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ২৪২

১০১. খাস্তগীর. আশিস, *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬ – ১৮৫৫),* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ২১

১০২. ইসলাম. মুস্তাফা নূরউল, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ২৪-২৫

১০৩. শহিদুল্লাহ. মুহম্মদ, 'আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা' *আল-এসলাম*, ২য় বর্ষ, ২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩; দত্ত, মিলন পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১০১

১০৪. সরকার. মোহম্মদ ফকিরউদ্দিন, *বাসনা*, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩১৬, দত্ত, মিলন পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১০১-১০২

১০৫. দত্ত. মিলন, 'মুসলমানের বর্ণপরিচয়', *মুসলিম জাহান*, কারিগর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১১০-১১১

১০৬. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১১১

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্ম প্রসঙ্গ ও ইসলামি প্রাইমার

আমাদের প্রকল্পিত গবেষণার মূল ক্ষেত্রটি হল বাংলা ভাষার প্রাইমার। এক্ষেত্রে আমরা বাংলা ভাষায় রচিত প্রাইমারসমূহকে দুটি পৃথক ধারায় রেখে তুলনামূলক বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছি। একটি ধারায় রেখেছি বাংলা ভাষার প্রচলিত প্রাইমারগুলিকে আরেকটি ধারায় রেখেছি বাংলা ভাষায় রচিত মাদ্রাসাকেন্দ্রিক ইসলামি প্রাইমারগুলিকে। এই দুই ধারা পৃথকীকরণের মানদণ্ড হিসেবে বেছে নিয়েছি ধর্মকে। অর্থাৎ ধর্মই কেন্দ্রে থেকে এই দুই ধারার প্রাইমারকে আলাদা করেছে। সেক্ষেত্রে আমরা দেখিয়েছি প্রচলিত প্রাইমারগুলির রচয়িতারা যেহেতু ধর্মীয় পরিচিতিগত দিক থেকে হিন্দু সম্প্রদায় ও সমাজ থেকে আগত স্বাভাবিকভাবেই সেখানে হিন্দু 'আত্ম' যতখানি স্পষ্ট, প্রকট এবং আধিপত্যকামী; তুলনামূলকভাবে মুসলমানের অস্তিত্ব প্রায় শূন্য বললেই চলে। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে, সেগুলি হল বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যবহৃত 'কিশলয়', 'আমার বই' ইত্যাদি। কিন্তু এই বিরল ব্যাতিক্রম লঙ্ঘন করে বাংলা প্রাইমারগুলির বৃহৎ পরিসর জুড়ে আসলে 'হিন্দু'র সমাজ, চরিত্র ও সংস্কৃতিই প্রাধান্য লাভ করেছে। এই অভিযোগ ও অভিমান থেকেই উনিশ শতকের সাতের দশক থেকে ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা প্রাইমারের সূত্রপাত হয়। অতঃপর মহম্মদ জহুরুদ্দিন, মুন্‌সি কাজিমুদ্দিন, মুন্‌সি সমিরুদ্দিন, মজহরুল্লা কাজি, মহঃ আবদুল মজিদ, সরদার ফতে মণ্ডল, ওহাজুদ্দিন আহমেদ, রহিমুদ্দিন সরকার, মালেকউদ্দিন আহমেদ, মুন্‌সি জমারত হুসেন, অর্পণ-উল-মুন্‌সি, হলিমন্নেষা খাতুন প্রমুখ হয়ে একেবারে বিশ শতকের গোঁড়ায় মুসলমান বালক বালিকাদের জন্য প্রাইমার রচনায় এগিয়ে আসেন মীর মশাররফফ হোসেন। তাঁর 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা'র হাত ধরেই আধুনিক মুসলমান বালক-বালিকাদের পথ চলার সূচনা হল।

১. ইসলামি প্রাইমারে ধর্মীয় প্রসঙ্গ : প্রস্তাবনার ইতিবৃত্ত

এখন প্রশ্ন হ'লো মুসলমান বালক বালিকাদের জন্য ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক প্রাইমার রচনার কি সত্যিই কোনো ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ছিল? এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে উনিশ শতকের প্রতিনিধিস্থানীয় মুসলমান লেখক মীর মশাররফ হোসেনের জবানীতে। তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনী'তে লিখেছেন –

> আমরা দুই ভাই কুষ্টিয়া স্কুলে ভর্তি হইলাম, ইংরাজি আর বাঙ্গালা পড়িতে হয়। এত দিন পড়িলাম – আল্লাহ-রসুলের নাম কোনো স্থানে পাইলাম না। যিনি গুরু তাঁহার মুখেও না, বরং ইংরাজি কেতাব মধ্যে কয়েক জায়গায় শূকরের নাম পাইলাম। পাকসাফ পবিত্রতার নামগন্ধ পাইলাম না। আল্লহ্ রসুলের নাম কেতাবে নাই কিন্তু রাম শ্যাম হরি কালী দুর্গা, শূকর, কুকুর, শৃগালের নাম অনেক স্থানে পাইলাম।[১]

যে মীর মশাররফ উনিশ শতকের নয়ের দশকে লিখেছিলেন 'সৎ প্রসঙ্গে'র মতো বৈপ্লবিক প্রবন্ধ, যেখানে হিন্দু – মুসলমান দুই ধর্মের মানুষের সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত হচ্ছিল, যেখানে দুই ধর্মের মানুষের মূলগত কোনো তফাৎকেই লেখক গুরুত্ব দেননি, সেই মীর মশাররফই ১৯০৮ এ প্রকাশিত তাঁর 'আত্মজীবনী' প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি প্রসঙ্গহীনতার খানিকটা অভিমানী। আর তাঁর এই অভিমান এতটাই ঘনীভূত হয়েছিল যে, 'বর্ণপরিচয়' রচনার ৪৮ বছর পর ১৯০৩ সালে লিখে ফেলেন 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা'। যে পুস্তকটির উদ্দেশ্যে সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন –

> মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা প্রথম ভাগ প্রকাশিত হওয়ার পর খোদাতালার কৃপায় অনেক গ্রাম্য বক্তব্য মাদ্রাসায় আদরের সহিত গৃহীৎ হইয়াছে এবং হইতেছে। সকল স্থান হইতেই ইহার বর্ণপরিচয় বানান ইত্যাদির সর্ব্বপ্রথম অংশ চাহিতেছেন । তাহাদের আদেশ ও উপদেশ ক্রমে মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষার সর্ব্বপ্রথম অংশ প্রকাশ করিলাম। এইখানে মুসলমান বালক বালিকাগণের সামান্য উপকার হইলেই শ্রম সফল মনে করিব।[২]

অর্থাৎ এই প্রাইমার স্পষ্টতই 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা' ও 'মুসলমান বালক বালিকাগণের সামান্য উপকার' এর উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে।

মুসলমান বালক বালিকাদের জন্য ধর্মের ভিত্তিতে যে পৃথক প্রাইমারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তার নমুনা পাওয়া যাবে সেকালে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগ সম্বলিত প্রবন্ধগুলির উপর নজর দিলে। ঢাকার 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র ১৮৮৬ – ৮৭ খ্রিষ্টাব্দের বার্ষিক অনুষ্ঠানপত্রে আধুনিক শিক্ষায় মুসলমানের আত্মবোধের অভাবকে সামনে রেখে লেখা হয় –

> শিক্ষিত মুসলমান যুবকের মধ্যে অনেকেই যিশুখ্রিস্টের প্রপিতামহের জীবনচরিত বলিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে মহম্মদীয় ধর্মশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি জিজ্ঞাসা কর, অমনি তাঁহার চক্ষুস্থির। ...আক্ষেপের বিষয় এই যে স্কুল সমূহে ধর্মশিক্ষার কোন প্রকার বন্দোবস্ত নাই। তাই মুসলমান অভিভাবকগণ বালকদিগের

> ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষার বিরোধী ও বাস্তবিক ধর্মশিক্ষার অভাবেই আধুনিক শিক্ষার দ্বারা আমাদের সমাজবন্ধন দীনদীনশিথিল হইয়া উঠিতেছে। উহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।[৩]

ধর্মশিক্ষার অভাবে কেবলমাত্র মুসলমানের সমাজবন্ধন শিথিল হয়ে পড়ছে তাইই নয়, কোথাও যেন তা সামাজিকভাবে স্থিতি এবং নিরাপত্তাকেও বিঘ্নিত করছিল বলে অনেকের ধারণা। আর সেই দুশ্চিন্তা থেকেই 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় রেয়াজুদ্দীন আহমেদ লিখলেন -

> মুসলমান বালক ও যুবকের পক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী নিরাপদ নহে। এই শিক্ষার দোষে ইংরাজি শিক্ষিত মুসলমানদিগের মধ্যে অনেক গুরুতর দোষ প্রবেশ করিয়াছে। প্রধান দোষ ধর্মাচারবিহীনতা ও নীতিজ্ঞানপরিশূন্যতা। ধর্মবিশ্বাসেও অনেকের ত্রুটি আছে। অনেকের ধর্মমত নাস্তিকের কাছকাছি।[৪]

'ইসলাম প্রচারক' মনে করে এহেন অধর্মচারিতার মূলে আছে আদব কায়দাহীন শিক্ষা ব্যবস্থা, যা গোটা ইসলামি সমাজকে অধঃপাতে নিয়ে যাচ্ছে। এ'প্রসঙ্গে প্রচলিত পাঠশালা ও পাঠ্যপুস্তকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে 'নূর অল ইমান' পত্রিকায় লেখা হল –

> পাঠশালায় যে সকল পুস্তক পড়ান হয়, তাহাতে হিন্দুদিগের পৌরাণিক কাহিনি, রাম রাবণের যুদ্ধ, কুরু পাণ্ডবের লীলা পড়িতে হয়। তৎসঙ্গে হিন্দুদিগের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার মুখস্থ করিতে হয়। তাহা করিয়াও নিস্তার নাই। কোমলমতি বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকে মোসলমানের নিন্দা, এসলামি আচার ব্যবহারের কুৎসা এবং মোসলমান জাতিকে ম্লেচ্ছ যবন ইত্যাদি নামে ঘৃণা প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। এই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পাঠশালায় শিক্ষার্থীগণের হৃদয়ে কীরূপ আত্মসম্মান ও জাতীয় প্রেম জন্মিতে পারে?[৫]

সুতরাং দরকার মুসলমানের গুণবাচক, শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক আখ্যান কল্পনা করা। অতঃপর ধর্মীয়ভাবে মুসলমানের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গৃহীত হল পরিকল্পনা। বিশ শতকের গোড়ায় 'বাসনা' পত্রিকায় সেই পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

> যাহাতে মুসলমানি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কথা, বীর বীরাঙ্গনার বিবরণ, সাধু দরবেশের আখ্যান, পয়গম্বরগণের উপাখ্যান, ধার্মিক-ধার্মিকাদের বৃত্তান্ত, নবাব বাদশাহদের জীবন, সতী রমণীগণের গুণ কাহিনি, ইসলাম ধর্মের সারতত্ত্ব, হাদিস দলিলের সারসংগ্রহ, নামাজ রোজার উপকারিতা, মুসলমানি পর্বাদির কথা ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয় সরল বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়া বিদ্যালয়ের পাঠ্যভুক্ত হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করা মুসলমান মাত্রেরই উচিত।[৬]

প্রায় একশো বছর পর ২০০৪ সালে প্রকাশিত 'শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম' নামক গ্রন্থে পাঠ্যপুস্তকে ইসলামি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে –

> পাঠ্যপুস্তক এর মাধ্যমে শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব গঠনের প্রচেষ্টা পৃথিবীর সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলী যথা আল্লাহুর রাসূল ও গুরুজনদের প্রতি ভক্তি সৎ সাহস.. সত্যবাদিতা কর্তব্যপরায়ণতা প্রকৃতি গুণাবলী সম্বলিত যে সমস্ত রচনা পাঠ্যপুস্তক স্থান পায়, তাদের লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের ওই সমস্ত গুণাবলী ও মূল্যবোধের প্রতি আকৃষ্ট করা।[৭]

অতঃপর যে সমস্ত উপাদানের মধ্যে দিয়ে পাঠককে আকৃষ্ট করা হবে সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

> শুধু ইসলামী উম্মাহর সংস্কৃতিকে সুসংহত করবার এবং ইসলামের নীতি ও আদর্শকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে দৃঢ় সংকল্পের কথা সম্প্রতি মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শোনা যাচ্ছে, সেই ইচ্ছাটুকু স্কুল পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মনে প্রতিফলিত'[৮] করা।

লক্ষ করবার বিষয় উপরোক্ত কথাগুলি প্রাবন্ধিক মুহাম্মদ আবদুশ শাকুর বলছেন ১৯৮৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায়। আমরা এই সময়পর্ব থেকেই আমাদের প্রাইমারগুলি নির্বাচন করেছি এবং প্রসঙ্গত এই সময়কাল থেকে একুশ শতকের প্রথম দুটি দশক পর্যন্ত ইসলামি বাংলা প্রাইমারসমূহে ধর্মীয় উপাদানের বিশ্লেষণ করেছি। অতঃপর সংক্ষেপে এই সমস্ত ইসলামি উপাদান সম্পর্কে বলা হয়েছে – 'ইসলামিক উপাদান বলতে বুঝায় ইসলাম সংক্রান্ত তথ্য এবং ইসলামের প্রতি আকর্ষণ ও শ্রদ্ধাবর্ধক রচনা মন্তব্য ছবি ও শব্দাবলী।'[৯] আলোচ্য প্রবন্ধে এই উপাদানগুলিকে আবার আটটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা –

১. আল্লাহর ও রাসুলের প্রতি ভক্তি ও অনুগত্যমূলক রচনা

২. রাসূল (সা.) খুলাফা-ই রাশিদিন, সাহাবা ও তাবিঈন-এর জীবনী, চরিত্র, শিক্ষা ও সাধনা সংক্রান্ত রচনা

৩. পরবর্তীকালের ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুসলিম মনীষী আউলিয়া দরবেশ রাষ্ট্র ও সেনানায়কদের কথা-কাহিনি

৪. কুরআনে বর্ণিত অন্যান্য নবীদের কথা-কাহিনী

৫. পবিত্র স্থান ও ইসলামের ইতিহাস প্রসিদ্ধ অন্যান্য স্থান সংক্রান্ত রচনা

৬. ধর্মীয় উৎসব সংক্রান্ত রচনা

৭. মুসলিমদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও কর্তব্য সংক্রান্ত রচনা

৮. ইসলামিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সংক্রান্ত রচনা[১০]

উপরোক্ত মন্তব্যটি যদি আমরা বিচার করি তাহলে লক্ষ করবো যে, উনিশ – বিশ শতক হয়ে আজকের দিনে রচিত ইসলামি প্রাইমারগুলির মূল অন্বিষ্টও কার্যত উপরের বিষয়গুলিই থেকে গেছে।

এখন আমাদের নির্বাচিত প্রাইমারগুলিতে ধর্মীয় প্রসঙ্গসূত্রে উপরোক্ত বিষয়গুলি কীভাবে আনাগোনা করেছে এবং এই বিষয়গুলি কীভাবে একটা স্বতন্ত্র্য সামাজিক মন গঠনে অগরসর হয়েছে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করবো। তবে তার আগে ইসলামের তত্ত্বানুযায়ী ধর্ম বলতে আমরা কী বুঝি এবং সমস্ত মুসলমানের কাছে ধর্ম কীভাবে কল্পিত হয় সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

২. ধর্ম : ইসলামে ও সাহিত্যে : রূপ থেকে রূপান্তরে

'বঙ্গীয় শব্দকোষ' – এ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ধর্ম' শব্দের নানা অর্থ করেছেন। যথা – লোকধারক, আচার, অনুষ্ঠান, সম্প্রদায় বিশেষের শাস্ত্রবিধি, ন্যায়, বিচার, স্বভাব, ভাব, প্রকৃতি, গুণ[১১] ইত্যাদি। প্রচলিত অর্থে ধর্ম শব্দের ইংরাজি সমার্থক হিসেবে আমরা 'রিলিজিয়ন' বুঝি। কিন্তু এই ব্যবহার ভ্রমাত্মক বলেই মনে করেছেন ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্র। তাঁর মতে, একজন অধার্মিক নাস্তিক লোকের 'ধর্ম' থাকতেই পাড়ে। সেদিক থেকে 'রিলিজনের'র প্রথম অর্থ হচ্ছে কোন সঙ্ঘের সদস্য বা সম্প্রদায়ের বিশ্বাসে বিশ্বাসী। সেই অর্থ পরে প্রয়ারিত হয়েছে ভাগ্য নিয়ন্ত্রা কোনো অসামান্য অলৌকিক সত্তায় বিশ্বাস, তার প্রতি নানা হৃদয়গতভাব এবং সেই অনুযায়ী পূজা, আরাধনা ইত্যাদির অনুষ্ঠান। কিন্তু সাহিত্য থেকে ধর্মশাস্ত্রে, আবার ধর্মশাস্ত্র থেকে লোকায়ত বিশ্বাসে আমরা সাধারণত ধর্মের প্রধান চারটি অর্থ দেখি। এ প্রসঙ্গ ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্র পি. ভি কানের 'History of Dharmasastras' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে যে নির্যাস প্রতিষ্ঠা করেছেন সেগুলি হল –

ক. ধর্মের প্রধান অর্থ কর্তব্যকর্ম। এর বিপরীতে আছে অধর্ম বা অন্যায় কাজ।

খ. কর্মের ফলকেও ধর্ম বলা হয়েছে। ... তাই ধর্মের অর্থ পুণ্য অধর্মের অর্থ পাপ।

গ. ধর্ম অর্থ বস্তুর স্বভাব গুণ ও শক্তি বোঝায়

ঘ. ধর্মের চতুর্থ অর্থ হল ঋত বা নিয়ম।

বিশ্বব্যাপী নিয়ম ও সুশৃঙ্খলার দ্যোতক শব্দ ঋত। ঋতের পথ ধর্মের পথ।[১২]

কিন্তু ইসলামে ধর্মের প্রচলিত অর্থের সঙ্গে কিছুটা ফারাক আছে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্রের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন –

> ইসলাম ধর্মের সমার্থক প্রচলিত শব্দ হল দীন, দীনের একার্থ ব্যাপক। আবার একার্থ বিশেষ। আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে দীন শব্দ প্রযুক্ত হয়। বলা হয় দীনে আল্লাহ। এটাই প্রসারিত হয় 'দীনে ইসলামে'।[১৩]

আবার মুসলমানদের পালনীয় ধর্ম 'ইসলাম' -এর ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে তিনি বলেছেন –

> সালাম থেকে ইসলাম কথাটা এসেছে। অর্থ আত্মসমর্পণ। যে আত্মসমর্পণ করে সে মুসলিম আল্লাহর আদেশের কাছে কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ করাই মানুষের কাজ। এর ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে ইহ জগতে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলা ও কাজ করা (হেদায়েতি) আর আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা (পরহেজগারী)। এই দীনের প্রথম স্তম্ভ ইমান (ঈমান)। ইমানের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস। আল্লাহর তৌহিদে বা একত্বে আর কোরআনের ঐশিত্বে চরম বিশ্বাস হচ্ছে ইমান।[১৪]

এক্ষেত্রে ইমানের ভিত্তি হিসেবে বলা হয়েছে –

> ইলম বা তত্ত্বজ্ঞানই যথেষ্ট নয়, আল্লাহর তাওহীদ বা একত্বে উপলব্ধি বা ইমানই একজনকে মুসলিম করে। কারণ উপলব্ধি না থাকলে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব নয়। এই ইমান থেকেই মুমিন বা বিশ্বাসী শব্দ এসেছে। ইমান ছাড়া ইসলাম সম্ভব নয়।[১৫]

অতঃপর ধর্মের অপরাপর অর্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইসলাম ধর্মে তার উৎস নিরূপণ করে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি লিখেছেন –

> অন্যদিকে ধর্মের যে অর্থে কর্তব্য আর আচরণের প্রয়োগ আছে, আদাবের অর্থ তাই। বেআদব বা বেআদবি প্রচলিত শব্দ। কিন্তু আদাবের বৃহত্তর অর্থ আছে। মুসলিম হবার জন্য প্রত্যেককে তার নির্দিষ্ট সামাজিক স্থান অনুযায়ী আদাব অনুসরণ করতে হয়, ফলে তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। সৎ ঈমানের প্রকাশ হয় সঠিক আদাবে। নৈতিক বিধি হচ্ছে আদাব।[১৬]

এই বিধিরও সাধারণ ও বিশেষ ভাগ আছে। সমাজের বিশেষ বিশেষ স্তরভুক্ত লোকেরা বিশেষ রকমের আদাব অনুসরণ করেন। বাদশার আদাব সুফির আদাব বা কারিগরের আদাব এক হবেনা। ঠিক একইভাবে ব্যাধের ধর্ম আর সন্ন্যাসীর ধর্ম পৃথক। ধর্মশাস্ত্রের মতো আদাবের সাহিত্য তাই বিপুল।

সবদিক বিচার করে বলা চলে এই ঈমান আর আদাবের সমন্বয়েই 'দ্বীন ইসলাম' গড়ে উঠেছে। কোরআনের শেষ আয়াতে দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করার এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে নির্ধারিত করার স্পষ্ট নির্দেশ আছে। তাই ইসলাম ও আদাবের অর্থ ব্যাপক, নিছক সম্প্রদায় বা মতের অর্থে দ্বীন ইসলামের প্রয়োগ সঙ্গত নয়।[১৭]

এখন আমাদের আলোচ্য ইসলামি বাংলা প্রাইমারগুলিতে যদি আমরা ধর্মীয় প্রসঙ্গের বিচার বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের দেখতে হবে উক্ত প্রাইমারগুলিতে ইসলামের এই মূল সূত্রগুলি অনুসৃত হয়েছে কিনা। অর্থাৎ 'দ্বীন' এবং 'ইসলাম' সম্পর্কে যে মূল শাস্ত্রীয় ভাষ্য তা এই সমস্ত প্রাইমারে কতদূর গৃহীত এবং কতদূর বর্জিত ও নবরূপে প্রতিভাত হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় দীনকে পূর্ণাঙ্গ করবার এবং ইসলামকে দীন হিসেবে নির্ধারিত করবার যে নিধান কোরআন শরীফে বর্ষিত হয়েছে তা ফলপ্রসূ করবার প্রচেষ্টা দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করে সকল মুসলমানই গ্রহণ করেছেন। যার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে পূর্বোদ্ধৃত মুহাম্মদ আবদুশ শাকুরের 'কয়েকটি মুসলিম দেশের পাঠ্যপুস্তকে ইসলামী উপাদান' প্রবন্ধটিতে। যেখানে প্রাবন্ধিক স্পষ্টতই জানিয়েছেন গোটা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাঠ্যপুস্তকের উপাদানসমূহের মধ্যে দিয়ে শিশুর কোমল চিত্তের অধিকার কায়েক করতে প্রয়াসী তাঁরা।[১৮] এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করবো কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক নয়, সাহিত্যকে অবলম্বন করে বিভিন্ন সময়ে দেশে দেশে কালে কালে ইসলামি উপাদান দ্বারা মানুষের মনকে নিজেদের নিয়ন্ত্রনে আনবার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে।

বাংলায় মধ্যযুগের জঙ্গনামা, পীর সাহিত্য কিংবা ইসলামি প্রণয় সাহিত্যের মধ্যেও কি কমবেশি মুসলমানের বীরত্ব, ধর্মপ্রাণতা, অলৌকিক ক্ষমতা ও মানবিক প্রেমের উচ্চাদর্শ প্রচারের সূক্ষ্ম রাজনীতি নেই? আমাদের মনে হয় আছে। তবে তা শরীয়ত নির্ধারিত কাঠামোর মধ্যেই সীমায়িত থাকেনি। 'ইমান ও নিশান' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্র এই হেরফের বা রূপান্তরের সমাজতাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং বলেছেন – 'এই সব শাস্ত্রেও নানা

মতভেদ আছে, সময়ের হেরফের দেখা যায়। অনেক সময় একটি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে ভিন্ন অর্থে ধর্মাধর্ম বা আদাবের প্রয়োগ হয়েছে।'[১৯] উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছেন পাঁচালি, পুঁথি বা কাব্যে মার্গ সংস্কৃতির শব্দগুলি যে নেই তা নয়, কিন্তু কাহিনি পরিবেশনের সময়ে কাঠামোতে রূপান্তরের শেষ নেই। এই কারণে মধ্যযুগে কৃষ্ণ আর হরির মাহাত্ম্যের কথা আছে, তাদেরও নবী বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আবার সমগ্র রচনায় 'আল্লাহ' ও 'নিরঞ্জন' সমার্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে ধর্ম আর নাথপন্থার লোকায়ত সাধনার ধারার স্পষ্ট যোগ লক্ষ করা যায়।

অতএব গ্রামীণ সমাজে দেশজ 'বাঙালী' লোকের কাছে 'আপনা দীনের বোল' প্রচার করার কাজ মধ্যযুগের লেখকেরা যেমন ইমানের কাজ বলে মনে করেছেন তেমনই এযুগের ইসলামি প্রাইমার রচয়িতারাও মনে করেন বাংলা ভাষায় ইসলামের মূল কথা প্রচার করাই তাঁদের অন্বিষ্ট। একটি উদাহরণ পুনঃস্মরণ করছি। 'ইসলাম শিক্ষা' নামক প্রাইমারটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই যুগের লেখকের স্পষ্ট ঘোষণা –

> বাংলায়... শিশুদের উপযোগী করে লেখা বইয়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ইসলামের সমস্ত আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-আমলগুলিকে শিশুদের মনের মতো করে পরিবেশন করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে এগুলো এমনভাবে পেশ করা প্রয়োজন যার ফলে শিশু মন তার অনেক জিজ্ঞাসার জবাব পেয়ে যায় এবং এগুলোকে নিজের মনের কথা বলে মেনে নিতে পারে। শিশু অবস্থাতেই যদি ইসলামের সমস্ত আকীদা ও আমল শিশু মনে গভীর রেখাপাত করতে পারে তাহলে পরিণত বয়সেও সে তার প্রভাব এড়াতে পারবেনা। তার জীবন একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়ে উঠবে। তার জীবনধারা একটা বিশেষ খাতে প্রবাহিত হবে। এই শিশুই হবে একটি সুখী শান্তিময় সমাজের পরিগঠক।... শিশুদের এভাবে গড়ে তোলার জন্য আমরা ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা আকীদা বিশ্বাস ইবাদাত ও আমল কে প্রাঞ্জল ভাষায় সহজবোদ্ধ করে পেশ করার চেষ্টা করেছি।[২০]

উপরোক্ত মন্তব্যে একথা স্পষ্ট যে, শিশু পাঠকের মনকে ধর্মীয় ভাবে দখল করে তার মনে ধর্মীয় চিন্তা কাঠামোর বিন্যাসকে পোক্ত করাই লেখকের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রশ্নহল ধর্মের যে আখ্যানগুলিকে তাঁরা বালকের মগজে অভিভাবিত করবেন তা কী শাস্ত্র যথা কোরান হাদিসের উৎস পাঠেরই অবিকৃত রূপ। নাকি সেখানেও প্রবেশ করবে সময় ও সমাজের অভিঘাত? যার দ্বারা পূর্বের আখ্যান খানিকটা বদলে যাওয়া স্বাভাবিক?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের মনে হয়েছে ধর্ম যেহেতু অনড় বা স্থিতিশীল চিন্তা কাঠামো নয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রেক্ষিত ও প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে ধর্মের কাঠামো বদল হয়েছে, ধর্মীয় চৈতন্যে এসেছে নানা রকম বিবর্তন। আর এই কারণেই গ্রামীণ সমাজে বাঙালি লোকের কাছে মধ্যযুগে ইমানের এবং দ্বীনের প্রচার করতে গিয়ে এদেশের মুসলমান কবি সাহিত্যিকরা যেভাবে ধর্মের তথা দিনের অবয়ব নির্মাণ করেছেন তা ইসলামের মূল উৎস থেকে বিবর্তিত। এক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন লোকায়ত নানা ধর্মেও এই আদি উৎসের ব্যবহার এবং তার ফলে শাস্ত্রীয় শব্দ বা তত্ত্বের পরিবর্তন সর্বদাই লক্ষ্য করা যায়।

এখন ইসলামি এই আখ্যানসমূহকেও দেশজ বাঙালির কাছে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি যে সচল ছিল সে সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্র প্রাসঙ্গিকভাবেই মন্তব্য করেছেন –

> লোকায়তে মার্গসংস্কৃতির রূপান্তরের ক্ষেত্রে ক্লদ লেভি স্ত্রাউস্তের অনুগামী হয়ে আমরা বলতে পারি যে লোকায়ত সংস্কৃতির বুদ্ধিজীবী বা কথক বা যোজকরা মার্গ সংস্কৃতির রসদ কে ব্যবহার করেন 'ব্রিকোলাজ' এর অর্থে। যে অর্থে একজন শিল্পী বা কারিগর তার হাতে ফেলে দেওয়া নানা টুকরা জিনিস নিয়ে 'কুটুম কাটাম' তৈরি করেন। এই কুটুম-কাটাম তৈরি করার প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত রসদ সৃষ্টিকর্তার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী আগে ভাগে সংগৃহীত হয় না। রসদ সংগ্রহের উৎসের মধ্যে কোনরকম সমত্ব থাকে না।[২১]

আর এই কারণেই আমরা আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে ধর্মীয় প্রসঙ্গে পরিচয়ের সময় যে সমস্ত শব্দ, ভাষ্য ও আখ্যানের সমাহার লক্ষ করি তা সব ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত নয়। এমনকি শাস্ত্রীয় যে সমস্ত উৎস আখ্যানগুলি গৃহীত হয়েছে সেগুলির মধ্যে খুব একটা স্থানিক ও কালিক সমতা রক্ষিত হয়নি। সমাজতাত্ত্বিকের ভাষায় –

> তৈরি জিনিসটা শিব হবে না বাঁদর হবে, তা নির্ভর করে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি, কথক বা যোজকের সামাজিক স্থান, ও তার পরিচিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের টানাপোড়েনে। ফলে প্রত্যেক কারিগর বা শিল্পী তার কুটুম-কাটামের জন্য রসদের ব্যবহারে কয়েকটি সম্ভাবনা থেকে যে কোন একটা সম্ভাবনা বেছে নেন।[২২]

লক্ষ করবার বিষয় ধর্মীয় মূল উৎসকে ব্যবহার করে যারা নতুনভাবে আখ্যান নির্মাণ করছেন সমাজতাত্ত্বিক তাঁদেরকে 'কারিগর বা শিল্পী' শব্দবন্ধে পরিচয় করাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে কারিগরী কর্ম

আর সৃজনকর্মের মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে আমরা জানি। তবে এখানে যাঁরা ধর্মীয় আখ্যানকে সমাজ পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রতিস্থাপন করছেন তাঁদের ভূমিকাটা প্রকৃতপক্ষে 'যোজকের'। আরো স্পষ্টভাবে বললে কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন যোজকের। আর যোজকের দায়িত্ব সমাজ ও প্রতিবেশের ক্ষুধা বা চাহিদা বুঝে রসদকে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তান্তে রূপ দান করা। ফলে কোনো একটি কালে রসদের ব্যবহারের সম্ভাবনা কারিগরের কাছে যেভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে অন্য সমাজে অন্য কারিগর একই রসদ নিয়ে হয়তো অন্য অর্থবহ কোনো কুটুম-কাটাম তৈরি করতে পারেন। ফলে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি আর অভিজ্ঞতা বারবার অর্থের প্রতিসরণকে নির্ধারণ করে।[২৩] আর এখানেই উৎস আখ্যানটি রূপান্তরিত ও বিবর্তিত হয়ে যাওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা।

এখন বিবেচ্য বিষয় হল এই - উৎস আখ্যানটি যে বিবর্তিত হচ্ছে এবং প্রতিবেশ ভেদে ভিন ভিন্ন অবয়ব লাভ করছে, তাহলে মূল শব্দের ও তার অর্থের প্রতিসরণ ঘটছে কীভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায়? বিষয়টিকে আরও সহজ করে বললে 'আল্লাহ' আর 'নিরঞ্জন' তো এক নয়, কৃষ্ণ আর হরিও নবী নয়, তাহলে কেন তাঁদের একই প্রকৃতির বলে কল্পনা করা হচ্ছে এবং কৃষ্ণ হরিকেও নবী বলে কল্পনা করা হচ্ছে? এপ্রসঙ্গে ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্র পুনরায় বাখতিনের তত্ত্বের ভিত্তিতে আমাদেরকে জানিয়েছেন -

> উচ্চতম মার্গ সংস্কৃতিতে শব্দ আর অর্থ – এর রকমফের থাকলেও তার সীমার মধ্যে আবদ্ধ, প্রত্যাশিত এবং ব্যাকরণসম্মত। সবকিছুই সেখানে সূত্রে এবং নিয়মে বেঁধে ফেলা হয়। অন্যদিকে নিম্ন কোটির সংস্কৃতিতে শব্দ আর অর্থের সীমা নিয়ত পরিবর্তনশীল, অপ্রত্যাশিতের আর আকস্মিকতার চমক সেখানে অনেক বেশি। কারণ নানা সূত্রে আহৃত রসদ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে সেখানে ব্যবহার হতে পারে। উৎসের আর সূত্রের সমত্ব থাকে না। নিয়মের নিগড়ও সেখানে হালকা হয়ে যায়, অর্থের সীমারেখা হয়ে পড়ে দুর্নিরীক্ষ্য। ... তার ফলে পরিবর্তনশীলতা, রং বদলানোর ক্ষমতা, 'আকস্মিকতা' নিম্নকোটির সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়ে। সেই ক্ষেত্রকে কোন কাঠামোয় ধরা আর বোঝাও দুরূহ।[২৪]

অর্থাৎ শব্দ ও তার অর্থের প্রতিসরণ উৎস আখ্যানকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যায় যখন খুব সহজে তাদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। আবার কখনো কখনো স্ববিরোধিতাই অধিক লক্ষিত হয়। যেমন ফুরুফুরা শরিফের সনাতনী ইসলামি পথে যাত্রা এবং ঘুটিয়ারি শরিফের নানা অনুষ্ঠানের সহজিয়া আচার ভক্তের মনে 'উরস' দুই জায়াগায় দুই ভিন্ন মাত্রায় চিহ্নিত করেছে।

এইভাবে লোকায়ত বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্মের আদি আখ্যানগুলি বিবর্তিত, বিবর্ধিত এবং নবরূপ লাভ করেছে। ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যাও আমরা পেয়েছি। কিন্তু প্রশ্ন হল, বিশ শতকের শেষ এবং একুশ শতকের গোঁড়ার দিকের মুসলমান সমাজ কি সেই বিবর্তন, বিবর্ধন ও নবরূপায়নকে ভালো চোখে দেখেছে? তাকে গ্রহণ করতে পেরেছে? নাকি বিবর্তনের সেই ঐতিহাসিক ধারাটিকে অনুধাবন করতে পেরে বর্তমানে তা সংশোধন ও বর্জনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন? আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলির উদ্দেশ্য ও অভিমুখ নির্ণয়কালে আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি বিশ শতকের শেষ দুটি দশক থেকেই ইসলামের শুদ্ধতায় প্রত্যাবর্তনের পালা শুরু হয়। স্বাভাবিকভাবেই বহুক্ষেত্রে মধ্যযুগে রচিত লোকায়তের আখ্যানগুলিকে প্রত্যাখানও শুরু হয় নিবিড়ভাবে। যৌথ সাংস্কৃতিক প্রণোদনায় সৃষ্ট সাহিত্য, প্রতিষ্ঠান কিংবা পোশাক পরিচ্ছদের চিহ্নগুলিকেও বাঙালি মুসলমান বহুক্ষেত্রে তার যাপিত জীবন পরিসর থেকে ছেঁটে ফেলতে শুরু করে। প্রত্যাখ্যান–বর্জনের এই ক্ষণমুহূর্তটি চিহ্নিত করে নাসিম-এ-আলম তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন

> আশির দশকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ধর্মের চেয়ে মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জীবনের প্রতিষ্ঠা। মুসলিম গ্রামগুলিতে শিক্ষার হার ছিল খুবই অল্প। তবু কৃষিকাজ করে, দূর রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করে গরিব মুসলমান পায়ের নীচে মাটি খুঁজতে শুরু করে। নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধ থেকে পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করে। তৎকালীন শাসকদলের কাছে ভোটই ছিল মুখ্য বিষয়। ... প্রশাসন ও সমাজকে ঠুঁটো বানিয়ে লোকাল কমিটি ভিত্তিক এক সমাজ বামপন্থীরা প্রতিষ্ঠা করেছিল। অলিতে গলিতে খারিজি মাদ্রাসার গজিয়ে ওঠা তখন থেকেই। দেখতে দেখতে মেয়েদের বোরখার প্রচলন শুরু হল। পার্থিব জগৎ নাকি মূল্যহীন। সব সুখ পরকালে। পরকালে জান্নাত তথা স্বর্গ পাওয়াই একমাত্র লক্ষ্য। পৃথিবী তুচ্ছ একটি স্থান। বিজ্ঞান চর্চায় অন্যায়। গান বাজনা চর্চা অধর্ম। এমন সব আজগুবি, যুক্তিহীন মনগড়া কথাবার্তার প্রচার শুরু করে মৌলবাদীরা। ...ডালপালা মেলতে থাকে মৌলবাদ। ... একটু একটু করে দিন অতিক্রান্ত হতে থাকে দু'হাজার পাঁচ -ছয় থেকে সমাজে আরো গভীরভাবে মৌলবাদী শিকড় প্রোথিত হয়।[২৫]

এই মৌলবাদী চিন্তা ভাবনার বাড়বাড়ন্ত বাঙালি মুসলমান সমাজের মৌল স্বভাবকেই পাল্টে দিল। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সাধনার ক্ষেত্রগুলিকে জনগণের মানসপট থেকে বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবিয়ে দিতে উদ্যোগী হলেন এঁরা এবং পূর্বের ঐতিহ্যসমূহকে বর্জন করবারও তাগিদ অনুভব করা গেলো ভেতরে ভেতরে। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন -

> একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেছে গ্রামের দিকে পুরনো দিনে কবিগান নাটক যার আসর বসত। অনেক গ্রামীণ মৌলবাদী এসব বন্ধ করে দিয়েছে। এখন অধিকাংশ গ্রামেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন পালিত হয় না। সাতের দশক পর্যন্ত নজরুল যেভাবে সমাদৃত হতেন, আলাদা করে তার কবিতা গুণগুন করতে যুবসমাজ আজ সেই আবেগ স্তিমিত। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবুল বাশারের উপন্যাস যে গৃহে পৌঁছায়নি সেখানে সীমান্তে পেরিয়ে পৌঁছে গেছেন একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী দিলওয়ার সাইদি। দুপুর উজাড় করে তার বক্তৃতার ক্যাসেট শুনছেন মুসলমান সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। ... মোটের উপর উদারপন্থার ও সংস্কৃতি চর্চা প্রায় নিঃশেষিত।[২৬]

আর সংস্কৃতি চর্চার সেই মুক্ত প্রাঙ্গণ দখল করেছে ধর্ম -

> ...মুসলিম গ্রামগুলিতে ধর্মচর্চা যত বেড়েছে, সাংস্কৃতিক চর্চা এক্কেবারে কমে গেছে। এলাকার শিক্ষিত ও নিরীহ মানুষ আশির দশক থেকে সমানে রাজনৈতিক হিংসার শিকার হয়েছেন। পরে মৌলবাদী রক্তচক্ষু দেখতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলির একটা বড় অংশে মোল্লাতন্ত্র বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কোনও মনীষীর জন্মদিন পালন করা যাবে না এগুলি নাকি ধর্মবিরোধী কাজ।[২৭]

যে ভারতরাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ মাথায় নিয়ে বড়ো হতে শুরু করেছিল তার পঞ্চাশ বছর পূর্তির আগেই ক্রমশ ধর্ম আবার জাঁকিয়ে বসতে শুরু করলো। অবশ্যই এর একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আছে, যেখানে আমরা লক্ষ করবো হিন্দুর স্বাজাত্য প্রীতি ব্যাপক হারে বর্ধিত হতে শুরু করলো। এই প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক আশিস নন্দী তাঁর 'জাতীয়তাবাদ ও ভারতচিন্তা' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'ধর্ম : রূপকথার পাখির পুনরুজ্জীবন' – এ বলেছেন

> একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ধর্ম কথেকে উড়ে এসে একেবারে সমাজের কেন্দ্র মুখে জুড়ে বসবে একথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অনেকেই ধর্মের শোকগাথা রচনা করেছিলেন। ... কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ধর্ম রূপকথার পাখির মতো নিজের ভগ্নস্তুপ থেকে উঠে এসেছে এবং নতুন বিজয় রথের চিহ্ন বহন করেছে।[২৮]

হিন্দু ধর্মের এই উত্থান কতখানি সুতীব্র এবং প্রবল আমরা তার একটি বিরল নমুনা উদ্ধার করেছি ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে প্রকাশিত স্বামী নির্ম্মলানন্দ রচিত 'হিন্দু হুঁসিয়ার' নামক একটি গ্রন্থে। যেখানে লেখকের সোচ্চার ঘোষণা এদেশে হিন্দুদেরকে পুনর্গঠিত হতে হবে এবং আপন ধর্মের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি মাথায় রেখে সর্বদা সচেতন হতে হবে। তাই তিনি হিন্দুদের 'হুঁশিয়ারি'

দিয়েছেন।[২৯] আটের দশক থেকেই হিন্দুদের মধ্যে এই আত্ম সচেতনতা প্রবল হয়। মুসলমান সমাজেও সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে পুনর্গঠনের তাগিদ। ধর্মীয়ভাবে এই প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের মধ্যেও এই আত্মগঠন যে কতখানি অনিবার্য ছিল সেকথাও আশিস নন্দী তাঁর 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ-বিরোধী ইস্তাহার' এ আলোচনা করেছিলেন। এখানে তাঁর প্রতিপাদ্য এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। কেননা –

> ১৯৬০ এর দশকের শেষভাগ থেকে ধর্মনিরপেক্ষকরণ ও জাতি গঠনে ভারতের দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে অগ্রণী দেশগুলির কথা বলা হতো ঠিক সেগুলিতেইও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পুরোনো ধারণা তার ঔজ্জ্বল্য হারাতে থাকায় বহু আধুনিক ভারতীয়ের মনে এক আস্থাহীনতা জন্ম নেয়।[৩০]

ঐ সমস্ত দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিণতি জানাতে গিয়ে সমাজতাত্ত্বিক শ্রী নন্দী জানিয়েছেন –

> প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের এক পর এক সমাজে ধর্মকে ভ্রান্ত চেতনা হিসেবে প্রত্যাখ্যান এবং প্রায় পরাস্ত করার পর সেখানকার সমাজকর্মী এবং বিশ্লেষকরা অনুধাবন করেছেন যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র – তার নব্য পুরোহিত শ্রেণীসোম বিজ্ঞানী, আমলা এবং উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একই অন্ধবিশ্বাস দাবি করছে যেমনটা একদা চার্চ তার অনুগামীদের কাছ থেকে করত। প্রযুক্তির সহায়তায় সে নিজেকে ঈশ্বরের মতোই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সর্বত্র বিরাজমান হিসেবে সাজিয়ে তুলছে।[৩১]

অতএব যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, বিজ্ঞানবাদ প্রাতিষ্ঠানিকতার পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যখন ক্ষমতা কাঠামো হিসেবে নিজেকে জাহির করতে আরম্ভ করলো তখন থেকেই মানুষের মন থেকে তা অনাস্থা অর্জন করলো এবং পরিত্যক্ত হতে শুরু করলো। আমাদের মনে হয় মানব মনের এই শূন্য জমিতেই ধর্ম আবার জাঁকিয়ে বসলো। এই সময় পর্ব থেকেই "আমরা প্রথমে ভারতীয়, তারপর হিন্দু, মুসলমান বা শিখ" – একদা এই জনপ্রিয় স্লোগান বস্তাপচা বলে পরিগণিত হতে থাকলো। সমাজতাত্ত্বিক শ্রী নন্দীর মতে, ভারতীয় জনসমাজের অধিকাংশের কাছে তখন এটা আর কোনো বাস্তব অবস্থান নয়, নিছকই এক সাধু প্রত্যাশা।[৩২] অর্থাৎ মানব পরিচিতির বহুমাত্রিকতাকে অগ্রাহ্য করে ধর্মকেন্দ্রিক একান্তবাদী পরিচিতিসত্তা বড়ো হয়ে দেখা দিতে লাগলো। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবেশী ধর্মগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হতে শুরু করলো, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পারস্পরিকতা ও যৌথতার ক্ষেত্রগুলিকে ছাঁটতে ছাঁটতে বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলো। আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলির অধিকাংশই রচিত হয়েছে এই সময়কালে। ফলে ধর্মীয় উপাদান - অনুষঙ্গ

নির্মাণ ও সংকলনে এই প্রাইমারগুলি সচেতনভাবে দৃষ্টি রেখেছে এবং নিজস্ব ধর্ম কাঠামোকে পূর্বাপেক্ষা মজবুত করতে প্রয়াসী হয়েছে।

২.১. ধর্ম : সাহিত্যে রূপান্তরের রুদ্ধতা, সম্ভব্যতা, অসম্ভব্যতা

এখন প্রসঙ্গত বিচার্য বিষয় ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক গৌতম ভদ্র ধর্মীয় মূল আখ্যানের প্রতিবেশ ভেদে যে রূপান্তরের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যার উপর ভিত্তি করে আমরা দেখেছি যে, প্রকৃতই মধ্যযুগের বিভিন্ন টেক্সটে ইসলাম ধর্মের যে রসদ আখ্যান বা মূল আখ্যান তা বিবর্তিত হয়েছে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল বিশ শতকের আটের দশক থেকে যখন ধর্মকে নতুনভাবে 'জাগানোর' প্রয়াস শুরু হলো, যে সময়টিতে নাসিম-এ-আলম তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার বাড়বাড়ন্তের কথা বলছেন, এবং যখন যৌথ সাংস্কৃতিক পরিসরগুলিকে সজ্ঞানে পরিত্যাগ করা হচ্ছে তখন কি সাহিত্যে ধর্মীয় প্রসঙ্গের রূপান্তর পূর্বের মতোই সম্ভব? নাকি ধর্মীয় আখ্যানগুলিকে অবিকৃত অবস্থায় রাখা হবে? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে বর্ণিত ধর্মীয় প্রসঙ্গের প্রকৃতি নির্ণয়।

আলোচ্য প্রাইমারগুলি পর্যবেক্ষণ করে আমরা লক্ষ করেছি যে, এগুলিতে ধর্মীয় আখ্যানের রূপান্তরের তত্ত্বকে যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্তত রূপান্তর যে হয় তা মেনে নিয়ে এ ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মীয় আখ্যানকে অবিকৃত রাখার চেষ্টা হয়েছে। এই ব্যাপারটিকে আমরা শরিয়তি শুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা বলে মনে করেছি। প্রাইমারগুলিতে ধর্মীয় শুদ্ধতা কতদূর বজায় রাখা যায় এবং সেক্ষেত্রে ধর্মীয় আখ্যানগুলির রূপান্তর, পুনর্নির্মান যে কতখানি ভ্রমাত্মক ও মারাত্মক সে বিষয়ে সচেতন আজকের ইসলামপ্রাজ্ঞ প্রাইমার রচিয়তারা। তাই ভাষাজ্ঞান ও ধর্মজ্ঞান থাকলেই যে কোনো মুসলমান বালক বালিকাদের জন্য ইসলামি প্রাইমার রচনা করবেন এবং তা অনুমোদিত হবে এমনটি নয়। তাই 'সালাফী বর্ণপরিচয়' এর রচয়িতা অধ্যাপক মাওলানা হাফেয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী স্পষ্ট বর্গ বিভাজন করে খাঁটি প্রাইমারের পক্ষে সওয়াল করেছেন, যেখানে কোনোপ্রকার শরিয়তি আখ্যানের রূপান্তর লক্ষ করা যাবে না। সোজাকথায় কোরআন হাদিসের কাহিনিকে ডিকন্সট্রাকশন করবার অধিকারও কারুর নেই। তাই তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা –

> দুঃখের বিষয় যে, ইতিপূর্বে বাংলাভাষী শিশুদের মানুষপটে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে যে শিক্ষা পাথরের মত দাগ কেটেছে তার অধিকাংশই ছিল তওহীদ বিরোধী শিক্ষা। তাই যারা প্রিয় নবীর (সঃ) মনোবিজ্ঞান প্রসূত উক্ত ফরমানটির প্রতি অগাধ আস্থা রাখে তারা মাতৃভাষা বাংলায় তাওহীদবাদী বই রচনা করাকে ঈমানের তাগিদ বলে মনে করে। ... সম্প্রতি কিছু বই ইসলামী ভাবধারায় রচিত হয়েছে। কিন্তু ঐ বইগুলার রচিয়তাগণ কোরআন ও হাদীসের অভিজ্ঞ আলেম নন বলে তাঁদের অজান্তে তাঁদের বইয়ে কিছু ইসলাম বিরোধী বেদআতী ভাবধারাও স্থান পেয়েছে। তাই সালাফি ভাবধারার নতুনভাবে বই তৈরীর প্রয়োজন ও গুরুত্ব আরো বেড়েছে।[৩৩]

লক্ষ করবার বিষয় পূর্বের ‘ঐ বইগুলার রচিয়তাগণ কোরআন ও হাদীসের অভিজ্ঞ আলেম নন বলে তাঁদের অজান্তে তাঁদের বইয়ে কিছু ইসলাম বিরোধী বেদআতী ভাবধারাও স্থান পেয়েছে’। সুতরাং তাঁদের বই সমাজে গৃহীত হবে না।

আমরা জানি ‘বেদাত’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল ‘নবসৃজন’। সেদিক থেকে বলা চলে যে, এমন কোনো উদ্ভাবিত বিষয় বা বস্তু যা কোরান ও হাদিসে নেই তাইই হলো ‘বেদাত’। লক্ষ করবার বিষয় এখানে নতুনভাবে সৃষ্টির কোনো জায়গা নেই। অর্থাৎ শিশুচিত্তকে কোরান হাদিসের ভাবনা চিন্তার খোপে পুরে তাকে ধর্ম ও সমাজের প্রতি অনুগত এবং বাধ্য করাই যেন এই সমস্ত প্রাইমারের লক্ষ্য। এই কারণে প্রচলিত মূলধারার বাংলা প্রাইমারগুলিকে ‘সালাফী’ পরিত্যাজ্য বলে মনে করে তো বটেই, যে কোনো মুসলমানের লেখা প্রাইমারকেও তাঁরা গণ্য করেন না। কেননা সেখানে ধর্মীয় আখ্যানের রূপান্তরের সম্ভব্যতা থাকতে পারে। তাই কেবলমাত্র ‘আলেম’ বা ইসলামপ্রাজ্ঞ লেখকের হাতে রচিত প্রাইমারগুলি সময়ের দাবি মেটাতে পারে বলে লেখকের বিশ্বাস। ইসলামি প্রাইমারের এই জায়গাটিই সর্বাধিক বিপজ্জনক। কেননা আখ্যানকে অবিকৃত রাখবার দাবি থেকেই তা হয়ে উঠবে স্থবির, প্রাচীন এক জড়বস্তু। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় প্রসঙ্গেও যে রূপান্তর আসে; সাম্প্রতিকের চৈতন্য তাকে নতুন করে নির্মিত দান করে; রূপান্তর প্রক্রিয়ার রুদ্ধতা ঘটিয়ে আখ্যান নির্মাণের সেই সম্ভব্যতাকেই আসলে হত্যা করা হয়। আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে ধর্মীয় আখ্যানের আদি রূপ যেমন আমরা পেয়েছে, তেমনই রূপান্তরিত আখ্যানের সম্ভব্যতার আঁচও পেয়েছি। অতএব আমরা শিশুপাঠ্য পুস্তকে ইসলামি উপাদানের নমুনাগুলি চিহ্নিত করতে অগ্রসর হবো।

৩. ইসলামি বাংলা প্রাইমারে ধর্মীয় উপাদান :

আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে ধর্মীয় উপাদান বলতে আমরা ইসলামি উপাদান সমূহকেই চিহ্নিত করবো। এক্ষেত্রে সমকালীন ইসলামিক তাত্ত্বিকরা ধর্মীয় উপাদান বলতে যে সমস্ত বিষয়কে বুঝেছেন আমরা সেগুলিকেই নির্বাচিত প্রাইমারে অনুসন্ধানের চেষ্টা করবো। তাঁদের মতে – 'ইসলামিক উপাদান বলতে বুঝায় ইসলাম সংক্রান্ত তথ্য এবং ইসলামের প্রতি আকর্ষণ ও শ্রদ্ধাবর্ধক রচনা মন্তব্য ছবি ও শব্দাবলী।'[৩৪] উপাদানগুলিকে আট ভাগে বিন্যস্ত করে দেখানো হবে। যথা –

১. আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ভক্তি ও অনুগত্যমূলক রচনা

২. রাসূল (সা.) খুলাফা-ই রাশিদিন, সাহাবা ও তাবিঈন-এর জীবনী, চরিত্র, শিক্ষা ও সাধনা সংক্রান্ত রচনা

৩. পরবর্তীকালের ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুসলিম মনীষী আউলিয়া দরবেশ রাষ্ট্র ও সেনানায়কদের কথা-কাহিনি

৪. কুরআনে বর্ণিত অন্যান্য নবীদের কথা-কাহিনী

৫. পবিত্র স্থান ও ইসলামের ইতিহাস প্রসিদ্ধ অন্যান্য স্থান সংক্রান্ত রচনা

৬. ধর্মীয় উৎসব সংক্রান্ত রচনা

৭. মুসলিমদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও কর্তব্য সংক্রান্ত রচনা

৮. ইসলামিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সংক্রান্ত রচনা

এগুলির সঙ্গে আমরা ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাবর্ধক শব্দাবলিকেও চিহ্নিত করতে চাই। সবমিলিয়ে মোট নয়টি বর্গে আমরা ইসলাম ধর্মীয় উপাদানগুলি অনুসন্ধান করবো।

৩.১ ইসলামি বাংলা প্রাইমারে ধর্মীয় শ্রদ্ধাবর্ধক শব্দাবলি

আক্ষরিক অর্থে শব্দ কতগুলি চিহ্ন বা প্রতীকের সমন্বয়। প্রযুক্ত শব্দের মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে একটা চিত্র ফুটে ওঠে। শব্দতাত্ত্বিক ও দার্শনিক হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন বাক, বাক্য বা শব্দ বস্তুস্থিতিকে চিত্রিত করে।[৩৫] এক্ষেত্রে চিত্রের প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে যেমন চিত্রিত পরিস্থিতি ফুটে ওঠে তেমন শব্দের মধ্যে দিয়ে একটা জগতের ছবি ফুটে ওঠে। তাই ফোটোগ্রাফ যেমন চিত্র পদবাচ্য হবে, তেমনই গানের স্বরলিপিকেও গানের চিত্র বলা হয়। 'চিত্র' শব্দটির এই ব্যাপক

অর্থকে ব্যাখ্যা করআর উদ্দেশ্যে হ্বিটগেনস্টাইন বলেন 'চিত্র' হল 'তত্ত্বার অনুকৃতি' বা 'a picture is a model of reality'[৩৬] অনুরূপভাবে আমরা বলতে পারি শব্দও হল বাস্তবের চিত্রময় রূপ। তবে শব্দের দর্শনের সঙ্গে জুড়ে আছে আরো জটিল এক সামাজিক রাজনৈতিক সম্পর্ক। উচ্চারিত বা লিখিত শব্দ কেবলমাত্র ঐ চিত্র সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত থাকে না। বরং উচ্চারিত ও লিখিত শব্দের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় এক অদৃশ্য বয়ান, আর সেই অদৃশ্য বয়ানের মধ্যে দিয়ে প্রযুক্ত শব্দ মানুষের মনকে গড়ে পিঠে নেয়, নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে কব্জা করে ফেলে মানব মন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'ভাষা, অর্থ, সত্য'-তে বলেছেন –

> আমরা যখন কথা বলি বা লিখি, তখন শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ ছাপিয়ে একটা উদ্দেশ্য ফুটে ওঠে। কথার মারফৎ আমরা শ্রোতা বা পাঠককে লিপ্ত বা প্রভাবিত করতে চাই – বলা যায় একটা কাজ হাসিল করতে চাই। ... শুধু গুরুতর বা গোলমেলে কথা নয়, সব কথারই একটা মতলব থাকে: একেবারে বিনা কারণে আমরা মুখ খুলি না, কলম ধরি না। কথা বলা তাই কেবল ভাষার উচ্চারণ নয়, লঘু বা গুরু কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা।[৩৭]

শব্দ প্রয়োগের এই স্বার্থপর রাজনীতির সঙ্গে আবার জুড়ে আছে এক অদ্ভুত প্রেমের সম্পর্কও। অর্থাৎ আমরা যে শব্দটি নির্বাচন করছি সেটি যেমন একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উচ্চারিত ও লিখিত হচ্ছে তেমনই সেই শব্দটির প্রতি শব্দ ব্যবহারকর্তার এক ধরণের অনুরাগও লক্ষিত হয়। এই জন্য ভারতীয় দর্শনে ভাষা বা বাকের উৎপত্তি প্রসঙ্গে মনে করা হয় পরস্পরের ভাব ও ভালোবাসা বিনিময়ের জন্য বাক – এর সৃষ্টি। এই মতটির বিচার করে দার্শনিক অরিন্দম চক্রবর্তী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন - 'প্রেম থেকেই এল শব্দ দিয়ে নাম দেবার আগ্রহ। ... তাই প্রেমহীন শব্দপ্রয়োগ ছিন্নমূল'।[৩৮] আমরা যদি ইসলামি বাংলা প্রাইমারগুলিতে ব্যবহৃত শব্দের প্রতি দৃষ্টি রাখি তাহলে লক্ষ করবো শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি বা প্রেম যেমন বিশেষভাবে কার্যকরী তেমনই তেমনই বিশেষ উদ্দেশ্যও সুস্পষ্ট। নিচে ইসলামি প্রাইমারে ব্যবহৃত উদ্দেশ্যমূলক শব্দ বিশেষত যেগুলিকে ধর্মীয় শ্রদ্ধাবর্ধক উপাদান বলে মনে করেছি সেগুলিকে গুলিকে চিহ্নিত করা হল।

এই পর্যায়ে শব্দ চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে আমরা বর্ণানুক্রমিক রীতি গ্রহণ করেছি, মূলত প্রাইমারগুলিতে যে বিন্যাসে শব্দগুলি সজ্জিত হয়েছে আমরা সেই বিন্যাসকেই বজায় রাখাত চেষ্টা

করেছি। সেক্ষেত্রে কোনো একটি বর্ণের অনুষঙ্গে যে সমস্ত শব্দগুলি বহুবার এসেছে, আমরা সেগুলিকেই তালিকায় সজ্জিত করেছি।

বর্ণ	শব্দ
অ	অজু/অযু/ অযূ, অহী। এছাড়া 'অ' – কার যোগে শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন – মকতব, নফল, যমযম, বরকত, রহমত, ফজর, ফরজ, হযরত, কবর ইত্যাদি।
আ	আল্লাহ, আলকুরআন, আমাল, আদম, আযান/ আজান, আতর, আলাক, আনসার, আবসার, আরাফাত, আরশ। এছাড়া আ' – কার যোগে শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন – রমাযান, উসমান, নামায, কালাম, কাবা, সালাম ইত্যাদি
ই	ইসলাম, ঈদ, ইজতেমা, ইফতার, ইমান / ঈমান, ইল্‌ম, ইউসুফ। এছাড়া 'ই' – কার যোগে শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন – মসজিদ, সিজদা, হিজরত, মগরিব ইত্যাদি।
ঈ	ঈদ, ঈমান। এছাড়া 'ঈ' – কার যোগে শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন – মদীনা, সাহাবী, তাবলীগ, তাশরীফ, তাফসীর, শরীয়তী ইত্যাদি।
উ	উম্মত, উলেমা, উসমান, উমরা। এছাড়া 'উ' – কার যোগে শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন – কুরআন, ফুরকান, সুন্নাত, দরুদ, দুয়া ইত্যাদি।
ঊ	ঊ – কার যোগে শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে যথা – রসূল, মকবূল, মাহমুদ, তূর, মরদূদ, সূরা, নমরূদ ইত্যাদি।
ঋ	কোনো ধর্মীয় শ্রদ্ধাবর্ধক শব্দ পাওয়া যায়নি
ঌ	কোনো ধর্মীয় শ্রদ্ধাবর্ধক শব্দ পাওয়া যায়নি
এ	একরা। এছাড়া 'এ' – কার যোগে শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন – কেয়ামত, হেফাজত, খেলাফত, খেদমত
ঐ	কোনো ধর্মীয় শ্রদ্ধাবর্ধক শব্দ পাওয়া যায়নি

ও	ওযু / ওজু, ওয়াদা, ওমর, ওশর। এছাড়া ‘ও’ – কার যোগে শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন – দোযখ, রোজাদার, খোদা, কোরআন, কোরবান, গোসল।
ঔ	ঔরঙ্গজেব। এছাড়া ‘ঔ’ – কার যোগে শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন – তৌহীদ, তৌফীক ইত্যাদি
ক	কুরআন/কোরআন, কোরান, কিয়ামত, কাযা, কিবলা
খ	খোদা, খলিফা, খালিফা, খাদিজা, খেদমত
গ	গুনাহ্, গীবত, গজব/গযব
ঘ	কোনো ধর্মীয় শব্দ পাওয়া যায়নি।
ঙ	সংশ্লিষ্ট বর্ণে ধর্মীয় শব্দ পাওয়া যায়নি।
চ	চাঁদ (ঈদের চাঁদ),
ছ	ছালাম (সালাম),
জ	জিকির, জামাত, জেদ্দা, (জেদ্দাগামী জাহাজের ছবি। উদ্দেশ্য হজ), জমাইত, জামাত
ঝ	সংশ্লিষ্ট বর্ণে ধর্মীয় শব্দ পাওয়া যায়নি।
ঞ	মিঞা
ট	টুপি, (ইসলামি ফেজ টুপি) সঙ্গে নামাজি মানুষের টুপি পরিহিত ছবি
ঠ	সংশ্লিষ্ট বর্ণে ধর্মীয় শব্দ পাওয়া যায়নি।
ড	সংশ্লিষ্ট বর্ণে ধর্মীয় শব্দ পাওয়া যায়নি।
ঢ	সংশ্লিষ্ট বর্ণে ধর্মীয় শব্দ পাওয়া যায়নি।
ণ	সংশ্লিষ্ট বর্ণে ধর্মীয় শব্দ পাওয়া যায়নি।

ত	তাসবিহ, তওবা, তালিম, তৌফিক, তিরমিযি
থ	সংশ্লিষ্ট বর্ণে ধর্মীয় শব্দ পাওয়া যায়নি।
দ	দান, দোয়া/দুয়া
ধ	ধর্ম, ধার্মিক (টুপি পরিহিত শ্মশ্রুধারী মুসলমান মানুষের ছবি)
ন	নামাজ/নামায, নবী
প	পুলসিরাৎ, পর্দা (হিযাব পরিহিত নারীর ছবি)
ফ	ফতেমা, ফজর, ফরজ
ব	সংশ্লিষ্ট বর্ণে ধর্মীয় শব্দ পাওয়া যায়নি।
ভ	সংশ্লিষ্ট বর্ণে ধর্মীয় শব্দ পাওয়া যায়নি।
ম	মসজিদ, মুমিন, মুজাহিদ, মুসলিম, মহাম্মদ, মুহাম্মদ, মোহাম্মদ, মাইয়াৎ, মহরম, মিসকিন, মনযিল, মরহুম, মুসুল্লি, মকতব, মাদ্রসা, মখলুকাত, মাবুদ ইত্যাদি।
য	যাকাত, নামায, যমযম,
র	রোজা/ রোযা, রমজান, রহমান
ল	লাইলাতুল কদর, লা ইলাহা ইল্লালাহু,
ব	বনি আদম, বিসমিল্লাহ্,
শ	শরীয়ত/শরিয়ত, শতর/সতর
ষ	সংশ্লিষ্ট বর্ণে ধর্মীয় শব্দ পাওয়া যায়নি।
স	সহীহ্ হাদিস, সবেবরাত, সুরা/সূরা, সতর/শতর, সাহরি/ সেহেরি
হ	হাদিস, হজরত/হযরত, হিজরত, হিজাব, হেরা গুহা
ড়	সংশ্লিষ্ট বর্ণে ধর্মীয় শব্দ পাওয়া যায়নি।

ঢ়	সংশ্লিষ্ট বর্ণে ধর্মীয় শব্দ পাওয়া যায়নি।
য়	সংশ্লিষ্ট বর্ণে ধর্মীয় শব্দ পাওয়া যায়নি।
ৎ	সংশ্লিষ্ট বর্ণে ধর্মীয় শব্দ পাওয়া যায়নি।
ং	হিংসা (টুপি পরিহিত দুই ভাইয়ের ছবি। বার্তা হিংসা ভোলার)
ঃ	সংশ্লিষ্ট বর্ণে ধর্মীয় শব্দ পাওয়া যায়নি।
ঁ	চাঁদ (ইদের চাঁদ)

[প্রাইমারে প্রাপ্ত বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে]

উপরোক্ত শব্দগুলি কেবলমাত্র শব্দ শিখনের কাজেই ব্যবহৃত হয়নি। বরং প্রত্যেকটি শব্দের সঙ্গে কমবেশি জুড়ে আছে ধর্মীয় ঐতিহ্য, মুসলমানের চিহ্ন সমন্বিত পোশাক, সংস্কৃতির ইতিহাস, এমনকি ইসলামি তরিকা ও আনুগত্য আদায়ের আখ্যান। তাই আমাদের আলোচ্য প্রাইমারে বিন্যস্ত শব্দগুলিকে আমরা বিশেষ উদ্দেশ্যে গৃহীত শব্দ বলেই বিচার করবো।

৩.২ আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ভক্তি ও অনুগত্যমূলক রচনা

কোরান ও হাদিস অনুসারে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে – 'যে শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অন্বেষণ করা হয়ে থাকে, কেউ যদি তা পার্থিব স্বার্থে অর্জন করে, কিয়ামতের দিনে সে জান্নাতের গন্ধও অর্জন করবে না।'[৩৯] একথার অর্থ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর অনুগত থাকা এবং শিক্ষাকে কোরান হাদিসের নির্দেশ অনুযায়ী কেবলমাত্র জান্নাতের লক্ষ্যে চালিত করা। স্বাভাবিকভাবে শিশুপাঠ্য পুস্তক বা প্রাইমারগুলিতেও কোরান হাদিসের এই নীতি মেনে শিক্ষাকে চালিত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ভক্তি এবং আনুগত্য কায়েম করবার উদ্দেশ্যে। আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে স্রষ্টা ও তাঁর নবীর প্রতি আনুগত্যের বয়ান লক্ষ করা যায় নানা ক্ষেত্রে। এখানে নির্বাচিত কয়েকটি নমুনা উপস্থাপন করা হল।

৩.২. ক।।

'শিশুকথা' দ্বিতীয় ভাগের প্রথম পাঠ শুরুই হয়েছে আল্লাহর ও তাঁর নবী রাসূলের প্রতি আনুগত্য নিবেদনের মধ্যে দিয়ে। পাঠের ভাষায় –

> পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, তোমরা আনুগত্য করো তাঁর এবং আনুগত্য করো তাঁর রাসুলের। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের(সা.) আনুগত্য ব্যতীত অন্যের আনুগত্য করলে সেই ব্যক্তি হবে জাহান্নামী। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে সাফল্য। আর সেটাই কাম্য।[৪০]

উক্ত উপদেশ বচনে একথ স্পষ্ট যে, আনুগত্যর একমাত্র আধার আল্লাহ এবং তাঁর নবী রাসুল। তাই ধর্মীয় শুদ্ধতা বজায় রাখতে জাগতিক যে কোনো বস্তু ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে অতি সহজেই নাকচ করতে পারেন একজন খাঁটি মুসলমান। প্রত্যাখ্যানের এই পাঠও যেন নিহিত আছে আলোচ্য বয়ানে।

অতঃপর সেই আনুগত্যর অনুশীলন শুরু হয় সকাল সকাল। এ প্রসঙ্গে 'সালাফী বর্ণ পরিচয়ের' নিদান -

> সকাল সকাল উঠ। আল্‌লা-হ আল্‌লা-হ বল। বয়স যার সাত হল তার উপর নাময চাপল। ঊশার সময় ফজর নামায। আযান দাও। নামায পড়ো। ... রমযান আল্লার খাস অবদান। হযরত উসমান মহান দাতা ও দয়াবান।[৪১]

৩.২.খ।।

'সালাফী বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগে সংকলিত গোলাম মোস্তফার কবিতা 'হাম্‌দ' - এ আমরা পাই আল্লাহ আনুগত্যের আরেকটি নমুনা –

> অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি, বিচার দিনের স্বামী
>
> যত গুণগান হে, হে চিরমহান, তোমারি অন্তর্যামী।।
>
> দ্যুলোকে ভুলোকে সবারে ছাড়িয়া
>
> তোমারি কাছে পড়ি লুটাইয়া
>
> তোমারি কাছের যাচি হে শকতি,

তোমারি করুণাকামী।[৪২]

৩.২.গ।।

'কচিকাঁচা' শীর্ষক প্রাইমারটিতে হজরত আদম ও হাওয়ার প্রতি শ্রদ্ধা বর্ষিত হয়েছে এভাবে -

> আমাদের আদি পিতা হযরত আদম। খোদা আদমকে তৈরি করেছেন মাটি থেকে। মা হাওয়া হলেন আদি মাতা। পৃথিবীর সকল মানুষ হযরত আদম এবং হাওয়ার বংশধর। তাই সব মানুষ ভাই ভাই। দেশ জাতি ভাষা নিয়ে কলহ বৃথা।[৪৩]

উক্ত পাঠটিতে ইসলামে নবীদের ইতিহাস যেমন বিবৃত হয়েছে তেমনই ইসলাম ধর্মের মানব কল্যাণ, শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের বাণীও প্রচারিত হয়েছে।

এই প্রাইমারটিরই পঞ্চম পাঠে বর্ণিত হয়েছে পরবর্তীকালের আরও কিছু নবী-রাসুলের কাহিনি:

> পৃথিবীতে যুগে যুগে বহু নবী রাসূল এসেছেন। তাঁরা মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। নবী রাসুল হলেন আমাদের মত মানুষ। তাঁদের কাছে খোদা ফেরেস্তা ও অহী পাঠান। নবী রাসূলগণ না এলে মানুষ জানতে পারত না, কে তাঁদের রব, পৃথিবীতে কেমন করে জীবন যাপন করতে হয়, মরণের পর কী হবে। কোরান শরীফে অনেক নবীর কাহিনি লেকাহ আছে। হযরত ইব্রাহিম ছিলেন এমন একজন মহান নবী। তার ছেলের নাম ইসমাইল।[৪৪]

অতঃপর হজরত ইব্রাহিম কীভাবে আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তাঁর ছেলে ইসমাইলকে কুরবানি দিতে উদ্যত হলেন এবং আল্লার প্রিয় বান্দা হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে থাকলেন তার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য পাঠটি যেন এভাবে সকল মুসলমানের মনে হজরত ইব্রাহিমের আত্মত্যাগ ও আল্লাহর প্রতি তাঁর আনুগত্যর আদর্শ সৃষ্টি করতে চাইছে।

৩.২.ঘ।।

'শিশুকথা' দ্বিতীয় ভাগের সপ্তম পাঠে বাক্য গঠনের ছলে শিশু মনে খাঁটি মুসলমান বালকের আদর্শ নির্মাণ করা হয়েছে। আবার আল্লহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

> আল্লাহর সত্ত্বা সর্বত্র বিরাজমান। তিনি শরীকহীন। বিশ্বে যা কিছু আছে সবই তাঁর। আমরা তাঁর বান্দা বা গোলাম। আমরা সর্বত্র তাঁরই গলামি করবো। গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেবো না। বুদ্ধি দিয়ে সঠিক পন্থা জেনে নেব।[৪৫]

উপরোক্ত পাঠটিতে যেমন আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনই তাঁর প্রতি মুসলমানের প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রকাশ করা হয়েছে।

৩.৩ রাসূল (সা.) খুলাফা-ই রাশিদিন, সাহাবা ও তাবিঈন-এর জীবনী, চরিত্র, শিক্ষা ও সাধনা সংক্রান্ত রচনা

আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে আল্লাহ রাসুলের প্রতি ভক্তি আনুগত্য যেমন বর্ষিত হয়েছে তেমনই পরবর্তীকালে যাঁরা ইসলামকে প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখেছেন তাঁদের ইতিহাসকেও স্মরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যাঁরা কোরান সংকলনে হাত লাগিয়েছেন, কখনো সুশাসক হিসেবে খলিফা অথবা নবীদের স্ত্রী কন্যাদের আদর্শকে নতুনভাবে আলোকিত করা হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই নবী সাহাবা ও তাঁদের স্ত্রী কন্যাদের আদর্শে বাঙালি মুসলমানের যাপিত জীবনের কাঠামো নির্ধারণ করা। এই ধরণের কয়েকটি নমুনা নিচে পেশ করা হলো।

৩.৩.ক।।

'সালাফী বর্ণ পরিচয়' দ্বিতীয় পাঠে নবী রাসূলের গুণকীর্তনের পাশাপাশি এসেছে অপরাপর ইসলামি চিন্তকদের কথা। যথা –

I. ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ ছিলেন অতুলনীয় বাগ্মী। বিস্ময়কর ছিল তাঁর স্মরণশক্তি।
II. নবীজির দুগ্ধমাতাঁর নাম ছিল হালিমা
III. মাওলানা নিয়ামাতুল্লার একটি বইয়ের নাম ধোকাভঞ্জন।
IV. অলি দরবেশগণ শুষ্ক রুটি খান। পার্থিব সুখ থেকে তাঁরা নিষ্কৃতি চান।
V. অ্যালজেব্রা মুসলিম মনীষী আলজাবারের সৃষ্টি।

'সালাফী বর্ণ পরিচয়' এর গদ্য পাঠ অংশে 'একটি ইসলামি আদব' গল্পে এসেছে হযরত আদম ও মা হাওয়ার বংশ বিস্তারের আখ্যান। সেইসঙ্গে হাবিল কাবিলের হাত ধরে কীভাবে পৃথিবীতে মানব প্রজাতির বিস্তার ঘটলো তার বৃত্তান্ত। এই প্রাইমারটির অন্তর্গত 'লেখাপড়া করার সুফল' পাঠটিতে এসেছে চতুর্থ খলিফা হযরত আলির মহিমা বর্ণন। 'দয়ার পুরস্কার' পাঠে এসেছে গজনীর বাদশাহ সবুক্তগীনের গোলাম জীবন থেকে বাদশাহ হয়ে ওঠার আখ্যান। 'হক বিচারের মর্যাদা' গল্পটিতে

আমরা পাই সুলতান গিয়াসুদ্দিনের সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়নতা ও কাজীর বিচারের নিরপেক্ষতার বৃত্তান্ত।

৩.৩.খ ।।

'শিশুকথা' তৃতীয় ভাগে 'আদব শিক্ষা' পাঠে আমরা দেখি খলিফা হারুনুর রশিদের বিচক্ষণতা ও যুক্তিবাদী মানসিকতা কতখানি প্রবল যার জন্য তিনি সর্ব শ্রেণির মানুষকে অকাতরে ভালবাসতে পারেন এবং ন্যায় বিচার পৌঁছে দিতে পারেন।

এই বইয়ের পরবর্তী পাঠের নাম 'মহান বীর'। এখানে একজন জেহাদি বীরের প্রকৃত বীরত্ব, সহিষ্ণুতা ও সততার আখ্যান বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় পাঠ 'হারজিত' মানবতাবাদ ও ভালোবাসার এক নির্ভেজাল আখ্যান। এখানে আমরা দেখি দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) কীভাবে একজন অসহায় বৃদ্ধাকে নিজে হাতে খাওয়ানো ও সেবা করার মতো মহানুভবতার পরিচয় দিচ্ছেন। এই পাঠেই স্বয়ং আবুবকর অর্থাৎ ইসলামের ইতিহাসে যিনি প্রথম খলিফা তাঁর মহানুভবতারও পরিচয় আছে। ইসলামি শাসকরা যে প্রেমে, ভালোবাসায় এবং মহানুভবতায় অনুকরণযোগ্য – এই হলো এই পাঠের নিহিত বিষয়।

'শিশুকথা' তৃতীয় ভাগের একটি উল্লেখযোগ্য পাঠ হলো 'সময়ের গুরুত্ব'। এই পাঠের বিষয়বস্তু - সময়কে সদ্ব্যবহার করে যেসমস্ত মুসলিম মনীষী বিশ্বের ইতিহাসে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের সাধনার কথা। ফলে এই পাঠে লেখক মুসলিম ইতিহাসের গৌরবপ্রকাশ করে বলেন –

> অতীতে মুসলিম জাতি সময়কে মর্যাদা দিয়েছিল। ফলে তাঁরা জীবনে সফলতা অর্জন করতে পেরেছিল। আবিষ্কার গবেষণা দিয়ে তাঁরা বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিতে পেরেছিলেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, চিকিৎসা, মহাকাশ গবেষণা সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা শুনলে তোমরা অবাক হবে। সে সময়েক কয়েকজন বিখ্যাত মনীষী হলেন – জাবির, ওমর খৈয়াম, আলবিরুনী, ইবনে আহমদ, মম্মহদ ইবনে মুসা, ... এঁদের মধ্যে রসায়নের জন্মাদাতা ছিলেন – জাবির, কম্পাস যন্ত্রের আবিস্কারক ইবনে আহমাদ। মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খারেজেমি ছিলেন বীজগণিতের জন্মদাতা। তাঁকে গণিতের শূন্যের জন্মদাতাও বলা হয়। ইবনে সিনা ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক... [৪৬]

উপরোক্ত পাঠটির মধ্যে দিয়ে মুসলমান বালকের চিত্তে ইসলামে বিজ্ঞান চিন্তার গৌরবময় ইতিহাস যেমন বর্ণনা করা হয়েছে তেমনই সেই গৌরবের ধারা বহন করতে শিশু পাঠককে প্রেরণা জোগানো

হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাইমারগুলি অতীতের উপর ভোর করে ইসলামের ভবিষ্যৎ পুনর্নির্মাণের পথে অগ্রসর হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়।

উপরিউক্ত নমুনাগুলিতে আমরা পরবর্তীকালের ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুসলিম মনীষী, আউলিয়া দরবেশ, রাষ্ট্র ও সেনানায়কদের কথা-কাহিনির যেমন নমুনা পেশ করেছি তেমনই কুরআনে বর্ণিত অন্যান্য নবীদের কথা-কাহিনিরও নির্বাচিত কয়েকটি অংশ সংযুক্ত করে মুসলমান সমাজে ধর্মীয় আদর্শ স্থাপনে প্রাইমারগুলির উদ্যোগ ও বিষয় বৈচিত্র্যের দিকটি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমরা পর্যবেক্ষণ করবো পবিত্র স্থান ও ইসলামের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান সংক্রান্ত বর্ণনা আমাদের নির্বাচিত প্রাইমারগুলিতে কীভাবে উঠে এসেছে।

৩.৪ : ইসলামি প্রাইমারে মুসলিমদের পবিত্র স্থান ও ইসলামের ইতিহাস প্রসিদ্ধ অন্যান্য স্থান সংক্রান্ত বিবরণ

ইসলামি বাংলা প্রাইমারগুলি মুসলমান শিশুর কাছে সহজপাঠ হিসেবে আদব কায়দা সদাচার ও সহবত শিক্ষার সমান্তরালে তাদের মনে ইসলামের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসকেও প্রোথিত করতে প্রয়াসী। এক্ষেত্রে ধর্মীয় ইতিহাস ও ধর্ম মাহাত্ম্য জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে গৌরবোজ্জ্বল অতীতোদ্ধার যেমন এই প্রাইমারগুলির অন্বিষ্ট হয়েছে, তেমনই ইতিহাসের প্রেক্ষিতে পবিত্র স্থান মাহাত্ম্য প্রচারও প্রাইমারগুলির একটি বিশেষ দিক হয়ে উঠেছে। যদিও ইসলামে পৌত্তলিকতার কোনো জায়গা নেই, স্থানপুজো ইসলামে 'শির্ক' বলেই পরিগণিত, তবুও আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে ইসলামের ধর্মীয় ঐতিহ্য প্রমাণের জন্যই স্থানমাহাত্ম্য বর্ণনার প্রসঙ্গটি এসে পড়ে। আমাদের মনে হয় এর পেছনে মুসলমানের আত্ম নির্মাণের একটা প্রচেষ্টা আছে। যে মুসলমানের ইতিহাস নেই বা ঐতিহ্য নেই বলে অভিযোগ আছে, সেই অভিযোগ খণ্ডন করতেই শিশু বয়সেই শিশুর শূন্য চিত্তে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে ধর্মীয় দিক থেকে ইসলামের সমৃদ্ধি ও গৌরবের নানা চিহ্নকে। অতএব ইসলামি বাংলা প্রাইমারে ইসলামের পবিত্র স্থানের সঙ্গে শিশু পাঠকের পরিচিতিকরণ একটি স্বতন্ত্র্য পাঠ হিসেবেই পরিগৃহীত হয়। নিচে এই বিষয়ক কতগুলি নমুনা দেওয়া হলো।

১. অহী এলো হেরার গুহায় [কচিকাঁচা]

২. আদিনা মসজিদ মালদায় [সালাফী – ১]

৩. কামাল মামা মক্কা যায়। [সালাফী – ১]

৪. আল্লাহর শেষ রাসুলের নাম হযরত মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি অসাল্লাম। তাঁর জন্ম সৌদি আরবের মক্কা নগরীতে। [সালাফী – ২]

৫. মক্কা শরীফ প্রিয় নবীর জন্মস্থান [সালাফী – ২]

৬. কাবা আছে ধরার মাঝে [শিশুকথা প্রবেশিকা]

৭. নানা ভাই সৌদি যাবে / আনবে বহু দৌলত [কচিকাঁচা]

৮. মুসলিমদের পবিত্রধাম মক্কা। দুনিয়ার প্রথম ঘর কাবা মক্কায় অবস্থিত। [শিশুকথা - ২]

৯. হেরা গুহা ধন্য কত নাই যে তাহার / খুশি হয়ে হাসতো কত সাফার পাদদেশ [কচিকাঁচা – ১]

১০. জাহাযে দেব সাগর পাড়ি / জেদ্দায় নেমে চড়বো গাড়ি [ইসলামি বর্ণপরিচয়]

[নিম্নরেখ সংযোজিত। নিম্ন রেখাঙ্কিত শব্দগুলিতে ইসলামের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি চিহ্নিত হয়েছে]

উপরোক্ত নমুনাগুলি ছাড়াও আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে হজ করবার প্রসঙ্গে কাবা শরিফের মাহাত্ম্যকথা বর্ণিত হয়েছে একাধিকবার, প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে আল আকসা সহ পৃথিবীর আরও বিখ্যাত কয়েকটি মসজিদের নাম ও মসজিদগুলির অবস্থানজ্ঞাপক স্থানের নাম। এভাবে ইসালামি ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রসিদ্ধ স্থান ও স্থাপত্যকীর্তি সমূহের অল্প বিস্তর উল্লেখ ও বৃত্তান্তের মধ্যে দিয়ে পাঠক চিত্তে ধর্মীয় ইতিহাসের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।

৩.৫ : ইসলামি বাংলা প্রাইমারে মুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও কর্তব্য সংক্রান্ত বিবরণ

এই পর্বে এসে আমরা মুসলমান সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় উৎসব, আচার অনুষ্ঠান ও কর্তব্য সংক্রান্ত বিহস্য নিয়ে আলোচনা করবো এবং এই বিষয়গুলি আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে কীরকমভাবে ধরা পড়েছে সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ করবো।

আমরা জানি যে কোনো জাতির চলার পথে আনন্দ উৎসব অপরিহার্য একটি অঙ্গ। এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে আমরা মিলিত হই এবং নিজেদেরকে উজার করে দিই। তাই দুঃখ ভোলবার ও দুঃখ মোচনের অবকাশ সৃষ্টি করার জন্য উৎসব আবহমানকাল মানুষের কাছে প্রীতির সঙ্গে

গৃহীত হয়েছে। এই উৎসব সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে আমরা যে কোনো জাতি, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ রুচি, কৃষ্টি ও মননের ধারাকে যেমন চিহ্নিত করতে পারি, তেমনই তাদের অতীত ও বর্তমান ইতিহাসকেও বুঝে নিতে পারি। তাই যেকোনো সভ্য জাতির মধ্যেই উৎসব, আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য আগ্রহ লক্ষ করা যায়। ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতিও তার ব্যতিক্রমী নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল ইসলাম ধর্মে এই উৎসব, অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির পরিধি কতদূর বিস্তৃত বা সীমায়িত?

এই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা লক্ষ করেছি মুসলমান সমাজে উৎসব অনুষ্ঠানের পরিসর অপ্রত্যাশিতভাবে সীমায়িত। খাইরুল বাসার তার 'পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ', এক্রাম আলি 'মুসলমান বাঙালির লোকাচার', 'বাঙালি মুসলমান লোকাচার ও সমাজ' এবং মইনুল হাসান তাঁর 'বাঙালি মুসলমান জীবন ও সংস্কৃতি' প্রভৃতি বইতে যে সমস্ত ইসলামি উৎসবের নাম করেছেন সেগুলির অধিকাংশ লোকায়ত বাঙালির নিজস্ব সৃষ্টি। একমাত্র ইদ উল ফিতর ও ইদোজ্জোহা বাদ দিয়ে আর কোন উৎসবকে শরিয়ত সেভাবে মান্যতা দেয় না। আমরা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে লক্ষ করেছি প্রকৃতই কোরান ও হাদিস নিয়ন্ত্রিত মুসলমান সমাজে উৎসব অনুষ্ঠানকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়নি। আর তার প্রমাণ পেয়েছি ইস্লামিম ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম' ও ড. ওসমান গনী রচিত 'ইসলামি চিন্তা ও চেতনার ক্রমবিকাশ', চরিত্র ও সমাজ গঠনে কোরয়ান শরীফ', 'চরিত্র ও সমাজ গঠনে হাদীস শরীফ' ইত্যাদি গ্রন্থগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণে। এই গ্রন্থগুলিতে সত্যই ইসলামি জীবন ও সংস্কৃতির অনুপুঙ্খ বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। সেখানে মুসলমানের সামাজিক, পারিবারিক, আধ্যাত্মিক, রাষ্ট্রিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের বিস্তারিত পরিচয় ও বিবরণ থাকলেও আমরা ইসলামি অনুষ্ঠান বা আচার সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাইনি। অনুষ্ঠান বলতে কেবলমাত্র একটি অনুচ্ছেদে বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পর্কে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি খরচ করা হয়েছে, বাকি কোথাও কোনো অনুষ্ঠান বা আচার পালনের কোনো উল্লেখ নেই। 'উৎসব' শিরোনামেও আলাদা করে কোনো এন্ট্রি নেই এই বইগুলিতে। তবে ইদ এবং বকরিদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। এই দুটির মধ্যে প্রথমটি আনন্দের উৎসব হিসেবে বর্ণিত, কিন্তু দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বকরিদ নেহাতই ত্যাগের মহিমায় আলোকিত, তাই সেখানে উৎসবের আনন্দ খোঁজা অবান্তর। বাদবাকি আর কোনো কিছুকে উৎসব বলা যাবে না। শরিয়তের নির্দেশ অনুযায়ী সেগুলিকে আমরা উৎসবের কোঠায় না ফেলে ধর্মীয় শিষ্টাচার হিসেবে বর্ণনা করতে চাই। অতএব আমাদের আলোচ্য ইসলামি বাংলা প্রাইমারে এই অংশটির অনুসন্ধান করতে এসে

আমরা সচেতনভাবে লক্ষ করবো ইসলামে উৎসব অনুষ্ঠানের অনুমোদন বড়োই স্বল্প – যা কিছু লক্ষ করবো, সেগুলিকে নির্ভেজাল উৎসব বা অনুষ্ঠান না বলে ধর্মীয় শিষ্টাচার পালনই বলবো। কেননা প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎসবের উদ্দেশ্যহীন আনন্দ ও মুক্তি অপেক্ষা সাধকের জান্নাত লাভের বাসনাজনিত কৃচ্ছ্রসাধন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল তাহলে ইসলামি প্রাইমারে মুসলমানের উৎসব অনুষ্ঠানের যে আখ্যান রচিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য কী? তা কি শিশু মনকে নির্ভেজাল আনন্দে মাতিয়ে তাকে মুক্তির আস্বাদ দিতে প্রয়াসী? নাকি ধর্মীয় শিষ্টাচার পালনের মধ্যে দিয়ে তাকে কেবল 'সাচ্চা মুসলমান' বানাতে উদ্যোগী? আমাদের মনে হয়েছে শৈশব থেকেই শিশু মনে জান্নাত লাভের বাসনাকে পোক্ত করে সেই মোতাবেক তাদের সাধনার গতিপথ চালিত রাখা এই সমস্ত প্রাইমারের মূল অন্বিষ্ট। অতপর দেখে নেওয়া যাক ইসলামি বাংলা প্রাইমাগুলিতে ইসলামি উৎসব, অনুষ্ঠান, ধর্মীয় আচার ও কর্তব্য সংক্রান্ত বিবরণ কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

৩.৫.ক ধর্মীয় উৎসব অর্থাৎ ইদ, বকরিদ শবে বরাত, শবে কদর, রমজান, হজ, উমরা, নামাজ ও মুসলমানের কর্তব্য

আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে ধর্মীয় উৎসব বলতে আমরা ইদ বকরিদ, ও শবেবরাত এই তিনটি উৎসবকে লক্ষ করবো। এর মধ্যে ইদ আনন্দের কিন্তু বকরিদে আছে আত্মত্যাগের বেদনার সুর। আর শবেবরাতে আছে প্রার্থনা ও কৃচ্ছ্রসাধনের নির্দেশ। রমজানও যতখানি না উৎসব তার থেকে অনেকবেশি কৃচ্ছ্রসাধন। এখন প্রথমে কয়েকটি উৎসব এবং তারপর কতগুলি কর্তব্য পালনের নমুনা দেওয়া হলো এবং আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে সেগুলির প্রায়োগিক ক্ষেত্রটি চিহ্নিত করা হলো।

প্রসঙ্গ ইদ :

১. ঈদের সময় সিমাই কাটি [শিশুকথা প্রবেশিকা]

২. ঈদের দিন মিলাও হাত [ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২]

৩. চাঁদ আনে ভাই ঈদের খবর [ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২]

৪. ঈদের দিনে খোশ কালাম / ঈদ মোবারক আসসালাম [ছড়া ছবিতে একের ভিতর তিন]

৫. ঐ দেখা যায় ঈদের চাঁদ / কাল হবে তাই মোলাকাত [ছড়া ছবিতে একের ভিতর তিন]

প্রসঙ্গ বকরিদ :

১. আজ বকরা ঈদ। নামায শেষে কুরবানি দেওয়া হবে। আব্বা দুম্বা কিনেছেন। ... কুরবানীতে পশুর রক্ত ঝরে। মায়া হয়। তবুও মন শক্ত করে থাকতে হয়। ... পশুর রক্ত, গস্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছয় না। আল্লাহর কাছে পৌঁছায় আমাদের ভক্তি। [ফুলকুঁড়ি, দ্বিতীয় পাঠ, পৃ. ৩৪]

প্রসঙ্গ শবেবরাত :

১. শবে বরাত আর শবে ক্বদরে / রুহগুলি আসে দ্বারে দ্বারে [ইসলামি বর্ণপরিচয়]

২. লাইলাতুল কদর পুণ্যে ভরা [কচিকাঁচা]

প্রসঙ্গ রমজান / রোজা :

১. ফেতরা বিনা রোজার ফাকি [ইসলামি বর্ণপরিচয়]

২. রোজা করতে সাহরী খাও [শিশুকথা প্রবেশিকা]

৩. রোযা রাখা ফরয তাই / ছাড়লে রোযা ক্ষমা নাই [ছড়া ছবিতে একের ভিতর তিন]

৪. রাখবে রোজা সেহেরী খেয়ে [কচিকাঁচা]

৫. একটি হাদিসে আছে, এক নারী-সাহাবী রুবাইয়া বলেন, আমরা কচিকাঁচা শিশুদের রোজা রাখার অভ্যাস করাতাম। তাঁরা যখন রোজা করতে করতে বিকেল বেলায় নড়তে চড়তে পারতো না। বরং খিদে ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়তো। এবং কাঁদতে লাগতো। তখন আমরা তাদের পশমের তৈরি খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। তাড়া তা নিয়ে খেলতে থাকতো। পরিশেষে সূর্য ডুবে যেত... তখন সবাই মিলে মহানন্দে ইফতার করতাম। ... নবীজির যুগের অইসব শিশুরা তোমাদের চেয়েও বয়সে ছোটো ছিল। তাহলে তোমরা এখন থেকেই নামাযের মতো রোযা রাখার অভ্যাস করবে না কি? [সালাফী বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ২৫]

প্রসঙ্গ নামাজ :

১. ঘরে সুন্নত পড়া ভাল

২. আজান শোনার সাথে সাথে / ধর জামাত দিনে রাতে [ইসলামি বর্ণ পরিচয়]

৩. ঊষার আগে ফরজ পড় [ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২]

৪. এশার নামাজ রাতের বেলা [ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২]

৫. পণ করেছি পড়বো নামাজ / সেই নিয়মে গড়বো সমাজ [ছড়া ছবিতে একের ভিতর তিন]

প্রসঙ্গ তসবিহ্ পাঠ :

১. গুনে গুণে তসবিহ পড়ো [ইসলামি বর্ণ পরিচয়]

২. গাছেরাও সব তসবিহ পড়ে [শিশুকথা প্রবেশিকা]

৩. স্মরণ করো আল্লাহ্র নাম / তসবিহ পড়া নিজের কাম [শিশুকথা প্রবেশিকা]

৪. নবীর নামে পাঠাই সালাম / সবাই পড়ি তসবিহ কালাম [ছড়া ছবিতে একের ভিতর তিন]

প্রসঙ্গ কোরান পাঠ :

১. কুরআন পড়ো সাঁঝ সকালে / খোদার রহম পাবে তাতে

২. ঊষাকালে ওজু করে / কোরআন পড় মধুর সুরে

৩. কোরআন পড় দিনে রাতে / সাফায়াত পাবে আখেরাতে

৪. ঐশীবাণী পাক কোরআন / আঁকড়ে ধর ভাই মুসলমান

৫. হাদিস কোরআন কেতাব পড় / নবীর সুন্নত হয় বড়

৬. ঊষাকালে কুরআন পড়ো [শিশুকথা প্রবেশিকা]

৭. শান্তি পেতে ক্বুরআন পড়ো

৮. ঘরে ঘরে কুরআন পড় [ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২]

৯. ঊষার সময় কোরআন পড়ি / আল-কোরআনের সমাজ গড়ি [ছড়া ছবিতে একের ভিতর তিন]

প্রসঙ্গ অজু/ অযূ/ ওজু :

১. অজু করে পাক হও / আল্লার নাম লও

২. অজু করে নামাজ পড়ো / ইমান আমাল শক্ত করো

৩. অজু করে নামাজ [ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২]

৪. অজু করে জামাত ধরো / অলস হলে দুঃখ বড়ো [ছড়া ছবিতে একের ভিতর তিন]

প্রসঙ্গ যাকাত :

১. ধনীর ঘাড়ে যাকাত ফরজ / নামাজ সবার তরে ফরজ

২. যতনে ধন বৃদ্ধি পায় / যাকাত দিলে আরো হয়

৩. যাকাত দাও অর্থ হলে / রাখতে হিসাব যেওনা ভুলে [ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২]

৪. ধন দৌলত আল্লাহর দান / দিলে যাকাত বাড়বে মান [ছড়া ছবিতে একের ভিতর তিন]

৫. যাকাত দিলে খুশি মনে / পুণ্য পাবে জনে জনে [ছড়া ছবিতে একের ভিতর তিন]

৬. যাকাত দাও খোদার ভয়ে [কচিকাঁচা]

প্রসঙ্গ হয/হজ :

১. হাজীরা যায় হজ্জের তরে [ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২]

২. উমরা করো খোদার টানে [কচিকাঁচা]

প্রসঙ্গ শরিয়ত :

১. শরিয়ত ছাড়া পথ নাই [ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২]

২. শরিয়তের বিধান মেনো / সিভিল কোডে পতন জেনো

উপরের মুসলমানের উৎসব অনুষ্ঠান ও কর্তব্যবিধির বিন্যাস পর্যবেক্ষণ করলে আমরা লক্ষ করবো, অজু, নামাজ, রোজা ও কোরান পাঠের প্রসঙ্গ পৌণঃপুনিকভাবে যতবার এসেছে সেভাবে উৎসব অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ যথা ঈদ বা বকরিদের কথা আসেনি। সর্বাধিক এসেছে কোরান পাঠের প্রসঙ্গ ও তারপর এসেছে যাকাত ও নামাজের প্রসঙ্গ। তবে কি উৎসব অনুষ্ঠানের আনন্দময় পরিবেশ খানিকটা এড়িয়ে গিয়ে শাস্ত্র ও শিষ্টাচারমুখী একবগ্‌গা জীবন প্রত্যাশা করেন ইসলামি প্রাইমারের রচয়িতারা? 'ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা' গ্রন্থে মওলানা সাইয়েদ মওদূদী লিখেছেন –

> ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হলো মানুষকে সাফল্যের চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে প্রস্তুত করা। ...এ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রচণ্ড নিয়মানুবর্তিতা (Discipline) আর শক্তিশালী বন্ধন। এ সংস্কৃতি তার অনুগামীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে নিজস্ব বিধানের অনুগত করে তোলে। ... সে চায় সমাজের লোকদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্র, আত্মানুশীলন, সত্যপ্রীতি, আত্মসংযম, ... উদারদৃষ্টি, কর্তব্যবোধ ,আত্মতৃপ্তি, আনুগত্য, আইনানুবর্তিতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণরাজি সৃষ্টি করতে।[৪৭]

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই ব্যাপকভাবে বর্তেছে আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলির বয়ান রচনায়। আর এই কারণেই প্রত্যেকটি প্রাইমারের কথক যেন শিশু পাঠকের উপর কড়া নজরদারি জারি রাখেন, সামান্যতম ত্রুটি হলেই যেন 'ক্ষমা নেই কোনো'। গত শতকের প্রখ্যাত দার্শনিক মিশেল ফুকো তাঁর 'Discipline and Punish' (১৯৭৫) বইতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় 'প্যান অপটিকান' বা সর্বদ্রষ্টার নজরে দেখেছিলেন এবং পাঠশালা ও কারাগারকে একাসনে বসিয়েছিলেন। শিষ্টতা ভদ্রতার প্রমিত মান থেকে কোনোরকম বিচ্যুতি বিদ্যালয়ের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ। বিদ্যালয়ের ভেতরেই যেন একটা 'ছোটো আদালত' বসানো আছে। যার লক্ষ্য শিশুদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে একটা বিশেষ দিকে পরিচালিত করা বা 'ট্রেইন' করা।[৪৮] আমাদের নির্বাচিত প্রাইমারের ধর্মীয় বয়ানকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে লক্ষ্য করবো 'জান্নাতি' সুখ প্রাপ্তির নেশায় শিশুর যাবতীয় ক্রিয়াকর্মকে পরিচালিত করা হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে অজু রে নামাজ-কোরান পাঠ থেকে শুরু করে পাঁচ বার নামাজ, এমনকি জামাতের সঙ্গে নামাজ ধরা থেকে শুরু করে যাবতীয় 'ফরয' ও 'সুন্নত' অর্থাৎ অনিবার্য ও আবশ্যিক কর্মে চালিত করার নিদান দিয়েছে এই প্রাইমারগুলি। জানিয়ে দিয়েছে – 'রোযা রাখা ফরয তাই / ছাড়লে রোযা ক্ষমা নাই', আবার 'অজু করে জামাত ধরো / অলস হলে দুঃখ বড়ো' কিংবা সামজিক জীবনের সাবধানবাণী – 'শরিয়তের বিধান মেনো / সিভিল কোডে পতন জেনো' অর্থাৎ শরিয়তকে কোনোভাবে লঙ্ঘন করলে নেমে আসবে সামূহিক বিপর্যয়। তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 'শরিয়ত ছাড়া পথ নাই'। এভাবে যেন এক প্রকার ধর্মীয় সংস্কৃতি নির্মাণের পথেই প্রাইমারগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে। আনন্দময় পাঠদানে ও উদার জ্ঞানরাজ্য সৃজনের পক্ষে এই ধরণের একপেশে নিয়ন্ত্রণকামী চিন্তা কাঠামো নিশ্চয় শুভ হবে না।

৩.৫ : বাংলা ভাষার ইসলামি প্রাইমারে ইসলামি ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্ব

বিশ শতকের আটের দশক থেকে ইসলামের পুনর্গঠনের যে প্রচেষ্টা শুরু হয় তাঁর একটি অন্যতম লক্ষ্য ছিল প্রকাশিত পাঠ্য পুস্তকে ইসলামি উপাদানের বিপুল সংযোগ ঘটানো। এই কাজে পাঠ্য পুস্তকগুলিতে অন্যান্য উপাদানের মতো ইসলামি ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্বের নমুনাও ঢেলে সাজানো হয়। এখন আমরা আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলির ধর্মীয় উপাদান হিসেবে ইসলামি ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্বের যে আখ্যান রচিত হয়েছে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো। প্রসঙ্গত এই ধরণের

চিন্তা ভাবনা শিশুপাঠ্যপুস্তক হিসেবে প্রাইমারগুলিকে কতোখানি সার্থক করেছে সে বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করবো।

৩.৫.ক।। প্রসঙ্গ ইসলামি প্রাইমারে সৌভ্রাতৃত্ব : সর্বজনীন বনাম ধর্মীয়

সৌভ্রাতৃত্ব বরাবরের জন্যই কল্যাণকর। পরিবার, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় হয়ে বৃহত্তর সমাজ ও সভ্যতার প্রাঙ্গণে সাম্য, মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের ভূমিকা অপরিসীম। এই বিপন্ন সময়ে যখন 'আমাদের ডান পাশে ধ্বস / ... বাঁয়ে গিরিখাদ / ... মাথায় বোমারু / পায়ে পায়ে হিমানীর তখন আরো বেশি করে হাতে হাত রেখে বেঁধে বেঁধে থাকলে অশান্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সহজ হবে। তাই সামাজিক মানুষের কাছে সংঘবদ্ধতার মূল্য অপরিসীম। কিন্তু এই সংঘবদ্ধতার ও সৌভ্রাতৃত্বের পরিসর যদি কেবলমাত্র কোনো একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সেই গোষ্ঠীর সংঘশক্তিকে বৃদ্ধি করবার উদ্দেশ্যে চালিত হয় তাহলে তা কোনোভাবেই সমাজ ও সভ্যতার পক্ষে মঙ্গলজনক বার্তা বহন করে না। সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথা চড়া দেয় এবং ক্রমশ তার আগ্রাসী কর্মকাণ্ডে সমাজের অপরপর গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। আমরা জানি বৃহত্তর স্বার্থে মানববন্ধন সর্বকালেই সামাজিক প্রগতিকে অব্যাহত রেখেছে কিন্তু ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত নির্দিষ্ট / নির্বাচিত ও নির্ধারিত মানুষের মধ্যেকার সৌভ্রাতৃত্ব সমাজে বিপর্যয় ডেকে এনেছে।

আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে ধর্মীয় সৌভ্রাতৃত্বের একটা বয়ান আমরা সর্বদা লক্ষ করেছি। তবে সেই সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের চরিত্র একমাত্রিক নয়, অর্থাৎ সেটি নির্দিষ্ট কোনো একটিমাত্র ভাষ্য রচনার মধ্যেই আটকে থাকেনি। একথা স্বীকার্য যে, প্রাথমিকভাবে সেই সৌভ্রাতৃত্বের প্রকল্পতে লেখকেরা মুসলমান সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। যেখানে তাঁরা মুমিন মুসলমানকে পারলৌকিক সাফল্য ও জান্নাত লাভের নেশায় বুঁদ করে সংঘবদ্ধ করে তুলতে প্রয়াসী। কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্র জুড়ে এই প্রাইমারগুলিতে মানববন্ধনেরও একটা বিকল্প বয়ান রচিত হয়েছে। তাই আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে যখন আমরা ইসলামিক উপাদানের পরিমাণ বিচারে প্রয়াসী হব তখন সৌভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের বয়ান রচনায় প্রাইমারগুলির মধ্যে এক প্রকার মিশ্র বায়ান লক্ষ করবো। কেননা বিশ শতকের আটের দশক থেকে ইসলামের পুনরুত্থান ও পুনর্গঠনের যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রচিত হয় সেখানে পুনরুত্থানবাদীদের মূল লক্ষ্য ও অভিপ্রায় ছিল পাঠ্যপুস্তক

সমূহে ধর্মীয় ভাষ্যের ব্যাপক ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীর মনের অধিকার কায়েম করা। সে ক্ষেত্রে ইসলামি সৌভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের বয়ান রচনাযই তাঁদের একমাত্র অন্বিষ্ট। কিন্তু আমরা মিশ্র বয়ানের কথা বলেছি এই কারণে যে, সেখানে ধর্মীয় সৌভ্রাতৃত্বের পাশাপাশি ধর্মীয় পরিসর বাদ দিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে মানবিক সৌভ্রাতৃত্বের বয়ান রচিত হয়েছে। এখন আমরা আমাদের আলোচ্য প্রাইমার গুলি থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ উদ্ধার করে সৌভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ বয়ানগুলিকে চিহ্নিত করবো।

৩.৫.খ ।। ইসলামি প্রাইমারে ধর্মীয় সৌভ্রাতৃত্ব ও সাম্য

নাজ বুক ডিপো, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'ইসলামী বর্ণ পরিচয়' – এ আমরা ধর্মীয় সৌভ্রাতৃত্বের একাধিক বয়ান লক্ষ করি। নিচে কয়েকটি নমুনা দেওয়া হলো।

১. ঐশীবাণী পাক কোরআন / আঁকড়ে ধর ভাই মুসলমান

২. চার খলিফা সবাই জানি / চার ইমাম আমরা মানি

৩. ছাতা মাথায় চলো যাই / আজান দেয় মোয়াজ্জেন ভাই

৪. ডর করো না মুসলমান / আল্লার পথে হও কুরবান

৫. ভোরের বেলা মধুর আযান / ফজোর হ'ল ভাই মুসলমান

'সালাফি বর্ণপরিচয়' -এ ধর্মীয় সৌভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের যে সমস্ত নমুনা আমরা পাই তা নিম্নরূপ –

১. ইসলামকে আঁকড়ে ধরো / ঈমানকে মজবুত করো

২. আমরা সবাই শেষ নবীর উম্মত

৩. আল্লাহ মুমিনের বন্ধু

৪. খাঁটি মুসলমান ইসলামের কট্টর সমর্থক

৫. আল্লামা সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী মুসলিম জাহানের গৌরবের দীপালী।

৬. বেগম রোকেয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মহিলা ছিলেন। তাঁর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতারই ফলে বাঙালী মুসলিম নারীদের শিক্ষাদীক্ষার পথ প্রশস্ত হয়।

৭. আমরা মুসলমান। আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম। আরবী ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি। তাই এক মুসলমানের সাথে আর এক মুসলমানের সাক্ষাৎ হলে বলতে হয় – আস্‌সালামু আলাইকুম। অর্থাৎ আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

৮. আমরা হব বিশ্বমাঝে সাচ্চা মুসলমান / দ্বীনের তরে যুদ্ধে যাব বিলিয়ে দেব প্রাণ

বিশ্বজনে বাসব ভাল হোক না সাদা হোক না কালো / আমরা সবাই আদম হাওয়ার একই যে সন্তান

'ফুলকুঁড়ি – দ্বিতীয় পাঠ' এ আছে 'নতুন দল' শীর্ষক একটি কবিতা। সেখানে শিশুদের বয়ানে বলা হয়েছে –

১. আমরা শিশুরা গড়িব এবার / নতুন দল / সব ভেদাভেদ ভুলে হব আজ / এক সকল/

নৈতিকতার এই মোরা গাঁঙে / আনিব বান / আমরা বাচ্চা তবুও সাচ্চা / মুসলমান।

৩.৫.গ ।। ইসলামি প্রাইমার ও ধর্মনিরপেক্ষ সর্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ব ও সাম্য

নাজ বুক ডিপো, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'ইসলামী বর্ণ পরিচয়' – এ আমরা ধর্মীয় সৌভ্রাতৃত্বের অপর প্রান্তে ধর্মনিরপেক্ষ সর্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বেরও একাধিক নমুনা লক্ষ করি। যেমন –

১. পতাকা হলো দেশের মান / রক্ষা করবো এর সম্মান

২. সাক্ষাৎ হলে সালাম কর / ভালো মন্দ জিজ্ঞাসা কর

৩. দুঃখী জনের পাশে দাঁড়াও / ইসলামী আদর্শ ভুলে না যাও

৪. দেশের ম্যাপ বুঝে নাও / যেথায় যাও মিলিয়ে নাও

'সালাফী বর্ণপরিচয়' -এ ধর্মনিরপেক্ষ সর্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের যে সমস্ত নমুনা আমরা পাই তা নিম্নরূপ –

১. সালাম দাও। ভালবাসা বাড়াও।

২. মিলিমিশি করি কাজ হারিজিতি নাহি লাজ।

৩. দুঃসময়ে দুঃখীদের দুঃখ দূর কর।

৪. সাধ্যমতো সবাইকে করবে আপ্যায়ন।

৫. যে বড়োদের মধ্যে গণ্য

৬. দরিদ্র ও আশ্রিত দয়ার পাত্র

৭. স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন নামকরা সন্ত।

৮. মাস্টার সাহেবগণ শ্রদ্ধার পাত্র

৯. হরিদাস মুন্দ্রা ছিলেন এক বিখ্যাত ধনী

১০. সত্যিকার মুসলমান কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারে না।

১১. ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে একজন শূদ্রেরও সম্ভ্রম খলীফার সমান হয় [সৌভ্রাতৃত্ব অপেক্ষা ধর্মান্তরকরণের প্রলোভন অধিক]

১২. ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

১৩. যার পার্শ্ববর্তী ভুখা থাকে সেই উদরপূর্ণ লোকটি নামধারী মুসলমান। প্রকৃত মুসলমান তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে হৃদ্যতাপূর্ণ করে তুলতে পারে।

১৪. আমরা হব বিশ্বমাঝে সাচ্চা মুসলমান / দ্বীনের তরে যুদ্ধে যাব বিলিয়ে দেব প্রাণ

বিশ্বজনে বাসব ভাল হোক না সাদা হোক না কালো / আমরা সবাই আদম হাওয়ার একই যে সন্তান

'ফুলকুঁড়ি দ্বিতীয় পাঠ' -এ ধর্মনিরপেক্ষ সর্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের এক আশ্চর্য নমুনা আমরা পাই। মূল পাঠ অনুযায়ী :

১. বক্সি গঞ্জ একটি ছোটো গ্রাম। সিরাজ মাস্টারের বাড়ি এখানেই। ... মানুষের প্রীতিবন্ধন তিনি চান। পরস্পরের মৈত্রী তাঁর কাম্য। ... সমাজ সংস্কারে তার অনেক অবদান।

'শিশুকথা দ্বিতীয়ভাগ' -এ ধর্মনিরপেক্ষ সর্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের যে সমস্ত নমুনা আমরা পাই তা নিম্নরূপ –

১. আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ। সংবিধানে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা হয়েছে।

২. মুসলিম কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না।

৩. ইসলামে বংশমর্যাদা বড়ো নয় – কর্মই প্রধান। তাই একজন শূদ্রও যদি ইসলাম গ্রহণ করে তার সম্ভ্রম আল্লাহর কাছে সমান [এখানেও সৌভ্রাতৃত্ব অপেক্ষা ধর্মান্তরকরণের প্রলোভন অধিক]

৪. ছোটো বন্ধুরা, আর্তের সেবা মানুষকে মহৎ করে। আল্লাহ যাঁদের ভালোবাসেন তাদের দিয়ে ভালো কাজ করিয়ে নেন। তোমরা সবসময় ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করবে। দুঃস্থ অসহায় মানুষদের সেবা করবে। সে যেন বোঝে এই পৃথিবীতে তাকে ভালোবাসারও মানুষ আছে। [শিশুকথা তৃতীয় ভাগ]

৩.৫.ঘ ।। ইসলামি প্রাইমার সৌভ্রাতৃত্ব ও সাম্য : দরকারে অদরকারে

উপরিউক্ত নমুনাগুলি যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি তাহলে লক্ষ করবো আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে সৌভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের যে আখ্যান রচিত হয়েচে তা চরিত্রগত দিক থেকে মিশ্র প্রকৃতির। ধর্মীয় চেতনা সম্ভূত কিছু কিছু পাঠে কঠোরভাবে 'সাচ্চা মুসলমান' নির্মাণের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। সেখানে এমনও বলা হয়েছে 'খাঁটি মুসলমান ইসলামের কট্টর সমর্থক' এবং সে দ্বীন অর্থাৎ ধর্মের জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত – 'আমরা হব বিশ্বমাঝে সাচ্চা মুসলমান / দ্বীনের তরে যুদ্ধে যাব বিলিয়ে দেব প্রাণ'। কিন্তু এখানেই এই পাঠ শেষ হয়নি। বরং পরের বাক্যে আছে 'সাচ্চা মুসলমানের' প্রকৃত স্বরূপ তা হল – ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত ও বিশ্বের যাবতীয় ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে সকলকে ভালোবাসা বিলিয়ে সাম্য ফিরিয়ে আনার দৃঢ় সংকল্প –

আমরা হব বিশ্বমাঝে সাচ্চা মুসলমান / দ্বীনের তরে যুদ্ধে যাব বিলিয়ে দেব প্রাণ।

বিশ্বজনে বাসব ভাল হোক না সাদা হোক না কালো / আমরা সবাই আদম হাওয়ার একই যে সন্তান

হিন্দু মুসলমান বা জৈন খ্রিষ্ট ভেদাভেদ নয়; বিশ্বের সমস্ত মানুষ 'আদম' অর্থাৎ মানুষের সন্তান। এই বোধ প্রাইমারগুলিকে ধর্মনিরপেক্ষ পাঠের মর্যাদা দান করে, একইসঙ্গে শিশুপাঠককে 'বিশ্বাত্মা' বোধে চালিত করতে প্রয়াসী হয়। যেখান থেকে এই প্রাইমার প্রকৃত মুসলমানের চিহ্ন নির্ণয় করে টুপি দাড়ি কিংবা পাঞ্জাবি পাজামার মধ্যে দিয়ে নয়; হৃদ্যতার মধ্যে দিয়ে । তাই প্রাইমার লেখক প্রকৃত মুসলমানের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে বলেন - 'যার পার্শ্ববর্তী ভুখা থাকে সেই উদরপূর্ণ লোকটি নামধারী মুসলমান। প্রকৃত মুসলমান তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে হৃদ্যতাপূর্ণ করে তুলতে পারে।' আবার আদর্শ ধার্মিক মানুষের নমুনা দিতে গিয়ে কল্পিত হয় সিরাজ মাস্টার। যাঁর ব্রত '... মানুষের প্রীতিবন্ধন। পরস্পরের মৈত্রী তাঁর কাম্য। ... সমাজ সংস্কারে তার অনেক অবদান।' সেইসঙ্গে মুসলমানের কলঙ্ক মোচনে এগিয়ে এসে এই প্রাইমার সখেদে জানায় – 'মুসলিম কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না।'

সৌভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের আখ্যান রচনায় ইসলামি প্রাইমারগুলিকে একথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, 'ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র'। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে লক্ষ করবো, প্রাইমারগুলির চালিকা শক্তি যেখানে ধর্ম, সেখানে এই প্রাইমারেই দেশের 'ধর্মনিরপেক্ষতার' আদর্শকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ ও সম্মান জানাবার মধ্যে কি নেই কোনো বিশেষ অভিপ্রায়? 'খাঁটি মুসলমান', 'সাচ্চা মুসলমান' যখন 'ইসলামের কট্টর সমর্থক' সেখানে কেন 'ধর্মনিরপেক্ষতা'রা আদর্শকে বারবার সোচ্চারে ঘোষণা করতে হয়? তবে কি ধরে নিতে হবে যে, 'সাচ্চা মুসলমান' বা 'খাঁটি মুসলমানের' লক্ষ্যে মুসলমান সমাজ চালিত হলেও তার টিকে থাকবার শক্তি নিহিত আছে 'ধর্মনিরপেক্ষতার' উদার আদর্শে? শক্তিশালী প্রতিবেশী ধর্মের আগ্রাসন এবং পশ্চিমী দুনিয়ার 'ইসলাম মানে সন্ত্রাস' এই সমস্ত লজ্জ যখন মুসলমানের অবস্থানকে প্রকৃতই কোণঠাসা করে দিয়েছে তখন কি আরও একবার বিশ্বাসের জমি নির্মাণের জন্য গোঁড়া থেকেই তালিম দিতে হয় 'মুসলিম কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না।'? অর্থাৎ ইসলাম অসাম্প্রদায়িক, শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের ধর্ম।

অতঃপর অসাম্প্রদায়িকতা, শান্তিপ্রিয়তা ও সৌভ্রাতৃত্বের ইতিহাসকে সমর্থন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিভাগের অধ্যাপক ড. ওসমান গনী তাঁর 'চরিত্র ও সমাজ গঠনে কোরয়ান শরীফ' গ্রন্থে লিখেছেন –

> ইসলাম কেবলমাত্র একটি ধর্ম সংঘই নয়। যদি তা ই হতো, তাহলে ওই সংঘের সকল সদস্যই তাদের কর্তব্য বা দায়িত্ব বলে জানতেন - কেবলমাত্র কতগুলি ধর্মীয় কাজ। কিন্তু ইসলাম নিছক ধর্ম সংঘের বহু উপরেই অবস্থান করে। যেখানে এই সংসারের মাটিতে ষোলোকলায় বিধৃত হয় বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, Universal Brotherhood, যেখানে ইসলামের সাম্য ভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ, সূর্যের ন্যায় দীপ্তিময়, সাগরের ন্যায় প্রশান্ত ও গভীর এবং পর্বতের ন্যায় অটল ও অবিচল।[৪৯]

ইসলামে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এই আদর্শের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি আরো বলেন –

> ইসলামে জাতপাত, বংশ, কুল, উপাধি, খেতাব, গোষ্ঠী গোত্র সমস্ত কিছুই বিলীন হয়ে যায় এক ভ্রাতৃত্বের স্বর্গীয় বাঁধনে। ... ইসলাম সাম্যবাদ ভিত্তিক একটি ভ্রাতৃ সংঘ। এ যেন একটি একান্নবর্তী পরিবার। এই সংঘের সকল সদস্যের একটি গুরুতর দায়িত্ব আছে । সেই দায়িত্বটি না মানলে সংঘের সদস্যপদ রাখা যায় না। ওই দায়িত্ব হলো সংঘের সকল সদস্যের প্রতি আপন আপন দায়িত্ব পালন ও সেই দায়িত্ববোধকে ফরজ রূপে মান্য করা, নচেৎ সংঘ সদস্য বা মুসলমান থাকা যায় না।[৫০]

ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধে সংযুক্ত থাকতে গেলে কী সেই দায়িত্ব যা অবশ্য পালনীয়? এই প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য –

> সংঘের প্রতিটি সদস্যকে লক্ষ্য করতে হবে, কোন গরীব অনাহারে দিন যাপন করছে, কোন দরিদ্র মানুষের একটিও শীতবস্ত্র নাই, কোন অনাথের একটি ঘরও নাই, কোথায় কোন গরীব মানুষ ঔষধ অভাবে মারা যাচ্ছে, কোথায় কোন গরীব বিধবা দুটি অন্নের জন্য প্রতীক্ষা করছে কোথায় কোন গরীবের বিবাহযোগ্য কন্যা অকালে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। কোথায় কোন মেধাবী দরিদ্র সন্তান অর্থাভাবে বই কিনতে পারছে না, বেতন দিতে পারছে না, পড়াশোনা বন্ধ করছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ... এই সমস্ত বিভিন্ন কারণেই ইসলামের যাকাত প্রথার বাধ্যতামূলক প্রবর্তন যার কাজ ধনী কে ভিখারী বা দরিদ্র বানাতে চায় না। তবে সে দীনাতিহীন অসহায় ভিখারী ও দরিদ্র মানুষকে বাঁচাতে চায়। এখানেই ইসলামী ভ্রাতৃ সংঘ।[৫১]

ড. ওসমান গনী কথিত কোরানের এই সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শ আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে কিঞ্চিদাধিক পরিলক্ষিত হয়েছে নিশ্চিত। কিন্তু সেইটেই একমাত্র ভাষ্য নয়। কেননা এখানেই বৃহৎ পরিসর জুড়ে আবার কট্টর মুসলমানের আদর্শও রচিত হয়েছে। যার দৃঢ় বিশ্বাস 'তালিম নাও মাদ্রাসাতে / সঠিক জ্ঞান পাবে তাতে', অথবা 'শরিয়তের বিধান মেনো / সিভিল কোডে পতন জেনো'। ফলে ধর্ম এই প্রাইমারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং তাকে নিয়ে একটা মিশ্র বয়ান রচিত হয়েছে প্রাইমারগুলিতে।

৩.৬ উপপত্তি

আমাদের গবেষণায় আলোচ্য প্রাইমারগুলিকে নির্বাচিত করেছি ধর্মীয় বিশেষত্বের মানদণ্ডে। আর এই কারণে মূলধারার প্রচলিত বাংলা প্রাইমারগুলির প্রতিস্পর্ধী হিসেবেই 'বাংলা ভাষার ইসলামি প্রাইমার'গুলিকে স্থাপন করেছি। সেক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়েছে বৃহত্তর ক্ষেত্র জুড়ে এই শ্রেণির প্রাইমারগুলির লক্ষ্য ধর্মীয় স্বাজাত্যপ্রীতি ও স্বাতন্ত্র্যচিন্তার নিরিখে ইসলামের ইতিহাসকে পুনর্গঠন করা। তাই প্রাইমারগুলির ছত্রে ছত্রে ধর্মের কথা বড়ো হয়ে দেখা দেয়। প্রায় প্রতিটি প্রাইমারের উদ্দেশ্য ও প্রসঙ্গকথা অংশে লেখকেরা কোনোরকম অস্পষ্টতা ছাড়াই জানিয়েছেন, বর্ণ পরিচয়ের ভেতর দিয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধকেই তাঁরা নির্মাণ করতে চান। সেক্ষেত্রে ধর্ম বাদ দিয়ে কোনোভাবেই এই প্রাইমারগুলিকে মূল্যায়ন সম্ভব নয়। কিন্তু সব থেকে বড়ো প্রশ্নটা এখানেই যে, সাধারণ অর্থে মানুষ যাকে 'ধর্ম' বলে সেই 'ধর্ম'ই কি মানব জীবনের সব? 'সূরা শূরা' (৪২ : ১৩) তে বলা হয়েছে

– 'তোমরা দ্বীন (ধর্ম)কে প্রতিষ্ঠিত কর, ওতে মতভেদ করো না।'[৫২] আবার 'সুরা নিসা' (৪: ১৭১) তে বলা হয়েছে – 'তোমরা স্বীয় ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।'[৫৩] 'সুরা বাকারহ' (২: ১৩৯) তে বলা হয়েছে – 'আমাদের কর্ম আমাদের জন্য, তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য'।[৫৪] 'সুরা কাফিরুন' (১০৯ : ৬) – এ বলা হয়েছে – 'তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, এবং আমাদের জন্য আমাদের ধরম'।[৫৫] উপরিক্ত সুরাগুলির বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় - ধর্ম নিয়ে আগ্রাসন 'কোরান শরীফ'ও অনুমোদন করে না। এমনকি সেখানে বিকল্প ধর্ম ও কর্মের অস্তিত্ব যেমন স্বীকৃত, তেমনই তা পালনের অধিকারও দেওয়া হয়েছে। জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া যেমন নেই, তেমনই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য অপরকে কোণঠাসা করবারও কোনো ইঙ্গিত নেই। সবথেকে বড়ো কথা কোরআন শরিফে মোট আয়াতের সংখ্যা যেখানে ৬২৩৬ বা ৬৩৪৮ কিংবা মতান্তরে ৬৬৬৬ টি, সেখানে ধর্ম সংক্রান্ত আয়াত মাত্র ২৫০ টি। এ প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রখ্যাত অধ্যাপক ড. ওসমান গনি জানিয়েছেন, কোরান শরিফের উক্ত ২৫০ টি আয়াত বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত আয়াত সমাজ সংক্রান্ত।[৫৬] এখন প্রশ্ন হল কোরআন শরীফে তাহলে কি তাহলে 'ধর্ম' অপেক্ষা সামাজিক জীবনকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে? সামাজিক শান্তি, সুস্থিতি ও মানবতার মধ্যে দিয়েই কি 'ধর্ম' প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হয়েছে? তাই যদি হয় তাহলে ধর্ম নিয়ে এত রবরবা কি সামাজিক পশ্চাদ্‌পদতারই ইঙ্গিত নয়? আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক জাগরণ ও সামাজিক সংস্কারের প্রসঙ্গ ততখানি আসেনি, যতখানি এসেছে ধর্মীয় পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবনের প্রসঙ্গ। তাহলে কি ধর্মাশ্রয়ী এই প্রাইমারগুলি মুসলমান সমাজে সামাজিক প্রগতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে?

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের অবস্থান জানতে ২০১১ সালের জনগণনার তথ্য ভিত্তিক একটি সমীক্ষা করে প্রতীচী ট্রাস্ট সংস্থার সহযোগিতায় অ্যাসোসিয়েশন স্ন্যাপ এবং গাইডেন্স গিল্ড। প্রায় তিন বছর রাজ্যের ১৯ টি জেলায় ৮১ টি ব্লকের ৩২৫ টি গ্রামের এবং ৩০ টি পৌরসভার ৭৩ টি ওয়ার্ডের ৭৮৮০ টি পরিবারে সমীক্ষা চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম অনগ্রসরতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে সংস্থাটি। যেটি 'Living Reality of Minority in West Bengal' নামে প্রকাশিত। এই প্রতিবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন রাজ্যে মুসলিমদের বেশিরভাগ অংশই এখনো গরিব ও বঞ্চিত।[৫৭] উপরোক্ত রিপোর্টটি বিশ্লেষণ করে ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, কলকাতার দুই শিক্ষক শুভ্রনীল

চৌধুরী ও শাশ্বত ঘোষ দেখিয়েছেন গোটা দেশে ও রাজ্যে মুসলমানদের জন্মহার প্রতিবেশী হিন্দুদের থেকে যে হারে বর্ধিত সেই হারে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে তাদের কোনো উন্নয়ন দেখা যায় না। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ধরা পড়েছে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে রাজ্যে মুসলমানদের উপস্থিতির হার ২.৭ %, প্রতিবেশী হিন্দুদের হার যেখানে ১০.৭ %। কর্মজগতে মুসলমানদের উপস্থিতির হার তাদের মোট জনসংখ্যার ৩৪.৫%, এর মধ্যে অধিকাংশ কৃষক, দিনমজুর, ঠিকাশ্রমিক, খেতমজুর ও গৃহশিল্পে কর্মরত। ঐ রিপোর্টে দেখানো হয়েছে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা মূলত কায়িক শ্রমিক ও ঠিকাকাজে যুক্ত। যেখানে গ্রামীণ বাংলায় ৮০ % মুসলমান গৃহস্থের পারিবারিক আয় মাসে ৫০০০ টাকার কম, শহরাঞ্চলে এই হার প্রায় ৬৫ %। রাজ্যের মুসলমানদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করেন। রাজ্যে মুসলমানদের মাত্র ৩.৩ % মানুষ সরকারি ক্ষেত্রে চাকরি করেন, যেখানে প্রতিবেশী হিন্দুদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ১২.৮ %।[৫৮]

অর্থনৈতিক অবনতির এই অবিচ্ছেদ্য অন্ধকার ইতিহাসকে সঙ্গে নিয়েই বাঙালি মুসলমান সমাজ আজো টিকে আছে। টিকে আছে গতরখাটা মেহনতি মানুষের শ্রমের জোরে। টিকে আছে এক দৃঢ় সহিষ্ণুতার সুতোয় বাঁধা ধর্ম যাজকদের প্রশ্নহীন আনুগত্যে। কিন্তু প্রশ্ন হলো - যে সমাজের এক তৃতীয়াংশ মানুষই দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করেন সেখানে কি সত্যই এত 'যাকাত' দেওয়া সম্ভব? তাহলে আমাদের ইসলামি প্রাইমারগুলিতে বারবার এত জাকাত দেবার কথা আসে কেন? কেন আসে এত 'দান খয়রাতের ফজিলতের' কথা? অথবা কেনই বা ফিরে ফিরে আসে হয করার প্রসঙ্গ? তাহলে কি 'গরিবের ধন' সব ধর্মই শুষে নিতে চায়? যে মুসলমান সমাজে এত সাম্য, এত সৌভ্রাতৃত্ব, এত বরকত এত রহমত তার বাস্তব ছবিটি এতখানি বিপন্নতার কেন? আর কেনই বা এই বিপন্ন সমাজকে নতুনভাবে পুনর্গঠনের কথা না বলে কেবলমাত্র ধর্মের উজ্জীবনের কথাই বলা হয় ইসলামি প্রাইমারগুলিতে? তবে কি অন্য কোনো অভিসন্ধি আছে ভেতরে? অন্য কোনো শাসন ও শোষণযন্ত্র চালিত আছে ধর্মাশ্রয়ী এই সমাজ কাঠামোর অলিন্দে? আর সেই শাসনযন্ত্রকে সচল রাখতেই কি শৈশব থেকে মগজ মেরামতের পথকে পোক্ত করা হয় ইসলামি প্রাইমারগুলিতে? এই প্রশ্ন বারবার ঘুরে ফিরে আসা অস্বাভাবিক নয়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. হোসেন, মীর মশাররফ, আমার জীবনী, মুন্সী সাদেক আলী দ্বারা প্রকাশিত, কালিকা যন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৩৩৫ সাল ১ লা আশ্বিন, পৃ. ১৭৮ – ১৮০

২. মান্নান. কাজী আবদুল (সম্পা.), *মশাররফ রচনা সম্ভার*, পঞ্চম খণ্ড, 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা', প্রথম ভাগ, প্রথম অংশ, বাংলে একেডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮৫, পৃ. ৫২৮

৩. ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী ১৮৮৬ – ৮৭ সালের অনুষ্ঠানপত্র, দেখুন, আহমেদ. ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৫১৫

৪. 'ইসলাম প্রচারক', ফাল্গুন – চৈত্র ১৩০৮, দেখুন, আহমদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, পৃ. ৪৯০

৫. নূর-অল-ইমান, শ্রাবণ ১৩০৭, দেখুন, আহমদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, পৃ. ৫১৫

৬. বাসনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬, দেখুন, আহমদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, পৃ. ৫১৫

৭. শাকুর, মুহাম্মদ আবদুশ, 'কয়েকটি মুসলিম দেশের পাঠ্যপুস্তকে ইসলামী উপাদান', দেখুন. *শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, নভেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৬৯

৮. শাকুর, মুহাম্মদ আবদুশ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৬৯

৯. ঐ, ঐ ,ঐ পৃ. ১৬৯

১০. ঐ, ঐ ,ঐ পৃ. ১৭১ – ১৭২

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়. হরিচরণ, *বঙ্গীয় শব্দকোষ* প্রথম খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০২৩, পৃ. ১১৫২ – ১১৫৩

১২. ভদ্র. গৌতম, *ইমান ও নিশান,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ ৩

১৩. ভদ্র. গৌতম, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩

১৪. ভদ্র. গৌতম, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩

১৫. ভদ্র. গৌতম, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩

১৬. ভদ্র. গৌতম, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩ – ৪

১৭. ভদ্র. গৌতম, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪

১৮. শাকুর, মুহাম্মদ আবদুশ, 'কয়েকটি মুসলিম দেশের পাঠ্যপুস্তকে ইসলামী উপাদান', দেখুন. *শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, নভেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৬৯

১৯. ভদ্র. গৌতম, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪

২০. হোসেন. আফযাল ও মাবুদ. আবদুল, *ইসলাম শিক্ষা,* বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ৩

২১. ভদ্র. গৌতম, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৭ – ৮

২২. ভদ্র. গৌতম, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৮

২৩. ভদ্র. গৌতম, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৮

২৪. ভদ্র. গৌতম, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৯

২৫. আলম, নাসিম-এ, 'সন্ত্রাসের এই জাল এক দিনে তৈরি হয়নি', *আনন্দবাজার পত্রিকা,* উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ, ২৭ নভেম্বর ২০১৪

২৬. আলম, নাসিম-এ, পূর্বোক্ত

২৭. আলম, নাসিম-এ, পূর্বোক্ত

২৮. নন্দী. আশিস, *জাতীয়তাবাদ ও ভারতচিন্তা,* বুক পোস্ট, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ১২৬

২৯. নির্ম্মলানন্দ. স্বামী, *হিন্দু হুঁসিয়ার,* ভারত সেবাশ্রম সংঘ, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৯৭, পৃ. ৪৫

৩০. নন্দী. আশিস, *ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিরোধী ইস্তাহার,* সেরিবান, কলকাতা, অগাস্ট ২০১৯, পৃ. ২৩

৩১. নন্দী. আশিস, *ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিরোধী ইস্তাহার,* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২৩

৩২. নন্দী. আশিস, ঐ, ঐ ,ঐ পৃ. ১৩

৩৩. আলিয়াভী. মাওলানা হাফেয শাইখ আইনুল বারী, *সালাফী বর্ণপরিচয়* (দ্বিতীয় ভাগ), সূফিয়া প্রকাশনী, কলকাতা, মে ২০১৯, পৃ. ২

৩৪. শাকুর, মুহাম্মদ আবদুশ, 'কয়েকটি মুসলিম দেশের পাঠ্যপুস্তকে ইসলামী উপাদান', দেখুন. *শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, নভেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৬৯

৩৫. বসু. সৌমিত্র, 'বাক্যের চিত্ররূপতা তত্ত্ব', দেখুন. সরকার. তুষারকান্তি, মৈত্র. শেফালী, সান্যাল. ইন্দ্রাণী (সম্পা.) *হ্বিটগেনস্টাইন : জগৎ, ভাষা ও চিন্তন,* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, কলকাতা, আশ্বিন ১৪২০, পৃ. ৩৩

৩৬. বসু. সৌমিত্র, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৩

৩৭. চৌধুরী. সুকান্ত, *ভাষা অর্থ সত্য,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৩৯

৩৮. চক্রবর্তী. অরিন্দম, দেহ গেহ বন্ধুত্ব : ছটি শারীরক তর্ক, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জুন ২০১১, পৃ. ৭০

৩৯. নাসিম. আবদুস শাহিদ, *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি,* শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা, জুন ২০১৪, পৃ. ১০২

৪০. রহমান. মুস্তাফিজুর জামান, শিশুকথা (দ্বিতীয় ভাগ), আদর্শ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৬

৪১. আলিয়াভী. শাইখ আইনুল বারী, *সালাফী বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ,* সুফিয়া প্রকাশনী, কলকাতা, মে ২০১৯, পৃ. ১৬

৪২. আলিয়াভী. শাইখ আইনুল বারী, *সালাফী বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ,* সুফিয়া প্রকাশনী, কলকাতা, মে ২০১৯, পৃ. ১৭

৪৩. মোল্লা. মশিয়ার রহমান, *কচিকাঁচা (১),* পুস্তক ভারতী, হাওড়া, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২১, পৃ. ৩২

৪৪. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩২

৪৫. রহমান. মুস্তাফিজুর জামান, *শিশুকথা (দ্বিতীয় ভাগ),* আদর্শ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩৭

৪৬. রহমান. মুস্তাফিজুর জামান, *শিশুকথা (তৃতীয় ভাগ),* আদর্শ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ২৮

৪৭. মওদূদী. সাইয়েদ, 'ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা', দেখুন. নাসিম. আবদুস শাহিদ, *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি,* শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা, জুন ২০১৪, পৃ. ১৯

৪৮. বন্দ্যোপাধ্যায়. সন্দীপ, 'পাঠশালা, কারাগার : ফুকো', দেখুন. শূর. চিরঞ্জীব (সঙ্কলিত) *মিশেল ফুকো,* আলোচনাচক্র, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৬, পৃ. ৭৩

৪৯. গনী. ড. ওসমান, *চরিত্র ও সমাজ গঠনে কোরয়ান শরীফ,* পারুল, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৮, পৃ. ৭৬

৫০. গনী. ড. ওসমান, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৭৬

৫১. গনী. ড. ওসমান, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৭৭

৫২. গনী. ড. ওসমান, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৭৪

৫৩. গনী. ড. ওসমান, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৬৬

৫৪. গনী. ড. ওসমান, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৬৭

৫৫. গনী. ড. ওসমান, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৬৮

৫৬. গনী. ড. ওসমান, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৭৩

৫৭. হক. শেখ সাইদুল, 'সংখ্যালঘু উন্নয় নামে চটকদারি রাজনীতি', *গণশক্তি,* ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৫৮. চৌধুরী. শুভ্রনীল ও ঘোষ. শাশ্বত, 'মুসলমানের বাদ দিয়ে উন্নয়ন হবে না', *আনন্দবাজার পত্রিকা,* উত্তর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, ১৭ মার্চ ২০১৬

চতুর্থ অধ্যায়

আত্ম - অপর সম্পর্ক: প্রচলিত ও ইসলামি বাংলা প্রাইমার

কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক বহুল পরিচিত ও জনপ্রিয় গ্রন্থ অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৪-১৯৬১) মহাশয়ের 'কাব্যজিজ্ঞাসা'র (১৯২৮) প্রথম অধ্যায় 'ধ্বনি'র সূচনাতেই প্রাবন্ধিক সৃষ্টিকর্মে আত্মপ্রক্ষেপ সম্পর্কে এক চমৎকার আখ্যান শুনিয়েছেন। সেমেটিক ধর্মে স্রষ্টাও সৃষ্টির মধ্যে নিহিত যে অন্তঃসম্পর্ক সে বিষয়ে অবগত করে তিনি লিখেছেন –

> ইহুদি ও খ্রীস্টানের ধর্মপুঁথিতে বলে, বিধাতাপুরুষ তাঁর আকাঙ্ক্ষার বলে দ্যৌঃ পৃথিবী, আলো অন্ধকার, সূর্য চন্দ্র সব সৃষ্টি করলেন এবং সৃষ্টির পর দেখলেন যে সে সৃষ্টি অতি চমৎকার। ঐ পুরাণেই বলে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে তৈরি করেছেন তাঁর প্রতিরূপ ক'রে, আর নিজের নিশ্বাসবায়ুতে তাঁর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।[১]

অর্থাৎ স্রষ্টা আপন বাসনায় এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের মধ্যে তাঁর 'আত্ম' (Self)কে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। অনুরূপভাবে মানুষ যেখানে স্রষ্টা সেখানে সেও তাঁর 'আত্ম'কেই যে নানাভাবে নির্মাণ করবে তা নিশ্চিত। এই কারণেই শ্রী গুপ্ত প্রাগুক্ত গ্রন্থে জানিয়েছেন –

> মানুষ যেখানে স্রষ্টা তার সৃষ্টির রহস্য বিশ্বসৃষ্টিরহস্যেরই প্রতিচ্ছায়া; অথবা যা একই কথা, নিজের সৃষ্টির স্বরূপ ছাড়া সৃষ্টিতত্ত্ব আয়ত্তের আর কোনো চাবি মানুষের হাতে নেই।[২]

বস্তুত মানুষ যা সৃষ্টি করেন তা নিছক তাঁর আত্মভাবনা ছাড়া আর কিছু নয়। আর এই আত্ম-সংস্কৃতির মধ্যে দিয়েই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করেছে। সেই প্রকাশের নানা ধারা। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "বাঙ্ময়, রূপময়, ধ্বনিময়, গতিময় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার প্রকাশ"[৩] সমবেত ও সংহত এই প্রকাশ পরবর্তীতে জন্ম দেয় শিল্প-সংস্কৃতির। 'শিল্প-সংস্কৃতি'র ভিত্তি কী? এই প্রসঙ্গেও 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' বলা হয়েছে 'আত্ম'র কথা –

> ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি। এতেষাং বৈ দেবশিল্পানাম্ অনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে – হস্তী, কংস, বাসো হিরণ্যম, অশ্বতরীরথঃ শিল্পম্।..... আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি, ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান সংস্কুরুতে।[৪]

উক্ত শ্লোকটির তর্জমা করে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন –

> (পার্থিব) শিল্প-সমূহ দেব শিল্প বা স্বর্গীয় শিল্প সমূহকেই প্রশংসা করে; এই সমস্তের (অর্থাৎ দেব শিল্পের) অনুকৃতি রূপেই এই পৃথিবীতে শিল্পকে ধরা হয়।... এই শিল্প-সমূহ হইতেছে আত্মার সংস্কৃতি, এগুলির দ্বারা যজমান (সাধারণ গৃহস্থ) নিজেকে ছন্দোময় করে।[৫]

এখানে আত্মোন্নতি বিধানে, আত্মিক সংস্কৃতিতে এবং নিজের জীবনকে ছন্দোময় করে তুলতে অর্থাৎ আনন্দময় করে তুলতে শিল্পের কার্যকরী ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ শিল্পের মধ্যে দিয়ে কেবলমাত্র আত্মসৃজন বা আত্মপ্রকাশই হচ্ছে না বরং আত্মোন্নতির পথানুসন্ধানও শিল্পের বিধেয় হয়ে উঠছে।

আমরা জানি বাঙ্ময় প্রকাশ শিল্পের মধ্যে সাহিত্য সেই আত্মদর্শনকে স্বতন্ত্র্যভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। সাহিত্য আত্মর হয়েও হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। সাহিত্যের মূলগত লক্ষ্যই হল তা নিজের হয়েও সকলের। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্রষ্টার চারপাশ, তাঁর সমাজ পরিবেশ, জীবন, জীবিকা, ধর্ম, রাজনীতি সংস্কৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছে যে মনোজগত তাকে কেন্দ্র করেই নির্মিত হয়েছে লেখকের আত্মভুবন। আর সেইসূত্রেই লেখকের ভাবনাবৃত্তের বাইরে, তাঁর সমাজ পরিসরের বাইরে থাকা আরেকটি যে অদেখা, না-ছোঁয়া জীবনবৃত্ত থেকে গেল তা 'অন্যভুবন' হিসেবে খানিকটা দূরেই থাকলো।

নিষ্ঠাবান, নিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী সাহিত্যিক মাত্রই সর্বদা এক বিশ্ব এক মানুষ এক অধিকারের লক্ষ্যে সওয়াল করেছেন। কিন্তু একান্তই মানুষিক সীমাবদ্ধতার কারণেই বহুক্ষেত্রে তাঁর রচনা হয়ে পড়েছে নির্দিষ্ট, সীমায়িত এবং বিশেষ কোনো গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের সংজ্ঞাবাহী। ফলে সাহিত্যের বৃহৎ পরিসরে এগুলির বাইরে অনেক শূন্য জমি পরিত্যক্ত থেকে গিয়েছে। যে'কারণে সেই 'অন্যভুবন' নিয়ে অন্য কোনো রচনাকারকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। অথবা ঐ 'অন্যভুবন' থেকেই নিজস্ব অভিজ্ঞতাসঞ্জাত 'অপর' লেখক সদর্পে শুনিয়েছেন 'অন্যস্বর'। স্বাভাবিকভাবেই তা হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের, প্রতিরোধের, প্রত্যাঘাতের আবার কখনো বা 'অধিকার বুঝে নেওয়া প্রখর দাবি'র ইস্তাহার।

আমাদের মনে হয় সামগ্রিক দর্শনে এবং মূল্যায়নে পৌঁছোবার জন্য মূলধারার প্রচলিত স্বরের পাশাপাশি 'অন্যধারা' বা 'অপর ধারা'র অবরুদ্ধ / বিকল্প স্বর শোনাও জরুরী। এই কারণে বাংলা সাহিত্যের 'আমরা-ওঁরা'র স্পষ্ট বিভাজন লক্ষ করে অধ্যাপক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় 'উপন্যাসে ওরা'

গ্রন্থে অপর ভুবনের কথা আলোচনা করেছেন। কথাসাহিত্যের মতো বাংলা শিশুসাহিত্যেও 'আমরা – ওঁরা' বিভাজন স্পষ্ট। তাই বাংলা প্রাইমার রচনার সূচনালগ্ন অর্থাৎ উনিশ শতক থেকেই প্রাইমারকে কেন্দ্র করে এই 'আত্ম-অপর' সংস্কৃতির সূচনা হয়েছে।

১. উনিশ শতকের বাংলা প্রাইমারের অসম বিন্যাস

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা প্রাইমার রচনায় জোয়ার আসে। গবেষক অধ্যাপক আশিস খাস্তগীরের হিসেব অনুযায়ী উনিশ শতকের শিশুপাঠ্য বর্ণ শিক্ষার গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পাঁচশোটি।[৬] অবশ্য বাংলা ভাষার প্রাইমার রচনার প্রচেষ্টা একটু বিলম্বিতভাবে হয়েছিল। শিশুপাঠ্য বর্ণ শিক্ষার গ্রন্থ রচনায় বাঙালিরা ১৮৩৫ সালের আগে হাত দিতে পারেননি। উনিশ শতকের সূচনায় পাশ্চাত্যের শিক্ষার আদর্শে ব্যাপক পরিমাণে 'স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে সেই স্কুলের প্রয়োজনে দরকার হয়ে পড়ল শিশুপাঠ্য বই। শিশুপাঠ্য বইগুলির জোগানে নানা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে। ১৮১৬ সালে শ্রীরামপুর মিশনারি থেকে বেরলো ১২ পাতার একটি বর্ণশিক্ষার বই। নাম *লিপিধারা* । এটিই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম প্রাইমার। লেখাবাহুল্য এর রচয়িতা কোনো বাঙালি নন।

১৮১৬ থেকে ১৮১৭ সালের মধ্যে মোট শতাধিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় যার ছাত্রসংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৭০০০ এর উপর। ১৮২৩ সালের মধ্যে ১৬০ টির বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হল।[৭] কাজে কাজেই বিদ্যালয় পাঠ্য শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। এটিই ছিল ঐতিহাসিকভাবে বাংলা প্রাইমার রচনার মোক্ষম কাল।

১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' ও ১৮১৮ সালে 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি। এই দুই সোসাইটি এদেশীয়দের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনায় উদ্যোগী হলেন। এবং তাদের ব্যবসা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এক বিস্তৃত চেহারা লাভ করে। এই স্কুল বুক সোসাইটির অধীনে ১৮১৮ সালে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট লিখলেন *বর্ণমালা* নামের একটি প্রাইমার। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ছাপার হরফে সেটিই বাংলা বর্ণমালা শিক্ষার প্রথম বই। কিন্তু না এই তথ্য সঠিক নয়। প্রথম প্রাইমার হল – *লিপিধারা* (১৮১৬)। ১৮৩৫ সালে উনিশ বছর পর ঈশ্বরচন্দ্র বসু প্রথম বাঙালি যিনি বাংলা ভাষার প্রাইমার লিখলেন। তাঁর প্রাইমারটির নাম – *শব্দসার।* বইটির বর্তমান অস্তিস্ব না থাকলেও লং সাহেব তাঁর তালিকায় লিখেছেন সেটি বর্ণমালা শিক্ষার বই। অর্থাৎ দেশীয় মানুষদের হাতে রচিত প্রথম প্রাইমার *শব্দসার*।

১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল আর একটিমাত্র প্রাইমার। নাম – *শিশুসেবধি*। এটি হিন্দু কলেজ পাঠশালাতে শিশুদের বর্ণ শিক্ষার জন্য লেখা হয়। 'শিশুসেবধি' একটি সিরিজ। এর প্রথম লেখক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার জন্য ১৮৪০ সালে লেখা হয় *বর্ণমালা* (২ খণ্ড)। ১৮৪১ সালে ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি থেকে প্রকাশিত *জ্ঞানারুনোদয়* নামের একটি প্রাইমার। ১৮৪৬ সালে স্কুল বুক সোসাইটি নতুনভাবে বার করলেন *বর্ণমালার* দুটি খণ্ড।

বাংলা প্রাইমারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে ১৮৪৯ সালে। ঐ বছর প্রতিষ্ঠিত হয় বেথুনের ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল। স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় ১৫ জন বাঙালি তদের কন্যাদের স্কুলে পাঠিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কারও ছিলেন। তিনি সেখানে বিনা বেতনের শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা করেছেন আবার ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য গ্রন্থের অভাব মোচনের জন্য লিখেছেন শিশুশিক্ষা নামে বিখ্যাত প্রাইমার। এটিও একটি প্রাইমারের সিরিজ। মোট পাঁচ খণ্ডে রচিত এই প্রাইমারের প্রথম তিনটি খণ্ড লিখেছেন মদনমোহন (১৮৪৯, ১৮৫০, ১৮৫০), চতুর্থ খণ্ড লিখেছেন বিদ্যাসাগর (১৮৫১), পঞ্চম ভাগ লিখেছেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫১)। তৃতীয় ভাগের নাম *ঋজুপাঠ,* চতুর্থ ভাগের নাম *বোধোদয়* এবং পঞ্চম ভাগের নাম *নীতিবোধ*। শুধুমাত্র বালিকা বিদ্যালয় নয়, সকলের জন্যই *শিশুশিক্ষা* আদর্শশিক্ষা হতে পেরেছিল। এই পুস্তকেই প্রথম শিক্ষার্থীকে সমঝে দেওয়া হয় যে *'লেখাপড়া করে যেই।/ গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।'*

১৮৫০ – ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে বেশ কয়েকটি *বর্ণমালা* প্রকাশিত হয়। অজ্ঞাতনামা এই সব বর্ণমালা ছাপা হয়েছে সত্যার্ণব প্রেস, কবিতা রত্নাকর যন্ত্র, ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস প্রভৃতি জায়গা থেকে। এছাড়া বোমওয়েচ লিখেছেন *ধ্বনিধারা* (১৮৫৩), জে. ইয়ুল লিখেছেন *শিশুবোধোদয়* (১৮৫৪)।

১৮৪৯ সালের মতোই ১৮৫৫ সাল বাংলা প্রাইমারের আরএকটি মাইলফলক। সে বছর বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙালির মনের আশ মেটাতে বাজারে হাজির করলেন বর্ণপরিচয় – এর দুটি খণ্ড। লেখাবাহুল্য শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয় এই প্রাইমার দুটি জনপ্রিয়তায় এমন জায়গায় পৌঁছল যে পরবর্তীকালে এগুলি প্রাইমার রচনার আদর্শ হিসেবেই বাঙালি প্রাইমার লেখকদের কাছে অনুকরনীয় হয়ে উঠলো।

১৮৫৫ সালের পরবর্তী দশ বছর খান পঁচিশ বাংলা প্রাইমার বাজারে এসেছে। উল্লেখযোগ্য হল – সাতকড়ি দত্তের *প্রথমপাঠ* (১৮৬২), ও অন্য আরো তিনটি পাঠ।

১৮৬৬ – ১৮৭০ এই পাঁচ বছরে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, মথুরানাথ তর্করত্ন, মহঃ জুহুরুদ্দিন, হারানচন্দ্র রাহা, হীরালাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

১৮৭১ থেকে ১৮৭৫ সাল এই পাঁচ বছর বাংলা প্রাইমারের গতানুগতিকতার বছর। এই পাঁচ বছরে প্রায় ৫০ টির মতো প্রাইমার প্রকাশিত হয়েছে এবং পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ২৫ টি।[৮] তবে এই সব প্রাইমারে লেখকদের স্বকীয়তার কোনো ছাপ পাওয়া দুষ্কর; এগুলি মূলত মদনমোহন বা বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসারীণ এবং প্রধানত ব্যবসায়ী স্বার্থে রচিত।

১৮৭৬ – ১৮৮০ এই পাঁচ বছরে শিশুপাঠ্য বইয়ের ঢল নামে বাজারে। নতুন বই বেরই প্রায় ৭০ টি আর পুনর্মুদ্রিত বইয়ের সংখ্যা ৭৫ টি।[৯] উল্লেখযোগ্য লেখক অক্ষয়কুমার রায়, উদয়কৃষ্ণ দত্ত, উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, দুর্গাচরণ গুপ্ত, দ্বারকানাথ পাল, মদনমোহন সরকার, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী, রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরি, রামরূপ চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

এই পাঁচ বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বই *নব শিশুপাঠ* – ১। লেখক উদয়কৃষ্ণ দত্ত বইটিকে দৃষ্টি শোভন করে তোলবার জন্য একটি পৃষ্ঠায় একটিমাত্র বর্ণ বড়ো আকারে সাজিয়েছেন এবং দৃষ্টি শোভন করার জন্য বইয়ে অনেক পশুপাখির ছবি দিয়েছেন। শিশুদের মনোরঞ্জন করার আয়োজনটি লক্ষনীয়।

লক্ষ করবার বিষয় বিগত সব বছরগুলির তুলনায় ১৮৮০তে সর্বাধিক প্রাইমার ছাপা হয়েছে। সস্তা দামে বাজার ধরতে অনেকেই বিদ্যাসাগরের পথে হাঁটেন নি। আশিস খাস্তগীর লিখছেন আশির দশকে শ'দেড়েক প্রাইমার ছাপা হয়েছে। *শিশুশিক্ষা* ও *বর্ণপরিচয়*কে ভাঙিয়ে এই দুই বছর অনেকে ব্যবসাও করেছেন। ১৮৮৯ সালে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের হুবহু নকল করে বই বের করবার খবরের কথাও জানা যায়। *অনুসন্ধান* পত্রিকায় ১২৯৬ সালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'জুয়াচোর গ্রন্থকারের' বর্ণনাসহ প্রতিবেদন বেরিয়েছিল –

> পাঁচ নং জুয়াচোর। শুনিতে পাই, দেখিতে পাই না। উদাহরণ, - শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় বহু সংখ্যক বিক্রিত হয়। জুয়াচোর গ্রন্থকারও বর্ণপরিচয় ছাপাইল।।[১০]

উনিশ শতকের পাঠ্য পুস্তকের অনুকরণপ্রিয়তা ঠিক এমন জায়গাতেই পৌঁছেছিল। আর এই ধরণের অনুকরণে অবশ্য ব্যবসার মুনাফা ভালই হত।[১১]

উনিশ শতকের আটের দশকে বাংলা প্রাইমারে বিশেষত্ব যোগ হলো। এই প্রথম প্রাইমারের সঙ্গে চিত্রকে জুড়ে দেওয়া হল। এই পথের প্রথম পথিক সাতকড়ি দত্ত। তিনিই প্রথম ছয়ের দশকে সচিত্র প্রাইমারের নেতা। এরপর আটের দশকের সূচনায় উদয়কৃষ্ণ দত্তের *নবশিশুপাঠে* ছবির ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। বাদবাকি কুড়ি বছরে চিত্রময়তার আরো ব্যাপ্তি ঘটবে। এই সময় পরবে যেসকল বই আজারে আসে তাদের নামের সঙ্গে 'সচিত্র' শব্দটি লক্ষণীয়। যেমন – *সচিত্র শিশুশিক্ষা – ১, সচিত্র শিশুবোধ – ১, সচিত্র অক্ষরশিক্ষা – ১, সচিত্র প্রথম শিক্ষা, সচিত্র শিশু শিক্ষা – ১/২ সচিত্র হাতেখড়ি বর্ণবোধ, সচিত্র আদর্শলিপি ও ধারাপাত* প্রভৃতি। অর্থাৎ সহজেই অনুমান করা যায় বাংলা প্রাইমারের এই পর্বে চিত্রময়তার উপর বাঙালি অভিভাবকের বিশেষ মায়া পড়েছিল।

এই শতকের প্রাইমারগুলির অপর একটি বৈশিষ্ট্য খুব সহজেই চোখে পড়ে। তা হল এগুলির সঙ্গে সংযুক্ত 'সহজ' কিংবা 'সরল' শব্দটি। যেমন – রাখালদাস চক্রবর্তীর *সরল শিক্ষা,* মতিলাল দত্তের *সরল বর্ণশিক্ষা;* এছাড়াও অন্যান্য লেখকদের *সরল বর্ণবোধ, সহজ বর্ণপরিচয়, সরল বাল্যশিক্ষা, সহজ বাল্যশিক্ষা*। এমনকি বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *সহজপাঠ* তাও কার্যত এই আকর্ষণেরই ফল। আক্ষরিক অর্থ ধরে বিচার করলেই বোঝা যায় শিক্ষার্থীর প্রথম পাঠকে আরো সহজ ও সরল করার কাজেই নেমে পড়েছিলেন সেকালের প্রাইমার প্রণেতারা।

উনিশ শতকের শেষ দশকেও বাংলা প্রাইমার বেড়েছে একই হারে। 'দশ বছরে সোওয়া'শ'।[১২] এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত প্রাইমারগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটিই তিন চারটি সংস্করণের মুখ দেখেছে। এই দশকের উল্লেখযোগ্য প্রাইমার লেখক হলেন - যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।

উনিশ শতকের শেষ দশকে (১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে) মারা যাচ্ছেন বিদ্যাসাগর। তাঁর মৃত্যুর আগেই বিস্ময়কর খবর হল ১৮৮৯ সালে পঞ্চান্ন বছরের মধ্যে *বর্ণপরিচয়ের* প্রথম ভাগ ১৫০ টি সংস্করণের মুখ দেখে ফেলেছে। ১৮৮৫ সালে ১৩৩ তম সংস্করণের পর থেকে *বর্ণপরিচয় – ১* পঞ্চাশ হাজার কপি করে ছাপা হয়েছে। যা বাংলা প্রাইমারের ইতিহাস দুর্ভেদ্য নজির। পাশাপাশি ১৮৯০ সালে *শিশুশিক্ষা – ১* এর ১৪৯ তম সংস্করণ, ৩ য় ভাগের ১৬০ তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তখন

শিশুশিক্ষা – ১ প্রতি সংস্করণে তিরিশ হাজার কপি করে মুদ্রিত হত। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর *শিশুশিক্ষার* কপিরাইটের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় এবং এর পর থেকে বইটির জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উনিশ শতকের জনপ্রিয় প্রাইমার হিসেবে *বর্ণপরিচয়* ও *শিশুশিক্ষার* পাশাপাশি ছিল আরো দু একটি নাম। শিশুবোধক ও বাল্যশিক্ষা। শিশুবোধকের লেখকের নাম জানা যায় বিশ্বনাথ তর্কবাগীশ। বাল্যশিক্ষার প্রথম রচয়িতা রামসুন্দর বসাক। ১৮৮৭ সালে ১ আনা ৫ পাই দামের এই বইটি সুলভ প্রেস থেকে তিন হাজার কপি ছাপা হয়েছিল। ১৮৯৫ সালে এই বইটি ৬৩ তম সংস্করণে পৌঁছেছিল। মুদ্রণ সংখ্যা বাড়তে বাড়তে তখন পঁচিশ হাজার কপিতে পৌঁছেছিল। খুব সহজ ছিল না এই উত্তরণের পথ।

এই বিপুল প্রাইমারের দুনিয়ায় সকল প্রাইমার লেখকই হলেন ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু – 'হিন্দু বাঙালি'। তাহলে প্রশ্ন উঠবে মুসলমান সমাজ থেকে কি শিশুশিক্ষার জন্য পৃথক কোনো প্রাইমারের পরিকল্পনা হয় নি? যদিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়' এর মতো প্রাইমার সকল ধর্মের মানুষের গৃহেই সমাদৃত ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা মনে রাখতে হবে যে উনিশ শতকের মুসলমান সমাজে তাঁদের স্বাজাত্যাভিমান প্রবল এবং সেখানে তাঁরা নিজস্ব পরিসরে 'পরিচিতি' নির্মাণের যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। সেখানে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রেও বিকল্প ভাবনা চিন্তা থাকাটাই স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাবে আশিস খাস্তগীরের গবেষণায়। সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন যে হিন্দু লেখকদের সমান্তরালে মুসলমান প্রাইমার লেখকরাও তাঁদের নিজস্ব সমাজ ও কৌমের শিশুদের জন্য প্রাইমার রচনা করেছেন। যদিও প্রাইমার রচনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের আনুপাতিক হারের ব্যবধান চোখে পড়ার মতো। সেখানে একজন মহিলা প্রাইমার রচয়িতাসহ মোট ১২ জন মুসলমান সাহিত্যিকের নাম পাওয়া যাচ্ছে যাঁরা মুসলমান সমাজের বালক বালিকাদের জন্য আদিপর্বে প্রাইমার রচনা করেছেন। আশিস খাস্তগীরের তথ্যানুযায়ী তাঁরা হলেন –

১। মহম্মদ জহুরুদ্দিন – *জ্ঞানশিক্ষা* – ১ (১৮৬৯)

২। মুন্‌সি কাজিমুদ্দিন – *শৈশবশিক্ষা* – ১ (১৮৮৩), *শৈশবশিক্ষা* – ২ (১৮৮৮)

৩। মুন্‌সি সমিরুদ্দিন - *প্রথম শিক্ষা* (১৮৮৫)

৪। মজহরুল্লা কাজি – *প্রথম ভাগ বর্ণবোধ* (২য় সংস্করণ, ১৮৮৬)

৫। মহঃ আবদুল মজিদ সরদার – *বর্ণশিক্ষা প্রথম ভাগ* (১৮৮৮)

৬। ফতে মণ্ডল – *অক্ষর পরিচয়-১* (১৮৮৮), *অক্ষর পরিচয়-২* (১৮৮৯)

৭। ওহাজুদ্দিন আহমেদ – *সরল শিক্ষা* (নোয়াখালি, ১৮৮৯)

৮। রহিমুদ্দিন সরকার – *নব বর্ণপরিচয়* (১৮৯৩)

৯। মালেকউদ্দিন আহমেদ – *নবশিশুশিক্ষা* (১৮৯৩)

১০। মুন্‌সি জমারত হুসেন – *সচিত্র শিশুশিক্ষা ১/২* (১৮৯৭)

১১। অর্পণ-উল-মুন্‌সি – *নববর্ণশিক্ষা* (১৮৯৭)

১২। হলিমন্নেষা খাতুন – *সরল আদিশিক্ষা*

লক্ষ করবার বিষয় যে সময়ে বাংলা ভাষাভাষী প্রাইমারের সংখ্যা প্রায় পাঁচশোটি সেখানে মুসলমান শিশু কিশোরদের জন্য প্রাইমার হাতেগোনা মাত্র ১৫ টি। তবুও এই সমস্ত প্রাইমারের কোনো প্রতিলিপি বা কপি এখনো পাওয়া যায় না। আশিস খাস্তগীর জানিয়েছেন তিনি জেম্‌স লঙের ক্যাটালগ থেকে যে কয়টি প্রাইমারের সন্ধান পেয়েছেন কেবলমাত্র সেগুলিরই নাম উল্লেখ করেছেন তাঁর গবেষণাগ্রন্থে।

এখন প্রশ্ন হল উনিশ শতকে প্রচলিত বাংলা প্রাইমারের অপর পিঠ হিসেবে আমরা কেন ইসলামি বাংলা প্রাইমারকে বিচার করবো বা পাঠ করবো? প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকে রচিত বাংলা প্রাইমারের অসম বিন্যাসই আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, মূলধারার প্রচলিত প্রাইমারের সঙ্গে ইসলামি বাংলা প্রাইমারের একটা স্বাভাবিক দূরত্ব আছে। সমাজ-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ভিন্নতার দরুন মুসলমান লেখকদের হাতে যে সমস্ত প্রাইমার রচিত হয়েছিল তা প্রচলিত বাংলা প্রাইমারের সমবর্গীয় নয়। উল্লেখ সেইসমস্ত প্রাইমার বাংলা ভাষাতে রচিত হলেও তার ভাষাগত বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ছিল, যে স্বাতন্ত্র্যকে রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'মক্তব-মাদ্রাসার বাঙ্গালাভাষা' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'মক্তব মাদ্রাসার বাংলা ভাষা' প্রবন্ধে চিহ্নিত করেছেন। অন্যান্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে যথাসাধ্য আলোচনার চেষ্টা করবো। তবে মনে রাখতে হবে পৃথক

ইসলামি প্রাইমার বা মুসলমানি প্রাইমারের মূলে ছিল উনিশ শতকের হিন্দু প্রাগ্রসর সমাজের আত্মতা এবং আত্মাভিমানী মুসলমানের বঞ্চনাবোধ।

২.০. উনিশ শতকীয় ইসলামি প্রাইমারের প্রাদুর্ভাব: হিন্দুর আত্মতা বনাম আত্মাভিমানী মুসলমানের বঞ্চনাবোধ

উনিশ শতকে রচিত বিপুল সংখ্যক প্রাইমারের জনক হলেন হিন্দু লেখকেরা – এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শুধুমাত্র প্রাইমার নয়, সাহিত্য সৃষ্টির বৃহত্তর পরিসরে হিন্দু বাঙালি যতখানি এগিয়ে ছিল, মুসলমানরা তার ধারে কাছে ছিল না – একথা স্বীকার করেছেন স্বয়ং মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর মতে – "বর্ত্তমান সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত, পদার্থ, তর্ক, রসায়ন ইত্যাদি শাস্ত্রে হিন্দু হইতে মুসলমান বহু যোজন পথ ব্যবধানে; - শত-বর্ষে দূর হইতে পারিবে কিনা সন্দেহ।"[১৪] এই সাংস্কৃতিক দূরত্ব থেকেই মুসলমানদের চিন্তা চেতনায় যেমন একপ্রকার বঞ্চনাবোধ তৈরি হয়েছে, তেমনই অনেকের মধ্যেই আবার ব্যবধান অতিক্রমণেরও প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে। অনুরূপভাবে হিন্দু বাঙালি নিজেদেরকে বিপরীত মেরুতে দাঁড় করিয়ে আত্ম নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন। উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দুর মন পর্যালোচনা করলে আমরা লক্ষ করবো যে, সেখানে 'হিন্দু আত্মতা' নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছিল –

> হিন্দু বাঙালি সাহেবদের আনুকূল্যে বাংলা ও সাহিত্যের যে কাঠামো তৈরি করেছিল ও যে কাঠামোকে উচ্চশিক্ষায় পাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল তাতে হিন্দু বাঙালির আত্মই যে প্রতিফলিত হয়েছে তা উচ্চশিক্ষায় বাংলাবিদ্যার অন্তর্ভুক্তির ক্রমিক ইতিহাস অনুসরণ করলেই টের পাওয়া যায়।[১৫]

অধ্যাপক বিশ্বজিৎ রায় তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, শুধুমাত্র সাহিত্যের আস্বাদনের গণপরিসরেই মুসলমান বাঙালির জীবন বিযুক্ত ও অবহেলিত নয়, প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরেও হিন্দু সাহিত্য বিশেষ বর্গ হিসেবে পরিচিত। 'The Bengal Academy of Literature' – এর ১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সংখ্যায় ঐ বছরের অগাস্ট মাসে অনুষ্ঠিত চতুর্থ অধিবেশনের কার্যাবলি প্রকাশিত হয়। লিওটার্ড সাহেব ঐ অধিবেশনে ক্রমানুসারে গবেষণার বিষয় নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর সেই বিষয় তালিকার মধ্যে ছিল –

> The poetry of *Hindu* names, that is, the original conception which led to the names' এবং '*Hindu literature* as portraying society and ethics among the Bengalis, past and present.[১৬]

লিওটার্ডের এই তালিকা খুব সহজেই আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, বিদ্যাচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরেও হিন্দু যেখানে প্রশংসিত ও আলোচিত, মুসলমানরা সেখানে অবহেলিত উপেক্ষিত।

হিন্দুর যা কিছু অতীত ঐতিহ্য তা পুনঃস্মরণ ও অনুকরণের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় 'হিন্দু রিভাইভাল' আন্দোলন। অধ্যাপক রাখাল চন্দ্র নাথ তাঁর 'উনিশ শতক : ভাব সংঘাত ও সমন্বয়' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক অস্থিরতা কীভাবে হিন্দু সমাজকে এক প্রকার কেন্দ্রিক শক্তিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন যুক্তিবাদী মতও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কখনো ডারউইনের তত্ত্বের নিরিখে, কখনো মানব ধর্মবাদের দৃষ্টিতে, কখনো একেশ্বরবাদ কিংবা সর্বেশ্বরবাদ আবার কখনো বা গীতার কর্মবাদ কিংবা ভক্তিবাদের দ্বারা হিন্দুধর্মের ভিত মজবুত করা হতে থাকে।[১৭] আসল কথা হল মিশনারি প্রবর্তিত ও প্রচারিত খ্রিস্ট ধর্মের হাত থেকে হিন্দুকে বাঁচানো এবং ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা। কেমন ছিল হিন্দুর এই আত্মতার স্বরূপ? তার অন্তত দু'একটি নমুনা নেওয়া যাক।

২.১ হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ও আত্মতা নির্মাণ

উনিশ শতকের হিন্দু বাঙালির 'আত্ম' নির্মাণের প্রথম শর্ত হল অতীত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার এবং তার নবর্নির্মাণ। এক্ষেত্রে তাঁরা যা কিছু হিন্দুর তা সজ্ঞানে গ্রহণ করতে থাকেন এবং যেখানে হিন্দুর কোনো স্পর্শ নেই তা স্মৃতি এবং সত্তা থেকে মুছে ফেলতে চান। লক্ষ করবার বিষয় যে বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ 'হিন্দু রিভাইভালিস্ট' তিনিই সেকালের রক্ষণশীল হিন্দুর হাতে আক্রান্ত হচ্ছেন, কেননা তাঁর উপন্যাসে ভারতীয় হিন্দুর আদর্শ যথাযথভাবে রক্ষিত হয়নি। একদা বঙ্কিম-শিষ্য নবীনচন্দ্র সেন বঙ্কিমের উপন্যাস নিয়ে গুরু বঙ্কিমকে অভিযুক্ত করেছিলেন এভাবে –

> আমি তো বরাবর আপনাকে বলিয়াছি আপনার বিলাতী পীরিতের পিণ্ড পিণ্ডাণ্ড আর আমার ভালো লাগে না। ... আপনাকে এত করিয়া বলিলাম যে, যে সকল প্রেম লইয়া আমাদের জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্য রামায়ণ ও মহাভারত - পিতৃপ্রেম, ভাতৃপ্রেম, বাৎসল্য, প্রজাপ্রেম, সর্ব্বশেষ ঈশ্বরপ্রেম – সেই স্কল প্রেমের আদর্শ আঁকিয়া আমাদিগকে মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যান। আপনি তো তাহা শুনিলেন না।

> ছাইভস্ম নরনারীর-প্রেমের ছবি আঁকিয়া আজ আপনি বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক নারীহত্যার – বিশেষত নারীদিগের আত্মহত্যার জন্য দায়ী হইতেছেন।[১৮]

নবীনচন্দ্রের এই বক্তব্যের মধ্যে শিষ্যসুলভ আবদার নেই, বরং জনরুচি বিশেষ করে হিন্দু জনমানসের চাহিদা বা দাবির কথা আছে। লক্ষ করবার বিষয় সেই দাবির মধ্যে হিন্দুর আদর্শই প্রধান। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রাগ্রসর ব্যক্তিও যদি তাঁর আখ্যান ভুবনে হিন্দুর অতীত ঐতিহ্যকে না রক্ষা করেন তাহলে তিনিও বাঙালি হিন্দুর মন ও মানসিকতা থেকে ত্যক্ত হবেন। তাই নবীনচন্দ্র বঙ্কিমের থেকে তাঁর তথা তাঁদের প্রত্যাশার কথা আরো স্পষ্ট করে বলেন পরের বাক্যে –

> [বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে] আদর্শ চরিত্র নাই। রামায়ণ মহাভারতের কল্যাণে ভারতের গৃহে গৃহে যে আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ মাতা, আদর্শ কন্যা, এমনকি আদর্শ ভৃত্য পর্যন্ত আছে, তাহা জগতে নাই। বঙ্কিমবাবু এ সকল আদর্শ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার আঘাতে বরং ভাঙিয়াছেন – গড়িতে পারেন নাই। ... বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলিন ইউরোপীয় উপন্যাস হিসেবে উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ভারতীয় সাহিত্য হিসেবে উৎকৃষ্ট নহে।[১৯]

নবীনচন্দ্রের এই সংশয়, অস্বস্তি এবং অস্থিরতা থেকেই আমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগবে তবে কি উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে হিন্দুকেন্দ্রিকতাই প্রধান গুণক হয়ে উঠছিল? অন্তত হিন্দুর হাতে রচিত সাহিত্যে? অর্থাৎ যেখানে হিন্দুর আদর্শ রক্ষিত হবে না তা অতি সহজেই পরিত্যজ্য হবে – এই আদর্শই কি তবে উনিশ শতকের সাহিত্য চেতনাকে অনেকাংশে চালিত করেছিল? যে কারণে উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দুকে সাহিত্য রচনা করতে গেলে মাথায় রাখতে হবে হিন্দুর ঐতিহ্য ও জাতীয় আদর্শ? অন্যথায় বঙ্কিমের মতো স্বসমাজেই নিন্দিত হতে হবে। উনিশ শতকের হিন্দু বাঙালির স্বধর্ম ও স্বসমাজের প্রতি এই অপ্রতিরোধ্য টান এবং ভালোবাসাকেই আমরা হিন্দু 'আত্মতা' বলে চিহ্নিত করতে চাই।

২.২ স্বজাতির সংরক্ষণ ও হিন্দুর আত্মতা

উনিশ শতকে সৃষ্ট এই 'হিন্দু আত্মতা'র আর একটি গুরুতর কারণ লক্ষ করা যাবে স্বজাতির সংরক্ষণ চিন্তায়। মধুসূদন দত্তের মতো বুদ্ধিমান যুবক কিংবা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষিত ব্রাহ্মণ যখন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে হিন্দুর ভাঁড়ার শূন্য করে চলে যাচ্ছিলেন তখন নিশ্চয় হিন্দু বাঙালি তাঁর ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব কল্পনায় বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন! তাঁরা নিশ্চয় বুঝতে পারছিলেন

হিন্দুকে টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বার্থে লড়তে হবে। যে'কারণে নব্যহিন্দু আন্দোলন নানাদিক থেকে হয়ে ওঠে সংস্কারকামী। প্রথম দিকে শশধর তর্কচূড়ামণির মতো মানুষ গ্রাহ্য হলেও পরবর্তীকালে তাঁদেরকে প্রগতিবিরোধী বলে পরিত্যাগ করা হয় এবং 'যুক্তিসিদ্ধ মানবপ্রীতি' (Rational Philanthropy) অনুসারে নানা ধরণের সংস্কার সাধন করা হয়। এই দিকটি নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন অধ্যাপক রাখাল চন্দ্র নাথ তাঁর 'উনিশ শতক : ভাব সংঘাত ও সমন্বয়' গ্রন্থের 'সংস্কার ও পুনর্জীবন' অধ্যায়টিতে।[২০] আবার অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'হিন্দু পুনরুত্থানের তত্ত্বাবলী' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কীভাবে বঙ্কিম, শশধর তর্কচূড়ামণি কিংবা ভূদেবের চিন্তাভাবনাকে অগ্রাহ্য করে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মতবাদ হিন্দুর পুনরুত্থানের কাঠামোকে পোক্ত করেছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই দয়ানন্দ সরস্বতী কিংবা মহাদেব গোবিন্দ রানাডের মতো সংস্কারকেরও বিশেষ অবদান স্বীকার্য।[২১] হিন্দুর এই সংস্কারের পেছনে মূলত ছিল যেভাবেই হোক হিন্দু ধর্মকে টিকিয়ে রাখা। আর এ'কারণেই ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের মার্টিন লুথার নামে পরিচিত দয়ানন্দ সরস্বতী ধর্মান্তরিত হিন্দুদের ধর্মে ফিরিয়ে আনবার অভিপ্রায়ে 'শুদ্ধি' আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। উনিশ শতকের এই 'ঘর ওয়াপ্‌সি' যে কার্যত হিন্দুর আত্মরক্ষার শেষতম প্রচেষ্টা তা অনুমান করা যাবে সেকালের পত্রপত্রিকায় চোখ বোলালেও।

উনিশ শতকে বাংলার বৌদ্ধিক বিপ্লবের প্রায় বিপরীত মেরুতে রক্ষণশীল হিন্দুরা আপন ধর্মের অস্তিত্ব নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলেন। যার প্রতিফলন লক্ষ করা যাবে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের 'নববার্ষিকী' পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে। 'বাঙ্গালার লোকসংখ্যা' শীর্ষক উক্ত প্রতিবেদনে বাংলায় নারী পুরুষ পরিসংখ্যা দানের পাশাপাশি হিন্দু, মুসলমান, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্যদাস ইত্যাদি জাতি ও বর্ণের মানুষদের সংখ্যা তুলে ধরা হয়। ঐ প্রতিবেদনে লেখা হয় –

> বাঙ্গালায় পুরুষের মোট সংখ্যা প্রায় তিন কোটি চৌত্রিশ লক্ষ, স্ত্রীলোকের মোট সংখ্যা তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ। ... আবার হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প।[২২]

এই পর্যন্ত বলার পর উক্ত প্রতিবেদনে হিন্দু-মুসলমানের জনসংখ্যার তারতম্যের প্রসঙ্গে মুসলমানদের শক্তি কীভাবে ক্রমবর্ধমান প্রতিবেদক সে'দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়েছেন এবং বলেছেন –

> মুসলমানদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প হইলেও তাহারা অন্য জাতীয়া স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করিয়া এই বৈষম্য দূর করিতে পারে। কিন্তু হিন্দু সন্তান যতদিন জাতিভেদ রক্ষা করিয়া চলিবেন, ততদিন ইহা হইবার উপায় নাই। ... এবং হিন্দু বংশ ক্রমে নির্মূল হইবে।[২৩]

লক্ষ করবার বিষয় হ'লো হিন্দু সমাজে জাতি বর্ণের জটিল বিন্যাসের জন্য যে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে সে বিষয়ে প্রতিবেদক যেমন সচেতন, তেমনই মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধিতেও তিনি আতঙ্কিত। এই আশঙ্কা থেকেই বলা হয় –

> ... যাহারা সংখ্যায় এত বাড়িয়াছে, তাহারা ক্রমে ক্ষমতায়ও প্রধান হইতে পারে। ... আর একটি আশঙ্কার বিষয় এই, মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে হিন্দুদিগের সমান হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু ১৮১০০৪৩৮, মুসলমান ১৭৬০৯১৩৫। হিন্দু সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা পাঁচ লক্ষমাত্র অধিক। নানা কারণে মুসলমানদিগের বংশ হিন্দুর অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। কে বলিতে পারে যে, ভারতবর্ষ কালে কেবল মুসলমানের দেশ হইবে না?[২৪]

অপরের বলবৃদ্ধিতে ভীতিও সচেতনতা থেকেই যে আত্ম'র সংরক্ষণ চেতনা বৃদ্ধি পায় তা সেকালের পত্রপত্রিকার ভাষ্য থেকে সহজেই পরিষ্কার। আর এই ভাষ্য কেবলমাত্র দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'নববার্ষিকী' পত্রিকাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সেই সময়ের অন্যান্য অনেক প্রবন্ধেও ঐ একই আশঙ্কার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে। যেমন কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত 'বান্ধব নবপর্যায়' এ ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধ 'ভারতে মুসলমান', 'ভারতরোদন' (বান্ধব, ১৮৭৫), 'ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ' (বান্ধব, ১৮৭৬), 'ভারতে আর্যজাতি' (বান্ধব, ১৮৭৮), 'মহাত্মদের উত্তরাধিকার' (বান্ধব, ১৮৭৮), 'ভারতে প্রজানীতি' (বান্ধব, ১৮৭৮) – প্রভৃতি প্রতিটি প্রবন্ধেই প্রতীকী উপস্থাপনা দিয়ে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, হিন্দু একটি লুপ্তপ্রায়, মৃত্যুপথযাত্রী জাতি – আগ্রাসী যবনদের ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদের মৃত্যুর পর যে উত্থান তার জন্যই হিন্দুজাতি বিনাশের সম্মুখীন।[২৫]

এই বিনাশের আশঙ্কা থেকেই হিন্দুর আত্ম সংরক্ষণ প্রবল হয়ে দেখা দেয় এবং এই প্রেক্ষিতেই 'অপর' হিসেবে মুসলমানের সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই প্রসঙ্গে অঞ্জন চক্রবর্তী ও অনুপ ধর তাঁদের যৌথ গবেষণাপ্রবন্ধ 'হিংস্রতার উদ্‌বর্তন, উদ্‌বর্তনের হিংস্রতা'তে আত্ম - অপর সম্পর্কের এই জটিল বিন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন –

> "অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আতঙ্কের মুখে আমরা কি কোনো রাজনৈতিক দর্শনের কথা ভাবতে পারি? মুহূর্তের জন্য তথ্য এবং সত্যের বিশাল ওজনকে নামিয়ে রেখে কি ন্যায়ের রাজনীতির কথা ভাবতে পারি – নিজেদের সংগঠিত করে কি সেই ন্যায়ের অন্বেষণ করতে পারি – যে ন্যায় আইন হতে বিচ্ছিন্ন

- যা অপরকে আত্মসাৎ করতে পারে না? তার জন্য সংগঠিত হওয়ার অর্থ চিরাচরিত ভাতৃত্ব বোধমূলক ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা...[২৬]

লক্ষ করবার বিষয়, অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার এই আতঙ্কের মুখেই হিন্দু তাঁর 'আত্ম'কে নির্মাণ করছেন এবং বলশালী করে তোলবার জন্য যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। যার পরিণাম 'অপর'কে কোণঠাসা করা, প্রান্তিক করে তোলা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুযোগ পেলে তাঁকে আত্মসাৎও করা। 'অপর' মুসলমানের প্রতি এই প্রান্তিকীকরণ ও আক্রমণাত্মক মানসিকতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার বেশ কিছু আক্ষেপধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী রচিত 'মুসলমান জাতি ও হিন্দু লেখক', কেনচিৎ মর্ম্মাহতেন হিতকামনা (ছদ্মনাম) রচিত 'মুসলমানের প্রতি হিন্দু লেখকের অত্যাচার', মৌলভী শেখ ওসমান আলী রচিত 'হিন্দু মুসলমানের বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়', খান ছাহেব আবুল হাসেম খান চৌধুরী রচিত 'হিন্দু মুসলমানের বিরোধ ও তাহা নিবারণের উপায়' প্রভৃতি প্রবন্ধে।[২৭]

প্রসঙ্গত 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ, অগ্রহায়ণ – পৌষ ১৩১০ বঙ্গাব্দের একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী রচিত 'মুসলমান জাতি ও হিন্দু লেখক' প্রবন্ধ থেকে 'অপর' মুসলমানের প্রতি হিন্দু লেখকের মানসিকতার ছোট্ট একটি নমুনা উদ্ধৃত করা হল –

> হিন্দু ভায়াদিগের যেরূপ মতিগতি – সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলমানদিগের প্রতি তাঁহাদের যেরূপ লম্ফ ঝম্ফ কুর্দ্দন এবং হুঙ্কার আস্ফালন দৃষ্ট হয়; হাটে মাঠে ঘাটে বাজারে অফিস আদালতে স্কুল কলেজে সভাসমিতিতে পত্র পত্রিকায় পুস্তক পুস্তিকায় – কবিতা এবং কাব্যে, বক্তৃতা এবং উপন্যাসে যেরূপ বিদ্বেষ-বিষ উদ্গীরণ করিতে দেখা যায়; তাহাতে ইহা ধ্রুব সিদ্ধান্ত যে, হিন্দুগণ যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বা শারীরিক বলবীর্য্যে অদৃশ্য ক্ষমতাশালী হইতেন, তাহলে নিশ্চয় তাঁহারা এই "অসভ্য বর্ব্বর দুর্দ্দান্ত পাষণ্ড পাতিনেড়ে পিশাচ পামর পাপিষ্ঠ অসুর দুরাত্মা অস্পৃশ্য ছাগলদেড়ে চাষা ম্লেচ্ছ যবন"গুলিকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান-পুর্ব্বক, পুণ্যভূমি আর্য্যস্থান ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিতেন – অথবা তোপে উড়াইয়া যবন বংশ ধ্বংস করিতেন।[২৮]

প্রাবন্ধিকের উপরোক্ত খেদোক্তি থেকে খুব সহজেই আমরা উনিশ শতকের মুসলমানের প্রতি হিন্দু লেখকের 'অত্যাচারের' বহর অনুমান করতে পারি। হিন্দুর স্বাভিমান ও মুসলমানের প্রতি উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই উপেক্ষা থেকেই জন্ম নেবে মুসলমানের বঞ্চনাবোধ এবং সেই অনুভূতি ক্রমে

ঘনীভূত হয়ে সাহিত্যে নবরূপ লাভ করবে। যার ফলস্বরূপ মূলধারার প্রচলিত সাহিত্যের প্রতিস্পর্ধী ধারা হিসেবে মুসলমানের সাহিত্য সম্ভার গড়ে উঠবে। আর সেখানে আমরা হিন্দুর দৃষ্টিতে 'অপর' মুসলমানের 'আত্ম' নির্মাণের আরেকটি প্রকল্প লক্ষ করবো।

২.৩ স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও হিন্দুর আত্মতা

উনিশ শতকের হিন্দু আত্মতা নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা। আমরা লক্ষ করেছি উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে ধর্ম ও সমাজ জীবনে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের ও পুনরুজ্জীবনবাদীদের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকের মতে তাই এই জাতীয়তাবাদ আসলে হিন্দু জাতীয়তাবাদেরই নামান্তর। ড. অমলেন্দু দে মনে করেন এই মনোভাব কার্যত শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করে।[২৯] কেননা তখনো গ্রাম সমাজে হিন্দু – মুসলমানের মধ্যে এক অভাবনীয় সম্মিলন লক্ষ করা যাচ্ছিল। তবে নাগরিকবৃত্তে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু পুনরুজ্জীবনের হোতা ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের পুরোধা একদা ব্রাহ্মদের দলত্যাগী এই রাজনারায়ণ বসু হিন্দু ধর্ম এবং তার উপাসনা পদ্ধতির উৎকৃষ্টতা বিষয়ে সকলকে সমঝে দেবার জন্য হিন্দু এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজ এর মিলিত উদ্যোগে ১৮৭২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় সভায় রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৭৯৪ শকাব্দ) বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। রাজনারায়ণ তার এই বক্তৃতায় হিন্দু ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ, কোন কোন অংশে হিন্দু ধর্ম অন্য ধর্মের থেকে উন্নত এই বিষয়ে আলোকপাত করেন। এখানে তিনি হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্বের বারোটি কারণ দেখিয়েছিলেন যেগুলিকে আমরা মনে করি হিন্দু জাগরণ ও হিন্দুর আত্মতা নির্মাণের অন্যতম আয়ুধ। রাজনারায়ণ দেখিয়েছেন–

> ১. হিন্দু ধর্মের নাম কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামমূলক নহে... ইহা দ্বারা হিন্দু ধর্মের প্রশস্ততা প্রমানীকৃত হইতেছে।
>
> ২. হিন্দু ধর্ম ব্রহ্মের অবতার স্বীকার করে না।
>
> ৩. হিন্দু ধর্ম কোন মধ্যবর্তী অর্থাৎ পেয়গম্বর স্বীকার করে না।

৪. আরেকটি বিষয়ে হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ইহাতে ঈশ্বরকে হৃদয়স্থিত জানিয়া উপাসনা করিবার উপদেশ আছে। ... এইটি হিন্দু ধর্মের প্রধান গৌরবের স্থল।

৫. হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে ইহাতে ঈশ্বরের সহিত যোগের উপদেশ আছে।

৬. হিন্দু ধর্মে সকাম নিস্কাম দুই প্রকার উপাসনারই বিধি আছে।

৭. হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা আর এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এই, উহাতে সর্বভূতে দয়া করিবার উপদেশ আছে।

৮. পরকাল সম্বন্ধীয় মতে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ প্রমাণিত আছে।

৯. হিন্দু ধর্মের ঔদার্য সর্ব ধর্মাপেক্ষা অধিক।

১০. এই ধর্মে জীবনে প্রত্যেক কার্য্যে ঈশ্বরকে স্মরণ করিবার বিধান আছে।

১১. হিন্দুদিগের সকল কার্য্য ধর্মের অনুশাসনানুসারে সম্পাদিত হয়।

১২. অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা হিন্দু অতিশয় প্রাচীন।[৩০]

রাজনারায়ণের এই বক্তৃতার মধ্যে যেমন স্বধর্মের প্রতি সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শিত হয়েছে তেমনই পরধর্ম বিশেষত ইসলামের প্রতি অবহেলা ও অসম্মান করা হয়েছে। 'পয়গম্বর' এর প্রতি অস্বীকৃতিই তার প্রমাণ। এখানেই শেষ নয় ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, মুসলমানেরা যখন ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশনে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন, তখন হিন্দুদেরও 'মহাহিন্দু সমিতি' গঠন করা উচিত। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য "মুসলমান ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যত পারি যোগ দিব, কিন্তু কৃষক যেমন পরিমিত জমি কর্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ষণ করে না, সেইরূপ হিন্দু সমাজই আমাদের কার্যের ক্ষেত্র হইবে।"[৩১] এরই পাশাপাশি তিনি ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় হিন্দুদের ধর্ম বিষয়ে ও স্বত্ব অধিকার রক্ষার ব্যাপারে এবং সাধারণত হিন্দু জাতির উন্নতি সাধনের জন্য নিদান দেন। প্রসঙ্গত জানিয়ে দেন – যদি হিন্দুরা তাঁদের প্রাচীন গৌরব ও ধর্ম সম্পর্কে সজাগ হন, তাহলে

সামাজিক বৈষম্য সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে একতার মনোভাব জাগ্রত হবে। এই উদ্দেশ্যেই সংস্কৃত ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও রাজনারায়ণ বসু হিন্দিভাষাকে হিন্দুদের সাধারণ ভাষা করার কথা বলেন।[৩২] অধ্যাপক অমলেন্দু দে মনে করেন বাংলার নবজাগরণে যেমন শিক্ষিত হিন্দুরা যুক্তিশীল মননের অধিকারী হয়েছিলেন, তেমনই নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতাও তাঁদের মনের অনেকটা জায়গা জুড়ে বিরাজমান ছিল।[৩৩]

তবে কি এই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব চেতনাই বৃহত্তর বাংলায় হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির মিলনের ক্ষেত্রে একটা বড়ো অন্তরায় হয়ে উঠলো? ঐতিহাসিকর মন্তব্যের সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি, যে উনিশ শতক কেন বিশ শতকের অন্তিম পর্যন্ত বাংলার লোকায়তবৃত্তে হিন্দু মুসলমান পৃথক অস্তিত্ব ততখানি অনুভূত হতো না। বাংলার বিভিন্ন ধরণের লোক উৎসব ও লোকসংস্কৃতির নানা আঙ্গিকে এই মিলন প্রত্যক্ষ করা গেছে। কিন্তু সচেতন শিক্ষিত এলিটদের মধ্যেই অস্তিত্ব সম্পর্কে এই আত্মসচেতনতা ফাটল ধরালো বাঙালি জাতিসত্তায় কোথাওবা ভারতীয়ত্বের বিশ্বাসেও। আশীষ লাহিড়ী সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের এই আত্ম-অপর রাজনীতির উদ্ভবলগ্নটি চিহ্নিত করে লিখছেন ১৮৫৭ সালের আগে পর্যন্ত ধর্মীয় নিরিখে রাজনৈতিক যুগবিচারের ব্যাপারটা তখনো ভারতীয়দের মনোজগতে প্রধান ছিল না। তাঁর মতে এদেশে হিন্দু রাজা মুসলমান রাজা আবার খ্রিষ্টান কোম্পানি এসে রাজত্ব গ্রহণ করেছে কিন্তু সেই সমস্ত রাজাদের ধর্ম কী তা কোনো বিবেচ্য বিষয়ই ছিল না। তবে ১৮৫৭ সালের পর প্যারাডাইম বদলে গেলো। এই বছরেই নীলমণি বসাকের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রথম প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ আর আধুনিক ভারতকে যথাক্রমে হিন্দু, মুসলিম আর ইংরেজ শাসনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হলো। সেই প্রথম ধর্মবিশ্বাসের নিরিখে রাজনীতি ও যুগকে বিচার করা শুরু হল। স্বতঃসিদ্ধর আকারে হিন্দুযুগকে স্বর্ণযুগ, মুসলিমযুগকে অধঃপতন আর অত্যাচারের যুগ বলে চিহ্নিত করা হল। বলা হল ঘৃণ্য মুসলিম শাসনের হাত থেকে হিন্দু ভারতকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের কৃপায় শ্বেতাঙ্গ শাসন অবতীর্ণ হয়েছে ভারতে। ইংরেজ শাসনে অবশেষে ভারতের সেই সুবর্ণযুগ পুনরুদ্ধারের সুযোগ এসেছে। অতঃপর সুবিধাভোগী হিন্দু ভারতীয় প্রজারা ব্রিটিশদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিংবা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজ শাসনের মহিমায় মুগ্ধ হলেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এর রচয়িতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যখন তাঁর প্রসিদ্ধ 'স্বাধীনতাহীনতা'র তত্ত্ব খাড়া করেন, সেখানে প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে মুসলিমদের কাছে হিন্দুদের পরাধীনতা; শ্বেতাঙ্গদের কাছে নয়। সোজাকথায়

মুসলিমদের অত্যাচারে ও শাসনে হিন্দুরা এতকাল বিপন্নতা বোধ করছিলেন কিন্তু শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা এসে ঐ অত্যাচারের যূপকাষ্ঠ থেকে হিন্দুদের উদ্ধার করলেন। তাই তাঁরা তাঁদের কাছে পরম আদরণীয় – আত্মীয়।[৩৪] কেননা তাঁরাই যেন 'স্বাধীনতা' এনে দিলেন।

আশীষ লাহিড়ী দেখাচ্ছেন – এই ছাঁদটা শাসকদের সুচতুর পরিকল্পনায় নানাবিভঙ্গে কোটিবার পুনরাবৃত্ত হতে হতে আম-হিন্দুর কাছে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠলো যে - ইংরেজ বন্ধু, আর শত্রু মুসলমান। আর এই বয়ানটিই ক্রমশ সংখ্যাগুরু হিন্দুর সাহিত্যের ও ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠলো।[৩৫] আবার অন্যদিক থেকেও প্রশাসনের কৌশলেই এই বিযুক্তির আরেকটি স্তর নির্মিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম পর্বে হিন্দু বাঙালি ভালো প্রাচ্য বা 'Good orient' হিসেবেই বিবেচিত হয়েছিল। তাঁর কারণ হিন্দু বাঙালি ইংরেজদেরকে 'সাহেবরূপে দেবতা' জ্ঞানেই পুজো করা শুরু করে দিয়েছিলেন।[৩৬] পরিবর্তে তাঁরা যে সাহেবদের আস্থাভাজনও হয়ে উঠছিলেন তার নমুনা পাওয়া যাবে ১২৬৪ বঙ্গাব্দের 'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা'য়। সেখানে লেখা হচ্ছে – "হিন্দুরা যে কেবল মুসলমান অপেক্ষা গভর্নমেন্টের অধিকতর বিশ্বাসভাজন এমত নহে; রাজপুরুষেরা হিন্দুদিগকে স্বজাতীয় মনুশ্যের সহিত সমভাবে বিশ্বাস করিয়া থাকেন... ডেপুটী কালেক্টরের তালিকা দৃষ্টি করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইবেক – যথা ইংরাজ ৫৮, হিন্দু ৫৭, মুসলমান ৪০ জন।"[৩৭] এই তৃপ্তিবোধ ইংরেজদের সঙ্গে হিন্দুর আত্মতাকে আরো মজবুত করেছে এবং মুসলমানকে 'অন্তঃস্থ অপর' (Internal Other) হিসেবে চিহ্নিত করে সম্পর্কের গ্রন্থিকে শিথিল করেছে। ফলে হিন্দু যেখানে 'Good Orient' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে মুসলমান ঠিক তার বিপরীত মেরুতে মন্দ এবং 'বিপজ্জনক' জ্ঞানে প্রান্তিকায়ীত (Marginalised) হয়ে পড়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমাদের মনে হয় এই জায়গা থেকেই ঔপনিবেশিক শাসনের একটি বিশেষ পর্বে ইংরেজদের সঙ্গে হিন্দু সুবিধাভোগী এবং আলোকপ্রাপ্ত নাগরিকদের এক প্রকার 'অসম আত্ম' সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং মুসলমানের সঙ্গে ঢের 'অপরত্ব' রচিত হয়েছে। আশীষ লাহিড়ী মনে করেছেন এটি এক প্রকার ঔপনিবেশিক প্রকৌশল যার মধ্যে দিয়ে শুধু আর্থিক বা রাজনৈতিক দাসত্ব নয়, চিন্তাজগতেও সর্বাধিপত্য (হেজিমনি) প্রতিষ্ঠার এক অতি নিপুণ খেলা শুরু হল।[৩৮]

চিন্তাজগতে বিশেষত সাহিত্য সংস্কৃতিরও বৃহৎ পরিসরে আমরা লক্ষ করবো 'হিন্দু আত্ম' সর্বাধিপত্য বা হেজিমনি প্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত হবেন। যার ফলস্বরূপ মুসলমানের প্রান্তিকীকরণ, অপরায়ন সুনিশ্চিত হবে। আর এখান থেকেই উনিশ শতকেই মুসলমান সমাজের প্রত্যাঘাত স্বাভাবিক নিয়মে পথ খুঁজে নেবে। যে কারণে তাঁদের মধ্যে নতুন 'আত্মবোধ' গড়ে উঠবে। ফলে উনিশ শতকেই দ্বিমুখী 'আত্ম – অপর' সম্পর্কের এক জটিল বিন্যাস রচিত হবে।

২.৪ মুসলমানের আত্মাভিমান ও স্বরূপের সন্ধান

উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ আত্মাভিমানী, লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং খানিকটা কক্ষচ্যুত। উনিশ শতকের পূর্বে বিশেষত প্রাক-পলাশী যুগে মুসলমানরা ছিলেন শাসক। আর শাসক সম্প্রদায়রূপে মুসলমানেরা সেনাবাহিনি ও ফৌজদারী বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। এমনকি তাঁরাই ছিলেন শাসনব্যবস্থার প্রধান পরিচালক। অন্যদিকে ভূমি ব্যবস্থা ও ব্যবসা বাণিজ্যে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল অধিক। অধ্যাপক অমলেন্দু দে'র মতে দশ ভাগের নয় ভাগ জমিদারিই হিন্দুদের দখলে ছিল। কানুনগো বিভাগ থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো ব্যাংকার সকলেই ছিল হিন্দু। অন্যদিকে বেশিরভাগ কৃষক মুসলমান ছিলেন। সম্প্রদায় ভেদে এরকম অসম জীবিকা বিন্যাস থাকলেও সেকালে মুসলমানদের জীবনে বিরাট কোনো বিপর্যয় নেমে আসেনি। এ'প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন – "...বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা এমনভাবে নিযুক্ত ছিলেন যে, সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের ভারসাম্য তখনও নষ্ট হয়নি।"[৩৯] কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন আসে। দ্রুত গতিতে মুসলমানেরা দুরবস্থায় পতিত হন। মুসলমানদের এই দুরবস্থার বর্ণনা করে অধ্যাপক অমলেন্দু দে জানিয়েছেন –

> শাসনযন্ত্রে নিযুক্ত মুসলমান আমিল ও ফৌজদারেরা অধিকারচ্যুত হন। মুসলমান সৈন্যদের পরিবর্তে সিপাহীরা নিযুক্ত হওয়ায় তাঁরাও কর্মচ্যুত হন। বিচার বিভাগেও মুসলমানদের ক্ষমতা লুপ্ত হয়। এইভাবে খুব অল্প সময়ের অধ্যেই মুসলমানদের অধোগতি হয়।[৪০]

অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে শাসনক্ষমতা, জীবিকা ও সামাজিক অধিকার থেকে পিছোতে পিছোতে মুসলমানরা প্রায় হয়ে পড়েন অন্ত্যেবাসী। অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ তাঁর 'উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন –

> বস্তুত ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ে রাজক্ষমতাচ্যুতি, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারির সংখ্যা হ্রাস, ১৮২৮ সালে বাজেয়াপ্ত আইনে নিস্কর ভূমির রায়তিস্বত্ত্ব লোপ এবং ১৮৩৭ সালে ফারসির রাজভাষাচ্যুতি পরপর এই চারটি বড়ো আঘাতে পূর্বের শাসক শ্রেণি নিঃস্ব রিক্ত নিরক্ষর নিষ্ক্রিয় নির্জীব জাতিতে পরিণত হয়।[৪১]

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান তাঁর 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ইংরেজ আমলে নবাবের রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে নবাবের আশ্রিত মুসলমান কর্মচারী, সভাসদ, জায়গিরদার ও অনুগৃহীতরা সর্বপ্রকার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হন। অভিজাত মুসলমানদের অর্থাগমের যে তিনটি প্রশস্ত পথ ছিল যথা – সামরিক পদলাভ, রাজস্বভোগ আর বিচার ও রাজনৈতিক নিয়োগ এই সমস্ত ক্ষেত্র থেকে মুসলমানদের অপসরণ শুরু হয়ে যায়।[৪২]

তুল্যমূল্য বিচারে এই সময়ে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের দুর্গতি অধিকতর মাত্রা লাভ করে। কেননা পূর্বের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য মুসলমানদের পক্ষে ইংরেজ শাসনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। সেইসঙ্গে ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ শাসক মুসলমানদের প্রতি বিরূপ হয়, কারণ বিদ্রোহীরা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে নবাবের মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। সেইসঙ্গে ফরাজি ও ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে এই বিরূপতা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমানরাও স্বধর্ম থেকে পতিত হওয়ার ভয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনাগ্রহ প্রকাশ করে। অন্যদিকে হিন্দুরা দ্রুত পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে থাকে এবং যাবতীয় সুযোগ সুবিধার ভাগীদার হ'তে থাকে। কাজে কাজেই ব্রিটিশ শাসনের শুরুতেই হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা পিছিয়ে থাকেন। মুসলমান সমাজের এই অন্ত্যেবাসী অবস্থান তাঁদের আত্মাভিমানকে আরো বৃদ্ধি করে। যার কিছু নমুনা পাওয়া যাবে সেকালের পত্রপত্রিকা ও সাহিত্যে।

১২৮১ বঙ্গাব্দের ১৮ শ্রাবণ 'সাধারণী' পত্রিকায় লেখা হয়েছে –

> যে সকল হিন্দুনামাভিমানী মহাত্মারা মুশলমান বর্গকে ঘৃণা করেন, তাঁহাদিগকে আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, যে, অন্যত্র যাহাই হউক, বঙ্গে আমাদিগের মুসলমান ব্যাতীত আর গতি নাই। বঙ্গে হিন্দু ১ কোটি ৮১ লক্ষ, মুসলমান ১ কোটি ৭৬ লক্ষ। প্রায় সমান, আবার তাহাতে বিবর্লি সাহেব বলেন যে, মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন হিন্দু অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে, কালে বঙ্গদেশ হইতে হিন্দুজাতির লোপ হইবার সম্ভাবনা। ... মুসলমানকে উপেক্ষা করিয়া বঙ্গে তিষ্ঠিবার স্থান নাই।[৪৩]

লক্ষ করবার বিষয় সংখ্যাতত্ত্বের হিসেব উল্লেখ করে এখানে মুসলমানের অপ্রতিরোধ্য গতি এবং তাঁদের উপর হিন্দুর নির্ভরতা কতোখানি তা বিজ্ঞাপিত করে বাঙালি মুসলমান তাঁর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে চাইছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভিমুখে তাঁদের এই যাত্রাই একদিন তাঁদেরকে পুনরায় সামাজিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতায় নিয়ে আসতে পারে এই অনুক্ত বাসনাও যেন উক্ত প্রতিবেদনে ঘোষিত হয়েছে।

নওসর আলি খাঁ ইউসফজী তাঁর 'বঙ্গীয় মুসলমান' গ্রন্থে মুসলমানের অতীত গৌরবগাথাকে সামনে রেখে সেকালের মুসলমানের চরিত্র নির্মাণের কথা বলেছেন। লিখেছেন – "বঙ্গীয় মুসলমানগণ কি শিক্ষা নৈপুণ্যে তাহাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের অপেক্ষা কোন শক্তিতে অভাবান্বিত? বঙ্গীয় মুসলমান কি বিদ্যাশিক্ষায় স্বাভাবিক শক্তিবিহীন হইয়া পড়িয়াছে?"[৪৪] লেখকের এই কাকুবক্রোক্তির পেছনে যে উত্তরটি স্বাভাবিক ছন্দে খেলা করে যায় তা হল – না; মুসলমান এত হীনবল, শক্তিহীন নয়। পরের বাক্যেই প্রাবন্ধিক সেইকথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন এবং মুসলমানের অতীত গৌরবের আলোয় তার বর্তমানকে রঞ্জিত এবং বিজ্ঞাপিত করে নিতে চান –

> যে মুসলমান জাতি এক সময়ে জগতে জ্ঞান ও সভ্যতার আদর্শস্থল হইয়া উঠিয়াছিল, যাহাদের জ্ঞান-রশ্মি কর্ডোভা, গ্রানেডা, বোগদাদ, কায়রো ও গজনীর বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ হইতে সমুত্থিত হইয়া ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার অধিবাসীদিগকে সভ্যতালোকে আলোকিত করিত, যে মুসলমান জাতির নিকটে জ্ঞান ও সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিল বলিয়া আজ ইউরোপভূমি ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান গরিমায় গৌরবান্বিত হইয়াছে, যে মুসলমান জাতির ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্যের অনুকরণে বর্ত্তমান ইতিহাস, ভূগোল ও সাহিত্যের অনুকরণে ইউরোপের বর্তমান ইতিহাস, ভূগোল ও সাহিত্য গঠিত হইয়াছে, যে মুসলমান জাতির গণিতশাস্ত্রের এল্‌জ্যাবরা এবং রয়াসনে ক্রিমিয়া নামে ইউরোপ ও আমেরিকায় গণিত ও রয়াসনশাস্ত্রের নামকরণ হইয়াছে, যে মুসলমান জাতির আরবী সংখ্যালিখনপ্রণালী আজো সমস্ত ইয়োরোপীয় জাতির গণিতে সমাদরে ব্যবহৃত হইতেছে, যে মুসলমান জাতি জগতে সর্ব্বপ্রথমে অবজার্ভেটরি স্থাপন করেন, এবং যে মুসলমান জাতির আবিষ্কৃত ত্রিকোণমিতির আবশ্যকীয় নিয়ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অঙ্কশাস্ত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে, বলিতে দুঃখ হয় - ! আজ বঙ্গদেশে সেই মুসলমান জাতি কি পাশ্চাত্য শিক্ষা আয়ত্ত করিতে অক্ষম? তাহাদের মস্তিষ্কের কি কোনো অভাব ঘটিয়াছে? না কখনোই নহে।[৪৫]

উনিশ শতকের মুসলমানের আলস্য ব্যাধিকে চিহ্নিত করেও প্রাবন্ধিক এখানে বিশ্বের দরবারে মুসলমানের খ্যাতির ইতিহাসকে আর একবার আলোকিত করলেন। তাঁর উদ্দিষ্ট পাঠকের কাছে

যেন এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাইলেন যে, মুসলমানের অগৌরবের কিছু নেই; কেননা ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য বিজ্ঞান গণিত সমস্ত কিছুর মূলে মুসলমান জাতির অবদান সর্বাধিক এমনকি যে আধুনিক বিদ্যা ও বিজ্ঞান নিয়ে পাশ্চাত্যের এত গৌরব তারও আদি উৎস মুসলমান জাতির অন্দরেই নিহিত।

বিদ্যা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের পাশাপাশি ব্যবহারিকতায়ও মুসলমান যে অন্য জাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও বিরল তার নমুনা পাওয়া যাবে শ্রীমীর আলি লিখিত 'অহংকারী ও অভিমানী কাহারা?' শীর্ষক নিবন্ধে। 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় ১৮৭৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত সেই নিবন্ধে লেখক জানিয়েছেন – "মুসলমানেরা তেমন অহংকারী নয়, বোধহয় মুসলমানদিগের ন্যায় তেমন উদারপ্রকৃতি মনুষ্য পৃথিবীতে আর নাই ..."[৪৬]

আসলে উনিশ শতকের বাংলায় মুসলমান যেভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলে সেখানে নিজের অর্থাৎ স্বজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্য আত্মানুসন্ধান আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। আর সেই আত্মানুসন্ধানের পথেই নানাসময়ে ধরা পড়েছে তাঁদের বর্ণময় স্বরূপ। উপরোদ্ধৃত প্রতিবেদনটিতে যেমন আত্মবিশ্বাসী মুসলমানের স্বপ্নসন্ধানী মনের ছবি ফুটে উঠেছে, তেমনই সেকালে তাঁদের 'প্রতিযোগী' হিন্দুদের প্রতি অবহেলার অভিব্যক্তিও বিরল নয়। অর্থাৎ উনিশ শতকের মুসলমানের অস্মিতা তাঁদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ যেমন রোপণ করছে তেমনই বিচ্ছিন্ন জাতিসত্তা তাঁদের আত্ম নির্মাণেও অগ্রসর হচ্ছে। এই জায়গাটিতে আমাদের মনে হয়েছে হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই ধর্মকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতিসত্তাও খণ্ডিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বাঙালি জাতিসত্তাকে যদি একটি একক জাতিসত্তা হিসেবে দেখা হয় তাহলে তার ভেতরেই দুটি পৃথক বর্গ – হিন্দু ও মুসলমান কার্যত 'অন্তঃস্থ অপর' (Internal Other) হিসেবেই অবস্থান করে।

এখন যদি আমরা উনিশ শতকে এই দুই ধর্মের মানুষের একক জাতিসত্তা থেকে ধর্ম পরিচয়ের নিরিখে বিচ্ছিন্ন হওয়ার তাগিদ বিচার করি তাহলে লক্ষ করবো মূলত আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই দুই ধর্মের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অবসথান তাঁদেরকে ভিন্ন খাতে বইয়ে দিতে উৎসাহিত করেছে। যেমনভাবে বলা চলে যে, এই কাল পর্বে কী আশরাফ কী আতরাফ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মুসলমানদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থান একেবারে তলানিতে গিয়ে পৌঁছয়।

সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' গ্রন্থে জানিয়েছেন উনিশ শতকে কলকাতা শহর ছিল সরকারি কাজকর্মের প্রধান কেন্দ্র এবং সেখানে স্বল্পশিক্ষিত থেকে সুশিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর আধিপত্য ছিল সর্বাধিক। তাঁর মতে, "এই আধিপত্য সরকারি চাকরির নিম্নস্তরেই বেশি, বাঙালি হিন্দুর সংখ্যা সেখানে প্রায় শতকরা ৯০ জন।"[৪৭] এ'প্রসঙ্গে তাঁর প্রদত্ত তথ্য থেকে বাঙালি হিন্দুর সরকারি চাকরিক্ষেত্রে অগ্রগতির একটি ছক কষে নেওয়া যেতে পারে –

কর্মক্ষেত্র	**পদের নাম**	**মোট কর্মী সংখ্যা**	**ভারতীয় কর্মী**	**বাঙালি হিন্দু কর্মী**
সেক্রেটারি অফিস, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া (ফিন্যান্স + বৈদেশিক + স্বরাষ্ট্র + সামরিক বিভাগ)	অ্যাসিস্ট্যান্ট	৩৬ জন		২৬ জন
	কপিস্ট	৩২		২৬ জন
	সহকারী মুনশি (বৈদেশিক বিভাগ)	৪ জন		১ জন
	ট্রান্সলেটর (বৈদেশিক বিভাগ)	১ জন		১ জন
	সুপারিন্টেনডেন্ট (বৈদেশিক বিভাগ)	১ জন		১ জন
	বিবিধ বিভাগ	৩ জন		২ জন
	সেকশন রাইটার (স্বরাষ্ট্র বিভাগ)	২৯ জন	৯ জন	৯ জন
	আফিস (সাধারণ বিভাগ)	৪৫ জন	১১ জন	১০ জন
	কপি বিভাগ	৬৬ জন	৩১ জন	৩১ জন
	পাবলিক ওয়ার্কস	৩ জন	২ জন	২ জন
	ড্রয়িং	৪ জন	৩ জন	১ জন
	কপিং	১০ জন	৭ জন	৫ জন
	পাবলিক ইন্সট্রাকশন বিভাগ	৬ জন	১ জন	১ জন

	পাবলিক ইন্সট্রাকশন বিভাগ আফিস	৫ জন	৪ জন	৪ জন
বেঙ্গল গভর্নমেন্ট সেক্রেটারির অফিস	অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট	৪৮ জন	১৮ জন	১৮ জন
	কপিস্ট	৭৯ জন	৫০ জন	৫০ জন
সদর রেভেনিউ বোর্ড	আফিস	২০ জন	৬ জন	৬ জন
	আমলা	৬ জন	৫ জন	৫ জন
	কাস্টমস	১০ জন	৬ জন	৬ জন
	লবন	৮ জন	৬ জন	৬ জন
	আফিম	৬ জন	৬ জন	৬ জন
	সাধারণ	৩ জন	৩ জন	৩ জন
	কপিস্ট	২৭ জন	২২ জন	২২ জন
স্ট্যাম্প ও ষ্টেশনারী আফিস	স্ট্যাম্প বিভাগ	১ জন	১ জন	১ জন
	ষ্টেশনারী বিভাগ	৭ জন	৫ জন	৫ জন
অ্যাকাউন্টেন্ট, বেঙ্গল গভর্নমেন্ট	অ্যাডজাস্টমেন্ট বিভাগ	১৯ জন	১৯ জন	১৯ জন
	রেমিট্যান্স বিভাগ	৪ জন	৪ জন	৪ জন
	মাসিক রেজিস্ট্যান্স বিভাগ	২ জন	২ জন	২ জন
	ট্রেজারি অ্যাকাউন্টেন্ট	১১ জন	১১ জন	১১ জন
	রেভেনিউ অ্যান্ড জুডিশিয়াল ডিপোজিটস	১৩ জন	১২ জন	১২ জন
	স্টেটমেন্ট	৯ জন	৮ জন	৮ জন
	নিমক ও আফিম	২৬ জন	২৪ জন	২৪ জন
	নৌ বিভাগ	১১ জন	১০ জন	১০ জন

উপরের এই তালিকাটি অসম্পূর্ণ। কেননা এখানে আরো অনেকগুলি বিভাগ ছিল যেমন – কাস্টমস হাউস, কালেক্টর অফ ক্যালকাটা, গভর্নমেন্ট এজেন্সি, পোস্ট অফিস প্রভৃতি। কিন্তু সেগুলিতেও মোট নিযুক্ত কর্মী সংখ্যার ৯০ শতাংশ বাঙালি হিন্দু। তাই তালিকাটিকে দীর্ঘ না করে এখানেই অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই তথ্য থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, সরকারি কর্মক্ষেত্রে বাঙালি হিন্দুর এই একাধিপত্য তাঁদেরকে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সাচ্ছন্দ্য দিতে পেরেছে মুসলমান সমাজ ছিল তা থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত এবং বিচ্ছিন্ন। অতঃপর মুসলমানদের এই পশ্চাৎপদতা তাঁদের মধ্যে অন্যভাবে ঘুরে দাঁড়াবার ইচ্ছাকে জাগ্রত করে তোলে। আর তা হল – ধর্মীয়ভাবে জাগরণ। অর্থাৎ নিঃস্ব রিক্ত জাতির হাতে যখন গর্ব করার মতো আর কিছু নেই, তখন ধর্মই হয়ে উঠলো তাঁদের একমাত্র অবলম্বন যাকে আশ্রয় করে অন্তত আপন স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখা যেতে পারে। অতঃপর ধর্মীয় পরিচিতিতে শান দেওয়া ও মুসলমানকে নতুনভাবে পরিচয় করানোর পর্ব শুরু হল। এই পর্বটিকে আমরা মুসলমানদের 'আত্ম' নির্মাণের পর্ব বলে আমরা চিহ্নিত করতে চাই। যেখানে বাঙালি জাতিসত্তার মধ্যে 'অন্তঃস্থ অপর' (Internal other) হিসেবে হিন্দু ও মুসলমান তাঁদের দূরত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি করতে শুরু করবে এবং আপনাপন ধর্মকে অবলম্বন করে সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নির্মাণের মধ্যে দিয়ে আত্মনির্মাণের পথ রচনা করবেন।

এখন আমরা বাঙালি মুসলমানের আত্ম নির্মাণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সোপান চিহ্নিত করে, সেগুলির মধ্যে দিয়ে তাঁদের আত্ম নির্মাণের ধারাটিকে বোঝবার চেষ্টা করবো।

২.৪.১ বাঙালি মুসলমানের ধর্ম ও তার আত্মতা

ধর্মকে অবলম্বন করেই উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান তাঁর পরিচিতি সত্তা নির্মাণের সাহস দেখিয়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাঙালি মুসলমান যখন চূড়ান্ত দুর্দশায় পতিত তখন কেবলমাত্র ধর্মই তাঁদের আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যার মধ্যে দিয়ে নিজেদের হৃত গৌরব পুনরদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। এই সময়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের (১৮১৭ – ১৮৯৮) আধুনিকতার আন্দোলন এবং তাঁর সামজিক ও ধর্মীয় চিন্তার প্রতিবাদী ধারা হিসেবে দেওবন্দ ভাবধারা মাথা তুলে দাঁড়ায়; যাঁরা পৃথকভাবে মুসলমানের স্বতন্ত্র সত্তাকে সামনে তুলে ধরতে প্রয়াসী ছিল।

এই সময় পর্বে মুসলমান সমাজে এই বিশ্বাস প্রগাঢ়ভাবে দানা বাঁধতে থাকে যে, ধর্মের আদর্শ ও আনুষ্ঠানিকতার দিক থেকে হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য আছে। হিন্দুগণ ঢাকঢোল বাজিয়ে পূজা করেন, মুসলমানদের ধর্মকর্মে বাদ্যযন্ত্র নিষিদ্ধ। হিন্দুর বলির পশু ও মুসলমানের কোরবানির পশু এক নয়। উভয়ের মধ্যে কিছু খাদ্যদ্রব্যেরও বাছবিচার আছে। যদিও তত্ত্বের গূঢ় রহস্যে প্রবেশ করলে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের ভেতরে কোনো তফাৎ নেই বলেই মনে করেন আধুনিক গবেষকরা। এ'প্রসঙ্গে ওয়াকিল আহমেদ প্রশ্ন তুলেছেন –

> হিন্দুগণ মৃন্ময় মূর্তির পশ্চাতে চিন্ময় পরমেশ্বরকে দেখেন – তত্ত্বের এই গুঢ় রহস্যে প্রবেশ করলে অবশ্য সে ভেদ থাকে না। ঈশ্বর আল্লাহ, মন্দির-মসজিদ, ব্রত-উপবাস, রোজা – নামাজ, পুজা-পার্বন, ইদ-পরব, বলি-কোরবানি ইত্যাদিতে তত্ত্বগত প্রভেদ কোথায়?[৪৮]

সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলেও প্রকৃতই তফাৎ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু ধর্মই যেখানে মানুষের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র হাতিয়ার হয়ে পড়ে তখন তাকে উপলক্ষ করেই রচিত হয় ব্যবধান। কাজে কাজেই সময়ে মুসলমানদের আত্মচিন্তায় গোঁড়া ধর্মসংস্কারান্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যাবে। মোহাম্মদ রেয়াজ-অল-দিন আহমদ মাশহাদি (১৮৫৯ -১৯১৮), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৪ – ১৯৫০), কিংবা ইসমাইল হোসেন সিরাজির (১৮৮০ – ১৮৩১) মতো বুদ্ধিজীবী লেখকের রচনায় রক্ষণশীল শরিয়তি ইসলামের প্রবর্তনের কথা ঘুরে ফিরে আসবে। যাকে বলা হয় 'ইসলামের আদি বিশুদ্ধতা' মুসলমানের জীবনে তাঁর প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশা করে মুসলমান সমাজ নিজেদের আত্ম রচনার কাজে মনোযোগ দিল ধূসর শূন্যের এই চূড়ান্ত মুহূর্তে। অতএব শুরু হল ধর্মীয় উপদেশ ও জ্ঞান দানের প্রচেষ্টা। ধর্মবলে মুসলমানকে বলীয়ান করে তুলতে জোরদার তাগিদ অনুভব করা গেলো। মহম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমেদ 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় লিখলেন -

> বঙ্গীয় মুসলমানগণ ইসলামের পবিত্র সীমা বেষ্টন পরিত্যাগ করিয়া অনেক দূরে চলিয়া যাওয়াতেই আজ তাহাদের ঈদৃশ্য শোচনীয় দুর্দশা। ... ফলত কোনো জাতির অধঃপতন যতদূর যাইতে পারে আমাদের তাহাই হইয়াছে। ... আমাদিগকে ধর্মবলে বলীয়ান হইয়া আমাদিগের হৃতসম্পত্তি পুনরায়নের চেষ্টা করিতে হইবে।[৪৯]

অতএব ধর্মবলে মুসলমানকে বলীয়ান করে তুলতে এবং সংগঠিত করে তুলতে শিয়া-সুন্নি বিভেদ দূর করার চেষ্টা শুরু হল। খ্রিষ্ট ধর্মের ধর্মান্তকরণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হল এবং

মুসলমানদের সামনে ইসলামের উন্নত আদর্শ প্রচার করা শুরু হল। সেকালে ব্রাহ্মধর্মের জনপ্রিয়তা ও বাড়বাড়ন্ত লক্ষ করে হিন্দুদের মতো মুসমানরাও শঙ্কিত হচ্ছিলেন। কিন্তু মুসলমানদের 'আত্মতা' নির্মাণের যুগে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই ছিল মূল লক্ষ্য। অতঃপর ইসলাম হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখানো হল যে, মুসলমান ধর্মই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। 'এসলামতত্ত্ব' (১২৯৫) এর ভূমিকায় লেখা হল –

> অপর এক সম্প্রদায় একেশ্বরবাদিতার ভাণ করিয়া ধর্মপ্রচারক ও তত্ত্ববাহকের (পয়গম্বরের) আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছে। এই সম্প্রদায়ের দু একটি মহাপুরুষ প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়া স্ব স্ব বিকৃত মস্তিষ্ক চিন্তাদৌর্বল্যের পরিচয় দিতে ত্রুটি করে নাই। কেবলমাত্র বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া অনেক লোক গোপনে ব্রাহ্ম মোট স্বীকার করিতেছে বাঙ্গালা ভাষায় এসলাম ধর্ম বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি বর্তমান থাকিলে তাহাদের এরূপ শোচনীয় পরিণাম হইত না। ... আমরা এই সকল বিপথগামী ও অন্ধবিশ্বাসী লোকদিগের চোখে আঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক দেখাইব যে, পৃথিবীতে এসলাম ধর্মই প্রকৃত ধর্ম।[৫০]

লক্ষ করবার বিষয় এখানে 'এসলামতত্ত্বের' লেখক স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে, বাংলা ভাষাতে মুসলমান ধর্মপ্রচারক উৎকৃষ্ট কোনো গ্রন্থ না থাকার দরুন ব্রাহ্মদের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছেন এবং অনেকেই অজান্তে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করে ফেলছেন। ফলে মুসলমান ধর্মে মানুষকে দীক্ষিত করে তুলতে এবং মুসলমানের প্রকৃত সংরক্ষনের জন্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা আবশ্যক; বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন জরুরী। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে উনিশ শতকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় যে, অসংখ্য মুসলমান আত্মনিয়োগ করবেন তাঁদের গোপন অভিসন্ধি কি তাহলে তাঁদের ধর্মকে গণপরিসরে পরিচিতিকরণ ঘটানো? তাহলে কি ইসলামি 'আত্ম' নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চাকে প্রাধান্য দেওয়ার তাগিদ অনুভব করা গেল এতদিনে? এরই পাশাপাশি লক্ষ করতে হবে প্রাবন্ধিকের উদ্দেশ্য 'এসলাম' ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন। অর্থাৎ উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমান যে তাঁর 'আত্ম' নির্মাণ করবেন সেক্ষেত্রে ধর্মই তাঁদের প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ মন্তব্য করেছেন –

> মুসলমানের এই ধর্ম আন্দোলনের একটা প্রত্যক্ষ ফল বাংলা চর্চা ও ধর্ম সাহিত্যের সৃষ্টি। ... অংশত হলেও পূর্বে এই ধর্মীয় সংস্কার বাংলা ভাষা চর্চার পক্ষে অন্তরায় ছিল। আলোচ্য যুগেও সমাজের এক শ্রেণির মানুষের আরবি ফারসি উর্দুর প্রতি মোহ ও আকর্ষণ ছিল। তাঁরা বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধর্ম শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। ... নতুন ধর্ম আন্দোলনকারীগণ এর গতিরোধ করার জন্য সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষাতেই ধরমপুস্তক রচনার প্রয়োজন বোধ করেন। কোরানের অনুবাদ, হাদিস, ফেকাহ ও

> অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ হয়েছে, আবার শিক্ষামূলক, আলোচনামূলক, বিতর্কমূলক পুস্তক পুস্তিকাও রচিত হয়েছে। ... ধর্মকথা, সাধু -সন্তজীবনী এবং ঐতিহাসিক বীরগাথা রচন করে তাঁরা মানুষের দৃষ্টিকে স্বধর্মের পথে ফিরিয়ে এনেছেন এবং নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন।[৫১]

অর্থাৎ ধর্মকে অবলম্বন করে এবং ধর্মাশ্রয়ী প্রচারমূলক সাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়ে বাঙালি মুসলমান যে তাঁর 'আত্ম' নির্মাণে এগিয়েছেন তা সন্দেহাতীত।

২.৪.২ বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য ও তার আত্মতা

আমরা শুরুতেই দেখিয়েছি সাহিত্যের মধ্যে আত্ম প্রক্ষেপ অনিবার্য এবং স্বাভাবিক ঘটনা। দেশে দেশে কালে কালে সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে দিয়ে আসলে সাহিতিক বা শিল্পীর আত্মভাবনাই প্রকাশিত হয়। মুসলমান সমাজেও সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে মুসলমানের আত্ম নির্মাণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়, তবে প্রথম দিকে পথটা অতটা সহজ ছিল না। কেননা এই বাংলার মুসলমানদের অধিকাংশই ছিলেন ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ও সহজ সরল। এমনকি ইসলামীয় আচরণবিধি সম্পর্কেও অনভিজ্ঞ। বাঙালি মুসলমানের এই অজ্ঞতা ও আপন ধর্ম সম্পর্কে শৈথিল্য সেকালের মুসলমান সমাজ সংগঠক ও লেখকদের পীড়িত করেছিল। তাই তাঁরা একেবারে গোঁড়া থেকেই মুসলমানের 'আত্মা' নির্মাণের কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে James Wise রচিত 'Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal' (1888) গ্রন্থ থেকে একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য আমাদের সামনে এনেছেন। যেখানে ড. ওয়াইজের লেখাটির তর্জমা করে অধ্যাপক দে লিখেছেন –

> বেশীরভাগ বাঙালি মুসলমান হল অজ্ঞ ও সরল কৃষক। সম্প্রতি তাঁদের মধ্যে হিন্দু আচরণ-বিধির প্রভাব মুক্ত হয়ে ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তাদের বলা হয় যদি খাঁটি মুসলমান হতে চাও তাহলে নির্দিষ্ট সময়ে আরবি ভাষার নামাজ পড়বে। যদিও আরবি তাদের বোধগম্য নয় এবং আরবি শব্দ উচ্চারণ করাও তাদের পক্ষে কষ্টকর। অনেক স্থানেই মুসলমান কৃষকদের পক্ষে আরবি ভাষায় সঠিক নামাজ পরিচালনা করবার জন্য যোগ্য ব্যক্তি সংগ্রহ করা কষ্টকর হয়। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দের কয়েকটা গ্রামের মুসলমানেরা বকর – ঈদ পালন করবার জন্য লখীয়া নদীর ধারে সমবেত হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে নামাজ পরিচালনা করতে পারে এমন কেউ ছিল না। তখন কুড়ি বছরের একজন ঢাকার যুবক নৌকাতে করে তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে সেখানে নামে এবং নামাজ পরিচালনা করে তাদের সাহায্য করে।[৫২]

ওয়াইজের এই বর্ণনা থেকেই উনিশ শতকের ঢাকা জেলার সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা কল্পনা করা যায়। লক্ষ করবার বিষয় তখনো তাঁরা আরবি ভাষায় নামাজ পড়তে পারতেন না এবং হিন্দুর আচরণবিধির প্রভাব মুক্ত হতে পারেন নি। আসলে এই বাংলার অধিক সংখ্যক মুসলমান এদেশের নিম্নবর্গীয় হিন্দু সমাজ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান,[৫৩] তাই তাদের রক্তে রক্তে শিরা ধমনীতে হিন্দুর সংস্কার ও হিন্দুর আচরণবিধি পূর্ব থেকেই বর্তমান। সেক্ষেত্রে তাঁদেরকে বিশুদ্ধ মুসলমানে পরিণত করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন অতীতের বিস্মরণ ও তারপর নতুন ভাবধারায় দীক্ষিতকরণ।

আমরা জানি মানুষের অস্তিত্ব কাঠামোর এক বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে তার প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। কোনো এককালে সে এক ধর্ম থেকে আর এক ধর্মের খাতায় নাম লেখালেও তার অস্তিত্বের সংজ্ঞাবাহী সেই ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য তাকে একটা স্বতন্ত্র মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক ধারায় চালিত করে। যে জন্য আমরা লক্ষ করবো নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান যাঁরা, তাঁরা অতি সহজে হিন্দুর ধর্মীয় আচার, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার তাঁদের চেতনা থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। ওয়াইজের বর্ণনায় আমরা যে অজ্ঞ, সরল মুসলমানদের লক্ষ করি তাঁরা এই ধর্মান্তরিত মুসলমানই হবেন - যাঁরা সঠিক তরিকা মেনে নামাজ পড়তে জানেন না, এবং আরবি জ্ঞান যাঁদের একেবারে নেই বলেই লেখক জানিয়েছেন। এই সংখ্যাটা সেকালে বাংলায় বিপুল। এবারে এই বিপুল সংখ্যক অজ্ঞ; আরবি জ্ঞানহীন এবং ইসলামি আদব কায়দা ও তরিকাবিহীন বাঙালি মুসলমানকে কব্জায় আনতে গেলে যে কোনো ধর্মকেই কতগুলি সাংগঠনিক প্রকৌশল গ্রহণ করতে হবে। আর এক্ষেত্রে প্রথমেই দরকার শিক্ষা – শিশুশিক্ষা। আর সেই শিক্ষা যদি গোঁড়া থেকেই চলে ইসলামি আদব কায়দায়, ইসলামি মতাদর্শে তাহলে সমাজ সংগঠক থেকে শুরু করে অভিভাবক সকলেই নিরাপদ বোধ করবেন। সুতরাং দরকার শিশুশিক্ষার উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক – প্রাইমার। এই প্রাইমারই মৃদু অথচ তীব্র আখরে পাঠকের মনে গেঁথে দিতে পারে সমাজ ও ধর্ম কাঠামোর সম্ভাব্য ছকটি। তাই সমাজ সংগঠনে প্রাইমার অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। উনিশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত যেটি আমরা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত করে থাকি। আমাদের আলোচনায় এই জায়গাটি আমরা যথাসময়ে বিশ্লেষণ করবো। এখন আর একবার ফিরে যাবো তৎকালীন মুসলমানের আত্মনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে এবং সেক্ষেত্রে সাহিত্যের ভূমিকা প্রসঙ্গে।

ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে ওয়াইজের গ্রন্থের পূর্বোক্ত তর্জমাটি বিশ্লেষণ করবার পর এই উপপত্তিতে এসেছেন যে, "শুধু ঢাকা জেলাতে নয়, সর্বত্রই গ্রাম বাংলায় সাধারণ মুসলমানদের এই অবস্থা ছিল।"[৫৪] অর্থাৎ সমগ্র বাংলার সাধারণ গতরখাটা মানুষ আরবি ভাষায় নামাজ পড়তে জানতেন না। তাই এই দুর্বলতা থেকে উদ্ধারের জন্যই মুসলমান লেখকেরা ইসলামি আদব কায়দা, শিক্ষা, ধর্ম ও আদর্শ সামজিক জীবনের পসার সাজিয়ে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করতে থাকেন। কেননা গ্রামীণ ও লোকায়ত মানুষকে ইসলামী মূল্যবোধে সংঘবদ্ধ করতে সাহিত্যই সেই সময়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হয়ে ওঠে। এ'প্রসঙ্গে 'নবনূর' পত্রিকার সূচনাতে সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী বলেছেন – "আমরা দেখিতেছি মুসলমানগণ সকল বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের জাতীয় জীবনের অবসাদই যেন একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ... পতিত মুসলমানকে উন্নত করিবার, উদ্ধার করিবার একমাত্র অবলম্বন সাহিত্য।"[৫৫]

আমাদের আলোচ্য ইসলামি প্রাইমারগুলি অবশ্যই এই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখেই রচিত হয়েছিল। তবে এখানেই শেষ নয়, মুসলমানের আত্মনির্মাণকে উপলক্ষ্য করে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেস থেকে রচিত হল মৌলবী মোহাম্মদ নইমুদ্দীন কর্তৃক সংকলন গ্রন্থ 'জোব্দাতল মসায়েল প্রথম খণ্ড'। এটি এই জাতীয় প্রথম গ্রন্থ এবং মুসলমানি ব্যবস্থার সারসংগ্রহ। গ্রন্থটি জমিদার হাফেজ মাহ্মুদালী খাঁর অনুমতি নিয়ে রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থ মুসলমান সমাজে এতোটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে লেখকের জীবিতকালে এই গ্রন্থের আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল শেখ আব্দুর রহিম রচিত 'হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি' (১৮৮৮), সেখ আবদোস সোবহান রচিত 'হিন্দু মোসলমান' (১৮৮৮) এবং নওসর আলি খাঁ ইউসফজী রচিত 'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯১)।

আবদোস সোবহান তাঁর 'হিন্দু মোসলমান' গ্রন্থটিতে মুসলমান জমিদারদের হিন্দু আমলারা কীভাবে মুসলমান জমিদারদের অদূরদর্শিতা ও বিলাসের সুযোগ নিয়ে নিজেরাই তাদের জমিজমার মালিক হয়ে বসেছে তার এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তাছাড়া সকল বিষয়ে কীভাবে মুসলমানদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হিন্দুরা কীভাবে শক্তি সঞ্চয় করেছে আলোচনা করে মুসলমানদের নিজেদের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান করেছেন। এরই পাশাপাশি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কথা বিশ্লেষণ করেছেন। কীভাবে শিক্ষিত হিন্দুদের দ্বারা সরকারি পদ

থেকে মুসলমানরা বঞ্চিত হয় এবং এই উদ্দেশ্য সাধনে কংগ্রেস সংগঠন ব্যবহৃত হয় তাও এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

নওসর আলি খাঁ ইউসফজী রচিত 'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯১) গ্রন্থটিতে লেখক নিরপেক্ষ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে তৎকালীন মুসলমানের সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দুরবস্থাকে তুলে ধরেছেন। এরই পাশাপাশি বাঙালি মুসলমানের উৎস ও বিবর্তনকে সামনে রেখে তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি নির্মাণ করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি বাঙালি বাঙালি মুসলমানের দুরবস্থা অতিক্রমণের জন্য করণীয় কিছু পথও বাতলে দিতে চেয়েছেন। আমাদের মনে হয়েছে উনিশ শতকে রচিত এই রকম গ্রন্থ বিরল, যেখানে প্রাবন্ধিক আত্মসমালোচনার মধ্যে দিয়ে আত্মউন্নয়নের উপায় খুঁজতে চেয়েছেন।

এই কালপর্বে মুসলমান বাঙালির সাহিত্যচর্চার ধারা হিসেবে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করতে হয়। আমরা জানি মুসলমান বাঙালিকে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইতে দুই ধরণের আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছিল –

১) খ্রিষ্টান মিশনারি বা তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখা

২) হিন্দু বাঙালির উপেক্ষা ও অবহেলার জবাব দেওয়া

কাজে কাজেই এই সময়ে রচিত মুসলমান বাঙালির সাহিত্যে লক্ষ করা গেল মুসলমানের অতীত গৌরবের পুনরায়ন। যেমন মহম্মদের জীবনী, নবীদের কাহিনি ইত্যাদির আদর্শে মুসলমান বাঙালি নিজদেরকে নির্মাণ করতে চাইলেন। ভিন ধর্মের আগ্রাসনের প্রতিউত্তর হিসেবে মুন্সী মেহেরুল্লা (১৮৬১ – ১৯০৭) লিখলেন 'খ্রিষ্ট ধর্মের অসাড়তা' (১৮৮৭), 'হিন্দু ধর্মের রহস্য বা দেবলীলা' (১৮৯৮) এর মতো পুস্তিকা।

বাংলা ভাষা গ্রহণ ও প্রতিগ্রহণের প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে মুসলমান লেখকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল, কিন্তু আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, এদেশের আমপাঠক ও শ্রোতার কাছে ধর্মের মাহাত্ম্য বা ইসলামের পূর্ব ঐতিহ্য পৌঁছে দিতে গেলে সাহিত্যই একমাত্র আশ্রয় এবং তা অবশ্যই মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য। তাই এই সময়ে মুসলমান বাঙালি তাঁর সাহিত্যের ভাষা নিয়েও নিজস্ব অবস্থানের কথা ব্যক্ত করেছে এবং সেখানে তাঁদের নিজেদের মতো করে বাংলা ভাষায় আরবি, উর্দু ফারসি

ব্যবহারের স্বাধীনতাও তাঁরা গ্রহণ করতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে 'নুর-অল-ইমান' পত্রিকার সম্পাদকের বক্তব্য – "বাঙ্গালা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলিয়া ঘৃণা না করিয়া আপনাদের অবস্থা ও সময়ের উপযোগী করিয়া লউন।"[৫৬] এই প্রস্তাবের সমর্থনে সেকালের মুসলমান বাঙালি আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে ভাষাকে নিজেদের সাহিত্যের উপযোগী করে তুলতে চাইলেন। তাই 'মাতৃভাষা ও বঙ্গ মুসলমান' প্রবন্ধে সৈয়দ এমদাদ আলী লিখলেন –

> এই বঙ্গভাষা রূপ নূতন দূর্গের মধ্যে আমরা নিরাপদে আমাদের নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান করিয়া লইতে পারি এবং তাহা করাই আমাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। নতুবা হিন্দু ভাব ও হিন্দু আদর্শ পূর্ণ সাহিত্য পাঠে মুসলমান ক্রমে ক্রমে নিজেদের বিশেষত্ব বর্জিত হইয়া এক অদ্ভুত মূর্তি পরিগ্রহ করিবে। [৫৭]

লক্ষ করবার বিষয় মুসলমান বাঙালি এখানে আপন জাতিসত্তা ও অস্তিত্বের ভিতকে পোক্ত করবার জন্য হিন্দুর ভাব ও হিন্দুর আদর্শকে সজ্ঞানে পরিত্যাগ করতে চাইছেন। আমরা জানি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই পরিসরে হিন্দু বাঙালি মুসলমানের কাছে 'অপর' তাই অপরের সঙ্গে দূরত্ব ও ব্যবচ্ছেদের মধ্যে দিয়েই 'আত্ম' তাঁর নিজস্বতা বজায় রাখতে প্রয়াসী। তবে ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা এবং 'আত্ম' নির্মাণের প্রচেষ্টা যে কী প্রকার তীব্র ও উদ্দেশ্যমুখিন রূপ পরিগ্রহ করবে তা লক্ষ করা যাবে 'ইসলাম প্রচারক' এর নিম্নোক্ত বক্তব্যটিতে। 'ইসলাম প্রচারক' এর সম্পাদক মহম্মদ রেয়াজুদ্দিন লিখছেন –

> যেদিন আমরা এই মাতৃভাষা বাঙ্গালায়, জাতীয় ভাষা আরবি, ফারসি, উর্দু প্রভৃতি হইতে জাতীয় বহুল শব্দ, জাতীয় ভাব, জাতীয় তেজ, জাতীয় ধর্মপ্রাণতা আনয়ন করিতে পারিব , সেইদিন এই মাতৃভাষা দ্বারা আমারা যথোচিত ফললাভ করিতে সক্ষম হইব। ... আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষার আলোচনা এদেশ হইতে উঠিয়া গেলে, আমরা জাতীয়ত্ব হারাইয়া সম্পূর্ণ হিন্দু হইয়া পড়িব, তাহা হইলে কালে বৌদ্ধদিগের ন্যায় আমাদিগের অস্তিত্ব হিন্দুদিগের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে।[৫৮]

উনিশ শতকে মুসলমান বাঙালির ধর্মীয় পরিচিতি সত্তাকে পোক্ত করা এবং ধর্মকে সংরক্ষণ করা উচ্চবর্গের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের লক্ষ্য। সেক্ষেত্রে মুসলমান বাঙালি তাঁদের 'বাঙালি' সত্তা পরিচিতি অপেক্ষা আরবি ফার্সি উর্দু ভাষার মধ্যে দিয়ে তাঁদের জাতীয় চরিত্র নির্মাণ করতে প্রয়াসী। তবে আরবি উর্দু কিংবা ফার্সিই মুসলমান বাঙালির ভাব প্রকাশের নির্বিকল্প মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হয়নি। একথা ঠিক সাহিত্য রচনার প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমান বাঙালি আরবি উর্দু ফার্সি প্রভৃতি ভাষার

মায়া ত্যাগ করতে চাননি, কারণ এই সমস্ত ভাষার মধ্যে দিয়ে বাঙালি মুসলমানের অনুকূল ভাব চিন্তনের যে স্পষ্ট প্রকাশ সম্ভব অন্য ভাষার ক্ষেত্রে তা ততখানি সম্ভব নয় বলেই তাঁদের বিশ্বাস। কিন্তু এ'জাতীয় ভাবনা দীর্ঘদিন তাঁদেরকে সীমায়িত করে রাখেনি। বরং ক্রমশ তাঁরা মাতৃভাষা বাংলাতেই আত্মপ্রকাশে সাবলীল হয়ে ওঠেন। সেক্ষেত্রে ভাষাগত দিক থেকে মুসলমান বাঙালি তাঁদের ঐক্য গড়ে তুলতে অগ্রসর হলেও মুসলমান বাঙালির যে কল্পিত স্বাধীন ভাবরাজ্য তাঁদের চেতনায় তখনো পর্যন্ত সক্রিয় ছিল, তা তাঁরা পরিত্যাগ করতে চাননি। এক্ষেত্রে তাঁরা স্পষ্টতই মনে করেছেন যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম ও সামাজিকতার নিরিখে যেমন একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বর্তমান তেমনই ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্রতা বজায় রাখা জরুরী। তাই মোহাম্মদ আবদুল হাকিম তাঁর 'বঙ্গ-সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা এবং জাতীয় সাহিত্যের আদর্শ' প্রবন্ধে লিখেছেন –

> আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্ম ও সামাজিকতার ন্যায় তাঁহাদের ভাষা ও সাহিত্যের একটা স্বতন্ত্রতার আবশ্যকতা অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই স্বতন্ত্রতা যতদূর সম্ভব ভাষার দিক দিয়া না হইয়া ভাবের দিক দিয়া হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ হিন্দু ও মোসলমান এই উভয় জাতির ধর্ম্ম -কর্ম্ম, রীতি-নীতি, ক্রিয়া-কলাপ, আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তায় এমন একটী নিজস্ব ভঙ্গি আছে, যাহার জন্য তাঁহাদের প্রত্যেকের ভাষার গতি একটু স্বতন্ত্র এবং ভিন্নমুখী হইবেই। ... আমাদের কথা এই যে ভাষা যাহাই হউক না কেন, প্রত্যেক জাতিরই ভাব প্রকাশের একটি স্বতন্ত্র ধারা আছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে মোসলমান সেই ধারাটি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। মোসলমান আরব হউক, ইংরেজ হউক কিংবা বাঙ্গালীই হউক, তাহার পোশাক পরিচ্ছদ দেখিয়া কিংবা তাঁহার নামটি শুনিয়াই যেমন বুঝা যাইবে যে তিনি হিন্দু বা অন্য ধর্মাবলম্বী নহেন – মোসলমান, সেইরূপ ভাষা ও সাহিত্যের বহিরাবরণ কিংবা উহার অন্তরের ভাবটি দেখিয়াই বুঝা যাইবে যে, এটি মোসলমানের ভাষা – অন্য ধর্মাবলম্বীর নহে। যে মোসলমান সাহিত্যিকের রচনায় এই জিনিসটি নাই, তাঁহার সাহিত্য সাধনাই বৃথা।[৫৯]

অবশ্য এখানেই শেষ নয়, এই সময়ের চিন্তাশীল মুসলমানরা মনে করলেন মুসলমানের 'আত্ম'কে প্রতিষ্ঠা করতে দরকার ধর্মীয় জাগরণ। তাই বারংবার জাতীয় আদর্শ প্রচারের কথা বলে তাঁরা আসলে ধর্মকেই জনপরিসরে আলোকিত করতে চাইছিলেন। আর ধর্মকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই সাহিত্যের ভূমিকাকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হচ্ছিল। তাই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কী হবে সাহিত্যের অবলম্বন? কোন ভাবকেই বা বিকশিত করে তুলবেন সাহিত্যিক সে ব্যাপারেও করা নির্দেশ বর্ষিত হয়েছে বঙ্গীয় লেখকদের প্রতি –

> উপন্যাসই হউক, গল্পেই হউক, অথবা কবিতায় হউক, যাহাতে মোসলমানের ধর্ম্মনীতি ও জাতীয় আদর্শ ক্ষুণ্ণ না হয়, তৎপ্রতি মোসলমান সাহিত্যিকদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাঁহার সমস্ত জীবন ও সাধনার মাঝখানে জাগাইয়া রাখিতে হইবে যে, আমি মোসলমান! আমার জীবন, আমার সাধনা, আমার কর্ম্ম সব ধর্ম্মময়। ধর্ম্মনীতি পরিহার করিয়া শুধু বিশ্বের সুখ সৌন্দর্য ও ভোগবিলাসের ভিখারী আমি নহি। এই ব্রত, এই সাধনা এবং লক্ষ্য লইয়া কাজ করিলেই মোসলমান সাহিত্যিকের সাধনা সিদ্ধ হইবে।[৬০]

অতএব নতুনভাবে আলোকপ্রাপ্ত মুসলমানকে নাটক নভেলের এঁদো গলিতে পড়ে থেকে কালক্ষয় করলে চলবে না। কোরান হাদিসের আদলে গড়ে তুলতে হবে নতুন সমাজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। উদ্ধার করতে হবে মুসলমানের অতীত ঐতিহ্যের ইতিহাস, ফেকা, অসুল ও আকায়েদ সংক্রান্ত পুস্তকের অনুবাদে করতে হবে। এমনকি গিরিশবাবু এবং পাদ্রীদের ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত ভ্রম প্রমাদপূর্ণ অনুবাদের উপর নির্ভর করে না থেকে নিজেদের নিজেদের দায়িত্বে শুদ্ধ অনুবাদ করতে হবে। এইভাবে ধর্ম সাহিত্যের সৌধের উপরেই উনিশ শতকের মুসলমান বাঙালি তাঁর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, তাঁর 'আত্ম' গড়ে তুলতে চাইলো।

এই কারণেই 'আত্ম' নির্মাণকামী মুসলমানের বাংলা সাহিত্যকে হয়ে উঠেছে অনেক বেশি সতর্ক, অনেক বেশি সাবধানী। প্রয়োজন মতো সেই সাহিত্য রচনা করেছে তার সীমা পরিসীমা, দরকারের বাইরে যা কিছু তা সাজ্ঞানে বর্জিত হয়েছে। কেননা এক্ষেত্রে সাহিত্যই মুসলমান বাঙালির সমাজ ও জাতীয় আদর্শ নির্মাণের উপায় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। তাঁদের বিশ্বাস উন্নত সাহিত্য যেমন 'উন্নতিশীল সভ্যজাতি' নির্মাণ করেছে তেমনই কদর্য সাহিত্যের কুৎসিত ভাব জগতকে রসাতলে নিয়ে গিয়েছে। তাই মুসলমানের আত্ম নির্মাণকালে যাত্রা, থিয়েটার, নাটক, নভেল, উপন্যাস, নবন্যাস, প্রহসন, গীতিকবিতা, প্রেমকবিতা, প্রেমকাহিনী এবং কদর্য্য সঙ্গীত পরিত্যাজ্য। নতুন পাঠককে এই সমস্ত গাঁজাখুরি গল্প আখ্যানের মধ্যে ডুব মারলে চলবে না, নায়ক নায়িকার উচ্ছৃঙ্খল প্রণয়ের পূতিগন্ধে পাঠক চিত্তকে কলুষিত করলে চলবে না। কিংবা 'চাঁদের হাঁসি' 'ফুলের রাশি', 'বিরহ অনল', 'মিলনের জল', 'প্রথম চুম্বন', 'প্রথম আলিঙ্গন' গোছের রোমান্টিক কাব্যকবিতায়ও মুক্তি নেই নতুন এই সাহিত্যের। কারণ এই সাহিত্যের 'লক্ষ্য নাই, উদ্দেশ্য নাই, অর্থ নাই, কেবল রসাল জাঁকাল শব্দের ঘটা'। অধঃপতিত জাতি কখনোই নাটক নভেল পড়ে বা বেশ্যা সঙ্গীত গেয়ে যাত্রা থিয়েটারে অভিনয় করে, বিলাস সাগরে ডুবে থেকে উন্নতি করতে পারে

না। অতঃপর মুসলমান বাঙালির উন্নতির জন্য দরকার সুরুচিকর উন্নত সাহিত্য আদর্শ। মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের বহু পূর্বেই সেই আদর্শের কথা বলেছিলেন সিরাজী। তাঁর মতে –

> জাতীয় উন্নতির জন্য তাহাঁদিগকে [মুসলমান লেখক] উচ্চ আদর্শে লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ সাবধানতা ও সতর্কতার সহিত রসনা ও লেখনী পরিচালনা করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তাহাদিগের উপরেই বিরাট বঙ্গীয় মুসলমান জাতির পুনরুভ্যুত্থান এবং সুখ সৌভাগ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।[৬১]

অতঃপর মুসলমান জাতির 'পুনরুভ্যুত্থান' ও উন্নয়নের জন্য যে সাহিত্য রচিত হবে তার মূল দ্রষ্টব্য হয়ে উঠবে – সাধুতা, সংযমশীলতা, পবিত্রতা, সরলতা এবং ধর্মভাবের জাগরণ। সেই সাহিত্য হয়ে উঠবে বারাঙ্গনা বর্জিত – শুদ্ধ সাহিত্য। তাই মুসলমান সাহিত্যিকদের প্রতি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সতর্ক ঘোষণা –

> বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যসেবকগণ! সাবধান এবং সতর্ক হও। অনুকরণ করিতে যাইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িও না। ইসলামের পবিত্রতা ও নীতির প্রাচীরের বাহিরে যাইয়া ভ্রমেও সাহিত্য সেবা করিও না। যদি বঙ্গ সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যে পরিণত করিতে চাও, যদি সাহিত্য শক্তি প্রভাবে জাতীয় জীবন-তরীকে গন্তব্যের দিকে পরিচালিত করিতে চাও - ... তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার কুচিন্তা কুকল্পনা ভীরুতা ও দীনতার হস্ত হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হও; - বদ্ধ পরিকর হও। ... জাতীয় ইতিহাস হইতে মহর্ষিগণ ও বীরেন্দ্রবর্গের প্রোজ্জ্বল জীবনচরিতাবলী সঙ্কলন কর। যে সমস্ত দোষে আমরা প্রকৃত মুসলমানের প্রভাব ও জীবন হইতে সহস্র যোজন দূরে পড়িয়া গিয়াছি, তৎসমুদয়ের মূলোৎপাটনে লেখনী ও রসনা পরিচালনা কর।[৬২]

মানব জীবনের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে, আদর্শ নির্মাণে, ইহজাগতিক সুখ কল্পনায় এবং সংহত জীবন গঠনে সাহিত্যের ভূমিকা অপরিসীম। যা কিছু অধরা, যা কিছু অদৃশ্য এমনকি যা বাস্তবাতীত তার রূপকল্পনার মধ্যে দিয়ে সাহিত্য আমাদের পৌঁছে দেয় অসীম প্রাপ্তির জগতে। আর তার মধ্যে দিয়ে প্রাপ্ত আনন্দই সাহিত্যের প্রধান অন্বিষ্ট। কিন্তু ইসলামী তাত্ত্বিক ও চিন্তকের কাছে সাহিত্যের মূল অন্বিষ্ট ভিন্নতর। ধর্ম ও নীতিশিক্ষা বর্জিত কেবলমাত্র আনন্দের লক্ষ্যে যে সাহিত্য রচিত হয় সেই সাহিত্য ইসলামের অনুমোদিত সাহিত্য নয়। সিরাজী যখন সচেতনভাবে 'সাহিত্য শক্তি প্রভাবে জাতীয় জীবন-তরীকে গন্তব্যের দিকে পরিচালিত' করবার কথা বলেন তখন আমাদের বুঝতে বাকি

থাকে না যে এই গন্তব্য আসলে মৃত্যু পরবর্তী বেহেশ্‌ত বা স্বর্গীয় সুখকেই ইঙ্গিত করছে। এ'প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আবদুল হাকিম স্পষ্টভাবে বলেছেন –

> মোসেলমানের জাতীয় সাহিত্যের আদর্শ ও লক্ষ্য ইহা হইতেও বহু পরিমাণে উন্নত, উদার ও বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। কারণ বিশ্বধর্ম্ম ইসলাম শুধু মানবের ইহলৌকিক উন্নতি কল্যাণ সাধন করিতেই জগতে আসে নাই, বরং সারা মানব জাতিকে মুক্তি ও কল্যাণের পথে লইয়া যাইতেই তাহার আগমন।[৬৩]

কী এই 'মুক্তি ও কল্যাণের পথ' ? তার উত্তরে আবদুল হাকিম বলবেন –

> মোসলেম জাতীয় সাহিত্য একদিকে যেমন উন্নতি ও কল্যাণের উৎস হইবে, অন্যদিকে তাহার স্বর্গের প্রেরণা ও মুক্তির ধারা সেই সাহিত্যের মধ্য দিয়াই বিশ্ব মানবের প্রাণের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাজাইয়া তুলিতে হইবে।[৬৪]

সোজা কথায় সাহিত্যকে ইহজাগতিক ভাবকল্পনায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। বিষয়ী বান্দাকে দুনিয়াদারির বদৌলত থেকে বাঁচাতে সাহিত্যকে হয়ে উঠতে হবে শিক্ষকের মতো কঠিন ও কঠোর। চঞ্চলচিত্ত চালিত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনপথ কণ্টকাকীর্ণ, সামূহিক ভুলে ভরা। এই ভুলই 'জীবন তরী'কে ভুল গন্তব্যে নিয়ে যেতে প্ররোচিত করে। ইসলামি চিন্তকরা তাই মনে করেছেন সাহিত্য হবে 'জীবন তরী'কে সঠিক গন্তব্যে পরিচালিত করবার কেন্দ্রীয় শক্তি বিশেষ। ইসলামি শাস্ত্রানুসারে সেই গন্তব্য হল 'বেহেশত'। তাই 'জাতীয় সাহিত্য কখনই উপযুক্ত স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইবে না', বর্জিত হবে আনন্দদায়ক উপকরণ এবং ইহজাগতিক প্রেরণাসমূহ; পরিবর্তে ইসলামি সাহিত্যের থরে থরে সজ্জিত হবে ধর্ম, নীতি, প্রাত্যহিক জীবনের নানাবিধ আদব কায়দাসমূহ।

২.৪.৩ বাঙালি মুসলমানের পত্রপত্রিকা ও তার আত্মতা

সাহিত্য প্রকাশের প্রধান ক্ষেত্রটি হল পত্রপত্রিকা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে নিজ নিজ সমাজ ও গোষ্ঠীর সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সংবাদপত্র তথা পত্রপত্রিকার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে পত্রপত্রিকাই হল আত্মপ্রকাশের সেই ক্ষেত্রবিশেষ যাকে অবলম্বন করে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জনজীবনের কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারিত ও প্রকাশিত হতে পারে। শুধুমাত্র তাইই নয়, জনশিক্ষা ও জনমত গঠনেও পত্রপত্রিকার গুরুত্ব ও দায়িত্ব অপরিসীম। কেননা গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জাতি দেশের শুধু মুখপত্র নয়,

অনেক সময় মেরুদণ্ড হিসেবেও কাজ করে পত্রপত্রিকা। তাই ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে সামন্তরাজাদের অসির লড়াই শেষ হলে বৌদ্ধিক সমাজে শুরু হয় মসির লড়াই।

আমরা লক্ষ করবো উনিশ শতকের প্রারম্ভে হিন্দু বৌদ্ধিক সমাজে শিক্ষা বিস্তারের প্রধান আয়ুধ হিসেবে পত্রপত্রিকার ব্যাপক প্রকাশ ও প্রচার শুরু হয়। পত্রপত্রিকার হাত ধরেই নব উদ্ভূত ধর্মীয়, সামজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা জনমানসে পৌঁছে দেবার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। লেখাবাহুল্য 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর', 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রভৃতি পত্রিপত্রিকার নাম থেকেই সহজে অনুমান করা যায় যে, এই সমস্ত পত্রপত্রিকা 'হিন্দু'র আত্মতা নির্মাণে কতোখানি সক্রিয় ছিল। শুধুমাত্র তাই নয়; হিন্দুর পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এমনকি প্রাত্যহিক জীবন কেমন হবে তার আদর্শ স্থাপন করে পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। যার মূল লক্ষ্য 'হিন্দু'র 'আত্ম' নির্মাণ এবং অখণ্ড জাতি চেতনা গড়ে তোলা।[৬৫] কিন্তু তুলনামূলকভাবে পত্রপত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রচেষ্টা অনেকখানি বিলম্বিত। ১৮১৮ থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত হিন্দুগণের সম্পাদনায় বহু মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকাটি হল, বরিশালের সৈয়দ আবদুল রহিম সম্পাদিত 'বালারঞ্জিক'। যেটি ১ বৈশাখ ১২৮০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও এর পূর্বে ফার্সি-বাংলা দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক এবং বাংলা-উর্দু-হিন্দি-ফার্সি-ইংরেজি পঞ্চভাষী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তবে বাংলা ভাষায় পত্রিকার প্রচেষ্টা এই প্রথম। অবশ্য এই দীর্ঘ কালবিলম্বের শূন্যতা পূরণের জন্যই বোধহয় পত্র পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে শতকের শেষ তিনটি দশকে ব্যাপক তাগিদ লক্ষ করা যায়। ওয়াকিল আহমেদ তাঁর 'উনিশ শতকে বাঙালির চিন্তা ও চেতনার ধারা' গ্রন্থে দেখিয়েছেন ১৮৭৩ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত এই ৩২ বছরে মুসলমান সম্পাদকের সম্পাদনায় মোট ৩২ টি পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতে দেখা যায়।[৬৬]

উনিশ শতকে প্রকাশিত এই সমস্ত পত্রপত্রিকার প্রধান লক্ষ্য ছিল –

ক. শিক্ষিত মুসলমান সমাজে স্বজাতির অতীত ঐতিহ্য স্মরণ ও তার নিরিখে ভবিষ্যতের মুসলমানের কাঠামো খাড়া করা

খ. বাংলার মুসলমানকে 'প্যান ইসলামইজমের' সঙ্গে যুক্ত করে বৈশ্বিক পরিচয় ঘটানো ও তার মধ্যে দিয়ে ইসলাম কেন্দ্রিক বিশ্বভাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা

গ. লোকায়ত সমাজে প্রচলিত আচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে শরিয়তের শুদ্ধ কাঠামোয় ধর্মীয় মূল্যবোধ নির্মাণ করা

ঘ. রাজনৈতিকভাবে মুসলমানদের সচেতন করে তোলা ও তাদের দাবি দাওয়ার প্রশ্নে জনমত গঠন করা

ঙ. হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনেও কিছু কিছু পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

অন্তত দুটি নমুনা গ্রহণ করলেই আমরা অনুমান করতে পারবো যে, মুসলমান সম্পাদিত পত্রপত্রিকাগুলি ইসলামি ভাবনা চিন্তা ও তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব চেতনায় কতোখানি তৎপর ছিল।

'সুধাকর' (১৮৮৯) পত্রিকার 'অনুষ্ঠানপত্র' লেখা হয় –

> সংবাদপত্র জাতীয় উন্নতির প্রাণস্বরূপ। ... আমরা বঙ্গীয় মুসলমান, অতএব আমাদের একখানা উপযুক্ত সংবাদপত্র নিতান্ত প্রয়োজন। ... ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রকৃতি সমস্তই থাকিবে। ... মোসলমান জাতির বিগত শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রম এবং বিদ্যাবুদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শনসূচক ইতিহাস সকলকে জ্বলন্তভাবে দেখানো যাইবে। এতদ্ভিন্ন এসলামধর্মের মাহাত্ম্য বিষয়ক এক একটি প্রবন্ধ প্রতি মাসে এই কাগজে বাহির হইবে। আমাদের যখন যে অভাব হইবে, তখনই তাহা সদাশয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের গোচরীভূত করিয়া তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করা যাইবে।[৬৭]

'সুধাকর' পত্রিকার উপরোক্ত ভাষ্য থেকে তৎকালীন মুসলমান সমাজে পত্রপত্রিকাগুলির দায়িত্ব সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা চলে যে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে মুসলমান সমাজকে পুনর্গঠিত করাবার দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছিল পত্রপত্রিকাগুলি। অর্থাৎ আত্মাভিমানী মুসলমান সমাজ তাঁর স্বরূপের সন্ধানে সক্রিয় তো বটেই, সমান্তরালভাবে তা সংরক্ষণের পথেও অগ্রগামী।

১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় রেয়াজুদ্দিন আহমদ সম্পাদিত 'ইসলাম ধর্মনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা' 'ইসলাম প্রচারক'। এই পত্রিকার লক্ষ্য ছিল ইসলাম ধর্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। তাই পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার সূচনায় সম্পাদক দশটি লক্ষ্যমাত্রার কথা বলেন। যেখানে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়, কোরান হাদিস ভিত্তিক ইসলামি আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা গৌরবময় অতীত কাহিনির মহিমা প্রচার দ্বারা সমাজের মানুষকে উদ্দীপিত করা। এই বিষয়টিকে আধুনিক গবেষক 'পুরোপুরি সংস্কার আন্দোলন' না বলে

'শুদ্ধি অভিযান' বলে ব্যখ্যা করেছেন। অর্থাৎ এই শুদ্ধি অভিযানের মধ্যে দিয়েই ইসলাম নতুনভাবে তাঁর 'আত্ম'কে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইছিল।

ইসলামি 'আত্ম' প্রতিষ্ঠার এই সন্ধিলগ্নে 'হাফেজ' নামক পত্রিকাটিও তার প্রথম সংখ্যার 'আভাস' -এ ঘোষণা করলো তার প্রকৃত উদ্দেশ্য –

> হে দয়াময়! আমাদের বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণকে বিদ্যার চর্চা ও বিদ্যোৎসাহী হইতে বঞ্চিত করিও না। কারণ বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণ ঘোর সমস্যার শয্যায় শায়িত হইয়া যেরূপ ভোগবিলাসে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাহাতে অচিরে তাহারা যে একেবারে ধ্বংস সাগরে নিমজ্জিত হইবেন, তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ... হাফেজ সেই ভোগবিলাস সুখাভিলাষী নিদ্রিত বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তাঁহাদের পূর্বপুরুষদিগের অতীত গৌরব ও ধর্মভক্তি কাহিনি এবং পবিত্র ধর্মের পবিত্র রীতি নীতি শুনাইয়া জাগরিত করিবার জন্য তোমারই আশ্রয় ও অনুগ্রহে আজ বঙ্গের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইল।[৬৮]

লক্ষ করবার বিষয় বিদ্যাচর্চার মধ্য দিয়ে বঙ্গীয় মুসলমান আপন স্বরূপ অনুসন্ধানে ব্রতী হতে চাইছে এবং পূর্বের সুখাভিলাষী জীবন যাপন থেকে মুক্ত হয়ে ধর্মীয়ভাবে শুদ্ধ, পরিশীলিত ও সংঘবদ্ধ হতে প্রত্যাশী। এক্ষেত্রে মুসলমান জাতিকে পরিমার্জিত ও সংস্কৃত করে তুলতে সাহিত্যের ভূমিকাকে স্বীকার করে নিল 'নবনূর' পত্রিকা। 'নবনূর' আত্মনির্মাণকামী মুসলমানের স্বপক্ষে ঘোষণা করলো –

> মুসলমানগণ সকল বিষয়ে পশ্চাদপদ হইয়া পড়িয়াছে... পতিত মুসলমানকে উন্নত করিবার উদ্ধার করিবার একমাত্র অবলম্বন সাহিত্য। সাহিত্য দ্বারাই জাতীয় জীবনের শক্তি উপচিত হয় এবং যদি কখনো মুসলমান জাতি নিজের পদে ভর করিয়া আবার দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হয়, তবে তাহা সাহিত্য-চর্চার শক্তি দ্বারাই হইবে।[৬৯]

'নবনূর' পত্রিকার উপরোক্ত ভাষ্যটিকে একটু তলিয়ে বিচার করলে আমরা লক্ষ করবো সমাজ সংগঠনে ও জাতির ভবিষ্য নির্মাণে এখানে ধর্মীয় কোনো পুঁথি যথা কোরান হাদিশ ইত্যাদি বাদ দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যের উপর ভর করা হচ্ছে। অবশ্য সেই সাহিত্যের শ্রেণিবিচার করলে সেখানে ধর্মীয় বয়ানেরই প্রাধান্য লক্ষিত হবে। কিন্তু এইখান থেকে আর প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম পুঁথি কিংবা শাস্ত্রগ্রন্থ নয়, বরং সাহিত্যকেই সমাজ সংগঠনের হাতিয়ার বলে মনে করা হচ্ছে। আর

এক্ষেত্রে সেই সাহিত্যের পরিবেশক বা উপস্থাপক হিসেবে পত্রপত্রিকাগুলিকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া শুরু হচ্ছে।

পত্রপত্রিকার এই বাড়বাড়ন্তের যুগে সেগুলি যে প্রকৃতই চরিত্রগত দিক থেকে ইসলামি 'আত্ম' নির্মাণের পরিপূরক হয়ে উঠছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে সেগুলির নামকরণের দিকে লক্ষ রাখলে। আদি পর্বের মুসলমান সম্পাদিত পত্রপত্রিকাগুলি ইসলামি আদর্শ ও ধর্মীয় মৌল বৈশিষ্ট্যসমূহকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসতে সচেষ্ট হলেও, আরবি ফার্সি শব্দের বহুল ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ইসলামিকরণ ও ইসলামের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত জ্ঞাপন কৌশলের কোনো উদ্যোগ আমরা লক্ষ করি না। তাই 'সংবাদ সভারাজেন্দ্র' কিংবা 'জগদ্দীপক ভাস্কর' এর মতো মুসলমান-সম্পাদিত পত্রিকার নামকরণে তৎসম শব্দ, সমাস বহুল শব্দ এবং পণ্ডিতি রীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। কিন্তু ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তীকাল থেকে যখন ওয়াহাবি আন্দোলনের ফল মানুষের মনের মধ্যে কমবেশি জায়গা নিতে শুরু করেছে তখন থেকেই পত্রপত্রিকার নামকরণে মুসলমানের স্বাতন্ত্রচিহ্ন আলাদাভাবে জ্ঞাপিত হতে শুরু করলো। একমাত্র মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত আজীজন নেহার' পত্রিকাটি বাদ দিলে আমরা যে সমস্ত পত্রিকার নাম পাই, সেগুলি হল – 'মহাম্মদী আখবার' (১৮৭৭ ও ১৮৭৮), 'আখবারে ইসলামীয়া' (১৮৭৮ ও ১৮৯৫), 'মুসলমান' (১৮৮৪), 'মুসলমান-বন্ধু' (১৮৮৫), 'ইসলাম' (১৮৮৫), 'ইসলাম প্রচারক' (১৮৮১ ও ১৮৯৯), 'হাফেজ' (১৮৯২), 'ইসলাম' (১৮৯৯ ও ১৯০০)।

এই সমস্ত পত্র পত্রিকার মধ্যে দিয়ে বাঙালি মুসলমানের তাঁর 'আত্ম' নির্মাণে যে পন্থা অনুসরণ করেছে সেখানে সে শুধুমাত্র বাংলার মুসলমানের কথা বলে ক্ষান্ত দেয়নি; বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাংলা ও ভারতের বাইরে যে বৃহত্তর ইসলামি ভূখণ্ড তার সঙ্গেই সে নিজেকে যুক্ত করে দেখতে চেয়েছে। ফলে বাংলার মুসলমান এই সময়পর্ব থেকেই আরব পারস্য তুরস্কের মুসলমানের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লেষিত করে ভাবতে শুরু করেছে। আমাদের মনে হয় এই সময়কালেই বাঙালি মুসলমানের মধ্যে যে 'আত্ম' নির্মিত হয়েছে তা খানিকটা 'হাইব্রিড সেল্‌ফ' বা 'দোআঁসলা আত্ম'।[৭০] কেননা তা ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে ভারতীয় ও বাঙালি কিন্তু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনায় আরব পারস্যের অনুসারী।

২.৪.৪ বাঙালি মুসলমানের সভাসমিতি ও তার আত্মতা

উনিশ শতকের গোঁড়ার দিকে হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মধ্যে আত্মবিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সোপান ছিল সভাসমিতি। রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ হওয়ার পূর্বে এই সভাসমিতির মাধ্যমেই ভারতীয়দের দাবি দাওয়া পৌঁছে দেওয়া হতো ব্রিটিশ সরকারের কাছে। কিন্তু ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে আমরা লক্ষ করবো উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলমান সমাজে কোনো সভা সমিতির অস্তিত্ব লক্ষ করা যাবে না। মুসলমান সমাজে প্রথম সংগঠন গড়ে ওঠে ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে। যেটির নাম 'আঞ্জমনে ইসলামী' বা 'মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন'।

স্যার উইলিয়ম জোন্‌স ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে প্রত্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এতে প্রথম দিকে ভারতীয়দের স্থান ছিল না। তাই ভারতীয়দের একত্রিত করতে রামমোহন রায়ের আত্মীয়সভা (১৮১৮), প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'গৌড়ীয় সমাজ' (১৮২৩), রাধাকান্ত দেবের 'ধর্মসভা' (১৮২৮) প্রভৃতির পাশাপাশি 'ব্রাহ্ম সমাজ' (১৮২৯), 'জ্ঞানসন্দীপন সভা' (১৮৩০), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৮) প্রভৃতি গড়ে ওঠে। কিন্তু এই সমস্ত সভায় মুসলমানদের প্রবেশ অবাধ ছিল না। এমনকি মুসলমানদের সামাজিক, ধর্মীয়, কিংবা সাংস্কৃতিক বিষয় আশয় নিয়েও কোনো চিন্তাভাবনা হতো না। কাজে কাজেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান সমাজে সভাসমিতির মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশের একটা তাগিদ লক্ষ করা যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ তাঁর 'উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা' গ্রন্থে লিখেছেন –

> উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে বাঙ্গাল্র মুসলমান সমাজের আত্মবিকাশের মাধ্যম হিসেবে মুসলমানের সমিতিগুলিও সমভাবে ক্রিয়া করেছে। শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, ক্রীড়া বিবিধ বিষয়কে অবলম্বন করে সমিতিগুলি গঠিত হয়েছে। তবে শিক্ষা-সমাজ-ধর্ম বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। আরবি ফার্সি উর্দুর মাধ্যমে ধর্ম শিক্ষা এবং ইংরাজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার আন্দোলনের কাজ সমিতিগুলি করেছে। অনৈসলামিক রীতিনীতি, ধর্মান্ধতা, নীতিহীনতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা দূর করে শরিয়ত ধর্মের আদর্শ প্রচার করে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন করেছে। ... ইংরাজি বিধর্মীর ভাষা, বাংলা হিন্দুদের ভাষা – এ ধরণের মনোভাব সমাজের এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে ছিল, অনেক সমিতি এরূপ মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেছে। অরথকরি বিদ্যা হিসেবে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কোনো কোনোটি সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে। ...। কোনো কোনোটি স্বতন্ত্র জাতিত্বের প্রশ্ন তুলে সমাজের স্বার্থ উদ্ধার ও অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছে।[৭১]

এভাবে দেখা যায় বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে মুসলিম পুনর্জাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে মুসলমানের এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মূল লক্ষ্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে মুসলমানের স্বাতন্ত্র রক্ষা ও তা লালন করা। সেকালের সভাসমিতিগুলির আলোচনায় প্রবেশ করলেও লক্ষ করা যায় যে, সদর কিংবা মফস্‌সল কোথাও হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনার প্রয়াস নেই। এমনকি 'হিন্দু মেলা'র কর্মসূচিতে যেমন মুসলমানের যোগদানের সুযোগ ছিল না, অনুরূপভাবে মুসলমানদের সভাসমিতিগুলিতেও অমুসলিম কোনো ব্যক্তির প্রবেশাধিকার চোখে পড়ে না। যদিও 'মহমেদান লেটারেরি সোসাইটি'তে হিন্দু ও খ্রিষ্টান ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। সমিতির নামগুলির সঙ্গে 'মুসলমান', 'ইসলাম' ইত্যাদি স্বাতন্ত্র্য সূচক শব্দ এমনভাবে অবস্থান করতো যে, এর দ্বারা সহজেই অনুমান করা যেত এই সমস্ত সংগঠনগুলি বস্তুতপক্ষে মুসলমানের 'আত্ম' নির্মাণেরই অন্যতম মঞ্চ বিশেষ। এ'প্রসঙ্গে অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ লিখেছেন –

> কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান স্বসমাজ ও স্বশ্রেণির স্বার্থে প্রকাশ্যভাবে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেছে। কী হিন্দু, কী মুসলমান উভয়ের পরিচালিত প্রায় প্রতিষ্ঠানের গতিধার ছিল একই – জাতিস্বার্থে প্রায় দ্বিমুখী।[৭২]

আর এ'কারণেই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তো দূরের কথা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও দুটি প্রধান সম্প্রদায় একত্রে মিলিত হতে পারেনি। উনিশ শতকের 'আত্ম'-সৃজনকামী এই বিচ্ছিন্নতাই পরবর্তী শতকেও সক্রিয় থেকেছে এবং মিলনের পথকে নানাভাবে অবরুদ্ধ করেছে।

বিলম্বিত যাত্রা হলেও উনিশ শতকের যে সমস্ত সভা সমিতির হাত ধরে মুসলমানের 'আত্ম' নির্মাণের পথটি প্রশস্ত হয়েছিল তার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন অর্ধ শতকের মধ্যে ইসলামি পুনর্জাগরণে প্রায় ৩১ টি সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৭৩] যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল – আঞ্জমন ইসলামী বা মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫৫), মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি (১৮৬৩), মাদ্রাসা লিটারেরি এন্ড ডেবেটিং ক্লাব (১৮৭৫), সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন (১৮৭৮), সমাজ সম্মিলনী সভা (১৮৮৩), ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী (১৮৮৩), নূর-অল ইমান সমাজ (১৮৮৪), এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা'

(১৮৮৯), আঞ্জমনে হেমায়েতে এসলাম (১৮৯১), কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন (১৮৯৩), মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব (১৮৯৪) ইত্যাদি।

২.৪.৫ বাঙালি মুসলমানের শিক্ষাচিন্তা ও তার আত্মতা

উনিশ শতকের আলোকপ্রাপ্ত বাঙালির শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা লক্ষ করবো তা মূলত এক প্রকারের 'এলিট ক্যাপচার'। অর্থাৎ সমাজের অভিজাত বা উচ্চবর্গের হাতে তালুবন্দি শিক্ষা। সমাজে 'সবার নীচে সবার পিছে সবহারা' মানুষেরা সেই শিক্ষার অংশীদারিত্ব অর্জন করতে পারেনি। অন্তত শিক্ষা গ্রহণ করবার মতো অর্থনৈতিক কাঠামো বা গণতান্ত্রিক স্বাধিকার তাঁরা তখনো আয়ত্ত করতে পারেননি। এই বিষয়টির আরো গভীরে প্রবেশ করলে আমরা লক্ষ করবো আধুনিক শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি তার প্রায় সবটা আবার অভিজাত মুসলমান সমাজ গ্রহণ করতে পারেননি। এ ব্যাপারে মুসলমানদের অনীহা যেমন ছিল তেমনই তুলনামূলক বিচারে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হিন্দুদের উপেক্ষাও একটা বড়ো কারণ ছিল। কারণ উনিশ শতকে হিন্দু সমাজের পুরোধারাই মূলত বাংলা গদ্যসাহিত্য ও বাংলার আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার বিষয়, ভাষা ও বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গভীর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। আবার বাঙালি বা ভারতীয় জাতীয়তারও বিকাশ ঘটেছিল হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে। ফলে জাতীয়তাবাদ আর হিন্দু জাগরণ প্রায় সমার্থক হয়ে ওঠে।[৭৪] হিন্দু জাগরণের ফলস্বরূপ বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অপরাপর দেশজ অখ্যাত (obscure) ধারাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা হয়। এ'ভাবে অখ্যাত ধারাগুলিকে পরিত্যাগে মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সময়ে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে একটা ব্যবধান তৈরি হয়। সমাজতাত্ত্বিক ও অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Nationalist thought And the Colonial World : A Derivative Discourse' গ্রন্থে দেখিয়েছেন – উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে এই হিন্দু ঐতিহ্যগর্ব কখনো কখনো মুসলমান বিদ্বেষের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতে থাকলো।[৭৫] 'ইতিহাসের উত্তরাধিকার' প্রবন্ধে তিনি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন –

> উনিশ শতকের শেষ দিকে ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নতুন বাংলা সাহিত্য এবং নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় ইতিহাসের এই ছকটির যে কী একচ্ছত্র প্রভাব ছিল তা আবিষ্কার করলে একটু চমকেই যেতে হয়। আধুনিক রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ইতিহাস রচনা চালু হওয়ার পর থেকে বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিক পর্যন্ত এর প্রায় কোনো ব্যতিক্রম নেই। জাতীয়তাবোধের ইতিহাসের এই দিকটা নিয়ে কিছুটা অস্বস্তি আছে

বলেই বোধহয় কথাটা ভুলে যাওয়ার একটা ঝোঁক আছে আমাদের মধ্যে। তাতে কিন্তু উগ্রহিন্দু প্রচারের সব চেয়ে জোরালো উপাদানটিকেই হিসেবের বাইরে রেখে দেওয়া হয়।[৭৬]

প্রকৃতপক্ষেই জাতীয়তাবাদের নাম করে প্রচলিত ইতিহাস সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে 'উগ্রহিন্দুর উপাদান'সমূহকেই যে সজ্ঞানে তালিম দেবার প্রচেষ্টা সেকালে শুরু হয়েছিল তা বাঙালি মুসলমানকে প্রবল অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছিল; বলা চলে তা খানিকটা বাংলাই মুসলমানকে তাঁদের অস্তিত্বের কিনারায় দাঁড় করিয়েছিল। ফলস্বরূপ সেই অস্বস্তি থেকে মুক্তির পথ হিসেবেই বাঙালি মুসলমান শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যে 'আত্ম' নির্মাণের পথে অগ্রসর হয়। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান মনে করেছেন, জাতীয়তা ও হিন্দু পুনর্জাগরণ সমার্থক হয়ে যাওয়ায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পৃথক জাতিতত্ত্ব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফল স্বরূপ 'আত্ম' নির্মাণের ক্ষেত্রে দ্বিমুখী ধারাটি সক্রিয় হতে থাকে।

মুসলমানদের জাতি হিসেবে শক্তিশালী করে তুলতে বাংলায় প্রথম এগিয়ে আসেন আবদুল লতিফ ও পরবর্তীকালে আমীর আলী। আবদুল লতিফের প্রচেষ্টায় মহসিন ফাণ্ডের টাকার সদ্ব্যবহার করবার জন্য রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতুন মাদ্রাসা স্থাপন করা হয় এবং তাঁরই সুপারিশে মুসলমান ছাত্রদের বেতন কমানো হয়। এমনকি মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়। এর ফলে সেখানে মুসলমান ছাত্ররা ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পায়। এরই পাশাপাশি সৈয়দ আমীর আলী বিভিন্ন লেখায় ও রিপোর্টে, আলোচনায় ও বক্তৃতায় মুসলমান সমাজের শিক্ষা উন্নতির কথা বলতে থাকেন।

তবে শিক্ষাচিন্তায় মুসলমানের 'আত্ম'বোধ সৃজনের জোরালো প্রয়াস লক্ষ করা যাবে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে। আবদুল লতিফ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ইংরাজি পাঠ্যপুস্তকের এবং সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী নিম্ন ও মধ্য বিদ্যালয়ের বাংলা পাঠ্যপুস্তকের আপত্তিকর অংশ পরিত্যাগ করার পরামর্শ দান করেছিলেন। তাঁদের মত ছিল স্বসমাজের অপমান, নিন্দা ও গ্লানি শেখবার জন্য তাঁরা তাঁদের সন্তানদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন না। কেননা আধুনিক শিক্ষায় ধর্মশিক্ষার জায়গা তো নেইই উপরন্তু সেখানে ইসলামের মূল্যবোধ বিরোধী চিন্তা ভাবনা ও বিষয়ের পাঠদান করা হয়।

মীর মশাররফ হোসেন ১৯০৮ সালে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনী'তে এ'প্রসঙ্গে লিখেছেন –

> আমরা দুই ভাই কুষ্টিয়া স্কুলে ভর্তি হইলাম, ইংরাজি আর বাঙ্গালা পড়িতে হয়। এতদিন পড়িলাম – আল্লাহ-রসুলের নাম কোনো স্থানে পাইলাম না। যিনি গুরু তাঁহার মুখেও না, বরং ইংরাজি কেতাব মধ্যে কয়েক জায়গায় শূকরের নাম পাইলাম। পাকসাফ পবিত্রতার নামগন্ধ পাইলাম না। আল্লহ্ রসুলের নাম কেতাবে নাই কিন্তু রাম শ্যাম হরি কালী দুর্গা, শূকর, কুকুর, শৃগালের নাম অনেক স্থানে পাইলাম।[৭৭]

'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় রেয়াজুদ্দীন আহমেদ লিখলেন –

> মুসলমান বালক ও যুবকের পক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী নিরাপদ নহে। এই শিক্ষার দোষে ইংরাজি শিক্ষিত মুসলমানদিগের মধ্যে অনেক গুরুতর দোষ প্রবেশ করিয়াছে। প্রধান দোষ ধর্মাচারবিহীনতা ও নীতিজ্ঞানপরিশূন্যতা। ধর্মবিশ্বাসেও অনেকের ত্রুটি আছে। অনেকের ধর্মমত নাস্তিকের কাছকাছি।[৭৮]

'ইসলাম প্রচারক' মনে করে এহেন অধর্মচারিতার মূলে আছে আদব কায়দাহীন শিক্ষা ব্যবস্থা, যা গোটা ইসলামি সমাজকে অধঃপাতে নিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকার 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র ১৮৮৬ – ৮৭ খ্রিষ্টাব্দের বার্ষিক অনুষ্ঠানপত্রে আধুনিক শিক্ষায় মুসলমানের আত্মবোধের অভাবকে সামনে রেখে লেখা হয় –

> শিক্ষিত মুসলমান যুবকের মধ্যে অনেকেই যিশুখ্রিস্টের প্রপিতামহের জীবনচরিত বলিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে মহম্মদীয় ধর্মশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি জিজ্ঞাসা কর, অমনি তাঁহার চক্ষুস্থির। ...আক্ষেপের বিষয় এই যে স্কুল সমূহে ধর্মশিক্ষার কোন প্রকার বন্দোবস্ত নাই। তাই মুসলমান অভিভাবকগণ বালকদিগের ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষার বিরোধী ও বাস্তবিক ধর্মশিক্ষার অভাবেই আধুনিক শিক্ষার দ্বারা আমাদের সমাজবন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া উঠিতেছে। উহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।[৭৯]

আবার পাঠশালা ও পাঠ্যপুস্তকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে 'নূর অল ইমান' পত্রিকায় লেখা হল –

> পাঠশালায় যে সকল পুস্তক পড়ান হয়, তাহাতে হিন্দুদিগের পৌরাণিক কাহিনি, রাম রাবণের যুদ্ধ, কুরু পাণ্ডবের লীলা পড়িতে হয়। তৎসঙ্গে হিন্দুদিগের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার মুখস্থ করিতে হয়। তাহা করিয়াও নিস্তার নাই। কোমলমতি বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকে মোসলমানের নিন্দা, এসলামি আচার ব্যবহারের কুৎসা এবং মোসলমান জাতিকে ম্লেচ্ছ যবন ইত্যাদি নামে ঘৃণা প্রদর্শন করা হইয়া থাকে।

> এই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পাঠশালায় শিক্ষার্থীগণের হৃদয়ে কীরূপ আত্মসম্মান ও জাতীয় প্রেম জন্মিতে পারে?[৮০]

'রায় নন্দিনী' (১৩২২) উপন্যাসের 'উপক্রমণিকা'য় ইসমাইল হোসেন সিরাজী লিখলেন –

> একই দেশের অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব থাকা সর্বদা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী ভ্রাতারা কাল্পনিক আর্যামীর গৌরব গানে বিভোর হইয়া... অসদ্ভাবের বীজ রোপণ করিতেছেন। দেশমাতৃকার কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহাদের সাবধানতার জন্য এবং মুসলমানদের আত্মবোধ জাগাইবার জন্যই, উপন্যাসের ঘোর বিরোধী আমি, কর্তব্যের নিদারুণ তাড়নায় 'রায় নন্দিনী' রচনা করিয়াছি।[৮১]

উপরোক্ত মন্তব্যগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা লক্ষ করবো প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমানের প্রান্তবাসী অবস্থানটি স্পষ্ট হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু লেখকগণ স্বদেশ চেতনা ও জাতীয়তাবোধের কথা বলতে গিয়ে স্বধর্মের কথা, স্বজাতির অতীত গৌরব কাহিনি, পুরাণ ও ইতিহাসকে এতটাই আশ্রয় করেছিলেন যে, সেখানে 'অপর' আরেকটি ধর্মের মানুষের কথা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত থাকছিল। যে দুএকটি জায়াগায় মুসলমানদের কথা বলা হচ্ছিল তা চূড়ান্ত নেতিবাচকতা ও অশ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত। এই অবস্থায় মুসলমানের 'আত্মবোধ' জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। যে জন্য সিরাজীর মতো লেখককেও উপন্যাস রচনার জন্য কলম ধরতে হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে লেখক তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, 'দেশমাতৃকার কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহাদের (বাঙালি হিন্দুদের) সাবধানতার জন্য এবং মুসলমানদের আত্মবোধ জাগাইবার জন্যই' তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন। অর্থাৎ একাধারে হিন্দু লেখককে সমঝে দিতে এবং বাঙালি মুসলমানকে নবতর চেতনায় শিক্ষিত করে তুলতে উনিশ শতকের অন্তিম লগ্নে রচিত হতে থাকলো নতুন নতুন সাহিত্য এবং শিক্ষামূলক বইপুস্তক। ইসলামি আত্ম কাঠামো গঠনে এই সমস্ত বই পুস্তকের উদ্দেশ্য ও অভিমুখ সম্পর্কে বলা হল –

> যাহাতে মুসলমানি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কথা, বীর বীরাঙ্গনার বিবরণ, সাধু দরবেশের আখ্যান, পয়গম্বরগণের উপাখ্যান, ধার্মিক-ধার্মিকাদের বৃত্তান্ত, নবাব বাদশাহদের জীবন, সতী রমণীগণের গুণ কাহিনি, ইসলাম ধর্মের সারতত্ত্ব, হাদিস দলিলের সারসংগ্রহ, নামাজ রজার উপকারিতা, মুসলমানি পর্বাদির কথা ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয় সরল বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়া বিদ্যালয়ের পাঠ্যভুক্ত হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করা মুসলমান মাত্রেরই উচিত।[৮২]

অতএব আমরা লক্ষ করছি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দুটি দশক থেকে বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকগণ সচেতনভাবে তাঁদের 'আত্ম' নির্মাণে সচেষ্ট হচ্ছেন এবং এক্ষেত্রে তাঁরা হিন্দু বাঙালি রচিত পূর্ববর্তী সাহিত্যকে পরিত্যাগ করে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত 'নিজস্ব সাহিত্য' সৃষ্টি করতে তৎপর হচ্ছেন। মনে রাখতে হবে নব সৃষ্ট সেই সাহিত্যে পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠিত ডিসকোর্সকে প্রশ্নের সামনে রেখে তার বিরুদ্ধ বয়ান নির্মাণই এঁদের প্রতিপাদ্য হয়ে উঠছে। সেক্ষেত্রে ধর্মই বাঙালি মুসলমান লেখকদের একমাত্র বর্ম হয়ে উঠছে। এখন প্রশ্ন হল এ যুগের সাহিত্য সমূহ ভাব, ভাষা, শব্দ ও সাহিত্যের বিতর্কে মুসলমানের আত্মজিজ্ঞাসা ও নবজাগরণের প্রেরণা আনলো বটে, কিন্তু তা কি সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি ও স্বাতন্ত্রচিন্তার বর্ণে একপেশে হয়ে থাকলো না? এই প্রশ্নের উত্তরে ওয়াকিল আহমদ যথার্থই বলেছেন যে, "এই পর্বে মুসলমান লেখকগণ বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করলেও বিষয় ও আঙ্গিক সম্পর্কে সংস্কারমুক্ত ছিলেন না বলে তাদের দ্বারা উন্নত সাহিত্য রচিত হয়নি।"[৮৩]

উনিশ শতকে উপ্ত বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যেকার সেই ভেদবুদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য চিন্তা কি আজো বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য ভাবনাকে আবৃত রাখেনি আচ্ছন্ন করেনি? এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাবে সাম্প্রতিককালে রচিত ইসলামি প্রাইমারসমূহের দিকে দৃষ্টি ফেরালে। যেখানে আমরা লক্ষ করবো প্রচলিত শিক্ষা কাঠামো ও সামাজিক আদর্শকে নাকচ করে ইসলামি প্রাইমারসমূহ সম্পূর্ণ মৌলিক ও স্বতন্ত্র একটি শিক্ষা ও সামাজিক আদর্শ স্থাপনে প্রয়াসী। অবশ্য এই প্রচেষ্টার একটি ঐতিহাসিক ধারাও আছে। অধ্যাপক-গবেষক আনিসুজ্জামান তাঁর 'স্বরূপের সন্ধানে' গ্রন্থে বাঙালি মুসলমানের সত্তা সন্ধানের যে প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করেছেন সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, সাহিত্যের হাত ধরে বাঙালি মুসলমান মোটামুটি তিনটি পৃথক ধারায় তাঁদের সত্তাকে নির্মাণ করেছেন।[৮৪] যথা –

ক. ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে

খ. ভাবাদর্শগত সমন্বয়ের ভিত্তিতে

গ. ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে

প্রথম ক্ষেত্রটিতে আমরা লক্ষ করেছি সম্পূর্ণভাবে ধর্মই প্রাধান্য পেয়েছে, যার সূত্রপাত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। সেখানে আমরা লক্ষ করলাম রাজনীতি, সভাসমিতি, সাহিত্য সৃষ্টি, পত্রপত্রিকা

প্রকাশ, এমনকি শিক্ষাচিন্তা যথা পাঠগ্রহণ ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্ভেজাল ইসলামি আদর্শই প্রধান অবলম্বন হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এই ধারাটির বিশ্বাস - যে সাহিত্যের স্রষ্টা মুসলমান নয়, যে সাহিত্যের বিষয়বস্তু মুসলমান নয় এবং যার স্পিরিট ও ভাষাও মুসলমানী নয়, তা কোনোভাবেই মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য সাহিত্য হতে পারে না, কেননা সেই সাহিত্যে মুসলমানদের যেমন কোনো দান নেই, তেমনই মুসলমানদের প্রতিও সেই সাহিত্যের কোনো দান নেই। সুতরাং সেই সাহিত্য পরিত্যাজ্য। সত্তা সন্ধানের জন্য বিকল্প সাহিত্যের সন্ধানই শ্রেয়, যার দরুন উনিশ শতকে এবং বিশ শতকে মুসলমানের 'আত্ম' নির্মাণ ও 'আত্মরক্ষার' লক্ষ্যে পৃথক সাহিত্য রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ধারাটি রচিত হয়েছে ভাবাদর্শগত সমন্বয়ের ভিত্তিতে। এই ধারাটির বিস্তার লক্ষ করা যাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পর। এই ধারাটিও ইসলামি মতাদর্শ রক্ষায় সচেষ্ট এবং আগ্রাসী। তবে ইসলামি আদর্শের স্পর্শ পেলে তাকে গ্রহণেও আগ্রহী। এই তত্ত্বের সবচেয়ে উৎসাহী সমর্থক ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা। যদিও বাংলা ভাষার পণ্ডিত এই তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তবু ষাটের দশকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের জন্য অবশ্যপাঠ্য বাংলা সাহিত্য সংকলনের ভূমিকায় গোলাম মোস্তফা এই মত প্রচারের সুযোগলাভ করেছিলেন। ইসলামি ভাবাদর্শের মাপকাঠিতে অতীত বা সাম্প্রতিক সাহিত্যকর্মের গ্রহণযোগ্যতা বিচারের একটি তত্ত্ব তিনি উপস্থিত করেন ১৯৫০ সালে। প্রথমত, মুসলমানের ধর্ম ও জীবনাশ্রয়ী কোনো উপাদান যদি কোনো সাহিত্যে থাকে তা গৃহীত হবে। দ্বিতীয়ত, হিন্দু লেখকের সাহিত্যে অহিন্দুর (তা খ্রিষ্টান কিংবা মুসলমান যা হোক) প্রাধান্য স্বীকৃত হলে তাকেও গ্রহণ করা হবে। তৃতীয়ত, হিন্দুর সাহিত্যে হিন্দুর বিরূপ ছবি থাকলে তাকেও বিশেষ কদর করা হবে। ভাবাদর্শগত এই সমন্বয়ের জায়গাটি পরীক্ষার প্রস্তাবেই সীমিত থাকে, কেননা তা রূপায়িত হওয়ার জন্য সেরকম জল হাওয়া পায়নি।

তৃতীয় ধারাটি ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের ধারা, যেখানে মাতৃভাষা ও বাঙালি জাতিসত্তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এঁদের মূল প্রস্তাব 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য।' এই ধারাটির অন্যতম প্রধান ধারক ছিলেন মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, আহম্মদ শরীফ, বদরুদ্দিন উমর প্রমুখ। আমাদের আলোচ্য

প্রাইমারগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় ধারাদুটিকেই টিকিয়ে রাখতে রচিত হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়।

এখন প্রশ্ন হল বিশ শতকের একেবারে প্রান্তে এবং একুশ শতকের প্রথম দুটি দশকের মধ্যে রচিত হয়েও আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলি কেন আবার সেই ধর্মীয় মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা ও সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র রক্ষায় ব্যপ্ত হল? তবে কি ধর্মীয় পরিচিতি (identity) ও ধর্মীয় অস্তিত্বরক্ষার প্রতিযোগিতা আবারও বড়ো হয়ে দেখা দিল? বিশ শতকের তিনের দশকে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনপ্রসূত যে ধর্মনিরপেক্ষ নির্ভেজাল বাঙালি সত্তাপরিচয় বাঙালি মুসলমানের অস্তিত্ব জ্ঞাপনের যথার্থ অভিজ্ঞান বলে পরিগৃহীত হচ্ছিল, কোন সন্ধিক্ষণে তা আবার উপেক্ষিত হতে চাইছে? বাঙালি মুসলমান তার 'আত্ম' নির্মাণে কেন আবার ধর্মেই আশ্রয় নিল? এই প্রশ্নের অনুসন্ধানে আমাদের হিন্দু বাঙালির প্রাইমার রচনা ও তার ধর্মীয় রাজনীতির ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণ জরুরী।

৩.০ প্রচলিত বাংলা প্রাইমারে হিন্দু 'আত্ম' ও মুসলমান 'অপরত্ব'র বিন্যাস

উনিশ শতক থেকে বাংলা প্রাইমার রচনার সূত্রপাত। সেই সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে বিপুল সংখ্যক প্রাইমার রচিত হয়েছে তার সিংহভাগের রচয়িতা হলো হিন্দু বাঙালি বিদ্বৎসমাজ। যেহেতু এই বাংলার বিদ্বৎসমাজ চিরকালই একপ্রকার অভিজাত শ্রেণির তালুবন্দী বা এলিট ক্যাপচার এবং সেই অভিজাতরা অধিকাংশ হিন্দু সমাজ অন্তর্গত তাই এই সমাজের তাগিদেই রচিত হয়েছে প্রাইমারসমূহ। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে বাংলা প্রাইমারের আদি যুগে খ্রিস্টীয় প্রেরণাও ছিল লক্ষ্য করবার মতো। ফলে সেই সময়কার প্রাইমারে খ্রিষ্টধর্মের মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরাপর জাতি অপেক্ষা খ্রিস্টানদের উচ্চ আদর্শের কথা ঘোষিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক প্রভুদের সুবিধা প্রাপ্ত ও শিক্ষা সংস্কৃতি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হিন্দু বিদ্বৎসমাজ যখন প্রাইমার রচনায় অগ্রসর হলো অনুরূপভাবে তাঁরাও তাদের রচিত প্রাইমারে আপন সমাজ ধর্ম ও সাংস্কৃতিক আদর্শকে মুখ্য করে তুললেন। এই ধারা উনিশ শতকে রচিত 'বর্ণপরিচয়' থেকে শুরু করে বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ' হয়ে 'কিশলয়' পর্যন্ত প্রবহমান। আমরা আমাদের আলোচনায় বিদ্যালয় শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার আলোকে বাংলা ভাষার ইসলামি প্রাইমার সম্পর্কে আলোচনা কালে ১৯৯০ থেকে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত সময়কালে রচিত ইসলামি প্রাইমারের সঙ্গে প্রচলিত প্রাইমারের তুলনামূলক বিশ্লেষণে প্রয়াসী। এক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের আলোচনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু

বাংলা ভাষায় রচিত ইসলামি প্রাইমারসমূহ, তাই আমরা ওই নির্দিষ্ট সময়কালে রচিত নির্বাচিত প্রাইমারগুলিকে ধ্রুবক ধরে নিয়ে তার সঙ্গে প্রচলিত বাংলা প্রাইমারগুলির তুল্যমূল্য বিচার করবো।

বর্তমান অধ্যায় প্রচলিত বাংলা প্রাইমার ও ইসলামি বাংলা প্রাইমারে আত্ম অপর সম্পর্কের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমে আমরা প্রচলিত প্রাইমারসমূহে হিন্দুর আত্ম নির্মাণ ও অন্যদিকে মুসলমানের অপরত্ব আরোপের ইতিহাস ও রাজনীতি আলোচনা করবো। এক্ষেত্রে আমরা প্রচলিত বাংলা প্রাইমার নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত কয়েকটি বাংলা প্রাইমারকে আমাদের আলোচনায় স্থান দিয়েছি। মনে রাখতে হবে যে এই প্রাইমারগুলি কেবলমাত্র হিন্দু সমাজে প্রচলিত নয় বরং এগুলির গ্রহণযোগ্যতার নিরিখে এগুলি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই পঠিত ও চর্চিত। তবে যেহেতু ইসলামিক প্রাইমারগুলির থেকে বিষয়বস্তু ও চরিত্রগত দিক থেকে এই প্রাইমারগুলি পৃথক এমনকি বিপরীত বর্গের তাই এগুলিকে আলাদা একটি ধারায় ভাগ করে এগুলির সঙ্গে ইসলামিক প্রাইমারির তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রচলিত বাংলা প্রাইমার হিসেবে আমরা যে সমস্ত প্রাইমারকে নির্বাচন করেছি সেগুলি হল –

১. শিশুশিক্ষা (প্রথম ভাগ, সংবৎ ১৯০৬)

২. শিশুশিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ, সংবৎ ১৯০৬)

৩. বর্ণপরিচয় (১৮৫৫)

২. হাসিখুশি (প্রথম ভাগ)

৩. হাসিখুশি (দ্বিতীয় ভাগ)

৪. সহজপাঠ (প্রথম ভাগ, ১৯৩১)

৫. সহজপাঠ (দ্বিতীয় ভাগ, ১৯৩১)

৬. কিশলয় (প্রথম ভাগ, নব পর্যায় সংশোধিত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৪)

৭. কিশলয় (দ্বিতীয় ভাগ, নব পর্যায় প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০০১) এবং (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১১)

৮. কিশলয় (তৃতীয় ভাগ নব পর্যায় তৃতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০৩)

৯. কিশলয় (চতুর্থ ভাগ, নব পর্যায় পুনঃ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৪)

১০. আমার বই প্রথম শ্রেণি

১১. আমার বই দ্বিতীয় শ্রেণি

১২. পাতাবাহার তৃতীয় শ্রেণি

১৩. পাতাবাহার চতুর্থ শ্রেণি

'বর্ণপরিচয়', 'হাসিখুশি' ও 'সহজপাঠ' এই তিনটি প্রাইমারের দুটি উনিশ শতক এবং অপরটি বিশ শতকে রচিত হলেও আমাদের আলোচনায় উক্ত প্রাইমার দুটিকে প্রচলিত বাংলা প্রাইমারির বর্গে রেখেছি কারণ প্রাইমার তিনটি আজও সমান জনপ্রিয়তায় বহুল প্রচারিত ও চর্চিত। বিশেষত এই প্রাইমার দুটির প্রভাব এতদূর বিস্তৃত যে এই দুটি প্রাইমারকে প্রতিপক্ষে (Counter) রেখে একাধিক ইসলামি প্রাইমারের সূচনা হয়েছে। তাই এই প্রাইমার দুটিকে আমরা আমাদের সারণিতে রাখতে বাধ্য হয়েছি এবং তার ভিত্তিতেই আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি।

৩.১ প্রচলিত প্রাইমার সমূহে বাঙালি হিন্দুর বয়ান

উনিশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালি হিন্দুর হাতে রচিত প্রাইমার সমূহে হিন্দুর জীবন ও সংস্কৃতির উপস্থিতি এবং আধিপত্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অন্যদিকে সংখ্যালঘু বাঙালি হিসেবে মুসলমানের উপস্থিতি নগন্য; বহুক্ষেত্রে তা নেই বললেই চলে। বাঙালি মুসলমানের এই বঞ্চনাবোধের জায়গা থেকেই এস. ওয়াজেদ আলি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় লিখলেন 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে তিনি হিন্দু মুসলমানের মিলনের পথ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাদের মধ্যেকার বিচ্ছিন্নতার জায়গাটিও তুলে ধরেন। এ'প্রসঙ্গে তিনি স্কুল পাঠ্য পুস্তকে হিন্দুর আধিপত্য ও তার বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। আমরা ইতিপূর্বেই সাহিত্য ও সমাজে সেই আধিপত্যকামীতার নানা নিদর্শন তুলে ধরেছি, এখন প্রসঙ্গত প্রচলিত প্রাইমারসমূহে হিন্দুর এই এক রইখিক বয়াঙ্কে চিহ্নিত করবো।

৩.১.২. শিশুশিক্ষা : হিন্দু – মুসলমান 'আত্ম'-'অপরত্ব'

মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচিত 'শিশুশিক্ষা' (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ) বাংলায় রচিত প্রাইমারগুলির মধ্যে একটি জনপ্রিয় প্রাইমার। 'শিশুশিক্ষা' বর্তমানে আর সেভাবে পাঠ্য না হলেও

এখনো পর্যন্ত সেই বইতে ব্যবহৃত ছড়া কবিতা বাঙালি পাঠকের কানে অনুরণন সৃষ্টি করে, সব থেকে বড়োকথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়'এর আদিরূপও খানিকটা এই ছিপছিপে প্রাইমারটি।

তিনভাগে রচিত এই প্রাইমারটির বিশেষত্ব হল এই যে, এটিই সচেতনভাবে প্রথম স্ত্রীশিক্ষার জন্য রচিত প্রাইমার। কিন্ত এই 'স্ত্রী' বলতে লেখক কতদূর ধর্ম বর্ণহীনভাবে স্ত্রীর আদর্শ নির্মাণ করতে চেয়েছেন তা বিচার্য বিষয়। কেননা এই প্রাইমারের প্রথম সংস্করণে যে সামা ও বামা নাম্নী স্ত্রীদের আদর্শ তুলে ধরা হয়েছিল তারা 'ঘোষালদের' মেয়ে - হিন্দু নারীর প্রতিনিধিত্ব করে। এমনকি এই প্রাইমারের ছত্রে ছত্রে হিন্দুর নিজস্ব সমাজ পরিবেশ ও তাদের সংস্কৃতির কথা জায়গা পেয়েছে।

প্রথম ভাগে বর্ণ ও বানানশিক্ষার ভেতর দিয়ে সচেতনভাবে মাধব যাদব রাম ও রমানাথদের উপস্থিতি বিশেষ একটি ধর্মীয় বর্গকেই চিহ্নিত করে। যেমন –

বেদ ছাড়ে / খেদ বাড়ে

মাধব আসিবে / যাদব হাসিবে

এখানে 'বেদ' ছাড়া অর্থাৎ বেদ পরিত্যাগ ও খেদ বা দুঃখ বৃদ্ধির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে শিশুপাঠকের মস্তিষ্কে কার্যত বেদ গ্রহণের বিকল্পকেই ইঙ্গিত করতে চাইছে।

১৫ সংখ্যক অনুচ্ছেদে লেখক প্রশ্ন উত্তরের ভঙ্গিতে বালকের পরিচয়দানের ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে ক্রমানুসারে লেখকের প্রশ্ন –

তুমি কি লোক?

তোমার নাম কি?

তোমার বাড়ী কোথায়?

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে বালকের জবাব –

আমি বামন

আমার নাম রমানাথ

বালকের এই পরিচিতিসত্তার মধ্যে দিয়ে হিন্দু বালক বিশেষত ব্রাহ্মণ বালকের ছবিটি লেখক স্পষ্ট করে তুলেছেন এখানে।

২২ নং অনুচ্ছেদে পাই –

> 'কান ঢাকিয়া রাখি এবং মাঝের কুঠুরীতে যাইয়া বসি। রাম! জল ছাড়িল আপদ গেল মেঘের ডাকে এখনি মরিয়া গিয়াছিলাম।'

লক্ষণীয় দুর্যোগমুক্তির পর শিশুকথকের ঈশ্বরস্মরণের জন্য 'রাম' নাম জপ। যা কার্যত হিন্দুবৃত্তকেই চিহ্নিত করে।

'শিশুশিক্ষা' প্রথম ভাগের কোথাও কোনোরূপ ইসলামি আদর্শ দূর অস্ত, মুসলমান বালক বালিকার নাম পর্যন্ত অমিল। বরং মুসলমান অপরত্বের নমুনা প্রদর্শিত আছে – নবম অনুচ্ছেদে। সেখানে শব্দে ও ছড়ায় বালকের কানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ধনবান হয়ে ওঠবার সেই মহামন্ত্র যা কিনা সম্পূর্ণভাবে ইসলামি আদর্শের পরিপন্থী –

খুদ খায় / সুদ চায়

লুন খাই / গুণ গাই

'নুন খাওয়া ও গুণ গাওয়া' র মধ্যে সর্বজনীন আদর্শের কথা থাকলেও 'সুদ চায়' কখনোয় ইসলামি আদর্শ বলে পরিগণিত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত 'লুন খাই / গুণ গাই' কার নুন? কার গুণ? এর মধ্যে দিয়ে কি ঔপনিবেশিক শাসকের তরফ থেকে সুবিধাপ্রাপ্তি ও তাকে সমর্থন দানের গোপন ইঙ্গিত রয়ে গেলো না ? নখদন্তহীন এক বশম্বদ শ্রেণি নির্মাণের স্বপ্ন থেকে গেল না? এই প্রশ্ন তুলেছেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আবার শিশশিক্ষা' গ্রন্থে।[৮৫]

'শিশুশিক্ষা'র দ্বিতীয়ভাগ রচিত হয়েছে সংজুক্ত ব্যঞ্জনশিক্ষা ও 'সর্ব্বসাধারণ শিক্ষার্থীকে উদাহৃত উপদেশবাক্য সমুদায়ের ভাবার্থ অবগত' করাবার জন্য। কিন্তু লক্ষ করবার বিষয় এই খণ্ডেও 'সর্ব্বসাধারণ' বলতে লেখক কেবলমাত্র হিন্দু শিশু পাঠককে উপলক্ষ্য করেই তার উপদেশাবলী বর্ষণ করেছেন।

নমুনা পাঠ –

ক. বিপ্রজাতি দান পায় (৩ নং অনুচ্ছেদ)

খ. ব্রত করে মুনি গণ (৩ নং অনুচ্ছেদ)

গ. রুক্মিণী অতি গুণবতী ছিলেন। (৫ নং অনুচ্ছেদ)

ঘ. ভীষ্মদেব মহাবীর ছিলেন (৫ নং অনুচ্ছেদ)

ঙ. ব্রহ্মোপাসনা করা সকলেরই উচিত (৬ নং অনুচ্ছেদ)

চ. শ্রীরামেরও জটা বল্কল ধারণ করিতে হইয়াছিল। (১১ নং অনুচ্ছেদ)

উপরোক্ত ছয়টি উপদেশ বিশ্লেষণ করলে নিশ্চয় আমরা বর্ণিত চরিত্রদের শ্রেণি ও ধর্মীয় পরিচয় আবিষ্কার করতে সক্ষম হবো এবং লক্ষ করবার বিষয় রুক্মিণী, ভীষ্মদেবদের আদর্শের কথা প্রচারের এক দুর্নিবার টানে লেখক একথাও প্রচার করে ফেলছেন যে, 'ব্রহ্মোপাসনা করা সকলেরই উচিত'। 'সকলের' শুধু নয়, 'সকলেরই'। এই আবশ্যকিতার বাইরে যেন কেউ নেই। এই সহজ অথচ একপেশে বয়ানের মধ্যে কোথাও কি হিন্দু 'আত্ম' প্রচার ও তার আধিপত্যকামী কণ্ঠ লুকিয়ে নেই? তাহলে কীভাবে এই উপদেশাবলি 'সর্বসাধারণের' জন্য প্রযুক্ত হলো?

এরপরে দ্বিতীয় ভাগে মাধবের পাঠশালা বিলম্বের আখ্যান, গোপালের বৃত্তান্ত ও মাধব-গোপালদের বোধ জাগৃতির কথা আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ভাগও সম্পূর্ণভাবে মুসলমান চরিত্র ভাব কিংবা আদর্শরহিত। কেবলমাত্র একটি জায়গায় 'আরব' দেশের কথা উল্লিখিত হয়েছে, যেখানে ঘোড়া পাওয়ার প্রসিদ্ধ স্থান হিসেবে আরবদেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে – 'আরব দেশে ভালো অশ্ব হয়' (৪ নং অনুচ্ছেদ)। অস্যার্থ, তবে কি আরব দেশ কেবলমাত্র অশ্বভূমি হিসেবেই খ্যাত? আর কোন মহিমা বা গুণরাজি আরবদের মধ্যে অনুপস্থিতি? এ'রকম একটি কূট প্রশ্ন তোলবার কারণ এই যে, তৃতীয় ভাগ ঋজুপাঠে মদনমোহন আরো একবার আরবদের প্রসঙ্গ আনবেন এবং সেখানেও আরবদের যাযাবর জীবনযাত্রা, তাদের উটের ব্যবহার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখক আরবীয়দের যে গুণ আবিষ্কার করেছেন তা নিম্নরূপ –

> জগদীশ্বর আরব দেশের জন্যই উটের সৃষ্টি করিয়াছেন। আরবীয়রা ইহার দুগ্ধ পান করে। ... ইহার মাংস খায় ও বিষ্টা জ্বালায়। স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার ও গৃহস্থালি দ্রব্য সকলি উটের পৃষ্ঠে লইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। পথিকদিগের সর্বস্ব লুটিয়া কেবল উটের গুণেই পরিত্রাণ পায়। অতএব উষ্ট্রই আরবদিগের পরম ধন।[৮৬]

উপরোক্ত পাঠবর্ণিত আরবদের যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় সেগুলি হল – আরবরা যাযাবর, অনুন্নত, লুঠতরাজবৃত্তি পরায়ণ এবং অকৃতজ্ঞ। তা নইলে উষ্ট্রই তাদের একমাত্র বাহন হবে কেন? যিনি লিখতে পারেন 'লেখাপড়া করে যেই / গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই' তিনি কি আরও একবার দেখিয়ে দিলেন যে, লেখাপড়ার অভাবে একটি জাতি কীভাবে যাযাবর ও লুঠতরাজ বৃত্তিতে মগ্ন থাকতে পারে?

যেখানে উনিশ শতকের মুসলমানের আদর্শ এবং ঘুরে দাঁড়াবার আশ্রয় আরব পারস্যের ইসলামি জীবন ও সংস্কৃতি সেখানে আরবদের এ'রকম নেতিবাচক চরিত্রায়ন নিশ্চয় সেকালের মুসলমান মননে বিরূপ প্রভাব ফেলবে এবং কোণঠাসা ও অপমানিত মুসলমান নিশ্চয় তাদের মতো করে আলাদা একটি বয়ান রচনা করতে এগিয়ে আসবে।

৩.১.৩. বর্ণপরিচয় : হিন্দু – মুসলমান 'আত্ম'-'অপরত্ব'

বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যক্তিজীবনে ঠিক কতোখানি ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন তা বহুল চর্চিত ও বিতর্কিত বিষয়। যে মানুষটি অতি সহজেই বেদান্ত দর্শনের অসারত্ব প্রমাণ করে ছাড়েন এবং 'ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা' নিয়ে সন্দিহান থাকেন তাঁর ধর্ম দর্শন আর পাঁচজনের থেকে নিশ্চয় স্বতন্ত্র। সেই বিদ্যাসাগর যখন প্রাইমার রচনার আসরে নামেন তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর রচিত প্রাইমারে ধর্মগন্ধ বালাই না থাকাই স্বাভাবিক। এই কারণে বর্তমান সময়ের অনেক গবেষক বিদ্যাসাগরের প্রাইমারকে 'প্রথম ধর্মপরিচয়হীন বাংলা প্রাইমার' বলে অভিহিত করেছেন।[৮৭] কেউ বা মনে করেছেন 'বিজ্ঞানসম্মতভাবে ধর্মীয় সংস্রবহীন' প্রাইমার।[৮৮] কিন্তু প্রশ্ন হল সেই 'ধর্মপরিচয়হীন' প্রাইমারটি কতোখানি ধর্মনিরপেক্ষ? একথা ঠিক যে, সেকালে প্রচলিত অন্যান্য প্রাইমারগুলিতে যেভাবে খ্রিষ্টীয় আদর্শকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছিল কিংবা হিন্দু বা ব্রাহ্মদের আদর্শকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল ঠিক তেমনভাবে কোনো ধর্মীয় বয়ান রচনা করতে আগ্রহী ছিল না এই প্রাইমারটি। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে পাঠ করলে কি এই প্রাইমারটির ভেতরেও এক প্রকার হিন্দু 'আত্ম'র জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না? আসুন সেদিকে একটু নজর ফেরানো যাক।

বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' প্রথমভাগের অনুপুঙ্খ পাঠে আমরা আদি থেকে অন্ত মোট ১৮ টি বালক চরিত্র পেয়েছি। যাঁদের মধ্যে দিয়ে লেখক বালকের আদর্শ নির্মাণের চেষ্টা যেমন করেছেন, তেমনই তাঁদের 'হয়ে ওঠা'র পথ প্রদর্শন করেছেন। এই অবসরে লেখক যে ১৮ টি চরিত্রের মধ্যে

দিয়ে তাঁর অন্বিষ্টকে অনুসন্ধান করেছেন সেখানে কোনো একটি চরিত্রের নাম, তার ব্যবহারিক, জীবন ও সমাজ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় না, যে তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ কোনো জীবনের পরিচয় বহন করে। বরং তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে 'হিন্দু' ধর্মেরই যোগ নিবিড়।

প্রথমে নামগুলিতে আসি – যদু, রাম, মধু, নবীন, ভুবন, মাধব, যাদব, কৈলাস, উমেশ, কেদার, তারক, ঈশান, সদয়, শশী, অভয়, উদয়, বেণী, গিরিশ ইত্যাদি। কোনো সমালোচকের মনে হতেই পারে যে, নামে কী এসে যায়? তাঁর দৃষ্টিতে এই নামগুলির মধ্যে ধর্মীয় পরিচিতিসত্তা খোঁজা অবান্তর। কিন্ত মনে রাখতে হবে যে, নাম যেকোনো মানুষের ক্ষেত্রেই একটি বাহ্যিক ধর্মীয় চিহ্ন।[৮৯] মুসলমানরা যেমন কোরানের আয়াত উদ্ধৃতি অনুসন্ধান করে নাম রাখেন তেমনই হিন্দুদের নামের ক্ষেত্রেও তাঁদের ধর্ম, পুরাণ ও শাস্ত্রীয় অনুষঙ্গ জড়িয়ে থাকে। উপরোক্ত নামগুলির উৎস বিচার করলে আমরা অবশ্যই হিন্দুর পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় অনুষঙ্গ আবিষ্কার করতে পারবো। সেক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাইমারে বর্ণিত চরিত্রমালাকে আমরা 'ধর্মপরিচয়হীন' বলি কোন যুক্তিতে?

লক্ষণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর 'বর্ণপরিচয়' – এর শুরুয়াত ঘটিয়েছেন বালকদের 'থাকা' 'না থাকা' 'ভালো – কালো'র বিন্যাস থেকে :

"আমার বই নাই / তোমার কলম নাই

যদুর কাগজ আছে / রামের কালী নাই

মধুর ভাল দুয়াত / নবীনের কাল কাপড়

ভুবনের ছাতা নাই।'[৯০] (প্রথম ভাগ, ৯ম অনুচ্ছেদ)

লক্ষ করুন এখানে একাদিক্রমে যে চরিত্রদের সমাবেশ ঘটেছে তাঁরা নিশ্চিতভাবেই একই সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি কাঠামোর অন্তর্গত। তাঁদের 'থাকা – না থাকা' তে গরমিল থাকতে পারে কিন্তু সকলেই একই সমাজের বাসিন্দা, এই ঐক্য তাঁদেরকে একত্রিত রেখেছে। লেখক যেন এখানে ভিন ধর্ম বা ভিন্ন জাতীয় কোনো চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে তাঁদের সামাজিক এবং ধর্মীয় স্থিতি বা শৃঙ্খলাকে টলাতে চাননি। তবে তাঁদের 'থাকা' ও 'না থাকা' এবং 'ভাল ও কাল'র দ্বিমুখী অবস্থা যে তিনি তাঁদের 'থাকা' ও 'ভাল'র জগতে পৌঁছে দিতে চান সেই অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়েছে তাঁদের

শিক্ষার আয়োজন দেখে। এক্ষেত্রেও সেই শিক্ষার আয়োজনেও তেমনভাবেই – ভিন ধর্মের কোনো শিশুর অনুপ্রবেশ ঘটেনি।

'বর্ণপরিচয়' এর দ্বিতীয় ভাগ রচিত হয়েছে 'বালকদিগের সংযুক্তবর্ণপরিচয়'এর উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে। তবে এই উদেশ্যে শিক্ষার্থীদের নিরসতা ও বিরক্তি দূর করবার জন্য এসেছে সহজ ও আনন্দদায়ক গদ্য পাঠ। যেখানে প্রথম পাঠে গোপালের মতো সচ্চরিত্র বালকের আদর্শ স্থাপন এবং দ্বিতীয় পাঠে গোপালের প্রতিপক্ষ হিসেবে 'সরকারদের ছেলে রাখালের' গল্প বিবৃত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠে গোপাল ও রাখালের পারিবারিক পরিচয় বাদ দিয়ে আর কোথাও ধর্মীয় পরিচিতির কোনো চিহ্ন নেই। তবে গোপালের মতো সুবোধ বালক যে, কেবলমাত্র ঘোষালদেরই বর্ণবৃত্তে সীমাবদ্ধ থেকেছে, গোপালের অনুরূপ আদর্শ যে ভিন্ন ধর্মের কোনো পরিসর থেকে অনাগত থেকে গেল – এই আক্ষেপও অস্বাভাবিক নয়। গবেষক পরমেশ আচার্য তাঁর 'শিক্ষাচিন্তায় সাম্প্রদায়িক বিভাজন' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষা ভাবনায় উনিশ শতকের বাঙালি বিদ্বৎসমাজ কতোখানি একদেশদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রত্যাশিত ছবি হিসেবে উভয় সম্প্রদায়ের বালক-বালিকার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ছবি কল্পনা করেছেন। যেটি পাওয়া যাবে আরো ৫৯ বছর পরে জলধর সেন রচিত প্রাইমার 'বাঙ্গালা দ্বিতীয় পাঠ' এ। সেখানে দেখা যাবে – "নরেন আব্দুল্লাহ দুইটি ছোটো বালক। তাহারা দুইজনেই প্রতিদিন এক পাঠশালায় যায়।"[৯১] কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রাইমারে এই ছবি অমিল, পরিবর্তে ঘোষালদের গোপাল, কিংবা সরকারদের রাখালারাই প্রধান শুধু নয়, নির্বিকল্প।

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পপাদনায় ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা। সেই 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় মুসলমানদের বিদ্যাশিক্ষা আগ্রহকে সমালোচনা করে লেখা হচ্ছে –

> আমরা বঙ্গদেশীয় মুসলমানদিগের ঐরূপ শৈলী দেখিতেছি, নিজ দোষকে গবর্ণমেন্টের দোষ করিয়া বর্ণনা করিতেছেন। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে তাহাদিগের নিজের অনুমাত্র আগ্রহ নাই। ... বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে মুসলমানদের অনুরাগ জন্মিবার একটি প্রধান প্রতিবন্ধক আছে... ইহারা অল্প বয়সে সুখাভিলাসী হইয়া পড়ে। সুতরাং অল্প বয়সেই ইহাদের অর্থোপার্জ্জন লালসা বলবতী হইয়া উঠে। ... সুতরাং উহাদিগের অবসর হয় না।[৯২]

এখানেই শেষ নয়। এরপর 'সোমপ্রকাশ' হিন্দুর বিদ্যাশিক্ষাতে বর্ণভেদ প্রথার গুরুত্বের কথা স্বীকার করে জানাবেন মুসলমানদের মধ্যে বর্ণভেদ প্রথার অনুপস্থিতি এবং জাত্যাভিমানের অভাবেই বিদ্যাশিক্ষায় তাঁরা এত পশ্চাদগামী –

> যদি মনু প্রভৃতি মাননীয় মহর্ষিগণ হিন্দুদিগের কার্য বিভাগের অনুসারে বর্ণ বিভাগ করিয়া না যাইতেন, বঙ্গবাসী হিন্দুদিগেরও বঙ্গবাসী মুসলমানদিগের ন্যায় শিক্ষা বিষয়ে অনুরাগ দৃষ্ট হইত সন্দেহ নাই। ... অত্রত হিন্দুগণ যে বিদ্যা বিষয়ে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ইহা প্রাচীন মহর্ষিগণের অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার ফল। জাতিভেদ এ অংশে মহোপকার সাধন করিতেছে। বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থই প্রধান। লেখাপড়াই ইহাদিইগের ব্যাবসায়। জাত্যাভিমান থাকিতে ইহারা অন্য কর্ম্মকে নীচ কর্ম্ম জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হন না। এই কারণেই বঙ্গবাসী হিন্দুগণ বিদ্যা বিষয়ে এত উন্নতি লাভ করিয়াছেন।[৯৩]

উপরোক্ত প্রতিবেদটিতে মুসলমানদের প্রতি যে অভিযোগগুলি করা হয়েছে তা অর্ধসত্য তো বটেই কোনো কোনো অভিযোগ অপ্রত্যাশিতভাবে অসত্য। আবার মুসলমানদের কাছে যে বর্ণভেদ ঘৃণার বস্তু 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদকের কাছে তাইই ছিল শিক্ষা বিস্তারের অনুকূল শর্ত। ভিন ধর্মের মানুষ ও সমাজের প্রতি তৎকালীন সমাজের প্রগতিশীলদের এই যে একরোখা ত্রুটিপূর্ণ মানসিকতা তা থেকেই জন্ম নিয়েছে এক সামাজিক দূরত্ব। আর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক এই দূরত্বই জন্ম দিয়েছে এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। যে কারণে মুসলমান সমাজ রেনেসাঁসের আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলেই আমাদের মনে হয়।

এখানেই শেষ নয়, বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' এর সমান্তরালে আমরা যদি তাঁর 'কথামালা'কে রেখে পাঠ করি তাহলে তাঁর রচনায় হিন্দু 'আত্ম' ও মুসলমান 'অপরত্ব' এর আর এক অদৃশ্য বিন্যাস পরখ করতে পারবো। যে বছরে তাঁর বৈপ্লবিক প্রাইমার 'বর্ণপরিচয়' প্রকাশ করেন তার পরের বছরেই ১৮৫৬ সালে ঐ বইয়ের সমান্তরালে প্রকাশ করেন 'কথামালা' নামক শিশুপাঠ্য পুস্তকটি। সেখানেও বর্ণপরিচয়ের অনুরূপ কোথাও তিনি মুসলমানের প্রতিনিধিস্থানীয় কোনো চরিত্র সৃজন করেননি। বরং যে বিধবার প্রতি তাঁর এত মমতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে সেই বিধবা মুসলমান হওয়ার দরুন তাঁর চরিত্রে তিনি নির্বুদ্ধি, লোভী ও অসততার পরাকাষ্টা প্রকাশ করেছেন। 'কথামালা'র গল্প 'বিধবা ও কুক্কুটী'টিতে তিনি লিখছেন –

> কোনো গ্রামে এক দরিদ্র মুসলমান বিধবা বাস করিত। সে কয়েকটি কুক্কুট কুক্কুটী পুষিয়াছিল। কুক্কুটীরা প্রত্যহ যে ডিম পাড়িত, সে ঐ ডিম লইয়া নিকটস্থ হাটে বিক্রয় করিত। ... সকল কুক্কুটী অপেক্ষা একটি কুক্কুটীকে ঐ দরিদ্র রমণী ভালবাসিত, কারণ ঐ কুক্কুটী প্রত্যহ প্রভাতে একটি করিয়া ডিম পাড়িত। বিধবা এইজন্য উহাকে অনান্য কুক্কুটী অপেক্ষা প্রত্যহ অধিক ধান খাইতে দিত। একদিন বিধবা ভাবিল যদি ঐ সামান্য ধান খাইয়া কুক্কুটী একটি করিয়া ডিম পাড়ে, তাহা হইলে যদি সে প্রত্যহ

> উহার আহারের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেয়, তাহা হইলে কুক্কুটী নিশ্চিতই প্রত্যহ দুইটি করিয়া ডিম পারিবে, আর তাহা হইলে সে সেই ডিম বিক্রয় করিয়া দ্বিগুণ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবে। ভবিষ্যতে অধিক অর্থ উপার্জন করিতে পারিবে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া, বিধবা সেইদিন হইতে সেই প্রিয় কুক্কুটীর আহারের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিল। প্রথম দুই তিন দিন কুক্কুটী পূর্ববৎ ডিম পাড়িল। কিন্তু তাঁহার পর অধিক আহারের ফলে ক্রমে যতই হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিল, ততই দুই একদিন অন্তর ডিম পাড়িতে লাগিল। শেষে কুক্কুটী এতই অধিক হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পড়িল যে, একেবারে ডিম পাড়া বন্ধ করিয়া দিল। তখন বিধবা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, হায়! আমি বুদ্ধি দোষে লোভ করিতে গিয়া সব হারাইলাম।[৯৪]

গল্পের প্রতিপাদ্য অবশ্যই মুসলমান বিধবার নির্বুদ্ধিতা, অনিষ্টকারী লোভ এবং হীনবৃত্তি। কিন্তু বিদ্যাসাগর নির্মিত এই বয়ানে কি সত্য সত্যই মুসলমান সমাজের সন্তুষ্টির কিছু ছিল? তিনি 'সেক্যুলার'; তাই ধর্মপরিচয়হীন চরিত্র চিত্রণ তাঁর সাহিত্যে সম্ভব হয়েছে, হয়তো সেইজন্যই মুসলমানদের জন্য আলাদা করে কোনো সৎ আদর্শ তিনি নির্মাণ করেননি, তাহলে এই বিরূপ চিত্রই বা কেন তাঁর হাতে রচিত হল? এইই কি প্রত্যাশিত ছিল মুসলমান সমাজের?

বিদ্যসাগরের 'বর্ণপরিচয়'এ একটিও মুসলমান চরিত্র নেই, নেই হিন্দুর বাইরে অপর কোনো সমাজ জীবনের কথা। অথচ তাঁর বইয়ের পাঠক শুধু হিন্দু সমাজের মানুষ নন, বৃহত্তর মুসলমান পাঠকও। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানরা তাঁর প্রকল্পিত ভাবনাবৃত্তে শুধু অনুপস্থিতই নয়, কঠোরভাবে অপাংক্তেয়, কোণঠাসা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে দেওয়ান মোহাম্মদ আবহাব চৌধুরী 'আল ইসলাহ' পত্রিকায় 'আমাদের মাতৃভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন -

> বিদ্যাসাগর মহাশয়ই আধুনিক হিন্দুয়ানী বাঙ্গালার বুনিয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি যে কেবল একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন এমন নয়, তিনি একজন দূরদর্শী রাজনৈতিকও ছিলেন। তিনি ছিলেন আধুনিক Hindu Renaissance' – এর জনক। তিনি বিধবা বিবাহের প্রচলন, মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপন ও হিন্দুয়ানী বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দু সমাজে এক নবযুগের সঞ্চার করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন (বর্তমান বিদ্যাসাগর) কলেজে যেমন মুসলিম ছাত্র প্রবেশ করিতে পারেন না, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা সাহিত্যে ইসলাম ও মুসলিম কালচারের কোন স্থান নাই।
>
> বর্তমান মুসলিম বিতাড়ন নীতির জন্য আমরা কেবল রায় বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র ও ডাঃ মুঞ্জের নিন্দা করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ভারতের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা সাহিত্য ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজে মুসলিম বিতাড়ন ও হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আদর্শ স্থাপন করেন। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের মাথায় টিকি, কপালে তিলক ও গাঁয়ে গঙ্গাজল ছিটাইয়া এমনভাবে "শুদ্ধ" করিয়া লইলেন যে, ইহাকে একেবারে হিন্দু বানাইয়া ফেলিলেন।[৯৫]

বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগ আমাদের আহত করলেও কথাগুলির সমস্তই অবান্তর ও ভিত্তিহীন নয়। বরং, একথা বলা চলে যে, সেই সময় বাংলার মুসলমান সমাজ বিদ্যাসাগরের অনুরূপ আর একজনকে চাইছিল; যার না থাকা মুসলমান সমাজের অভিমানকে আরো বেশি ঘনীভূত করেছে। অবশ্য এই না-থাকার যে ব্যবধান তা পূরণ করবার জন্যই বোধহয় বাঙালি মুসলমান সমাজেও একালে রচিত হয় 'ইসলামী বর্ণপরিচয়'। যে বিষয়ে আমারা যথাস্থানে আলোচনা করবো।

৩.১.৪. হাসিখুসি : হিন্দু – মুসলমান 'আত্ম'-'অপরত্ব'

যোগীন্দ্রনাথ সরকার রচিত 'হাসিখুসি'র দুটি ভাগ। 'হাসিখুসি' শুরুই হয়েছে ছড়া দিয়ে। অ্যালফাবেটিক পদ্ধতিতে প্রাইমারটিকে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। এই প্রাইমারটির আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করলে আমরা লক্ষ করবো এখানে উপস্থাপিত পাত্রপাত্রীরাও সকলেই ধর্ম ও বর্ণের পরিচয়ে হিন্দু।

নমুনা :

প্রথম ভাগে বর্ণ শিক্ষার অবসরে আমরা পাই –

ঋ – ঋষি মশাই ব'সে পূজায়

ঝ – ঝাড়ু হাতে এলো কানাই

ঔ – কার যোগে শব্দে পরিচয়ে 'গৌর মাঝি' এবং ঃ বিসর্গযোগে শব্দ পরিচয়ে 'দুঃখীরাম'[৯৬]

কেবলমাত্র এই দুটি জায়গায় হিন্দু নাম এবং তাদের ধর্ম ও কর্ম পালনের উল্লেখ পাচ্ছি। তাছাড়া প্রথম ভাগে যেসমস্ত শিশু বালক বালিকাদের পাচ্ছি তাঁরা কেউ খুকু, কেউ খোকা। কেউ মিনি, মণি এবং সবশেষে 'হারাধনের দশটি' ছেলে ছড়াটিতে হারাধনের ছেলে হারাবার আখ্যান।

'হাসিখুসি'র দ্বিতীয় ভাগে আমরা হিন্দু বালক বালিকার উল্লেখ যেমন পাচ্ছি তেমনই হিন্দু দেবদেবতার নাম ও তাঁদের মাহাত্ম্যের কোথাও পাচ্ছি।

নমুনা : ১

কৃষ্ণ তুমি এস কাল
অপরাহ্ন বেলা,
মাঠে গিয়ে করব সুখে
হাড়ু-ডুডু খেলা।

নমুনা : ২

সেজে-গুজে বিষ্ণু বাবু
আসিলেন ধীরে
উকিলের শামলা এক
শোভে তাঁর শিরে।[৯]

এরপরেই 'ন-ফলা যোগে' শব্দ শিখনের স্থানে আছে -

ফটকের নিম্ন দিয়া
সোজা যাও চলে
আহ্নিক করিয়া এসো
জাহ্নবীর জলে।[৯৮]

লক্ষ করবার বিষয় লেখকের কাছে অন্বিষ্ট পাঠক যে হিন্দু বাঙালি পাঠক তা তিনি যেন একশো ভাগ নিশ্চিত, তাই জাহ্নবীর জলে পূজা আহ্নিকের মতো আচারের কথাও তিনি বলতে ভোলেন না। এছাড়া কৃষ্ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি নামের সমান্তরালে আছে রুক্মিণীর কথাও –

খোপা ভরা পদ্মফুল
আসিছে রুক্মিণী
ছদ্মবেশ ধরি যেন
পরীদের রাণী।[৯৯]

এই প্রাইমারটিতে দুটি জায়গায় আমরা মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে দুটি চরিত্র পাচ্ছি উল্কি পরা কাজী ও করিম গাজী।

নমুনা : ১

ফাল্গুন মাসে পালকি চ'ড়ে
উল্কী পরা কাজি,
জাঁক-জমকে যাচ্ছে মেলায়
দেখতে ভেল্কিবাজী

নমুনা : ২

হারাধনের ছয়টি ছেলে
খেলছে সাঁতার বাজী
জলে-ডোবা ছেলেটিক
তুল্লে করিম গাজী।[১০০]

'হাসিখুসি' পূর্ববর্তী প্রাইমারগুলি অপেক্ষা কিছুটা হলেও স্বতন্ত্র। এখানে এসে আমরা হিন্দু 'আত্ম' প্রতিষ্ঠার বয়ান জমির পাশাপাশি মুসলমান 'অপর'এর একটু ভিন্ন পরিসর লক্ষ করছি। 'উল্কি পরা কাজি'র জাঁকজমক তাঁর ক্ষমতাচিহ্নিত শ্রেণি চরিত্রকে যেমন স্পষ্ট করেছে, তেমনই প্রতিবেশী হারাধনের ডুবন্ত ছেলেকে জল থেকে তুলে এনে করিম গাজী তার মানবিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিতে পেরেছে। ঠক চাচাদের বর্গ ভেঙে করিম গাজীদের নির্মাণ নিশ্চয় বাংলা সাহিত্যে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে।

৩.১.৫. সহজপাঠ : হিন্দু – মুসলমান 'আত্ম'-'অপরত্ব'

স্কুল পাঠ্যপুস্তকে মুসলমান জীবনের থাকা না-থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে খ্যাতনামা জমিদার শ্রীযুক্ত সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী মহাশয় ১৩০৬ বঙ্গাব্দে উর্দু ভাষায় যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করে বিচলিত হয়েছিলেন। বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে ১৩০৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন –

> বাঙ্গালা স্কুলে প্রচলিত পাঠ্য পুস্তকগুলি বিশেষ রূপে হিন্দু ছাত্রদের পাঠ্যপোযোগী করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে, অথচ বাঙ্গালার অনেক প্রদেশেই হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান প্রজাসংখ্যা অধিক... কিন্তু ক্রমশই মুসলমান ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ভালো বাঙ্গালা লিখিতে পারেন এমন মুসলমান লেখকের অভাব নাই অতএব মুসলমান ছাত্রদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাঠ্যপুস্তক রচনার সময় আসিয়াছে। স্বধর্ম্মের সদুপদেশ এবং স্বজাতীয়ের সাধু দৃষ্টান্ত মুসলমান বালকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমরা আরো বলি মুসলমান শাস্ত্র ও সাধুদৃষ্টান্তের সহিত শিক্ষায় অবশ্যবার্য্য অঙ্গ হওয়া উচিত।
>
> বাঙ্গালা দেশে হিন্দু মুসলমান যখন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, পরস্পরের সুখ দুঃখে নানান সূত্রে বিজড়িত, একের গৃহে অগ্নি লাগিলে অন্যকে যখন জল আনিতে ছুটাছুটি করিতে হয়, তখন শিশুকাল হইতে সকল বিষয়েই পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিচয় থাকা চাই। বাঙ্গালী হিন্দুর ছেলে যদি তাহার প্রতিবেশী মুসলমানের শাস্ত্র ও ইতিহাস এবং মুসলমানের ছেলে তাহার প্রতিবেশী হিন্দুর শাস্ত্র ও ইতিহাস অবিকৃতভাবে না জানে তবে সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষার দ্বারা কেহই আপন জীবনের কর্তব্য ভালো করিয়া পালন করিতে পারিবে না।
>
> অতএব সৈয়দ সাহেব বাঙ্গালী মুসলমান বালকের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে কথা বলিয়াছেন, আমরা বাঙ্গালী হিন্দু বালকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঠিক সেই কথাই বলি – অর্থাৎ বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে হিন্দুছেলের পাঠ্যপুস্তকে তাহার স্বদেশীয় নিকটতম প্রতিবেশী মুসলমানের কোনো কথা না থাকা অন্যায় এবং অসঙ্গত।[১০১]

যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুছেলের পাঠ্যপুস্তকেও তার নিকটতম প্রতিবেশী মুসলমানের কথা থাকার পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন সেই তিনিই যখন শিশুপাঠ্যপুস্তক রচনা করতে আসেন তখন আমাদের মনে হয়, এইবার বোধহয় যাবতীয় ফাঁকফোকর পূরণ করে পাঠ্যপুস্তকের ময়দান ভরাট হবে। কিন্তু বাস্তবে যা লক্ষ করা গেল তা মুসলমান সমাজের কাছে অপ্রত্যাশিতই মনে হল। কেননা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত শিশু পাঠ্য পুস্তক 'সহজপাঠ' আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করলে সেখানেও আমরা উল্লেখযোগ্য মুসলমান চরিত্রের উপস্থিতি অধরাই লক্ষ করবো। পরিবর্তে তিনিও স্বসমাজের ভাবনাবৃত্তেই মশগুল থাকলেন।

'সহজপাঠ' এর প্রথম ভাগের প্রথম অংশে বর্ণ শিক্ষার পর ছড়া সহযোগে বাক্য শিখন পর্যায়ে কার্যত যে সমস্ত চরিত্ররা উঠে আসে তারা প্রত্যেকেই হিন্দু সমাজের। যথা –

খুদিরাম / পাড়ে জাম।

মধু রায় / খেয়া বায়।

জয়লাল / ধরে হাল।

অবিনাশ / কাটে ঘাস।

হরিহর / বাঁধে ঘর।

পাতু পাল / আনে চাল।

দীননাথ / রাঁধে ভাত।

গুরুদাস / করে চাষ।[১০২]

উপরে আটটি ক্রিয়ার অনুষঙ্গে যে আটটি চরিত্র উঠে এসেছে তারা প্রত্যেকেই স্বসমাজের। রবীন্দ্রনাথও এই সমাজের মধ্যে কেন যে প্রতিবেশী কোনো ভিন ধর্মের মানুষকে রাখলেন না, তা বড়োই বিস্ময়ের!

এখানেই শেষ নয়। সেই হিন্দু সমাজের ধর্মাচরণের ছবি দিতেও ভোলেন না রবীন্দ্রনাথ। পরের পাঠেই মিলে যায় সেই বৃত্তান্ত –

> রাম বনে ফুল পাড়ে। ... জবা ফুল তোলে। বেল ফুল তোলে। ...। ফুল তুলে রাম বাড়ি চলে। তার বাড়ি আজ পূজা। পূজা হবে রাতে। তাই রাম ফুল আনে। তাই তার ঘরে খুব ঘটা। ঢাক বাজে, ঢোল বাজে। ঘরে ঘরে ধূপ ধুনা।

রামেদের এই মহোৎসবে সমারোহের অন্ত নেই। লেখক জানিয়েছেন তার আড়ম্বরের কথা।

> পথে কত লোক চলে। গোরু কত গাড়ি টানে। ... থালা ভরা কৈ মাছ, বাটা মাছ। সরা ভরা চিনি ছানা। গাড়ি গাড়ি আসে শাক, লাউ আলু কলা।[১০৩]

বুঝতে পারি এলাহি এই আয়োজনে এই আয়োজনে 'কতো লোক খাবে। কত লোক গান গাবে।' কিন্তু এই আয়োজনে নিকটতম প্রতিবেশী কেউ আছে কি? রবীন্দ্রনাথ তার কোনো উল্লেখ করেননি। 'কত লোক খাবে। কত লোক গান গাবে।' এই ভিড়ের মধ্যে নিকটতম প্রতিবেশীকে সনাক্ত করে ওঠা আমাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়ে।

তৃতীয় পাঠে ঢাকা থেকে আগত আশাদাদার বৃত্তান্ত। চতুর্থ পাঠে বিনিপিসি বামী রানীদিদি আর নীলু আর দীনুদের সুখী জীবন। সেখানে আমরা দেখি দীনুদের একটি পাখিও আছে, যে কিনা কথা বলে। কী সেই কথা? "ও বলে রাম রাম হরি হরি।"[১০৪]

চতুর্থ পাঠের শেষে সংযোজিত 'ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি' কবিতায় যে গ্রামখানির ছবি আমরা পাই সেও সর্বার্থে হিন্দু গ্রাম। তার বাসিন্দারা হলেন হরি মুদি থেকে শুরু করে বিধু গয়লানী ও কানাই বলাইদের গ্রাম। এখানেও ভিন জাতির সহাবস্থান পরিলক্ষিত হয়না।

পঞ্চম পাঠের যে বালক বালিকারা চড়ুইভাতি করতে যায়, তারা উমা ঊষা, গুপি, নটু। প্রতিবেশী ভিন ধর্মীয় কোনো বন্ধুবর্গ যেন এঁদের নেই। এঁরা যেন কঠোরভাবে একক ও বিচ্ছিন্ন। পঞ্চম পাঠের শেষে কবি সেই একক ও বিচ্ছিন্ন গ্রামটির পরিচয় দিয়ে বলেছেন সেইটি নাকি বামুনপাড়া –

> আমাদের ছোটোনদী চলে আঁকে বাঁকে,
>
> বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
>
> ... আর পারে আমবন তালবন চলে,
>
> গাঁয়ের বামুন পাড়া তারি ছায়াতলে।[১০৫]

বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় এই ছায়া সুনিবিড় স্বপ্নের গ্রামখানির বাসিন্দারা কেবলমাত্র হিন্দু নয়, এখানে বামুনদেরই প্রধান্য অধিক। তাই তার চারিধারে কোথাও অপর ধর্ম বর্ণের মানুষদের দেখা মেলা ভার হয়ে ওঠে। সহজপাঠের ষষ্ঠ পাঠে বালকদের ফুটবল খেলার আয়োজন। সেখানে উপস্থিত থাকে শচী সেন, মণি সেন, বশী সেন, মধু শেঠ, খেতু শেঠ প্রভৃতি একই বলয়ের ছেলেরা। পূর্ব পাঠের চরুইভাতিতে যেমন ভিন ধর্মের কেউ জায়গা পায়নি, অনুরূপভাবে

শচী সেনদের সঙ্গে ফুটবল খেলায়ও প্রতিবেশী বালকদের কোনো অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। বরং এই পাঠের শেষে কবি আরো একবার এই ছেলেদের নিজস্ব বলয়কে চিহ্নিত করে দিয়েছেন শরতের শেষে পূজার ছুটির আনন্দের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। যে আনন্দেরও অংশীদার একমাত্র তাঁরাই –

যে দিকে তাকাই সোনার আলোয়

দেখি যে ছুটির ছবি –

পূজার ফুলের বনে ওঠে ঐ

পূজার দিনের রবি।[১০৬]

ক্রীড়া, চড়ুইভাতি, পাঠ, পূজা উৎসব এই তিন চার রকমের আনন্দ আয়োজন ও সমারোহের বোধ নিয়েই অতঃপর সহজপাঠের প্রথম ভাগ শেষ হয়। যে পাঠের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কোথাও একটিও মুসলমান চরিত্র তো নেইই, নেই প্রতিবেশীকে চেনাজানার কোনো স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ পরিসর।

সহজপাঠের দ্বিতীয় ভাগের প্রথম পাঠ শুরু হয়েছে ং প্রযুক্ত শব্দের সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করাবার উদ্দেশ্যে। তাই রং, ঢং, সংসার, পাংশু প্রভৃতি শব্দ ঘুরেফিরে এসেছে। সেই অবসরে এসেছে কংস-বধের অভিনয়ের কথা।

"কংস-বধের অভিনয় হবে। ... কংস-বধ অভিনয় তাকে দেখাবে"

লক্ষণীয় হিন্দু পৌরাণিক আখ্যানবৃত্তের ঘোরাফেরা। এরপর আমরা দ্বিতীয় পাঠে পাই - আদ্যনাথ বাবুর কন্যার বিবাহ উৎসবের ছবি, যেখানে চরিত্রমালায় ভিড় করে এসেছে – আদ্যনাথবাবু, কন্যা শ্যামা, বর অহল্যাপাড়ার বৈদ্যনাথ, ভাই সৌম্য, ধৌম্যনাথ, রম্যনাথ, নিত্যশরণ, ভৃত্য সত্য ইত্যাদিদের কথা। প্রসঙ্গত এই পাঠে আদ্যনাথের দান ধ্যান পুণ্য কাজে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতঃপর এই পাঠের অন্তে সংযোজিত 'হাট' কবিতায় কবি পদ্মাপারের বক্সিগঞ্জে যে গ্রামীণ হাটের চিত্র এঁকেছেন সেখানে গাড়োয়ান বংশীবদন থেকে শুরু করে তার ভাগ্নে মদন হয়ে অন্ধ কানাই অনেকের কথাই পৃথক করে উল্লেখ করেছেন কিন্তু সেখানেও এমন কোনো চরিত্রের দেখা মেলে না, যাকে অন্তত অহিন্দু বলে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

তৃতীয় পাঠে মঙ্গলবার পাড়ার জঙ্গল সাফ করবার দিন রঙ্গলালবাবু, বঙ্গবাবু, সিঙ্গি, অনঙ্গদাদাদের সামাজিক উদ্যোগ লক্ষ করি। এরই পাশে ভিঙ্গি মেথরের উপস্থিতি এই পাঠ-কে

এক আলাদা সামাজিক সাম্যে পোঁছে দিয়েছে। সেইসঙ্গে পঙ্গপালের আক্রমণে অক্ষয়বাবুর চাষাবাদের ক্ষতি পূরণ করতে ঈশানবাবুর সাহায্যের ইঙ্গিতে তার মহানুভবতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় রঙ্গলালবাবুদের সামাজিক কর্মোদ্যোগে হিন্দুবৃত্তের বাইরে আমরা আর কাউকে লক্ষ করি না। রবীন্দ্রনাথ কল্পিত শিশুপাঠ্যের এই গ্রাম এবং পাড়া কঠোরভাবেই যেন অহিন্দু বর্জিত।

তবে হ্যাঁ, এই সব কিছু বাদ দিয়ে পঞ্চম পাঠে পৌঁছে আমরা 'সহজপাঠ' এ প্রথম কোনো অহিন্দু চরিত্র পাবো, যিনি ধর্ম পরিচয়ে একজন মুসলমান। নাম তার তুর্কি মিঞা। পেশা পরিচয়ে আর্দালি। যিনি বর্ষণমুখর দিনে নামহীন কোনো এক কর্তাবাবুর সঙ্গে চলেছেন। যার প্রসঙ্গে কবি একটি লাইন ব্যয় করেছেন –

> "বর্ষা নেমেছে। গর্মি আর নেই। ... কর্তাবাবু বর্ষাতি পরে চলেছেন। সঙ্গে তাঁর আর্দালি তুর্কি মিঞা।"

তুর্কি মিঞাকে বাদ দিয়ে 'সহজপাঠ' এর আর একটিবার একটি মুসলমান চরিত্রকে আমরা দেখি তিনি হলেন – তমিজ মিঞা। কবি সপ্তম পাঠে 'আমি যে রোজ সকাল হ'লে' কবিতায় এই দ্বিতীয় মুসলমান চরিত্রটির কথা বলেছেন। পেশাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে যিনি একজন গাড়োয়ান। কবিতার ভাষায় –

> আমি যে রোজ সকাল হ'লে
>
> যাই শহরের দিকে চ'লে
>
> তমিজ মিঞার গোরুর গাড়ি চ'ড়ে...[১০৭]

উপরোক্ত দুই মিঞা – তুর্কি এবং তমিজ বাদে গোটা সহজপাঠ বইতে আর কোথাও কোনো মুসলমান চরিত্র নেই। নেই মুসলমানের জীবন ও সংস্কৃতির সামান্যতম কোনো পরিচয়। অথবা প্রতিবেশী হিন্দুর সমান্তরালে হাঁটবার সুযোগ ও অধিকার। যে দু'টি চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে পেশাগত পরিচয়ে তাঁদের একজন আর্দালি অর্থাৎ পেয়াদা বা বেহারা, অপরজন একজন গাড়োয়ান; যে গাড়োয়ানের গোরুর গাড়ি চ'ড়ে কথক রোজ শহরে যান রাজমিস্ত্রির কাজ করতে। লক্ষণীয় বিষয় এরপরে এই বইতে এরপর আরো নানা ছোটো ছোটো আখ্যান রচিত হবে যার থরে থরে সাজানো আছে শক্তিনাথের সাহস, কাত্যায়নী দেবীর দয়া ধর্ম, দানশীলতা মহানুভবতা,

বিশ্বম্ভরবাবুদের অরণ্য অভিযানসহ আরো রোমাঞ্চকর নানা কাহিনি। লক্ষ করেছি আদ্যনাথবাবুর সততা, পুণ্যকর্মের নমুনা, রঙ্গলালবাবু - বঙ্গবাবুদের পরিবেশ ও সমাজ সচেতনতা। কিন্তু তমিজ মিঞা এবং আর্দালি তুর্কি মিঞা এঁরা যেন এঁদের পাশে খুবই নিস্প্রভ। নজরে পরবার মতো তাঁদের কোনো সামাজিক কৃত্যালী নেই। ঘোষিত হতে পারে এমন কোনো গুণাদর্শও যেন তাঁদের মধ্যে অনুপস্থিত। পাশাপাশি তাঁদের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা বৌদ্ধিক কোনো কর্মকাণ্ডেরও পরিসর রচিত হয়নি এখানে। আদ্যনাথবাবুদের ভিড়ে এঁরা যেন নিতান্তই কোণঠাসা, প্রান্তিক; তাই ভিড় ঠেলে এঁদেরকে আলাদা করে চেনা এবং মনে রাখা সত্যই দুষ্কর।

১৩০৭ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ নিচের কথাগুলি বলছিলেন –

> বাঙ্গালা দেশে হিন্দু মুসলমান যখন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, পরস্পরের সুখ দুঃখে নানান সূত্রে বিজড়িত, একের গৃহে অগ্নি লাগিলে অন্যকে যখন জল আনিতে ছুটাছুটি করিতে হয়, তখন শিশুকাল হইতে সকল বিষয়েই পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিচয় থাকা চাই। বাঙ্গালী হিন্দুর ছেলে যদি তাহার প্রতিবেশী মুসলমানের শাস্ত্র ও ইতিহাস এবং মুসলমানের ছেলে তাহার প্রতিবেশী হিন্দুর শাস্ত্র ও ইতিহাস অবিকৃতভাবে না জানে তবে সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষার দ্বারা কেহই আপন জীবনের কর্তব্য ভালো করিয়া পালন করিতে পারিবে না।
>
> ... বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে হিন্দুছেলের পাঠ্যপুস্তকে তাহার স্বদেশীয় নিকটতম প্রতিবেশী মুসলমানের কোনো কথা না থাকা অন্যায় এবং অসঙ্গত।[১০৮]

১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয় 'সহজপাঠ' প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ বইদুটি। উপরের কথাগুলির সঙ্গে মাত্র তিরিশ বছরের ব্যবধান। সহজপাঠ – এ 'নিকটতম প্রতিবেশী মুসলমানের কোনো কথা' ছিল না, এমনটি নয়। কিন্তু যে'টুকু ছিল তা কি প্রতিবেশীকে জানা ও বোঝার পক্ষে যথেষ্ট?

৩.১.৬. নিজে পড়ো : হিন্দু – মুসলমান 'আত্ম'-'অপরত্ব'

সুখলতা রাও রচিত 'নিজে পড়ো' বাংলা প্রাইমারের জগতে এক অভাবনীয় সৃষ্টি। এই বইতে প্রথম বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে বর্ণের গড়নের সাদৃশ্যে বর্ণ চেনাবার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এই প্রাইমারটি প্রসঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক পবিত্র সরকার বলেছেন –

> এটি একটি বিজ্ঞানসম্মত প্রাইমার এবং এর পদ্ধতি ও প্রকরণ, বিষয় সংগ্রহ ও বিন্যাস – সবই বাস্তববোধ ও বিজ্ঞান-সম্মত। পশুপাখি, খেলাধুলা, ফলমূল, উৎসব, জাহাজ-উড়োজাহাজ, শিশুর চেনা

আকর্ষণের জগত, আর শিশুর উৎসুক কল্পনার জগৎ, গ্রাম ও শহরে সমান অংশে বিন্যস্ত সমাজের ছবি – সবই খুব মমতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সাজানো হয়েছে এই বইতে।[১০৯]

উপরোক্ত মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করলে প্রকৃতই আমরা এই প্রাইমারটির বিষয়বস্তুর জগৎ সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করে নিতে পারি। কিন্তু 'গ্রাম ও শহরে সমান অংশে বিন্যস্ত সমাজের ছবি' রচনায় লেখিকা কতদূর ঐক্য বজায় রাখতে পেরেছেন সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এই বইতে ধর্ম বর্ণ ও জাতি চেতনার নিগড়ে পৃথক কোনো সমাজ রচিত হয়নি ঠিকই; কিন্তু তা সত্ত্বেও এই প্রাইমারটির পাত্রপাত্রীদেরকেও নাম পরিচয়ে পৃথকভাবেই চেনা যায়। যেমন –

১.

ঋষিপদ ঊষাদিদির ভাই।

ঋষিপদ ঋজুপাঠ পড়ো।[১১০]

২.

ভূতনাথ আন পাত।

রূপনাথ খাও ভাত।

চূড়ামণি খায় ননী।

পূরবীর চলা ধীর। [১১১]

আবার 'পেটুক রামু' ছড়াটিতে দেখি -

পেটুক রামু পেটুক ভারি, দিন রাতই ভাবে

পোলাও লুচি পায়েস কত, কত মিঠাই খাবে।[১১২]

আলোচ্য ছড়াটির উদ্দিষ্ট পাত্রপাত্রীদের প্রত্যেকের নাম পরিচয় হিন্দুর চিহ্ন বহন করে। এই প্রাইমারটি বিষয় বিন্যাস ও ভাবনাচিন্তায় প্রকৃতই গ্রাম-শহরের নির্ভেজাল ছবি উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এটিও কোনোরকম প্রতিবেশী বালক বালিকার নাম পরিচয় বা সংস্রবহীন থেকে গেছে।

৩.১.৭. কিশলয় : হিন্দু – মুসলমান 'আত্ম'-'অপরত্ব'

কিশলয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় মার্চ ১৯৮১ সালে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রকাশিত এই প্রাইমারটি এককভাবে কোনো লেখকের রচনা নয়। এই প্রাইমারটি প্রকৃতই 'পদ্ধতি ও উপকরণের দিক থেকে খুবই পরিণত চিন্তার ফসল।'[১১৩] প্রাইমারটিতে যেমন 'whole-word method' গ্রহণ করে বর্ণ পরিচয় সাধনের পরিকল্পনা করা হয়েছে, তেমনই বিষয় বিন্যাসের ক্ষেত্রেও সামগ্রিকতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই প্রাইমারটিতেই প্রথম লক্ষ করি হিন্দু-মুসলমান-আদিবাসী সমাজের এক সামগ্রিক জীবনচিত্র। কোন একটি বিশেষ ধর্মের মানুষের জীবন ও সংস্কৃতিকে অধিকতর গুরুত্ব না দিয়ে এখানে আপাতভাবে সকল ধর্ম ও বর্ণের পাঠকের কথা মাথায় রেখে বিষয় বিন্যাসে সমতা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই এখানে আমরা হিন্দু – মুসলমানের 'আত্ম' – 'অপরত্বের' নির্মাণের কাঠামো পরিত্যাগ করে পারস্পরিকতার ভিত্তিতে একটা ধর্মনিরপেক্ষ সুস্থ মানব সমাজের পরিকল্পনা লক্ষ করি।

যেমন :

ফল এনেছে নোটন মাসি

খোকার মুখে তাই তো হাসি।[১১৪] (পৃ. ১৪)

এখানে নোটন মাসির নাম পরিচয়ে যেমন ধর্মের চিহ্ন অস্পষ্ট, তেমনই খোকাও ধর্মনিরপেক্ষ পরিচিতিসত্তা নিয়ে বিরাজমান।

বর্ণমালা শিক্ষার পরের পৃষ্ঠাতেই পর পর দুটি পাঠ উল্লেখযোগ্য – একটিতে হিন্দুর বিবাহ উৎসবের বর্ণনা, তো পরেরটিতেই রয়েছে মুসলমানের ইদ উৎসবের এক চমৎকার সহাবস্থান; যেখানে আবার হিন্দু মুসলমান সকলে মিলে সেই উৎসবে যুক্ত হওয়ার সুযোগ ও অধিকার পেয়েছে।[১১৫] দুটি পাঠকে পাশাপাশি রাখা হল –

প্রথম পাঠ	দ্বিতীয় পাঠ
ওই বর।	আজ ইদ উৎসব।
সর্ সর্।	পথ ঘর সব ঝলমল।
পথ কর্।	ওই আলম এল অমর এল।

জল আন্। আসন আন্। বরণ কর্।	আয়, আমন আয়। রতন আয়। আকবর আয়।

হিন্দু – মুসলমানের আত্ম প্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রচারে নিগড় অগ্রাহ্য করে এই প্রথম যেন পারস্পরিকতার শুরু হল এবং সেই পারস্পরিকতা এতটাই দৃঢ় যে, আলম-অমর, রতন-আকবর ধর্মীয় উৎসবেও একাত্ম। তারা যেন পুরোনো বর্গ ছেড়ে ধর্মনিরপেক্ষে এক মানববলয় রচনার দিকে এগোচ্ছে। এই বইতে সাংস্কৃতিক পরিসরেও সেই মানব বলয় নির্মাণের পথ দেখানো হয়েছে –

> ওই যায় বাবা মা।
>
> ... ওরা ওপাড়ায় যায়।
>
> ওপাড়ায় আজ গান।
>
> বাদল গান গায়।
>
> নারান তবলা বাজায়।
>
> হাসান বাজায় সানাই।
>
> সারারাত গানবাজনা হয়।[১১৬]

রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ' এর কথা মনে পড়ছে? সেখানে পূজা উৎসব কম হয়নি, কিন্তু সেই উৎসবে কেবলই একটি বিশেষ ধর্মের মানুষ নিজেকে জুড়তে পেরেছেন, মুসলমানরা ছিলেন সেখানে ব্রাত্য, অপাঙ্‌তেয়। অথচ 'কিশলয়' - এ সেই ব্যবধান সম্পূর্ণ ঘুচে গিয়ে নারান ও হাসানকে এক মঞ্চে জায়গা করে দিয়েছে।

'কিশলয়' কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ খাড়া করে ক্ষান্ত থাকেনি। বরং আমাদের যাপিত জীবনের প্রাত্যহিকতায় এই প্রাইমারটি হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের চমৎকার আদর্শ নির্মান করেছে। 'পাঠ একক – ২৩' এ পাওয়া যাবে তার নমুনা :

"বৈশাখ মাস। বিকেলবেলা। নদীর ধারে বসে আছে ক'টি ছেলে।" তবে এই ছেলেগুলি গোপাল-রাখাল-ভুবন-যাদব-মাধব কিংবা শচী সেন, মণি সেন, বশী সেনদের মতো একই বৃত্ত বা গোত্র পরিচয়ের নয়। 'কিশলয়' যাঁদেরকে একত্রিত করেছে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ও ধর্মের প্রতিবেশী বালক বালিকা। অতঃপর –

> একটা নৌকো সওয়ারি নিয়ে এপারে আসছে। ... এমন সময় কাল বৈশাখীর ঝড় উঠলো। ছেলেরা দৌড়ে জলে নামল। সবার আগে নামল সৈফুল। তার পিছু পিছু সৈকত, ভৈরব, সৌরভ আর নৌশাদ। জেলেপাড়া থেকে অনেকে ছুটে এল। সব সওয়ারিকে তারা তীরে তুলে আনল। ... সবাই মিলে কৌশল করে নৌকোটা তীরে নিয়ে এল।[১১৭]

'সহজপাঠ' এর রঙ্গলালবাবুদের জঙ্গল সাফ করবার আয়োজনে বাবুরা ছাড়া আর কেউ ছিলেন কি? নিশ্চয় না। অবশ্য 'আর ছিল ভিঙ্গি মেথর'; যে কিনা তাঁর ' মেথর' সম্বোধনেই কোণঠাসা বোঝা যায়। 'সহজপাঠে'এর সামাজিক কর্মে মুসলমানরা ঠাঁই না পেলেও 'কিশলয়' সকল ছেলেকে এক জায়গায় বসবার, খেলবার ও সমবেতভাবে লড়বার পরিসর করে দিয়েছে। বিপদের দিনে একত্রিত হয়ে উদ্ধারকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার মুহূর্তে সৈফুল, সৈকত, ভৈরব, সৌরভ, নৌশাদ ধর্মীয় আত্ম-অপরের গণ্ডি ভেঙে এক চিরন্তন মানববলয় রচনা করেছে। এই পথই তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত ছিল, সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতিতে এই পারস্পরিকতা ও নৈকট্যই তো মানব অস্তিত্বের মূল নির্যাস।

'কিশলয়' – এ আরও যে সমস্ত স্থানে হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থানের চিত্র পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ –

১.

কিশলয়ের প্রথম সংস্করণে আয়েষা	**কিশলয়ের পরবর্তী সংস্করণে আয়েষা**
সকাল হয়। মা ডাকেন। আয়েষা লেপ ছাড়ে। উঠে পড়ে।	আয়েষা মেয়েটি বেশ। সে ঘরের কাজ করে। কাজ সেরে সে লেখাপড়া করে, খেলাধুলোতেও তার বেজায় শখ।

দাঁত মাজে। হাত পা ধোয়। মা খেতে দেন। রেখা এসেছে। হাতে তার কতবেল মাখা। খেতে বেশ মজা হবে। [১১৮]	একদিন সে হবে দেশের সেরা মেয়ে।[১১৯]

নিশ্চয় প্রথম সংস্করণের আয়েষা পরবর্তী সংস্করণে আয়েষা আরো বেশি পরিমার্জিত এবং উন্নত। পূর্ববর্তী কোনো প্রাইমারে যেখানে মুসলমান মেয়েদের অস্তিত্বই ছিল না, সেখানে 'কিশলয়' মুসলমান মেয়েদের আদর্শ স্থাপনসহ তাকে 'দেশের সেরা মেয়ে'র সংকল্পে চালিত করেছে।

২.

আজ আমাদের ইস্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ... হাইজাম্প, লংজাম্প, সাধারণ দৌড়, মিঠাই দৌড়, পা ধা দৌড়, দড়ি টানাটানি – আরও কতরকম প্রতিযোগিতা। ... চঞ্চল, পান্না আর সেলিম খুব ভালো দৌড়োয়। মেয়েদের দৌড়ে সেলিনা, চম্পা আর রুনার মধ্যে একজনের প্রথম হবার সম্ভাবনা। (খেলার মাঠে)[১২০]

৩.

সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি। স্কুল ছুটি হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। হইহই করতে করতে বাড়ি ফিরছে ক-টি ছেলেমেয়ে। রবিন, রহিম, মিতা, আবদুল, ষষ্ঠী, রোকেয়া, রাসু, দিনেশ।[১২১]

রবিনের পাশে রহিম আবদুল এবং মিতাদের সঙ্গে রোকেয়াদের সহাবস্থানকে আরো মজবুত করা হয়েছে 'কিশলয়' এর তৃতীয় ভাগে বন্দে আলি মিঞা রচিত 'আমাদের গ্রাম' কবিতাটিতে -

৪.

আমাদের ছোটো গাঁয়ে ছোটো ছোটো ঘর,

থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।

পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই,

একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।[১২২]

লক্ষণীয় বিষয় 'শিশুশিক্ষা' থেকে 'বর্ণপরিচয়' 'সহজপাঠ' কিংবা 'নিজে পড়ো'তে একসাথে 'খেলা ও পড়া'র কোনো সহাবস্থান ছিল না। অন্তত হিন্দু-মুসলমানের ক্ষেত্রে সেই সহাবস্থানের কোনো জায়গা ছিল না। কিন্তু এখানে সেই সহবাস্থানের পরিবেশ সূচিত হয়েছে। তৃতীয়ভাগে প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে রোকেয়ার কথা, যিনি সমাজ ও পরিবারের প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নিজে পড়ালেখা শিখেছেন এবং ভবিষ্যতে মুসলিম মেয়েদের পড়াশুনার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল। 'মহীয়সী রোকেয়া' পাঠে আমরা পাই সেই বৃত্তান্ত –

> করিমুন্নেসা লুকিয়ে লুকিয়ে বাংলা শিখে ফেললেন। ... তবু একদিন ধরা পড়ে গেলেন। ... আবু আলি সাবের মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। ... ছোটো বোন রোকেয়া অবাক হয়ে গেল। এ বাধা সে মানবে না। এরকম একটি জেদ তাকে বালিকা বয়েসেই পেয়ে বসল। ... অতি গোপনে চলতে লাগলো রোকেয়ার লেখাপড়া। ... আর সময় পেলে লিখতে লাগলেন গল্প কবিতা। নানা বিষয়ে লিখে চললেন তিনি। ... রোকেয়া ভাবলেন তিনি নিজে লেখাপড়া শিখেছেন বটে কিন্তু অন্য মুসলিম মেয়েরা? তারা কি লেখাপড়ার সুযোগ পাবে না? এই চিন্তা মাথায় ঢুকল তাঁর। স্বামী সাখাওয়াত হোসেন ও এই কাজে নামলেন। সাখাওয়াত দম্পতির চেষ্টায় ভাগলপুররে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হল। ... সাখাওয়াত হোসেন মারা গেলেন। রোকেয়াকে ভাগলপুর ছেড়ে চলে আসতে হল কলকাতা। এখানে স্বামীর নামে প্রতিষ্ঠা করলেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল। ... রোকেয়ার চেষ্টায় মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার বিস্তার ঘটলো। ... এই কাজের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।[১২৩]

'কিশলয়' এর প্রথম ভাগে একটি মেয়ে ছিল, নাম আয়েষা, যে 'ঘরে কাজ সেরে লেখাপড়া' করতো, ওই পাঠে বলা হয়েছিল 'একদিন সে হবে দেশের সেরা মেয়ে।' দ্বিতীয় ভাগে আরো একটি মেয়ে ছিল, যে আবদুল মিতা রবিন রহিম ষষ্ঠী রাসু দিনেশদের সঙ্গে ইস্কুল যায়। ওই পাঠের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি আহত ব্যাঙদের দুঃখে সে মেয়ে কাতর। এইবারে দ্বিতীয় ভাগে এসে 'মহীয়সী রোকেয়া' পাঠটি একটু মিলিয়ে পড়লে আমরা সেই ছোট্ট রোকেয়ার বৃহৎ সংস্করণটিকেই যেন এখানে আবিষ্কার করবো। এই পাঠে এসে আমরা যে রোকেয়াকে পাই তিনিই কি সেই 'সেরা মেয়ে'র মূর্ত প্রতীক নন? যে মেয়ে ব্যাঙের আঘাত সহ্য করতে পারেন না, সে মেয়ে মুসলিম মেয়েদের অশিক্ষার আঘাত সহ্য করবেন কেন? তাইই তো তিনি মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। মুসলিম মেয়েদের এক চিরন্তন আদর্শ খাড়া করেন। তাই একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, 'কিশলয়' কেবলমাত্র মুসলিম ছেলেমেয়েদের সহাবস্থান

দান করেই নিশ্চিন্ত থাকেনি, বরং সুচিন্তিতভাবে সুপরিকল্পিত কৌশলে মুসলিম মেয়ের আত্মপ্রতিষ্ঠাকেও অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। এখানেই আর পাঁচটি প্রাইমারের সঙ্গে কিশলয়ের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব।

৩.১.৮. আমার বই : হিন্দু – মুসলমান 'আত্ম'-'অপরত্ব'

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ থেকে ডিসেম্বর ২০১২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় 'আমার বই' শীর্ষক শিশুপাঠ্যপুস্তকটি। এই পুস্তকটির 'প্রাককথন' অংশেই রয়েছে এর আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তার কথা। 'শিশুকেন্দ্রিক' শিক্ষার উপযোগী বলে দাবি করে এই প্রাইমারটিতে বলা হয়েছে –

> রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ অনুসরণ করে 'আমরা পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকে সঙ্গীত, চিত্র আর 'আত্মপ্রকাশের আনন্দময় উপায় উপকরণ' সমন্বিত আকারে পরিবেশন কররার চেষ্টা করেছি। ... যদি আমাদের রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে এই বইটির মাধ্যমে বড়ো পরিবর্তন ঘটে তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।[১২৪]

'আমার বই'তে সত্যিই বেশ কিছু পরিবর্তনের ইশারা লুকিয়ে আছে। 'আমার বই' এর এই 'আমি'টি যে স্বঘোষিত শিশু পাঠকটি তা বলার আর দ্বিধা নেই। অর্থাৎ বইটির কর্তৃত্ব যেন সম্পূর্ণভাবেই শিশুপাঠকের। তাই শিশুপাঠকের উপযোগী করেই প্রাইমারটি বিন্যস্ত হয়েছে। পূর্ববর্তী প্রাইমারগুলির মতো এটি কেবলমাত্র বাংলা ভাষা শিক্ষাতেই নিরত থাকেনি, বরং শিক্ষার্থীদের বইয়ের ভার লাঘবের জন্য এই মলাটের অন্দরে বাংলা, ইংরাজি ও গণিতের প্রাথমিক সমস্ত ধারণাকে সূত্রাকারে গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে।

'আমার বই' শুরু হয়েছে 'সহজপাঠে'র আদর্শ পরিগ্রহণের ভেতর দিয়ে – 'ছোটো খোকা বলে অ আ / শেখে নি সে কথা কওয়া'। অতঃপর এই বইতে তার কথা বলা ও কথা শেখা শুরু হয়েছে।

প্রাইমারটিতে শিশু কথকটিকে কোনো ধর্মীয় পরিচিতিতে আমরা চিহ্নিত করতে পারি না। বরং এখানে পাঠ্য বিষয় উপস্থাপনে পাত্রপাত্রীরা ধর্মনিরপেক্ষ থেকেছে। যেমন ১৯৫ – ১৯৮ পৃষ্ঠা জুড়ে একজন শিশুর পরিবেশ দর্শনের চমৎকার ছবি পাই –

> আমি দেখি কত রং আকাশের গায় / মেঘ রোদ মিলেমিশে এক হয়ে যায়।

দেকঝি আমি ডালে ডালে ফুলেদের খেলা / গাছপালা ফুল দেখে কেটে যায় বেলা।

এই 'আমি' সম্পূর্ণ নামপরিচয়হীন এক চিরশিশু। তবে যে'সমস্ত ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীদের ধর্মের ভিত্তিতে সনাক্ত করা যায়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে উভয় ধর্মের চরিত্রদেরই উপস্থিতি লক্ষণীয়। নিচে সেই তালিকা দেওয়া হল -

৬৪ পৃষ্ঠায় 'া' (আ-কার) ও 'ি' (ই-কার) সহযোগে বানান শিক্ষার জায়গায় ছবি, রবি, ছড়া, পড়া, মাড়ি, হাঁড়ি, দাড়ি প্রভৃতি শব্দের পাশাপাশি এসেছি – 'নানি', 'দাদি' ইত্যাদি শব্দ। যা কার্যত মুসলমানি সম্পর্কের মানুষদের সঙ্গে প্রযোজ্য হয়।

২৩১ পৃষ্ঠায় 'ভোরের পাঠ' শীর্ষক পাঠে আছে হাসানের কথা –

> "পাখির ডাকে ভর হলো। চারিদিকে সোনালি আলো। সবাই ঘুম থেকে ওঠে। দাঁত মাজে ছোটোরা লেখাপড়া করে। বড়োরা কাজে যায় যায়। হাসানের বাড়ি নদীর ধারে। সেখানে সারি সারি তালগাছ।"[১২৫]

২৪১ পৃষ্ঠায় গ্রীষ্মকালীন পরিবেশে আম পাড়া খেলা ও তার আনন্দ বন্টিত হয়েছে রহিম–কানাই সকলের মধ্যেই –

> গরম কাল। জল আন।
>
> আম পাড়। রহিম আর কানাই আয়।
>
> হইচই করিস না।[১২৬]

৩১৪ পৃষ্ঠায় 'সকাল বিকেল' পাঠটিতে আছে বিশু, আসমা আর বাহামণিদের একত্রে মেলায় যাওয়ার কথা –

> সকালের আকাশ ঝলমল করছে। পুকুরের জল ঝিলমিল করছে। ... আজ মেলা বসবে। মেলায় খুব ধুমধাম হবে। চটপট বেরিয়ে পড়ল বিশু। সাথে আসমা আর বাহামণি।[১২৭]

৩৩৮ পৃষ্ঠায় 'এসো ছবি দেখি আর পড়ি' পাঠটিতে আছে বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে শিশু পাঠকের পরিচয় পর্ব। তাই এখানে কালুদা যেমন বিদ্যুতের তার সারাই করে, তেমনই আছে পিয়ন দাদার কথা, সমান্তরালভাবে এসেছে আসগর দোকানদারি ব্যবসার কথা –

সামনের মাঠে চলছে ফুটবল খেলা। রেবা দেখে আর তালি দেয়। ওপারে আসগর চাচার দোকান। দোকানে চাচার মন নেই।[১২৮]

৪২১ পৃষ্ঠায় পাঠের নাম 'ছুটির মজা'। এখানে শিশু পাঠকের চিত্তে উৎসবের ছুটির আনন্দ সঞ্চালিত করে দেওয়া হয়েছে। সেই উৎসবে যেমন শারদোৎসবের কথা আছে তেমনই ইদের কথাও বাদ পড়েনি।

শরৎ এসেছে। ছুটির বাঁশি বাজে। আকাশ ঘন নীল। পেঁজা তুলোর মতো। ... দূরের মাঠে সাদা কাশফুল। হাওয়ায় দোলে। উঠোনের শিউলি গাছটা ফুলে ভরা। চারিদিকে দুগ্‌গা পুজো আর ইদের খুশি। সবাই মাতোয়ারা। ... তাই শুধুই মজা।[১২৯]

লক্ষ করবার বিষয় নিকটতম প্রতিবেশী দুই ধর্মের মানুষের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসবকে একই জায়গায় নিয়ে এসে উৎসবের আনন্দ সকল শ্রেণির পাঠকের মধ্যেই বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে।

গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রেও হিরু, মোতি, হীরা, কাজল প্রভৃতিদের সঙ্গে আসিফ ও তার চাচা এবং ফুফুর আগমন এই প্রাইমারের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে।

'আসিফকে তার চাচা ৪ টে লিচু দিল। ফুফু আরো ৬ তা লিচু দিল। আসিফের মোট কটা লিচু হলো?'[১৩০]

আসিফের সঙ্গে পরিচয়ের পাশাপাশি এখানে চাচা ও ফুফু এই ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কের মানুষগুলি সম্পর্কেও যেন প্রতিবেশী পাঠকের মনে একটা স্বচ্ছ ধারণা দান করতে চাইছে প্রাইমারটি।

৪৯০ পৃষ্ঠার একটি অংকে আমরা দেখি সমাজের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত বিভিন্ন মানুষ এসেছেন প্রতিবেশী দুটি ধর্ম থেকে। মাছ বিক্রেতা অধীর মামা যেমন আছেন, তেমনই সবজি বিক্রির ময়দানে একইসঙ্গে আছেন আয়ুব চাচা এবং সীমাদিদি –

ক. মাছ বেচছেন অধীর মামা। কিনলেন রানী পিসি ...

খ. আয়ুব চাচা ফুলকপি বেচছেন। জয়নাল দাদা ২ টো কপি নিয়েছেন...

গ. সীমাদি বেগুন বেচছেন...[১৩১]

আবার ৪৯৭ পৃষ্ঠার আরেকটি অংকে অনুরূপভাবে আছে –

কামাল ভাই আলু বেচছেন। হেনা আপা ৮ টাকার আলু নিলেন।[১৩২]

'আমার বই' শেষ হচ্ছে একটি অভূতপূর্ব পাঠ দিয়ে। নাম – 'নীল ময়ূরের পালক'। এই পাঠের দুই নায়ক রহমান আর আবির দুই ভিন্ন ধর্মের ও ভিন্ন সমাজের শিশু। তাঁদের ভালোবাসা, ভরসা ও স্বপ্নের গল্প এই 'নীল ময়ূরের পালক' পাঠটি।

গল্পটিতে দেখা যায় রহমান স্বপ্নে দেখে খেলার মাঠ থেকে বাড়ি ফেরার পথে তার বন্ধু আবির তাকে একটা 'নতুন দেশে' যাওয়ার কথা বলছে। যেদেশে 'পাহাড়ে পাহাড়ে উড়ে বেড়ায় নীল ময়ূর।' যেখানে 'ঢালু বালির পরে বিশাল সাগর। বড়ো বড়ো ঢেউ উথাল পাথাল' করে আর কাছে এসে বসে পেখম তোলা নীল ময়ূর। এই নতুন দেশে আগত বন্ধুদের দেখে তখন মেঘের ফাঁক দিয়ে ঝলমলে রোদ ছড়ায় চারিদিকে। অভিভূত হয় দুই বন্ধু। অধিকতর অভিভূত হতে দেখি আবিরকে। "রহমান নীল সাগরে নামবি?' বলতে বলতে জলের দিকে এগোয় আবির। উথাল পাথাল নীল জলের আগ্রাসন দেখে রহমানের ভয় হয় – "ও সাঁতার জানে তো?

মায়ের আকস্মিক আগমনে রহমানের এই স্বপ্নে ভেঙে গিয়ে মন খারাপ করে - 'চোখ খুলে দেখলাম সকাল হয়ে গেছে। মা বললেন, 'আটটা বাজে, এবার ওঠো। ইস্কুলে দেরি হয়ে যাবে।"[১৩৩]

স্বপ্ন দর্শন হলেও গল্পের এই 'নতুন দেশ' এক আলাদা মাত্রা নিয়ে আসে পাঠকের কাছে। এখানে একে অপরের সঙ্গে মেলবার মেশবার কোনো বাধা নেই। নেই জাতিবর্ণের কোনো শিকল, সংস্কার। বরং আছে 'সাঁকো পেরিয়ে' রহমান ও আবিরদের মেলবার অবকাশ, একসঙ্গে পথ চলবার নিরুপদ্রব পরিসর, আছে ভরসা ও প্রত্যাশার গভীর প্রত্যয়। আর সেই প্রত্যয় থেকেই একই সঙ্গে 'নীল সাগরে নামার' দুঃসাহস দেখাতে পারে আবির। কিন্তু আবির সাঁতার জানে কিনা এই সতর্ক প্রশ্নে রহমানের মনে যে গভীর উদ্বেগ জন্ম নিয়েছে তার নামই তো ভালোবাসা; তার নামই তো সখ্য। 'আমার বই' দুই ভিন্ন ধর্মের সখাকে সত্যই একটি 'নতুন দেশে'র লক্ষ্যে চালিত করতে পেরেছে।

'আমার বই' এর দ্বিতীয় ভাগ পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ২০১৩ সালে। এই প্রাইমারটির বিশেষত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে 'বর্ণ চেনা ও শব্দভাণ্ডার তৈরির ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 'বর্ণপরিচয়' বইটিকে বহুলাংশে অনুসরণ করা হয়েছে।'[১৩৪] এরই সঙ্গে শিক্ষার্থীর শিখন যাতে 'আনন্দময়' এবং 'আতঙ্কবিহীন' হয় তার চেষ্টা করা হয়েছে।

হিন্দু 'আত্ম' ও মুসলমান 'অপরত্ব'র প্রাচীর ভাঙার যে প্রচেষ্টা এই সিরিজে নেওয়া হয়েছে তার সার্থক নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা পাঠে। এখানে তাঁরই দু'চারটি নমুনা তুলে ধরে এই বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন করা করা যাক।

এই বইয়ের প্রথম পাঠের নাম 'বনের পথে' যেখানে আমরা আলিবাবার উপস্থিতি টের পাই। পাঠের ভাষায় –

> "আলিবাবা ক্বচিৎ এ পথে আসে। ঘন বনে এগোনো শক্ত। ডালপালায় ধাক্কা দিয়ে ঘোড়া এগিয়ে চলে।"[১৩৫]

৫ নং পৃষ্ঠায় আছে বিক্রম ও টিপুর একসঙ্গে ঘুড়ি ওড়াবার আনন্দ যাপনের কথা –

"শুক্রবার এলে বিক্রমের ভারি মজা। সামনেই শনি-রবিবার ছুটি। ও আর টিপু ঘুড়ি ওড়াতে দক্ষ।

৮৯ পৃষ্ঠায় সাবিনার অবস্থান থেকে তিনটি নৌকার দূরত্ব বিচার করার অংকের খেলা আছে। ৯২ পৃষ্ঠায় রাজু ও রানার সঙ্গে মীরের অবস্থান আমাদের নজর কাড়ে। ৯৩ পৃষ্ঠাতে আমরা দেখি সৌমেন, ডেভিড এবং আসিফ তিনজন তিন ধর্মের শিশু কিশোর তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে আম পাড়ছে। ছবিতে দেখা যায় তিন জনেই আমের স্পর্শ পেয়েছে – কেউ গাছের উপরে উঠে, কেউ আকশি দিয়ে, কেউ বা একেবারে নিচে হাতের নাগালে। এই ছবির একটা আলাদা ব্যঞ্জনা আছে বলে আমাদের মনে হয়, আর তা হলো প্রত্যেকের নিজ নিজ অবসথান থেকে সমানাধিকারের প্রসঙ্গ।

৯৪ পৃষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে আবার ববি, সলমন, জন, সানি এই চারটি ছেলের দৌড়ের ছবি আছে, যার দ্বারা শিশুপাঠককে ছেলেদের সামনে পেছনে-কাছে দূরের অবস্থান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে। এই ছবির চারজন বালকও অবশ্যই তিনটি প্রতিবেশী ধর্ম থেকে আগত; নামেই তা টের পাই। একইসঙ্গে এদের দৌড়কে আমাদের জীবনের পারস্পরিক চলার পথের ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করে।

১২৭ পৃষ্ঠায় আছে ইসলামি পোশাক প্রসঙ্গ; বিশেষত উৎসবে রঙিন ও বিশেষ ধরণের পোশাক পরিধানের বৃত্তান্ত –

উৎসবে ছোটোরা রঙিন টুপি পরবে। একটি দোকানে ১৫ টি নীল টুপি ও ১২ টি লালা টুপি আছে। দোকানে দুটি রঙের মোট কটি টুপি আছে দেখি।[১৩৬]

উপরের পাঠটি অংকের হিসেব নির্ণয়ের জন্য নির্মিত হলেও প্রথম বাক্যটিতে সুপরিকল্পিত ও সুন্দরভাবে প্রতিবেশী ধর্মের মানুষদের উৎসব ও সেই উৎসবে টুপি পরার বিশেষত্বকে চিনিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'উৎসবে ছোটোরা রঙিন টুপি পরবে।' এই বাক্যে আমরা নিশ্চিতভাবেই অনুমান করতে পারি সেই উৎসব হল ইদ উৎসব। আর তার মধ্যে দিয়ে মুসলমানদের উৎসবের বিশেষত্বকেই প্রকাশ করা হল।

উল্লেখ্য এই প্রাইমারটির ৩৪৬ পৃষ্ঠায় রজনীকান্ত সেনের 'পরোপকার' কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। এই কবিতাটির নিচে ছয় জন মনীষীর চিত্র সংযোজিত হয়েছে। লেখা হয়েছে – "অন্যের উপকার করেছেন এমন কয়েকজন মনীষীর ছবি নিচে দেওয়া হলো। ছবির নীচে এঁদের নাম লিখি। বড়োদের কাছে এঁদের জীবনের গল্প শুনি।"[১৩৭] লক্ষণীয় বিষয় চিত্রে গান্ধিজি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং, ঋষি অরবিন্দের পাশাপাশি মহীয়সী রোকেয়া এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদের ছবি সংযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এখানেও শিশুপাঠকের মনের বর্গ বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যবস্তুতে সমতা বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে। পূর্বের খুব স্বল্প সংখ্যক প্রাইমারেই এই মহান উদ্যোগের নিদর্শন পাওয়া যায়।

প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন পাঠে নামচিহ্ন দ্বারা ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলমান বলে যাঁদের সনাক্ত করা যায় তারা সংখ্যায় কম নয় এবং তাদের অবস্থানও বেশ সন্তোষজনক। এখানে এ'রকম কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা হল –

ক. রোশেনারা ৩২ টি গাঁদা ফুল নিয়ে মালা গাঁথা শুরু করল।[১৩৮]

খ. জেরিনা ২৭ টি পুঁতি দিয়ে মালা গেঁথেছে।[১৩৯]

গ. আফসানা তার বাবার সঙ্গে বাজারে গেল।[১৪০]

ঘ. আজ আমাদের বাড়িতে আমার দুজন বন্ধু মিতা ও মতিউর এসেছে। মা একটা প্লেটে ৬ টি নাড়ু দিয়ে গেলেন। আমরা তিনজনে সমান ভাগে ভাগ করে নেব। [১৪১]

ঙ. সুতপার কাছে ২৯ টি রং পেনসিল ছিল। সে রফিককে ৮ টি রং পেনসিল দিল।[১৪২]

উপরের পাঠগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা লক্ষ করবো অংকের হিসেব নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত বয়ানগুলি রচিত হলেও এই বয়ানের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে দুটি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনটি পৃথক ধর্মের শিক্ষার্থীদের নাম। যা তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ রচনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। যখন আমরা দেখি শিশু কথকের বাড়িতে সে, মিতা এবং মতিউর মিলে তিনজন একই প্লেটে নাড়ু ভাগ করে খাওয়ার সামাজিক পরিসর পাচ্ছে, তখন আমাদের মনে হয় আমরা ধর্ম বর্ণের শিকল ছিন্ন করে একত্রিত হওয়ার স্বাধীন ও উন্মুক্ত পরিসর রচনা করতে সক্ষম হতে পারি। হয়তো অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ও সমাজ-সাংস্কৃতিক সমানাধিকার ও সমসুযোগের (Equality & Equity) শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে এই পাঠে। বিদ্যালয় শিক্ষায় ব্যবহৃত এই প্রাইমার যেভাবে আমাদেরকে একত্রে চলার পথ বাতলে দেয় তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য নিশ্চিতভাবেই প্রশংসনীয়।

'আমার বই' এর বড়োদের সংস্করণ 'পাতাবাহার' তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্য। এই প্রাইমারটি নানা শ্রেণির রচনার সংকলন। কবিতা, গল্প, ছড়া ও ভাবনামূলক গদ্যের পাশাপাশি লোককথার কাহিনি এবং বিদেশি অ্যাডভেঞ্চার গল্পও এখানে সংকলিত হয়েছে। সংকলনের বিষয়বস্তু যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনই বিষয়ের বিন্যাসও চমকপ্রদ। কোথাও কোনো একপেশে বয়ানের আধিপত্য লক্ষিত হয়নি। সুপরিকল্পিতভাবে পুরুষ লেখকদের সমান্তরালে উল্লেখযোগ্য লেখিকাদের সরস রচনাকে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুনির্মল বসু, প্রমদারঞ্জন রায়দের রচনা যেমন সংকলিত হয়েছে, তেমনই আছে পুণ্যলতা চক্রবর্তী, লীলা মজুমদার, রাণী চন্দ, কুসুমকুমারী দাশ প্রমুখের রচনা। আবার গোলাম মোস্তাফা থেকে কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখদের রচনাও বাদ পড়েনি। সম্পূর্ণ আনন্দময় পরিবেশে প্রতিবেশীকে জানার ও বোঝার পরিসর রচিত। নির্দিষ্ট কোনো পাঠেই ধর্মীয় পরচিতিসত্তা পৃথকভাবে ঘোষিত হয়নি। বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রমে তাই এই প্রাইমারটিও ধর্মনিরপেক্ষ উদার শিক্ষারই পরিবেশ রচনা করতে সক্ষম হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা নির্বাচিত প্রচলিত বাংলা প্রাইমারে হিন্দু 'আত্ম' ও মুসলমান 'অপরত্বে'র বিন্যাস বিশ্লেষণকালে লক্ষ করলাম উনিশ শতকে রচিত প্রাইমারসমূহে মুসলমান বালকের আদর্শ স্থাপনের উপকরণের নিতান্ত অভাব রয়েছে। এমনকি বিশ শতকে রচিত যোগীন্দ্রনাথ সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুখলতা রাওদের প্রাইমারেও সেই অভাব যথেষ্টই প্রকট।

পরিবর্তে হিন্দু বালকের পছন্দের খোরাক যথেষ্ট। তাই এই সমস্ত প্রাইমারের বিষয় বিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ, সমাজ পরিসর রচনা এবং আদর্শ সৃষ্টিতে হিন্দু আধিপত্যজনিত কারণে হিন্দু 'আত্ম'ই সক্রিয় থেকেছে। মুসলমান সমাজ, জীবন ও চরিত্রাদর্শ কোণঠাসা ও প্রান্তিক হয়ে পড়েছে। পাঠ্যপুস্তকে এই সাংস্কৃতিক ব্যবধান কাঙ্ক্ষিত নয় বলেই মনে করেন সমাজতাত্ত্বিকরা। তবে এই ব্যবধানের গ্লানিকে মাথায় নিয়ে শূন্যস্থান পূরণে পরবর্তীকালে এগিয়ে এসেছে 'কিশলয়'সহ সাম্প্রতিকালের 'আমার বই' এবং 'পাতাবাহার' এর প্রাইমার সিরিজগুলি। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু আত্ম ও মুসলমান অপরত্বের চেনা ছকটি ভেঙে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি উদার পরিসর তৈরি হয়েছে। কিন্তু 'শিশুশিক্ষা' (১৮৪৯) থেকে 'কিশলয়' (১৯৮২) পর্যন্ত ১৩২ বছরের এই দীর্ঘ সময় পর্বে শিশুপাঠ্যপুস্তকে বাঙালি মুসলমানের উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিতি কি তাদেরকে ভিন্ন পথে চালিত করতে বাধ্য করেনি? বিপক্ষের সজ্ঞান প্রত্যাখ্যান কি মেনে নেওয়া এতটাই সহজ ছিল তাদের? নাকি সেই প্রত্যখ্যানের গ্লানি থেকে ভেতরে ভেতরে গড়ে উঠছিল বিকল্প ভুবন নির্মাণের প্রস্তুতি ও প্রয়াস? বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক ইতিহাসের অন্দরে ডুব মারলেই আমরা খুঁজে পাবো তার প্রকৃত সাক্ষ্য। লক্ষ করবো প্রচলিত বাংলা প্রাইমারের বিপরীতে গড়ে উঠেছে বাংলা ভাষায় ইসলামি প্রাইমার। তার উদ্দেশ্য, অভিমুখ ও স্বরূপ বিদ্যালয় শিক্ষায় ব্যবহৃত প্রাইমারের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আমরা সেই সমস্ত ইসলামি প্রাইমারে মুসলমানের 'আত্ম' এবং হিন্দুর 'অপরত্ব'র বিন্যাসটি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করবো।

৪.০ ইসলামি বাংলা প্রাইমারে মুসলমান 'আত্ম' ও হিন্দু 'অপরত্ব'র বিন্যাস

পূর্ববর্তী আলোচনাতে আমরা বিশ্লেষণ করেছি কোন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বাংলা ভাষায় ইসলামি প্রাইমার সমূহের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা গেল। বর্তমান আলোচনায় আমরা বিচার করবো প্রচলিত বাংলা প্রাইমার সমূহের উত্তরপক্ষ হিসেবে ইসলামি বাংলা প্রাইমারগুলি কীভাবে তার পাঠ্যবস্তু ও বিষয় বিন্যাসে স্বাতন্ত্র্য আমদানি করেছে এবং সেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় পূর্বপক্ষ অর্থাৎ পূর্ব প্রচলিত বাংলা প্রাইমারগুলির বিরোধী চিন্তা প্রস্থান গড়ে তুলেছে। এক্ষেত্রে আমারা আলো ফেলতে চাই ইসলামি বাংলা প্রাইমারগুলিতে বর্ণিত আত্ম-অপর সম্পর্ক কাঠামোতে। আমরা জানি শিল্প ও সৃষ্টি কার্যত শিল্পীরই আত্মস্বরূপ, তাই তার মধ্যে দিয়ে আমরা স্রষ্টা ও তার স্বসমাজ পরিসরকেই গুরুত্বের সঙ্গে পরখ করি। সেক্ষেত্রে ইসলামি প্রাইমারগুলিতে মুসলমানের 'আত্ম'র

ধরন-গড়ন এবং অপরদিকে হিন্দু 'অপরত্ব'র অস্তিত্ব অনুসন্ধান ও তারও গঠন বিচার করাই এই অধ্যায়ে আমাদের অন্বিষ্ট।

৪.০১ : নির্বাচিত ইসলামি প্রাইমার

ইসলামি বাংলা প্রাইমারসমূহে মুসলমানের 'আত্ম' ও হিন্দু 'অপরত্ব' বিচারের এই আলোচনায় আমরা আলোচনার সুবিধার্থে নির্বাচিত কিছু প্রাইমারকে গ্রহণ করেছি। বর্তমান আলোচনায় যে সমস্ত প্রাইমারকে আমরা গ্রহণ করেছি, সেগুলি হলো -

১. মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা (১৩১৩) – মীর মশাররফ হোসেন

২. আমাদের প্রিয় নবী, (১৯৮৪) - আবদুল মাবুদ

৩. ছোটদের দুআ, (মার্চ ১৯৮৫) – নিযাম উদ্দীন মোল্লা

৪. সালাফী বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, (জানুয়ারি ১৯৮৭) - অধ্যাপক মাওলানা হাফেজ শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী

৫. সালাফী বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ, (জানুয়ারি ১৯৮৭) - অধ্যাপক মাওলানা হাফেজ শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী

৬. সালাফী সাহিত্য বীথি, (জুলাই ১৯৯০) - অধ্যাপক মাওলানা হাফেজ শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী

৭. তা'লীমুল ইসলাম প্রথম ভাগ (মে ১৯৯২) – হযরত মুফতী মোঃ কেফায়াতুল্লাহ

৮. তা'লীমুল ইসলাম দ্বিতীয় ভাগ (মে ১৯৯২) – হযরত মুফতী মোঃ কেফায়াতুল্লাহ

৯. তা'লীমুল ইসলাম তৃতীয় ভাগ (মে ১৯৯২) – হযরত মুফতী মোঃ কেফায়াতুল্লাহ

১০. তা'লীমুল ইসলাম চতুর্থ ভাগ (মে ১৯৯২) – হযরত মুফতী মোঃ কেফায়াতুল্লাহ

১১. কচিকাঁচা -১, (১৯৯৯) – মশিয়ার রহমান মোল্লা

১২. ফুলকুঁড়িদের অ আ ক খ, (প্রকাশকাল অনুল্লিখিত) -ছাত্রবন্ধু প্রকাশন

১৩. ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা - ১, (জানুয়ারি ২০০৬) - মুহাম্মদ নুরুদ্দীন

১১. ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা - ২, (মার্চ ১৯৯৭) - মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ও সেখ নাসিরুদ্দীন আহমদ

১২. ফুলকুঁড়ি প্রথম পাঠ, , (মার্চ ২০০৬) - মুহাম্মদ নুরুদ্দীন

১৪. ফুলকুঁড়ি দ্বিতীয় পাঠ, (জানুয়ারি ২০০১) - মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ও সেখ নাসিরউদ্দীন আহমদ

১৫. ফুলকুঁড়ি তৃতীয় পাঠ, (জানুয়ারি ২০০১) - মুহাম্মদ নুরুদ্দীন

১৬. ফুলকুঁড়ি চতুর্থ পাঠ, (মার্চ ১৯৯৭) - মুহাম্মদ নুরুদ্দীন

১৭. এসো জীবন গড়ি, (জানুয়ারি ২০০৩) - আবদুল মাবুদ

১৮. আমাদের ছড়া ১ (মার্চ ২০০৪) - শেখ ফজলুর রহমান

১৯. আমাদের ছড়া ২ (জানুয়ারি ২০০১) – মুহাম্মাদ নূরুদ্দীন

২০. এসো পড়তে শিখি (এপ্রিল ২০০৫) - বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট

২১. ইসলাম শিক্ষা, (২০০৬) - আফযাল হোসেন ও আবদুল মাবুদ

২২. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা - ১, (ফেব্রুয়ারি ২০০৬) মুহাম্মদ নুরুদ্দীন

২৩. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা - ২, (ফেব্রুয়ারি ২০০৬) মুহাম্মদ নুরুদ্দীন

২৪. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা - ৩, (ফেব্রুয়ারি ২০০৬) মুহাম্মদ নুরুদ্দীন

২৫. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা - ৪, (জানুয়ারি ২০১৬) মুহাম্মদ নুরুদ্দীন

২৬. ছড়া ও রাইম্‌স্‌, (জানুয়ারি ২০১৭) - ছাত্রবন্ধু প্রকাশন

২৭. শিশুকথা প্রবেশিকা - জামান মুস্তাফিজুর রহমান (প্রকাশকাল অনুল্লিখিত)

২৮. শিশুকথা প্রথম ভাগ - জামান মুস্তাফিজুর রহমান

২৯. শিশুকথা দ্বিতীয় ভাগ - জামান মুস্তাফিজুর রহমান

৩০. শিশুকথা তৃতীয় ভাগ - জামান মুস্তাফিজুর রহমান

৩১. শিশুকথা চতুর্থ ভাগ - মোহাম্মদ হাদিউজ্জামান,

৩২. ইসলামি বর্ণপরিচয়, (প্রকাশকাল অনুল্লেখিত) - নাজ বুক ডিপো

৩৩. ছড়া ছবিতে একের ভিতর তিন [ইসলামী কায়দা] (প্রকাশকাল অনুল্লিখিত) – অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল ইসলাম

৩৪. ইসলামি সাহিত্য পাঠ (প্রকাশ সাল অনুল্লিখিত) অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল ইসলাম

উপরের তালিকায় আমরা উনিশ শতকের ইসলামি প্রাইমারের রচয়িতা হিসেবে মীর মশাররফ হোসেনের বিখ্যাত প্রাইমার 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা'কে গ্রহণ করেছি এবং তার পাশাপাশি আমাদের প্রস্তাবিত সময়কালের আরো ৩৩ টি প্রাইমারকে নির্বাচন করেছি। উনিশ শতকে মুসলমান লেখকদের হাতে রচিত প্রায় ষোলোটি প্রাইমারের অস্তিত্বের কথা গবেষক আশিস খাস্তগীর মহাশয় আমাদের অবগত করলেও, সেগুলির কোনো কপির হদিশ পাওয়া যায়নি। তাই কেবলমাত্র 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা' প্রাইমারটিকে মুসলমান রচিত আদি প্রাইমারের নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করে আমরা মূলত আমাদের প্রস্তাবিত সময়কালে রচিত প্রাইমারগুলির সঙ্গে আদি প্রাইমারটির হেরফের কিংবা সাদৃশ্যের জায়গাগুলি যেমন চিহ্নিত করতে পারবো তেমনই সেকালে এবং একালে ইসলামি প্রাইমারসমূহে মুসলমান ও হিন্দুর আত্ম-অপর সম্পর্কের বিন্যাসটি বিশ্লেষণে অগ্রসর হবো।

৪.০২. মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা : মুসলমান 'আত্ম' ও হিন্দু 'অপরত্ব'র বিন্যাস

বর্ণপরিচয় এর ৪৮ বছর পর ১৯০৩ সালে বেরোয় মীর মশাররফ হোসেনের বাংলা প্রাইমার 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা'। বইটির আখ্যাপত্রে লেখা আছে : 'শ্রী মীর মশাররফ, প্রণীত', 'কলিকাতা টালিগঞ্জ শ্রী মীর এব্রাহিম হোসেন দ্বারা প্রকাশিত'।

'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা' কেন লেখা হয়েছে তার কৈফিয়ত দিয়েছেন লেখক প্রথম ভাগের প্রথম অংশের বিজ্ঞাপন অংশে। সেখানে মীর সাহেব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন -

> মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা প্রথম ভাগ প্রকাশিত হওয়ার পর খোদাতালার কৃপায় অনেক গ্রাম্য বক্তব্য মাদ্রাসায় আদরের সহিত গৃহীৎ হইয়াছে এবং হইতেছে। সকল স্থান হইতেই ইহার বর্ণপরিচয় বানান ইত্যাদির সর্ব্বপ্রথম অংশ চাহিতেছেন । তাহাদের আদেশ ও উপদেশ ক্রমে মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষার সর্ব্বপ্রথম অংশ প্রকাশ করিলাম। এইখানে মুসলমান বালক বালিকাগণের সামান্য উপকার হইলেই শ্রম সফল মনে করিব। [১৪৩]

লক্ষ করবার বিষয় লেখক এখানে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর এই শিশুপাঠ্যপুস্তকটি কেবলমাত্র মুসলমান বালক বালিকাদের বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য রচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করবো এর পূর্বে রচিত একাধিক প্রাইমারে হিন্দু 'আত্ম' প্রতিষ্ঠার তাগিদ ও যাবতীয় আয়োজন থাকলেও কোথাও লেখক এভাবে গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানিয়ে দেননি যে,

সেটি হিন্দু বালক বালিকাদের নাকি মুসলমান বালক বালিকাদের জন্য রচিত হয়েছে। অর্থাৎ মীর মশাররফ গোড়া থেকেই তার রচিত প্রাইমারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল যে এই প্রাইমার কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্যই রচিত। স্বাভাবিকভাবেই এখানে যে ইসলামি আত্ম অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

অতঃপর আসা যাক এই প্রাইমারের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে। লেখক প্রাইমারটির প্রথম ভাগের প্রথম অংশের প্রথম পাঠ শুরু করেছেন আল্লাহ তায়ালার নাম স্মরণের মধ্যে দিয়ে

বেসমেল্লা হের্ রাহমাঁনের রাহিম

দাতা দয়ালু খোদাতালার নামে আরম্ভ করিতেছি হয়।[১৪৪]

গ্রন্থের সূচনায় এ'রকম ধর্মীয় আবহ নির্মাণই বুঝিয়ে দেয় এই পুস্তক পাঠের উদ্দেশ্য ও অভিমুখকে কী হতে চলেছে। অতঃপর এই প্রাইমারটির প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠে আসে বর্ণ ও শব্দ পরিচয়ের পর্ব। সেখানে লেখক 'রতন, নরম, চরম, সরস' প্রভৃতি শব্দ শিখনের পাশাপাশি 'ফজর', 'ফরজ', 'কবর' প্রভৃতি শব্দও পাঠককে চিনিয়ে দেন। শব্দ পরিচয় পর্বের শেষে আসে বাক্য পরিচয় অংশ। সুতরাং চতুর্থ পাঠে শুরু হয় শিক্ষার্থীদের প্রতি লেখকের কড়া নির্দেশ এবং উপদেশ -

তুমি মুসলমান।

টুপি নাই কেন?

খালি মাথা ছি ছি।

চাদর আর ধুতি।

হরি বাবুর নাতি।

পায়জামা চাপকান্।

হয় শেখ নয় পাঠান।

লক্ষ করবার বিষয় লেখক এখানে শৈশবেই তাঁর উদ্দিষ্ট পাঠকের কাছে 'মুসলমানের' যাবতীয় চিহ্নকে স্পষ্ট করতে চাইছেন এবং তা ধারণ করতে প্ররোচিত করছেন। সেইসঙ্গে এখানে হিন্দুকে অপরপক্ষে ঠেলে দিয়ে 'শেখ ও পাঠানের' পোশাক গৌরবের কথা বলছেন। 'খালি মাথা' ইসলামে বরদাস্ত নয়, চাদর আর ধুতিও ইসলামী পোশাক নয়' তাই লেখক খালি মাথার ধুতি

চাদ পড়া হরিবাবুর নাতিদের 'ছি ছি' বলেত দ্বিধা করেননা। এখানে ভিন্ন রুচিকে প্রতিহত ও নাকচ করে ইসলামের একপেশে সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার যেমন আগ্রাসী প্রবণতা আছে, তেমনই 'শেখ ও পাঠান'দের মতো আশরাফ মুসলমানের প্রতি শ্রেষ্ঠত্বেরও ইঙ্গিত আছে।

'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা'র পঞ্চম পাঠ শুরু হয় ওসমান নামক একজন প্রশ্নকর্তা ও রমজান নামক একজন জবাবদাতার কাল্পনিক সংলাপের মধ্যে দিয়ে। এই পাঠে মুসলমান ছাত্রের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে লেখক অবহিত করতে চেয়েছেন -

ও। তোমার নাম কি?

র। আমার নাম রমজান গাজী

ও। তোমার হাতে কি কেতাব?

ও। আমপারা

র। তোমার বাপের নাম কি

ও। মহরম গাজী ফকির।

...

জানি ভাই জানি। তোমার বাপকে খুব চিনি। তিনি একজন দরবেশ খুব নামাজী। রোজ রোজ রোজা রাখেন সারারাত এবাদত করেন তুমি ভাই মহরম এর ছেলে। না হবে কেন? আমপারা শেষ হয়েছে কি?

র। তিনটি সূরা হলেই সারা হয়।

ও। বেশ বেশ।

র। সালাম সাহেব। আমি এখন যাই। দেরি হলে মৌলবি সাহেব রাগ করিবেন। আমার সালাম আমি আর থাকিতে পারি না।

১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর 'বর্ণপরিচয়'-এ গড়ে তুলেছিলেন উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ অনুগত বালক গোপালকে আর তার ৫৩ বছর পর ১৯০৮ সালে মীর মশাররফ হোসেন তার 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা' গ্রন্থে আদ্যপ্রান্ত একজন মুসলমান বালক রমজানকে গড়ে তুলেছেন

গোপালেরই আদর্শে, যে কিনা তার বাপ মা এবং মৌলভী সাহেবের আনুগত্যে বশীভূত। মদনমোহন তর্কালঙ্কাকারের 'শিশুশিক্ষা -১' এ শোনা গিয়েছিল : 'তোমার হাতে কি পুঁথি?' উত্তর ছিল : 'আমার হাতে শিশুশিক্ষা'। আর মীর মশাররফ হোসেনের প্রাইমারে জনৈক ওসমানের জিজ্ঞাসা : 'তোমার হাতে কি কেতাব?' এখানে রমানাথের পরিবর্তে উত্তর দেয় রমাজন : 'আমপারা'। লক্ষণীয় 'বই' এর স্থানে 'কেতাব', রমানাথের স্থানে 'রমজান', 'শিশুশিক্ষার' স্থানে 'আমাপারা' ইত্যাদি আমাদেরকে এই প্রাইমারের গোত্র বিচারে যথেষ্ট রসদ যোগায়।

প্রসঙ্গত লক্ষ করবার বিষয় রমজানের বাবা মহরম গাজী চরিত্রটিকে। তিনি 'খুব দরবেশ মানুষ' এবং 'রোজ রোজা রাখেন ও সারারাত ইবাদত করেন'। তবে কি মশাররফের দৃষ্টিতে রোজদার, ইমানদার, বান্দা মানুষই কাঙ্ক্ষিত? যার প্রাথমিক তালিম সম্পন্ন হয়েছে বলেই আমরা রমজানকে প্রশংসিত হতে দেখি?

রমজানের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখে, রমজানদের নির্মাণের উদ্দেশ্যেই এই প্রাইমারটি শেষ হয়। দ্বাদশ পাঠে 'বালকগণের প্রতি' পাঠে সকল বালককে উদ্দেশ্য করে লেখকের বাণী –

> আল্লার নাম করি সবে ফজরে উঠিবে,
>
> মুখ ধুয়ে অজু করে নামাজ পড়িবে।
>
> তারপর আমপারা হাদিস কোরাণ,
>
> যার যাহা পাঠ্য থাকে পড়িবে শ্রীমান।
>
> শেষে এই বাঙ্গালা শিক্ষা অবশ্য পড়িবে,
>
> খোদার ফজলে দিন কায়েম থাকিবে।[১৪৫]

লক্ষ করবার বিষয় আদর্শ বালক তৈরি করবার জন্য যে ধর্মবোধ এবং হাদিস কোরানের অনুশীলন দরকার তার বিধিবদ্ধ দিনলিপি তৈরি করে দিচ্ছেন যেন মীর মশাররফ। এ'প্রসঙ্গে সেইসময়ের বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক ও সামাজিক দাবি দাওয়াগুলিও আমাদের মনে পড়বে।

১৯০৩ / ১৯০৬ এ 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল, আর ১৯০৮ এ দ্বিতীয় অংশটি। এই সমসাময়িককালে ১৯০২ সালের ২৪ মে কার্জন হুকুম দিচ্ছেন – 'বাংলার মানচিত্র নতুন করে আঁকা হোক', ১৯০৫ এর ১৬ অক্টোবর যাবতীয় উপরোধ ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও

বঙ্গভঙ্গ হয়। আর ঢাকায় ১৯০৬ এর ৩০ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারত মুসলীম লীগ'। মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা দিবসে ময়মনসিংহ জেলা নিবাসী ইব্রাহিম খাঁ 'লাল ইস্তেহার' নামে একটি পুস্তিকা বিলি করেন। সেই পুস্তিকার মুখ্য বক্তব্য – 'বঙ্গ বিভাগে মুসলমানের নিশ্চয় উন্নতি হইবে'।[১৪৬] সেইসঙ্গে মুসলমানদের কার্যপন্থা সম্পর্কে এ'কথা বলা হল যে, 'হিন্দুগণ তাঁহাদের আন্দোলনের নাম 'স্বদেশী আন্দোলন' রাখিয়াছেন। আমরা আমাদের আন্দোলনের নাম 'স্বজাতি আন্দোলন' রাখিলাম'।[১৪৭] এইসময়ে 'লাল ইস্তেহার' থেকে আবৃত্তিযোগ্য কিছু কবিতাও জনমানসে ব্যাপক সাড়া ফেলে। যথা –

জাগরে মোস্‌লেমগণ জাগ একবার,

আলস্য জড়তা কর পরিহার।

... শিখিব করিব মোরা যত শিল্প আছে,

যাব না কখন মোরা বিজাতির কাছে।

... কর যোড়ে কই এবে শুনরে মোস্‌লেম।

হিন্দুর সহিত আর বাড়াইও না প্রেম।

... মোস্‌লেম অধম সেই মোস্‌লেম অধম,

হিন্দুর সহিত কর বন্দেমাতরম'।[১৪৮]

বিজাতির কাছে না যাওয়া, বিজাতির প্রাইমারে আশ্রয় না নেবার জন্যই তো মুসলমানের জন্য পৃথক প্রাইমারের প্রয়োজন। সেইসঙ্গে 'স্বজাতি আন্দোলনে' সামিল করবার জন্য স্বজাতিকে যেভাবে গুণান্বিত হতে হবে তারই তো মাপকাঠি খাড়া করা হচ্ছে শিশুপাঠ্য পুস্তকে। 'হরি বাবুর নাতি'দের সঙ্গে পোশাকে আশাকে যেমন গড়মিল আছে তেমনই রাজনৈতিক মঞ্চেও তাঁদের চিন্তা চেতনার সঙ্গে বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়েছে সেকালে।

৪.০২.০১ আমাদের প্রিয় নবী: মুসলমান 'আত্ম' ও হিন্দু 'অপরত্ব'র বিন্যাস

আবদুল মাবুদ প্রণীত 'আমাদের প্রিয় নবী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। এটি বর্ণপরিচয়ের উদ্দেশ্য রচিত হয়নি তবে এটি প্রাথমিক স্তরের শিশুপাঠ্য পুস্তক। তাই এটিকে আমরা ইসলামী

প্রাইমারের বর্গে রেখেই আলোচনায় অগ্রসর হবো। প্রাইমারটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে –

> প্রিয় নবীর জীবনকথার চাইতে ভালো উপহার কচি-কিশোরদের জন্য আর কি হতে পারে! জীবন গঠনের জন্য প্রিয় নবীর জীবনের চাইতে ভালো আদর্শ আর কি হতে পারে! বাংলায় শিশুদের উপযোগী করে লেখা প্রিয় নবীর জীবন কথার যথার্থ অভাব রয়েছে। এ অভাব পূর্ণ করার জন্য আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।
>
> এ জীবন কথা পড়ে দুটি কচি-কিশোরও যদি সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়, দুটি কচি-কিশোরও যদি এ জীবনকথায় বিবৃত যথার্থ নবী চরিত্রে নিজেদেরকে রঞ্জিত করতে পারে তাতেই এর সার্থকতা।
>
> গুণী অভিভাবক ও শিক্ষক সমাজ ... শিশুদের প্রয়োজন মতো সাহায্য করলেই তারা এ বই থেকে যথার্থ উপকৃত হতে পারবে বলে আশা করি।[১৪৯]

উদ্দেশ্যের দিক থেকে লেখক স্পষ্ট যে, সম্পূর্ণভাবে ইসলামি ন্যায় আদর্শ ও নবী চরিত্রের আদলে মানুষ গড়াই তাঁর লক্ষ্য। স্বাভাবিক ভাবেই এই শিশুপাঠ্য পুস্তকটির আদ্যপান্ত ইসলামি ইতিহাস, জীবনাদর্শ ও নীতিবাক্য দিয়ে ঘেরা। এই পুস্তক সজ্জিত হয়েছে নানা পাঠে। যথা – নবী কাকে বলে? প্রিয় নবী কেমন ছিলেন?, প্রিয় নবীর প্রিয় কথা, আমাদের উপর প্রিয় নবীর অধিকার ইত্যাদি ভাগে। কাজে কাজেই এখানে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন জীবন সংস্কৃতির কোনো জায়গাই নেই।

৪.০২.০২: ছোটদের দুআ: মুসলমান 'আত্ম' ও হিন্দু 'অপরত্ব'র বিন্যাস

নিযামুদ্দিন মোল্লা প্রণীত 'ছোটদের দুআ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। প্রকাশক – 'বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাষ্ট'। এটিও বর্ণশিক্ষার বই নয়, তবে শিশুদের ধর্মশিক্ষার বই। ইসলাম ধর্মাবলম্বী শিশুদের 'খোদাগত প্রাণ' করে তোলবার তাগিদেই এই পুস্তকটি রচনা করা হয়েছে। মুখবন্ধে বলা হয়েছে – 'এই সুন্দর ও একান্ত প্রয়োজনীয় পুস্তকটি সচেতন অধ্যয়নে ছোটোরা যেমন খোদাগত প্রাণ হয়ে গড়ে উঠবে, সেইসঙ্গে বড়োরাও কম উপকৃত হবেন না। ... পুস্তিকাটি একদিকে যেমন প্রতিটি বালক বালিকার হাতে যাওয়া অপরিহার্য, তেমনই প্রতিটি মুসলিম গৃহে সমাদৃত হবে সর্বান্তঃকরণে এ কামনা করি!"[১৫০]

বইটির ভূমিকা অংশে লেখক জানিয়েছেন – 'বাংলা ভাষায় ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের এ ধরণের মাসনুন দো'আর বই এর অভাব বহুদিন যাবৎ অনুভূত হচ্ছিল। ... এইসব দো'আর মাধ্যমে তারা আল্লাহির নিকটবর্তী হবে ও সফলতা লাভ করবে।"[১৫১] অর্থাৎ মূল পাঠের সঙ্গে সঙ্গে শিশুপাঠককে 'অপরিহার্যভাবে' এই বই পাঠ করানো হয় এবং পারলৌকিক সাফল্য লাভের পথে চালিত করা হয়।

বইটিতে মোট ৮০ টি দোয়া সন্নিবেশিত হয়েছে। সকালে ঘুম ভাঙা থেকে রাত্রে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটিক্ষণ শিশুদের জীবন শৃঙ্খলিত ও 'আখেরাতে সফল' করে তোলবার জন্য এই দোয়াগুলির সংকলন। উল্লেখযোগ্য দোয়া – 'ঘুমানোর সময়ের দোয়া', 'ঘুম থেকে ওঠার পরের দোয়া', 'প্রস্রাব পায়খানা থেকে বের হবার দোয়া', 'প্রস্রাব পায়খানাতে প্রবেশ করার দোয়া', 'খাওয়া আরম্ভ করার দোয়া', 'খাওয়া সমাপ্ত করার পরের দোয়া', 'ঘর থেকে বের হবার সময়ের দোয়া' ইত্যাদি জীবন যাপনের প্রতিটি বিষয়ের দোয়া।

৪.০২.০৩: সালাফী বর্ণপরিচয় : মুসলমান 'আত্ম' ও হিন্দু 'অপরত্ব'র বিন্যাস

'সালাফী বর্ণপরিচয়' ইসলামি প্রাইমারের একটি উল্লেখযোগ্য সিরিজ। এর মোট তিনটি ভাগ। যথা – 'সালাফী বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ' (১৯৮৭), 'সালাফী বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ' (১৯৮৭) ও 'সালাফী সাহিত্য বীথি' (১৯৯০)।

এই প্রাইমার রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'প্রসঙ্গ কথা' অংশে লেখক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন :

> ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় কতিপয় বর্ণপরিচয় লেখা হয়েছে। কিন্তু তার অধিকাংশ 'আল্লা-হ এবং লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'র ভাব বর্জিত। এমতাবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীসের উদ্যোগে আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়াচসহ ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়মূলক একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান – জামেআ রহমানিয়া – নামে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ... ঐসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সমন্বিত করে ... প্রিয় নবীর পূর্ব নির্দেশিত পথপ্রদর্শন অনুযায়ী বাংলা ভাষায় কিছু পাঠ্য পুস্তক তৈরির প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। তাই এই প্রয়োজনে ফলশ্রুতি হিসেবে শিশু ও প্রথম শ্রেণির পাঠ্যরূপে "সালাফী বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ" প্রকাশিত হল। বই দুটি পাঠ কোরে কচিকাঁচা শিশুরা যদি লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হর ভাব ধারায় উজ্জীবিত হয় তাহলে আমাদের মেহনত সার্থক হবে – ইন-শা-আল্লাহ্‌।[১৫২]

অতঃপর ‘প্রসঙ্গ কথা’ অনুসারেই এই প্রাইমারটির পাঠ প্রদত্ত হয়েছে। আল্লহ্‌র একত্ব এবং ‘মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রসূল’ এই ভাবধারাকে সামনে নিয়ে চালিত হয়েছে ‘সালাফী বর্ণপরিচয়’। তাই শুরুতেই ‘বর্ণপরিচয়’ অংশে আমরা পাই –

অ – অযূ করে পাক হও

আ – আল্‌লার নাম লও

ই – ইসলামকে আঁকড়ে ধর

ঈ – ঈমানকে মযবুত কর

আবার ব্যঞ্জনবর্ণ শিখনকালে লেখা হয়েছে –

ক – কুর আন পড়ো সাঁঝ সকালে

খ – খোদার রহম পাবে তাহলে

ছ – ছলনাকাড়ির পরিণাম

জ – জান্নাত নয় জাহান্নাম

ট – টুপী হল ইসলামী সাজ

ঠ – ঠগবাজী বেঈমানী কাজ

অ – কার যোগে বাক্য শব্দ পরিচয় অংশে –

ফরজ, কবর, নফল, গযব, বরকত, রহমত, মকতব, যমযম প্রভৃতি শব্দ যেমন আছে তেমনই বাক্য পরিচয় অংশে আছে –

> ‘ফজর হল। রব বল। ... কবর নরক ভয় কর। ফরয পড় সময় মতো। যমযম বরকতময়। হযরত ওমর অমর।”[১৫৩]

আ – কার যোগে শব্দ পরিচয় অংশে –

নামায, সালাম, কালাম, হারাম, মক্‌কা, আল্‌লা প্রভৃতি ধর্মীয় শব্দ যেমন আছে তেমনই কাক, সাপ, বাবা দাদা, মামা, সখা ইত্যাদি ধর্মনিরপেক্ষ শব্দও আছে।

আ – কার যোগে বাক্য পরিচয় অংশে পাই –

সকাল সকাল ওঠ। আল্‌লা-হ আল্‌লা-হ বল। বয়স যার সাত হল তার উপর নামায চাপল। ... আযান দাও, পড় নামায। ... রমাযান আল্‌লার খাস অবদান। ... হযরত উসমান মহান দাতা ও দয়াবান।[১৫৪]

এই প্রাইমারটির আদ্যোপান্ত 'ইসলামী ভাবধারা' ও সংস্কৃতির পরিচয় থাকলেও গুটিকয়েক ক্ষেত্রে হলেও অপরপক্ষ হিসেবে অনৈস্লামিক শব্দ ও নামের সঙ্গে পরিচয় আছে। যথা –

ক. রবিঠাকুর কবিগুরু (পৃ. ১৯)

খ. কেশববাবু পড়ছে বেদ। তার মনে নেই খেদ। (পৃ. ২২)

গ. রবিঠাকুর পেয়েছিলেন নাইট খেতাব। (পৃ. ২২)

ঘ. শৈবাল বাবু খুবই বৈষয়িক (পৃ. ২৩)

ঙ. গৌরীবাবু মৌড়ী খায় (পৃ. ২৪)

চ. শংখ ও কংস বাজাবে না। (পৃ. ২৬)

'সালাফী বর্ণপরিচয়' প্রথমভাগে সংকলিত হয়েছে মোট সাতটি ছড়া কবিতা যার মধ্যে পাঁচটির রচয়িতা মুসলমান সমাজের কবি যথা – গোলাম মোস্তফা, শেখ আইনুল বারী তিনটি কবিতা, মাওলানা মোযাফ্‌ফার হোসেন বর্ধমানী; বাকি দুটির রচয়িতা মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

'সালাফী বর্ণপরিচয়' প্রথমভাগ শেষ হচ্ছে একটি প্রাসঙ্গিক ছড়া দিয়ে, যার মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় ভাগ পাঠের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে –

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা / পড়বি কে কে আয়, / সালাফী ঢঙে বের হয়েছে / "বর্ণ পরিচয়'।

কোরআন ও হাদীসের / কথা মোরা শিখবো, / মাতৃভাষা বাংলায় তা / ফুটিয়ে মোরা তুলবো।

...খেলাধূলার মাঝেও মোরা / আল্‌লাকে কেউ ভুলবো না, / লেখাপড়া শিখবো সেথায় / ঝগড়া কভু করবো না।[১৫৫]

'সালাফী বর্ণপরিচয়' এর দ্বিতীয় ভাগের 'প্রাসঙ্গিক বক্তব্য' থেকে এই প্রাইমারটি রচনার উদ্দশ্য স্পষ্ট হয়। শিশুদের স্মরণশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাদের মস্তিষ্ককে অতি সহজে ইসলামি পথে চালিত করবার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে :

ঐ সময় শিশুরা যা মুখস্থ করে তা তাদের মনের মণিকোঠায় পাথরের মতো দাগ কাটে। ... সুতরাং ... শিশুদের শিশুমনে পাথরের মতো দাগ কাটার মতো যে শিক্ষা দেওয়া হবে তা যেন ইসলামী বুনিয়াদি শিক্ষা অবশ্যই হয়।"[১৫৬]

একথা বলার পর গ্রন্থকার সংশয়ের সঙ্গে জানাচ্ছেন যে, ইসলামী ভাবধারাকে প্রসারের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলির রচয়িতারা কোরআন ও হাদিস সম্পর্কে অভিজ্ঞ নন, তাই সেইসমস্ত বইতে ইসলাম বিরোধী বেদআতী ভাবধারাও স্থান পেয়েছে বলে লেখকের ধারণা। তাই 'ঐ প্রয়োজন ও গুরুত্বের তাগিদেই কোরআন ও হাদীসের নির্ভেজাল ভাবধারায় সালাফী বর্ণপরিচয় ... প্রকাশিত হল।"[১৫৭]

স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয়ভাগেও এসেছে ইসলামি নানা প্রসঙ্গ। যথা নীতিশিক্ষা, ধর্মীয় জ্ঞান ও ব্যবহারিক জীবন পরিচালনার নানা ইসলামি আদর্শ। মূলত কোরান ও হাদিসের তরিকা মেনে শিশুর জীবন চালনার পথ বাতলে দেওয়াই এই প্রাইমারটির লক্ষ্য। তাই এই বইয়ের থরে থরে সাজানো হয়েছে ইসলামি 'আত্ম' প্রতিষ্ঠার নানাবিধ উপকরণ। নীচে কয়েকটি নমুনা পেশ করা হল –

ক. সর্বদা আল্লাহ্‌রই আশ্রয় চাও। (পৃ. ৪)

খ. সবরকম প্রশংসার একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তাআলা।(পৃ. ৪)

গ. হযরত ফাতেমা সতী ও সাধ্বী নারী (পৃ. ৫)

ঘ. আল্লাহ্ আল্লাহ বল। রসূলুল্লাহ্‌র পথে চল। (পৃ.৫)

ঙ. সর্বদা দুনিয়াদারীতে মগ্ন থাকবে না। (পৃ. ৬)

চ. আমরা সবাই শেষ নবীর উম্মত (পৃ. ৬)

ছ. মুসলমানদের পবিত্রধাম মক্কা (পৃ. ৭)

জ. ডঃ শহীদুল্লাহ ছিলেন এশিয়া মহাদেশের এক বিদগ্ধ প্রতিভা (পৃ. ৮)

ঝ. শুদ্ধ মনে আল্লাহর নিকট কর ফরিয়াদ (পৃ. ৮)

ঞ. খাঁটি মুসলমান ইসলামের কট্টর সমর্থক (পৃ. ১১)

ট. কেবল আল্লাহর প্রেমেই হও মত্ত (পৃ. ১১)

ঠ. বেগম রোকেয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মহিলা ছিলেন (পৃ. ১৯)

ড. সত্যিকারের মুসলমান কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারে না (পৃ. ২০)

ঢ. ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে একজন শূদ্রেরও সম্ভ্রম খলিফার সমান হয়। (পৃ. ২০)

ণ. তোমাদের বয়স এখন ছয় কিংবা সাত হবে। ... তোমারা এখন থেকেই নামায পড়া শেখো। নামায পড়লে নামযির স্বভাব-চরিত্রও ভাল হয়। (পৃ. ২৪)

ত. মহাগ্রন্থ আল্‌কুরআন মন্থন কর। (পৃ. ১২)

প্রাইমারটির অধিকাংশ পরিসর জুড়ে ইসলামি ভাবধারার বিস্তার লক্ষিত হয়েছে [নিম্ন রেখাঙ্কিত শব্দগুচ্ছ দ্রষ্টব্য] তবে কয়েকটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে অপরপক্ষ হিসেবে অনৈস্লামিক কিছু প্রসঙ্গ এসেছে। যথা –

ক. ল-ফলা যোগে শব্দ গঠনে – "এটা কি বেদের শ্লোক?" (পৃ. ৫)

খ. হিন্দুরা বাজায় শঙ্খ (পৃ. ৯)

গ. রোজা ও ঈদের ব্যাপারে পঞ্জিকার উপর ভরসা করা যাবে না (পৃ. ১০)

ঘ. চণ্ডাল থাকে শ্মশান ডাঙ্গায়। (পৃ.১১)

ঙ. গামা পালোয়ান মুদ্গর ঘোরাতেন। (পৃ. ১২)

চ. গান্ধীজী খদ্দর পরতেন। (পৃ. ১২)

ছ. স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন নামকরা সন্ত। (পৃ. ১২)

ছ. নাথুরাম গান্ধীজীর হন্তা। (পৃ. ১২)

জ. তপস্বী বল্কল পরেন। (পৃ. ১৪)

ঝ. নাস্তিকরা নাস্তিক্যবাদ বিস্তারে খুবই সক্রিয় (পৃ. ১৬)

ঞ. হরিদাস মুন্দ্রা ছিলেন এক বিখ্যাত ধনী (পৃ. ১৯)

ট. তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস ইসলামী ধ্যানধারণার বিরূপ (পৃ. ১৯)

ঠ. ইসলাম কখনো সন্ন্যাসব্রত সমর্থন করে না। (পৃ. ২০)

ড. মুসলমানদের মধ্যে কোন সন্ন্যাস্যী থাকতেই পারে না। (পৃ. ২০)

নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা আলোচ্য প্রাইমারে অপরপক্ষ হিসেবে অনৈস্লামিক শব্দ ও প্রসঙ্গগুলিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছি। এখানে লক্ষ করবার বিষয় অপরাপর ইসলামি প্রাইমার অপেক্ষা এই প্রাইমারটিতে অমুসলমান ব্যক্তিদের তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং তাঁদের আদর্শকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে যেসমস্ত ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধিনিষেধ কঠোরভাবে অলঙ্ঘনীয় সেইসমস্ত ক্ষেত্রে অমুসলমান সংস্কৃতিকে সজোরে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এই প্রাইমারটিতে সংকলিত কবিতার সংখ্যা মোট নয়টি। তার মধ্যে ধর্ম পরিচয়ে কেবলমাত্র দুজন হিন্দু কবির কবিতা সংকলনে গৃহীত হয়েছে; যথা – ঈশ্বর গুপ্তের 'বড় কে?' এবং যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'কাকাতুয়া'।

৪.০২.০৪: তা'লীমুল ইসলাম : মুসলমান 'আত্ম' ও হিন্দু 'অপরত্ব'র বিন্যাস

হযরত মুফতী মোঃ কেফায়াতুল্লাহ রচিত এবং মো. মাসরুর আহমেদ অনূদিত 'তা'লীমূল ইসলাম' বা 'ইসলাম শিক্ষা' বাংলা ভাষায় রচিত একান্তই ইসলাম শিক্ষা বিষয়ক ধর্মীয় প্রাইমার। এই প্রাইমারটির মূল লক্ষ্য বাংলা বর্ণ বা ভাষা শিক্ষা নয়, একমাত্র লক্ষ্য ইসলাম ধর্ম শিক্ষা ও ইসলামি চিন্তার প্রসার ঘটানো। এটি বিশেষত বিভিন মক্তব মাদ্রাসাতেই পাঠ্য। এই প্রাইমারে আরবি এবং বাংলা দুইরকম ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ইসলামি জ্ঞানকে পোক্ত করতে চাওয়া হয়েছে। তবে বাংলা ভাষাভাষী অধিক সংখ্যক পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভের আশায় এই প্রাইমারটিতে বাংলা ভাষাকেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে শিশু চিত্তে আত্মভাবনাকে দেবার কাজেই এই পুস্তিকাটি ব্যবহৃত হয়।

'তা'লীমুল ইসলাম' ৪ ভাগে বিভক্ত। এই চারটি ভাগেরই প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২ সালের মে মাসে। শব্দ, বর্ণ ও চিত্র পরিচয়হীন এই পুস্তিকাটি গোঁড়া থেকেই ইসলামি আত্মভাবনাকে মজবুত করতে প্রয়াসী।

প্রথমভাগের প্রথম পাঠের শিখনীয় বিষয় শিশু পাঠকের আত্মপরিচয় নির্মাণ। তাই প্রশ্নোত্তরের ছলে চলতে থাকে – "প্রশ্নঃ তুমি কে? / উত্তরঃ মুসলমান। / প্রশ্নঃ মুসলমানদের ধর্মের নাম কী? / উত্তরঃ ইসলাম"[১৫৮]। অতঃপর এই বইতে পাঁচটি কলেমার উচ্চারণ ও তার অর্থ, নামাজের নিয়ম, অজুর নিয়ম, অজু কাকে বলে, আযান কাকে বলে? সুরা কাকে বলে? নামায পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় সুরা প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া হয় এই প্রাইমারটিতে।

'তা'লীমুল ইসলাম' এর দ্বিতীয় ভাগের বিষয়বস্তু আল্লাহপাক সম্পর্কে মুসলানদের কাঙ্ক্ষিত ধারণা গঠন, ইসলামি কিতাবসমূহের ধারণা, আল্লাহর রসূল সম্পর্কিত ধারণা, ক্বিয়ামতের বর্ণনা, ক্বিয়ামত থেকে বাঁচার উপায় সমূহ এবং প্রাত্যহিক জীবনাচরণের নানা কৃৎকৌশল।

'তা'লীমুল ইসলাম' এর তৃতীয় ভাগের বিষয়বস্তু হিসেবে এসেছে ইসলামের একত্ববাদ, ফেরেস্তাদের প্রসঙ্গ, বিভিন্ন সাহাবাদের বিবরণ, মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য বিষয়ে ধর্মীয় জ্ঞান, নামাজের শর্ত এবং আযানের বিবরণ।

'তা'লীমুল ইসলাম' এর দ্বিতীয় ভাগের বিষয়বস্তু – ঈমান ও ভালোমন্দ কাজের বর্ণনা, বিভিন্ন প্রকার গুনাহর বর্ণনা ও তা থেকে মুক্তির পথ, বিদআত প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে ইসলামী আ'মল বা অনুশীলনের নানা প্রকরণের বর্ণনা। যথা – রোজা, যাকাত, ইতিকাফ। প্রসঙ্গত নানা ধরণের নামাযের কথা এখানে এসেছে।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে লক্ষ করবো এই বইটি মক্তব মাদ্রাসার শিশু পাঠককে ধাপে ধাপে ধর্মীয় জ্ঞান দান করে পূর্ণ জ্ঞানী করে তোলার সোপান। 'পূর্ণ জ্ঞানী' কথাটি এখানে হাস্যকর ঠেকলেও একথা অস্বীকার করা চলে না যে, ইসলামে কোরান হাদিসের জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান এবং শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। যিনি বা যাঁরা সেই জ্ঞান চর্চা করেন এবং সেই জ্ঞান দ্বারা চালিত হন তাঁরাই পূর্ণ জ্ঞানী। সেই অর্থে এই সমস্ত প্রাইমারগুলি শৈশব থেকেই শিশুর মানসপট দখল করতে আগ্রাসী ভূমিকা পালন করে, যেখানে তার সবটা জুড়েই কেবল কোরান ও হাদিসের বাণী ও নিয়ন্ত্রণ কায়েম থাকবে। তাই এই শ্রেণির প্রাইমারে কোনো ছবিও থাকে না, থাকে না কোনো ছড়া বা গল্প কবিতার স্পর্শ। স্বাভাবিকভাবেই এই ধরণের প্রাইমারে অপরপক্ষের মানুষ ও তাঁদের জীবন সম্পূর্ণভাবেই বর্জিত।

৪.০২.০৫: কচিকাঁচা : মুসলমান 'আত্ম' ও হিন্দু 'অপরত্ব'র বিন্যাস

আমাদের প্রকল্পিত সময়পর্বে রচিত ইসলামি প্রাইমারসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরেকটি প্রাইমার হল মশিয়ার রহমান মোল্লা 'কচিকাঁচা'। প্রাইমারটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৯ সালে, আমরা হাতে পেয়েছি এর দ্বিতীয় সংস্করণ যেটি পুস্তক ভারতী প্রকাশনী থেকে ২০২১ সালে বাজারে এসেছে 'কচিকাঁচা - ১' নতুন শিরোনামে। প্রকাশক ও রচয়িতার সঙ্গে কথা বলে আমরা জানতে পেরেছি প্রাইমারটির আর কোনো ভাগ প্রকাশিত হয়নি, তবে পরবর্তী সংস্করণ থেকে

২৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রথম ভাগে রাখা হবে এবং ২৯ থেকে ৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বাকি অংশ যেখানে ছড়া ও গদ্য পাঠের জায়গা রয়েছে সেই অংশটি দ্বিতীয় ভাগে রাখা হবে। এখন দেখা যাক প্রাইমারটির বিষয় বিন্যাসে মুসলমান-হিন্দু আত্ম-অপর সম্পর্ক কীভাবে রচিত হয়েছে।

প্রাইমারটির নিবেদন অংশ 'আরজ' – এ রচয়িতা এটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ছড়া আকারে বলেছেন – 'ফুলের মতো কচিকাঁচা / পড়ো কেতাবখানি ।/ ওহীর আলোয় বর্ণ শেখো, / হও বড়ো জ্ঞানী। / সামনে তোমার অনেক পথ, / চলতে হবে বুঝে। / সরল সঠিক খোদার পথ, / নিতেই হবে খুঁজে।। / ঈমান যদি আসে প্রভু, / ওদের হৃদয় মনে। / শ্রমটুকুই মোর সফল হবে, / শেষ বিচারের দিনে।"[১৫৯] অর্থাৎ 'ওহী' বা আল্লহর প্রত্যাদেশের আলোয় বর্ণ শিক্ষার পাশাপাশি জ্ঞানবান করে তোলাই এই প্রাইমারটির উদ্দেশ্য। সেইসঙ্গে একথা বলা হল যে, সামনের নানা জটিল ও কুটিল পথে সঠিকভাবে চলার জন্য খোদার পথকেই বেছে নিতে হবে এবং সেই পথ দেখাতে সাহায্য করবে এই প্রাইমারটি। সর্বোপরি ইমান অনয়নের লক্ষ্যেই প্রাইমারটির অবতারণা।

আলোচ্য প্রাইমারটির বর্ণপরিচয়, শব্দপরিচয় এবং বাক্য শিখন অংশের বৃহৎ পরিসর জুড়ে ইসলামি আত্ম নির্মাণ ও তাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়াই মূল অন্বিষ্ট। কয়েকটি নমুনা দ্বারা এই বিষয়টি বোঝানো হল –

বর্ণপরিচয় অংশ :

স্বরবর্ণ পরিচয় অংশে ইসলামি 'আত্ম' :	**ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয় অংশে ইসলামি 'আত্ম' :**
অ – অহী এলো হেরার গুহায়	ক – কোরান হল খোদার বাণী
আ – আল্লাহ দিল হুকুম ধারায়	খ – খোদা সবার মালিক জানি
ই – ইমাম ঐ খোৎবা পড়ে	ঙ – রাঙা ভোরে রহম ঝরে / মাঙো দোয়া ফজর পরে
ঈ – ঈমান আনো খোদার তরে	চ – চার খলিফা চির মহান
উ – উমরা করো খোদার টানে	ছ – ছয়টি ঋতু খোদার দান
ঊ – ঊষার আলো ফজর আনে	জ – জাহান্নামে আযাব বড়ো

এ – একরা হল প্রথম অহী	ড – ডাকো সবে নবীর পথে
ঐ – ঐশী বিধান খুবই সহি	ঢ – ঢাকো সতর দিনে রাতে
ও – অমর ফারুক সেরা বীর	ণ – মরণ পরে নতুন জীবন / ঈমান আমল করো স্মরণ
ঔ – ঔরঙ্গজেব জিন্দা পীর	ন – নামাজ কাযা বড় পাপ / ফরজ কাজে নেই মাফ
× × × × ×	য- যাকাত দাও খোদার ভয়ে
	র – রাখবে রোজা সেহেরী খেয়ে
	ল - লাইলাতুল কদর পূণ্যে ভরা
	ব - বনি আদম সৃষ্টি সেরা
	শ –শরীয়তের বিধান মেনো / সিভিল কোডে পতন জেনো

শব্দ পরিচয় অংশ :

	অ – কার যোগে	আ – কার যোগে	ই – কার যোগে	ঈ – কার যোগে	উ – কার যোগে	ঊ – কার যোগে	এ – কার যোগে	ঐ – কার যোগে	ও – কার যোগে
মুসলমান 'আত্ম' চিহ্নিত শব্দ	ফজর আসর ওশর আদম রহম বদর ফরজ নফল	হালাল হারাম হাশর জামাত যাকাত বাকারা আয়াত হায়াত	কিবলা খলিফা ফিকির জিহাদ তসবি মসজিদ হিজরত জিয়ারত	হাদীস নবী মদীনা তারাবী অহী হাজী মীরাস শরীয়ত	অজু রুহু নুহু রসুল মুমি খুৎবা কুরআন ফুরকান	নূর হূর সামূদ দরূদ	আলেম হাফেজ ফাতেমা মায়েদা খাদেজা সেজদা হেজাব বেলাল	তৈয়েব	জোহর ফরজ দোজখ মোনাজাত মোহরানা রোজাদার

	মহরম হজরত বরকত	ঈমান সাহাবা ইসলাম	শরিয়ত যিকির	তাফসীর তবলীগ	মুশরিক মুনাফিক মুহাজির		হেলাল কাফেলা ইজতেমা		
অনৈস্লামিক 'অপর' চিহ্নিত শব্দ	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	শৈল জৈন দৈব হৈম	× × ×

বাক্য পরিচয় অংশ

বাক্য	মুসলমান 'আত্ম' চিহ্নিত বাক্য	অনৈস্লামিক 'অপর' চিহ্নিত বাক্য
অ – কার যোগে বাক্য	হক বল। বদর চলো।	× × ×
আ– কার যোগে বাক্য	রমজান মাস। হালাল খাও। আযান হয়। যাকাত দাও। সাহাবারা মহান।	× × ×
ই – কার যোগে বাক্য	তিরমিযি হাদিস পড়ি। আবাবিল পাখি। যিকির জানি শরিয়ত মানি।	× × ×
ঈ – কার যোগে বাক্য	পড়ি নবীর জীবনী। মদিনা রাজধানী। হাজীরা ধনী। সহী হাদীস নবীর জানি।	× × ×
উ – কার যোগে বাক্য	রসুল ছিলেন খুব দয়ালু। মুহাজির হিজরত করে।	× × ×
ঊ – কার যোগে বাক্য	হূদ নবী। সামূদ জাতি। কুরআন রূপকথা নয়। জিব্রাইল আল্লাহর দূত।	শূকর পূত নয়
এ – কার যোগে বাক্য	সেজদা করো। ইজতেমা হেদায়েত নাও । বেলাল একজন সাহাবী। যায়েদ একজন লেখক। মায়েদা	× × ×

	কোরানের সুরা। মেয়েদের হেজাব ফরজ। সবার আগে ঈমান আনে হযরত খাদেজা।	
ঐ – কার যোগে বাক্য	দৈনিক মসজিদে যায়। কলেমা তৈয়েব শিখি।	× × ×
ও – কার যোগে বাক্য	বিয়েতে মোহরানা লাগে। মসজিদে জোহর পড়ি। একসাথে মোনাজাত ধরি। রবের কাছে দোয়া চাই। রজার মাসে কোরাআন পড়ি।	× × ×
ঔ – কার যোগে বাক্য	হোসেন একজন মৌলবী। ... তার অনেক তৌফিক।	× × ×

উপরের নমুনাটি আরো দীর্ঘ করা যেত, কিন্তু আমরা লক্ষ করেছি প্রায় প্রতিটি বর্ণে, শব্দে এবং বাক্য বাক্যে ইসলামী প্রসঙ্গ, ধর্মীয় অনুশাসন কিংবা ধর্মীয় আদর্শকে সংযুক্ত করা হয়েছে। যার নিরিখে বলা চলে যে এই ধরণের প্রাইমারের মূল লক্ষ্য হল শিশু শিক্ষার্থীর মস্তিষ্কে গোঁড়া থেকেই ইসলামি চৈতন্য পোক্ত করা।

আলোচ্য প্রাইমারটির ছড়া, গদ্য পাঠ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামি নিদর্শনের ব্যাপকতা লক্ষিত হয়েছে। প্রসঙ্গত এই প্রাইমারটিতে আমরা 'বর্ণপরিচয়' খ্যাত গোপালের অনুরূপ একটি বালকের আবির্ভাব লক্ষ করছি, যার নাম রফিক। উনিশ শতকে হিন্দুর হাতে রচিত প্রাইমার পাঠ করার পর মুসলমান সামাজের স্বাভাবিক একটি আক্ষেপ ছিল সেখানে গোপাল, রাখাল, কৃষ্ণ, রাম, শ্যামদের বাড়বাড়ন্ত; রহিম করিমদের অস্তিত্ব শূন্য। এই অভাব মেটাতেই বর্তমান প্রাইমার রচয়িতাকে গোপালের সাদৃশ্যেই গড়ে তুলতে হয় রফিককে। লেখক এখানে গোপালের যাবতীয় গুণ তার মধ্যে আরোপ করেছেন। আসুন গোপাল এবং রফিককে পাশপাশি রেখে পাঠ করা যাক এই অভিনব আখ্যান।

যেহেতু আমাদের মূল অন্বিষ্ট রফিকের চারিত্র অনুসন্ধান এবং তার সঙ্গে গোপালের মিল-অমিল খোঁজা তাই আমরা গোপালকেকে বাম দিকে এবং রফিককেকে ডানদিকের সারণিতে রাখলাম।

‘বর্ণপরিচয়’-এর গোপাল	‘কচিকাঁচা’র রফিক
গোপাল বড়ো সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন, সে তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভাল খাব, ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না। গোপাল আপনার ছোটো ভাই ভগিনীগুলিকে বড় ভাল বাসে। সে কখনও তাদের সহিত ঝগড়া করে না, তাদের গায়ে হাত তুলে না। এ কারণে তার পিতামাতা অতিশয় ভাল বাসেন। গোপাল যখন পড়িতে যায় পথে খেলা করে না। সকলের আগে পাঠশালায় যায়। পাঠশালায় গিয়া, আপনার জায়গায় বসে। আপনার জায়গায় বসিয়া, বই খুলিয়া পড়িতে থাকে, যখন গুরু মহাশয় নূতন পড়া দেন, মন দিয়া শুনে। খেলিবার ছুটি হইলে, যখন সকল বালক খেলিতে থাকে, গোপালও খেলা করে। আর আর বালকেরা খেলিবার সময়, ঝগড়া করে, মারামারি করে। গোপাল তেমন নয়। সে একদিনও কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করে না। পাঠশালার ছুটি হইলে, বাড়ি গিয়া, গোপাল পড়িবার বইখানি আগে ভাল জায়গায় রাখিয়া দেয়; পরে কাপড় ছাড়িয়া, হাত পা মুখ ধোয়। ... সে পাঠশালায় যাহা পড়িয়া আইসে, বাড়িতে তাহা ভাল করে পড়ে; পুরাণ পড়া গুলি দুবেলা আগা গোড়া দেখে। ... গোপালকে যে দেখে, সেই ভাল বাসে। সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত।[১৬০]	রফিক খুব সুবোধ বালক । সে রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে। ফজরের নামাজ শেষে কিছু সময় মসজিদে বসে। ইমাম সাহেবের কাছে আরবি পড়া শেখে। বাড়ি ফিরে ভাই-বোনদের সাথে পড়তে বসে। সে ভাই-বোনদের সাথে মারামারি করে না। রফিকের মা যখন যা কিছু খেতে দেয়, সে তাই খায়। খেতে বসে এটা খাব ওটা খাবো বলে সে উৎপাত করে না। পড়া শেষ হলে মায়ের সাথে কাজ করে। সে সদা পিতা-মাতার কথা শোনে। তাই তার পিতা-মাতা তাকে খুব ভালবাসে। সে রোজ বেলা দশটার সময় অপর বালকদের সাথে পড়তে যায়। যাবার সময় পথে খেলা করে না । কোনদিনও পড়া কামাই করে না। না বলে কারো জিনিসের হাত দেয় না । টিফিনের ছুটি হলে নিজের জায়গায় বসে পুরানো পড়াগুলো দেখতে থাকে। পড়ার ছুটি হলে সে হইচই করে ছোটাছুটি করে না । বই খাতা গুছিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ি ফেরে। হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসে। বৈকালে অপর বালকদের সাথে খেলা করে। খেলার সময় কাউকে গালি দেয় না। মাগরিবের আজান হলে নামাজ সেরে তাড়াতাড়ি পড়তে বসে। রাতে সব পড়া সারা হয়ে গেলে, সে ঘুমাতে যায়। পরিবারের কেউ পীড়িত হলে তার সেবা করে। সে জানে, দুঃখী মানুষের সেবা করলে নেকী হয়। সকলে রফিককে অতিশয় ভালোবাসে। [১৬১]

উপরের নমুনা দুটিতে পড়া নামক ক্রিয়া, সামাজিক-পারিবারিক সহবত, শৃঙ্খলিত মন, ভালো হয়ে ওঠবার উদগ্র বাসনা, অমানুষিক নিয়ন্ত্রণকামিতা গোপাল ও রফিক নামের দুটি ভিন ধর্মের বালককে এক নিবিড় সাদৃশ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। নিম্ন রেখাঙ্কিত বাক্যগুলিতে তাদের

সাদৃশ্যের বহর আরো ব্যাপকভাবে প্রমাণিত। শুধু কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের বৈসাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা হল – রফিক রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামজ পড়তে যা। বর্ণপরিচয়ের পাঠে গোপাল পাঠশালা যায় একথা স্পষ্ট, কিন্তু রফিক কথায় যায় তা স্পষ্ট নয়; বিদ্যালয়, নাকি মক্তব নাকি মাদ্রাসা? লেখক সুকৌশলে কেবলমাত্র জানিয়েছেন – 'সে রোজ বেলা দশটার সময় অপর বালকদের সাথে পড়তে যায়।" আরেকটি উল্লেখযোগ্য তফাৎ রচিত হয়েছে গোপাল ও রফিকে। সেটি হ'ল রফিক 'পরিবারের কেউ পীড়িত হলে তার সেবা করে। সে জানে, দুঃখী মানুষের সেবা করলে নেকী হয়।' এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। পাঠে ফজর এবং মাগরিব দু'ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের কথা আছে অবশ্য। অর্থাৎ রফিক শৈশব থেকেই নেকদার আমলওয়ালা বান্দা মানুষ। তাই পরিবারের কেউ পীড়িত হলে তাঁর সেবা করে বটে, তবে সে'সবের পেছনে থাকে পুণ্যার্জনের এক গোপন বাসনা। 'নেকি' লাভের ও তা সঞ্চয়ের বাসনা সে কথেকে পায়? কে দেয় সেই তালিম তাকে? বিদ্যালয় নাকি মাদ্রাসা? এই প্রশ্ন আমাদের মনে থেকেই যায়। আর সেই কৌতূহলে আরো ধোঁয়াশা সৃষ্টি করতেই বোধহয় লেখক রফিকের পড়তে যাওয়ার নির্দিষ্ট স্থানটি আমাদেরকে চেনানো থেকে বিরত থাকেন।

সমগ্র প্রাইমারটিতে অপর সমাজ, সম্প্রদায় ও জন জীবনের কোথাও কণো চিহ্ন নেই। কেবলমাত্র নবম পাঠে দেখা যায় হাসানের বড়ো ছেলে নজরুলের তিনদিন অসুখ। তাই সে 'ভোলা কবিরাজের দোকান থেকে অসুধ কিনলো।'[১৬২] ভোলা কবিরাজই এই প্রাইমারের একমাত্র হিন্দু প্রতিনিধি, যিনি তাঁর নিকটতম প্রতিবেশীর অসুখ নিবারণের জন্য ওষুধ বিক্রি করে পাশে থেকেছেন। অতি কিঞ্চিৎ এই পরিসর মুসলমান-হিন্দু আত্ম-অপর সম্পর্কের জটিল বিন্যাসকে যেমন চিহ্নিত করে তেমনই মনজগতে পারস্পরিকতার অভাবটুকুকেও প্রকট করে তোলে।

৪.০২.০৬: ফুলকুঁড়ি : মুসলমান 'আত্ম' ও হিন্দু 'অপরত্ব'র বিন্যাস

ইসলামি বাংলা প্রাইমারগুলির মধ্যে একটি লম্বা সিরিজের প্রাইমার হল 'ফুলকুঁড়ি' । এই সিরিজে আমরা মোট ৭ টি প্রাইমারের কথা পাচ্ছি। যেগুলি হল –

১. ফুলকুঁড়িদের অ আ ক খ, (প্রকাশকাল অনুল্লিখিত) -ছাত্রবন্ধু প্রকাশন

২. ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা - ১, (জানুয়ারি ২০০৬) - মুহাম্মদ নুরুদ্দীন

৩. ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা - ২, (মার্চ ১৯৯৭) - মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ও সেখ নাসিরুদ্দীন আহমদ

৪. ফুলকুঁড়ি প্রথম পাঠ, (মার্চ ২০০৬) - মুহাম্মদ নুরুদ্দীন

৫. ফুলকুঁড়ি দ্বিতীয় পাঠ, (জানুয়ারি ২০০১) - মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ও সেখ নাসিরউদ্দীন আহমদ

৬. ফুলকুঁড়ি তৃতীয় পাঠ, (জানুয়ারি ২০০১) - মুহাম্মদ নুরুদ্দীন

৭. ফুলকুঁড়ি চতুর্থ পাঠ, (মার্চ ১৯৯৭) - মুহাম্মদ নুরুদ্দীন

এই সিরিজের প্রাইমারগুলিতে প্রকাশকালের উল্লেখে কিছু গড়মিল থাকতে পারে আমাদের ধারণা, কেননা আমরা লক্ষ করেছি 'ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ১' যেখানে প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে ২০০৬ সালে, সেখানে 'ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২' এর প্রকাশকাল দেখছি ১৯৯৭ সাল। আবার 'ফুলকুঁড়ি প্রথম পাঠ' ২০০৬ সালে প্রকাশিত অথচ চতুর্থ পাঠের প্রকাশকাল দেখাচ্ছে ১৯৯৭। সেদিক থেকে আমাদের মনে হয়েছে পুস্তকে উল্লিখিত প্রকাশকালের ব্যাপারে লেখক ও প্রকাশকের সতর্কতার অভাব ছিল। তবে আমরা আলোচনার সুবিধার্থে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় – এই ক্রম মেনে প্রাইমারগুলির চরিত্র বিচারে অগ্রসর হবো। প্রসঙ্গত উপরোক্ত প্রাইমারগুলিতে মুসলমান-হিন্দ আত্ম-অপর সম্পর্কের বিন্যাস আলোচনা করা হল।

৪.০২.০৬.ক : ফুলকুঁড়িদের অ আ ক খ

'ফুলকুঁড়িদের অ আ ক খ' ছাত্রবন্ধু প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। তবে বইতে এই প্রাইমারটির প্রকাশকাল অনুক্ত আছে। প্রাইমারটি কেবলমাত্র ছবি ও ছড়াতে বর্ণপরিচয়ের জন্য রচিত হয়েছে। এটির স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয় অংশে মূলত ইসলামি চিন্তা ভাবনারই একপেশে আদর্শ বিজ্ঞাপিত হয়েছে। তবে এখানে প্রত্যেকটি বর্ণের সঙ্গে একটি করে শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে, অন্যান্য প্রাইমারের মতো প্রতিটি বর্ণে ছড়ার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়নি।

স্বরবর্ণ পরিচয় : ইসলামি আত্ম	ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয় : ইসলামি আত্ম
অ – অজু	ক – কুরআন
আ – আযান	ন - নামায
ই – ইজতেমা	ম – মসজিদ
ঈ – ঈদ	××××

এই বইতে ছড়া পাঠের মধ্যে দিয়ে ইসলামি চিন্তা প্রচারের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য ছড়া –

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
গান ধরেছে পাখি
আল্লাহর নাম গাইছে তারা
কিচির মিচির ডাকি। [১৬৩]

অথবা –

আল্লাহ হলেন সবার বড়ো
তাঁর বড় কেউ নাই
আমরা সবাই মুমিন শিশু
তাঁর গুণগান গাই।[১৬৪]

আরেকটি ছবিতে দেখা যায়, একজন অভিভাবকের সঙ্গে দুটি বালক ফেজ টুপি অ পাঞ্জাবি পাজামা পরে মসজিদের পথে এগোচ্ছে এবং নীচে সংকলিত ছড়া –

পূবের আকাশ ফর্সা হল
আর যে সময় নাই।
মুয়াজ্জিনের আযান শুনে
মসজিদেতে যাই।[১৬৫]

এই শিশু পাঠক সকালবেলা কেন মসজিদে যাবে তার কারণ বর্ণিত হয়েছে পরের ছড়াটিতে –

নামায পড়ি কুরআন পড়ি
হাদীস পড়ি রোজ।
কুরআন হাদীস পড়লে পাব
আল্লাহতালার খোঁজ।[১৬৬]

‘ফুলকুঁড়িদের অ আ ক খ’ কার্যত স্বল্প পরিসরে শৈশব থেকেই শিশুকে মসজিদমুখী এবং আল্লাহর অনুগামী করে তুলতে প্রয়াসী। এই পুস্তকে শিশুর ভাবরাজ্যের অন্য কোনো স্বাধীনতা নেই, নেই ইসলাম ভিন্ন অন্য কোনো জগতের সঙ্গে পরিচয়ের পরিসর।

৪.০২.০৬.খ : ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ১

মুহাম্মদ নুরুদ্দীন রচিত ছাত্রবন্ধু প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত ‘ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ১’ প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালে। ২০০৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ১২ বছর সময়কালের মধ্যে বইটি চোদ্দটি মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করে। প্রাইমারটির উপযোগিতা সম্পর্কে আখ্যাপত্রে লেখা হয়েছে – “সমস্ত নার্সারী স্কুল, শিশু মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-শিশু শ্রেণীর (লোয়ার নার্সারী) উপযোগী বর্ণ পরিচয়”।[১৬৭] এ’কথার মধ্যে দিয়ে প্রাইমারটি রচনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়। তবে, এখানে ‘সমস্ত নার্সারি স্কুল’ কথাটির মধ্যে অতিব্যাপ্তি আছে, কেননা প্রাইমারটিতে ছবি ও বর্ণ পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে ব্যাপকভাবে ইসলামি আত্ম চিন্তা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষণীয়।

স্বরবর্ণ পরিচয় : ইসলামি আত্ম	ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয় : ইসলামি আত্ম
অ – অজু	ক – কুরআন
আ – আযান	ন - নামায
ই – ইজতেমা	ম – মসজিদ
ঈ – ঈদ	হ – হাদীস

বর্ণ যোগে শব্দ পরিচয় অংশে আমরা ইসলামি আত্ম ও অনৈস্লামিক অপর এর বিন্যাস লক্ষ করছি নিম্নরূপ –

	আ – কার যোগে	ই – কার যোগে	ঈ – কার যোগে	উ – কার যোগে	ঊ – কার যোগে	এ – কার যোগে	ঐ – কার যোগে	ঔ – কার যোগে
মুসলমান 'আত্ম' চিহ্নিত শব্দ	খালা নানা কাযা কাবা ঈমান ইমাম আযান	× × ×	কাজী গাজী রাকীব	অজু	রসূল দরূদ	হেলাল বেলাল আলেম হাফেজ	× × ×	× × ×
অনৈস্লামিক 'অপর' চিহ্নিত শব্দ	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	বৈদিক বৈরাগী	গৌরী

আলোচ্য প্রাইমারটিতে কেবলমাত্র তিনিটি শব্দ প্রাপ্ত যেখানে অনৈস্লামিক 'অপর'এর বোধ নির্মিত হতে পারে, বাকি সর্বত্র ইসলামি আত্ম প্রতিষ্ঠায় মগ্নতা লক্ষণীয়।

৪.০২.০৬.গ : ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২ : মুসলমান-হিন্দু আত্ম-অপর বিন্যাস

মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ও শেখ নাসিরুদ্দীণ আহমদ রচিত ছাত্রবন্ধু প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২' প্রথম প্রকাশিত হয় মার্চ ১৯৯৭ সালে। ২০১৮ পর্যন্ত নতুন সংস্করণ সহ এটির সতেরোটি মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করে। 'ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ১' ছিল 'লোয়ার নার্সারী' ক্লাসের জন্য সেখানে 'ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২' রচিত হয়েছে 'আপার নার্সারী' ক্লাসের জন্য।

প্রাইমারটির 'পাঠ – ১ ছড়ায় ছড়ায় বর্ণ শেখো' অংশে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ শেখানো হয়েছে ছড়ার সাহায্যে। এই অংশে ইসলামি আত্ম ও অনৈস্লামিক অপর - এর বিন্যাস নিম্নরূপ –

স্বরবর্ণ পরিচয়		ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয়	
ইসলামি 'আত্ম'	**অনৈস্লামিক 'অপর'**	**ইসলামি 'আত্ম'**	**অনৈস্লামিক 'অপর'**
অ – অজু করে নামায	× × × × ×	ক – কুরআন হল জীবন বিধান	× × × × ×
আ – আদম হতে মানব সমাজ	× × × × ×	খ – খোদার এ যে মহান দান	× × × × ×
ই – ইসলাম হল সঠিক পথ	× × × × ×	গ- হুনাহ হলে তওবা কর	× × × × ×
ঈ – ঈদের দিনে মিলাও হাত	× × × × ×	ঘ – ঘরে ঘরে কুরআন পড়	× × × × ×
ঊ – ঊষার আগে ফজর পড়	× × × × ×	ঙ – রাঙা ভোরের আগে জাগো / ফজরকালে রহম মাগো	× × × × ×
এ – এশার নামায রাতের বেলা	× × × × ×	ণ – মরন সবার হবেই জানি / কুরআন হাদীস সঠিক মানি	× × × × ×
× × × × ×	× × × × ×	ত – তালিম নাও মাদ্রাসায়	থ – থান পূজাতে শির্ক হয়
		শ – শরীয়তের বিধান চাই / খোদার পথে চলবো ভাই	× × × × ×
		য় – ময়না পাখী আল্লাহ বলে	
		ঁ – চাঁদ আনে ভাই ঈদের খবর	

উপরের সারণীটি থেকে স্পষ্ট ইসলামি আত্ম যেভাবে প্রকট ও প্রখর সেখানে অনৈস্লামিক 'অপর' প্রায় নিশ্চিহ্ন।

বর্ণ যোগে শব্দ পরিচয় অংশে আমরা ইসলামি আত্ম ও অনৈস্লামিক অপর এর বিন্যাস লক্ষ করছি নিম্নরূপ :

ইসলামি 'আত্ম' চিহ্নিত শব্দ	অ – কার যোগে শব্দ	আ – কার যোগে	ই – কার যোগে	ঈ – কার যোগে	উ – কার যোগে	ঊ – কার যোগে	এ – কার যোগে	ঐ – কার যোগে	ও -– কার যোগে	ঔ – কার যোগে
	ফরজ বরকত জমজম কওসর ফরজ উমর রহমত	জামাত যাকাত নামায নানা মাদরাসা কারবালা ইসলাম ইফতার রমজান	আবাবিল মসজিদ মসজিদ আযাযিল	হাজী গাজী তফসীর তবলীগ তরতীব তসবীহ হাদীস মীযান	মুসলিম মুহাজির কুরাইশ ফুরকান কুরআন খুৎবা	রসূল দরূদ সামূদ মূসা	সেজদা ফাতেমা কাফেলা হেলাল বেলাল জেহাদ হেজায আলেম হাফেজ কেয়ামত মারেফাত ইজতেমা খেদমত	তৈয়ব সৈয়দ খৈয়াম	জোহর হোসেন মোমেন মোনাজাত রোযাদার	মৌলবী, তৌহীদ, তৌরত,
অনৈস্লামিক 'অপর' চিহ্নিত শব্দ		× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	দৈববাণী জৈন দৈবাৎ		গৌরী

বাক্য পরিচয় অংশে শিশুপাঠককে ইসলামি ভাবনা চিন্তায় চালিত করার ক্ষেত্রে এই প্রাইমারটি নিদর্শন যথেষ্ট। নীচে কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল –

	ইসলামি 'আত্ম'	অনৈস্লামিক 'অপর'
আ – কার যোগে বাক্য	সাহাবারা মহৎজন জামাত ছাড়া ইসলাম নাই ফরজ নামাজ পড়	× × ×
ই - কার যোগে বাক্য	মসজিদ গড়া চাই তিরমিযি পড়া চাই	× × ×
ঈ - কার যোগে বাক্য	নবীর কথা হল হাদিস শরীয়ত ছাড়া পথ নাই তকদীর মানা ফরজ নবীর ভাষা ছিল আরবী	× × ×
উ - কার যোগে বাক্য	কুরআন পড় কুফরী ছাড় অজু কর	× × ×
ঊ - কার যোগে বাক্য	ইসলাম রূপকথা নয় দরূদ পড় সব সময় মূসা নবী যায় তূর	× × ×
ঋ - কার যোগে বাক্য	শুধু কৃপাণ দিয়ে জিহাদ হয় না	× × ×
এ - কার যোগে বাক্য	সেজদা কর, হেজায চল বেলাল আযান দেয় ঐ দূর মীনারে	× × ×
ঐ - কার যোগে বাক্য	সুদ খাওয়া বৈধ নয় কলেমা তৈয়ব পড়ে মুসলমান হতে হয়	× × ×

	ঈমানদার মানুষ অবৈধ খায় না সৈয়দ সাহেব ঐ বৈঠক করে	
ও - কার যোগে বাক্য	হোসেন সাহেব কোমল মানুষ জোহর নামাজ পড়ে। দু-হাত তুলে দোয়া করেন সকল মানুষ তরে। রোজা রাখি মোবারক দিন দোয়া কর	× × ×
ঔ - কার যোগে বাক্য	তৌফিক চাও খোদার কাছে। তৌহীদ ইসলামের মূল কথা। মূসা নবীর উপরে তৌরাত নাযিল হয়।	× × ×
ং - যোগে বাক্য	সংসার ছেড়ে বৈরাগী হওয়া ইসলামে নেই।	× × ×
ঃ - যোগে বাক্য	দুঃখ যদি দাও হে খোদা / শকতি দিও সহিবারে সুখ দুঃখ সবই খোদার দান	× × ×
ঁ - যোগে বাক্য	পাঁচবার নামায পড়া ফরজ	× × ×

আমাদের আলোচ্য প্রাইমারটিতে সংকলিত ছড়ার সংখ্যা ছয়টি। ছড়াগুলির কোনটিতে খোদার গুণকীর্তন, ইদের আনন্দ, শরিয়তি নির্দেশ মোতাবেক সুদ পরিত্যাগ ও ঘুষের পরিণতি সম্পর্কে জানানো হয়েছে। তবে খুবই সচেতনভাবে শিশুদেরকে 'খোদার আইন'এর নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে, যেখানে শিশু পাঠকের বয়ানটি উল্লেখযোগ্য –

সূদ নেবো না সূদ দেবো না

দুটোই হারাম জানি

আমরা শিশু কেবল শুধু

খোদার আইন মানি।।[১৬৮]

গদ্য পাঠ অংশে প্রথম পাঠ ‘পড়তে শেখো’তে শিশু শিক্ষার্থীর ‘পড়া’ বলতে নামাজ অ কোরান পড়ার কথাই বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে ইসলামি আচরণবিধি মান্য করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যেমন – ‘সকাল হল। এবার ঘুম থেকে ওঠ। ওজু করো। নামায পড়ো। নামায পড়ে পড়তে বস’ কিন্তু সেই পড়া কী পড়া? সেই বিষয়ে এই পাঠের নির্দেশ - ‘কুরাআন পড়ো। বই পড়ো। ... লেখা পড়ায় ভালো না হলে জীবনে কেউ বড়ো হতে পারে না।”

ইসলামি সহবত শিক্ষা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – “কারো সঙ্গে দেখা হলে বল, ‘আসসালামো আলাইকুম’। এর মানে, তোমার উপর খোদার রহম হোক। কেউ তোমাকে আগে সালাম দিলে বল – ‘ওয়া আলাইকুম আস্‌সালাম”।[১৬৯]

লক্ষণীয় বিষয় ইসলামি আত্ম প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ মানবধর্মের কথাও প্রচারিত হয়েছে এই প্রাইমারটিতে। যথা –

> সকলের সাথে ভালো আচরণ করো। ভালো মানুষের সাথি হও। কখনো কাউকে গালিও দিও না। ... বড়দের কদর করো। ছোটদের ভালবাস। কখনো কাউকে হিংসা করবেনা। হিংসা মানুষের পতন ঘটায়।[১৭০]

ইসলামি প্রাইমারে এই অহিংসার মন্ত্র ও সর্বজনীন ভালোবাসার মন্ত্র প্রাইমারটির একপেশে চরিত্রকে খানিকটা লাঘব করেছে বলেই আমাদের মনে হয়।

‘সহজপাঠ’ প্রথম ভাগের ষষ্ঠ পাঠে ছিল শচী সেন, মণি সেন, বশী সেন, মধু শেঠ, খেতু শেঠ প্রভৃতি একই বলয়ের শিশু কিশোরদের ফুটবল খেলতে যাওয়ার বৃত্তান্ত। চতুর্থ পাঠে ছিল গুপী ও নুটুদের কুল পেরে চড়ুইভভাতি করার আনন্দ সংবাদ। কিন্তু সেখানে প্রতিবেশী ভিন ধর্মের কোনো বালক বালিকার উপস্থিতি আমরা টের পাইনি। মুসলমান বালক বালিকারা সেখানে অপাঙ্‌তেয়। তাই ‘ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২’ তে আত্মাভিমানী ইসলামি চিত্তের সেই শূন্যতা খানিকটা ভরাট করে নিয়েছেন লেখক। ‘পড়তে শেখো’ পাঠটিতে আমরা দেখি খেলার মাঠে

মুসলমান বালক আযাদের সঙ্গে হিন্দু বালক বাপি ও নিলুদের এক চমৎকার সহাবস্থান। মনে রাখতে হবে এই 'নীলু'কে আমরা প্রথম পেয়েছিলাম কিন্তু 'সহজপাঠ' প্রথম ভাগের চতুর্থ পাঠে। যেখানে শিশু কথক তাকে সঙ্গে নিয়ে সবুজ প্রান্তর ভ্রমণে বেরিয়েছিল – "চলো ভাই নীলু। এই তালবন দিয়ে পথ। তার পরে তিলখেত... তিসিখেত... তারপরে দিঘি।" এই নিলুকেই খেলার সঙ্গী করেছে ফুলকুঁড়ি'র কথক।

এই পাঠটিকে যদি আমরা 'সহজপাঠ' এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়ি তাহলে মুসলমানের আত্মাভিমানের জায়গাটি যেমন চিহ্নিত করতে পারবো, তেমনই প্রচলিত প্রাইমারে তাঁদের প্রান্তিক দশা থেকে মুক্তির চিন্তাও লক্ষ করবো।

সহজপাঠ প্রথম ভাগ	ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২
ষষ্ঠ পাঠের বিষয় "... তারপর খেলা হবে।। একা খেলা যায় না। ... ঐ যে আসে শচী সেন, মণি সেন, বশী সেন, মধু শেঠ, খেতু শেঠ। ফুটবল খেলা হবে খুব। বল নেই গাছ থেকে ঢেলা মেরে বেল পেড়ে নেব।" **পঞ্চম পাঠের বিষয় ছিল** – "আজ বুধবার, ছুটি। নুটু তাই খুব খুশী। ... চড়িভাতি হবে। ঝুড়ি নিতে হবে। তাতে কুল ভরে নিয়ে বাড়ি যাব।"[১৭১]	"আজ রবিবার । আজ ছুটির দিন। ... সারাদিন খেলা হবে। আয় নিলু আয় আযাদ আয়। চল গড়ের মাঠে ফুটবল খেলি। বাপি আর সালাম কই? তারা বিলের মাঠে কুল পাড়তে গেছে। এই কুল পাড়তে যাবি? চল, ওদের গাছে বড় বড় কুল। না যাবনা। অপরের গাছ থেকে ঢেলা মেরে কুল পাড়তে নেই। না বলে কিছু নিলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় গুনাহ।"[১৭২]

লক্ষ করবো, 'ফুলকুঁড়ি'তে কেবলমাত্র নিলুর নির্দোষ অন্তর্ভুক্তিই হয়নি, তার সঙ্গে বালকেরা খেলার আনন্দটুকুও ভাগ করে নিতে প্রয়াসী। তবে 'সহজপাঠ' এর বালকেরা ফুটবলের অভাব মিটিয়ে নিতে নির্বাচন করেছে সহজপন্থা - গাছ ঢেলা মেরে বেল পেড়ে নিয়েছে। আবার সহজপাঠের শিশু কথক যেভাবে ঝুড়ি ভ'রে কুল নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছে সেই সুযোগ কিন্তু আযাদ সালামদের নেই। কেননা তাঁদের মাথায় রয়েছে শাস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ। তাই সে অধিকতর সংযমী, সাবধানী। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কুল পেড়ে খাওয়া নির্দোষ আনন্দ হলেও ইসলামে প্রাইমারে তা

গুনাহ বলেই বিবেচিত। তাই এই পাঠের শিশুপাঠকের মুখ থেকে আমরা শুনতে পাই – "অপরের গাছ থেকে ঢেলা মেরে কুল পাড়তে নেই। না বলে কিছু নিলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় গুনাহ।"

'পড়তে শেখো' তৃতীয় পাঠে আমরা দেখি সুমহান ভারতের গুণকীর্তন করা হয়েছে; যেখানে কেবলমাত্র ইসলামি আত্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। বরং এদেশে বসবাসকারী নানা জাতি, নানা ভাষার মানুষ ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অপরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এই পাঠে বলা হয়েছে -

> আমরা ভারতবাসী। ভারত আমাদের মাতৃভূমি। ... কত বিশাল এই দেশ। কোথাও সমভুমি, কোথাও মরুভূমি, আবার কোথাও বা উঁচু নিচু পাথরে ভরা মালভূমি। ... কত মানুষ। কত ভাষায় কথা বলে তারা।[১৭৩]

'ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা - ২' স্বল্প পরিসরে হলেও শেষ পর্যন্ত বৃহৎ ভারতকে চেতনায় আনার মধ্যে দিয়ে অপর ভাষা ও জাতির অস্তিত্বকে স্বীকার করেছে।

৪.০২.০৬.ঘ : ফুলকুঁড়ি প্রথম পাঠ: মুসলমান-হিন্দু আত্ম-অপর বিন্যাস

মুহাম্মদ নূরুদ্দীন প্রণীত 'ফুলকুঁড়ি প্রথম পাঠ' রচিত হয়েছে 'সমস্ত নার্সারী স্কুল, শিশু মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য' হিসেবে। এই প্রাইমারটিতে মুসলমান-হিন্দু আত্ম-অপর সম্পর্কের বিন্যাস পূর্ববর্তী প্রাইমারগুলির রক্ষণশীলতাকে অনেকখানি অতিক্রম করেছে বলে আমাদের মনে হয়। কেননা এই বইতে বিষয়বস্তু সর্বদা ধর্মীয় পরিসরেই আবদ্ধ থাকেনি, বরং নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে হিন্দুর আনাগোনা এই বইটিকে একটা স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে। প্রথম পাঠে শিশু পাঠককে ঘুম থেকে উঠে নাময এবং মাদ্রাসায় পাঠ নিতে যাওয়ার কথা বলা হলেও পরের পাঠটিতেই আসে মিলি ও লিলির মিতালি অর্থাৎ বন্ধুত্বের কথা। যাঁদের নাম পরিচয়ে ধর্মীয়ভাবে পৃথক করা যায় না। অনুরূপভাবে পঞ্চম পাঠে এসেছে মিনু আর দিলুর কথা; তাদেরকেও নাম পরিচয়ে ইসলামি বর্গে বর্গিকৃত করা সম্ভব হয় না। সপ্তম পাঠে প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে এই পৃথিবীতে বহুমানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আখ্যান – "পৃথিবীতে কত মানুষ। কেউ কৃষ, কেউ পৃথুল। কেউ কৃপণ। আবার কেউবা উদার।... সকল মানুষ ভাই। কাউকে ঘৃণা করা ঠিক নয়।"[১৭৩] তবে নবম পাঠে এই প্রাইমারটি মুসলমান ও হিন্দুর পারস্পরিক যাপনের চিত্র

তুলে ধরেছে। ইসলামি প্রাইমারগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেখানে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে অপর ধর্মের ও বর্গের মানুষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, এক্ষেত্রে সেই উদাসীনতা ও অনাগ্রহ খানিকটা মুছে গিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বয়ান রচিত হয়েছে। নবম পাঠে তাই আমরা দেখি –

> বৈশাখ মাস। বৈকাল বেলা। নৈশ হতে আর বেশি দেরি নেই। কৈখালি থেকে চৈতালি এল। মৈনুল আর তৈয়ব তাকে দেখে হৈ হৈ করে ছুটে এল।
>
> ... সৈয়দ সাহেব বড় ভালো লোক। সব সময় বৈধ খান। বলেন নৈতিকতাই বড় ধন। ... দিনু বৈরাগীও এসে গেছেন। তাঁর গৈরিক পোশাক অপরূপ। দুজনেই একসাথে বের হয়। দৈবাৎ ঝড় ওঠে। সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়।[১৭৪]

এই পাঠটিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করে দেখলে আমরা লক্ষ করবো, এখানে নিকটতম প্রতিবেশীর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস অটুট থেকেছে। ইসলামি প্রাইমারসমূহে সম্মিলনের এই বয়ান অভিনব এবং আশাপ্রদ।

প্রথম অনুচ্ছেদে লক্ষণীয়, চৈতালিকে স্বাগত করতে হৈ হৈ করে এগিয়ে যাচ্ছে মৈনুল আর তৈয়ব। পেছনের পটভূমিটা কিন্তু 'নৈশ হতে আর বেশি দেরি নেই।' তাহলে অনুমান করা যায় যে, চৈতালি ও মৈনুল-তৈয়বদের সহাবস্থান পূর্বের থেকে অনেকবেশি স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করেছে। কেননা দুটি প্রতিবেশী ধর্মের বালক বালিকাদের মধ্যে আনাগোনাটা এখন অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লক্ষ করি সৈয়দ সাহেব এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে দিনু বৈরাগীর আগমন। 'তাঁর গৈরিক পোশাক অপরূপ' এই লাইনটিতে অপরের ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দৃষ্ট হয়। এই পাঠের ছবিতে দেখা যায়, গৈরিক বর্ণের ধুতি ও চাদর পরিহিত টিকিধারী দিনু বৈরাগী দু'হাত প্রসারিত করে আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছেন সাদা পাঞ্জাবি পাজামা ও ফেজ টুপি পরিহিত দাড়িধারী সৈয়দ সাহেবের দিকে আর সৈয়দ সাহেব যেন এক হাত প্রসারিত করে তাঁর প্রত্যাশিত আগমনে তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছেন, ভাবটি যেন এ'রকম – চলো এবার এগোনো যাক। অতঃপর কাঙ্ক্ষিত পাঠ – 'দুজনেই এক সাথে বের হয়।' এ'ভাবে একসঙ্গে চলার পথটিই আসলে হিন্দু-মুসলমান যৌথ সংস্কৃতির পথ। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ

নির্মাণের পথ। শিশুমনে একত্রে পথ চলার এই স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ পরিসর নির্মাণের দলিল হিসেবে প্রাইমারটি চিরস্মরণীয় হয়ে থেকে যাবে।

প্রাসঙ্গিকভাবে এই প্রাইমারটিতে এসেছে নজরুল ও রবীন্দ্র চেতনার সমন্বয়। একবিংশতম পাঠে নজরুল প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে –

> দুখু আবার কবিতা লেখা শুরু করে। গান লেখে। লেখে দেশের কথা। লেখে গরিব দুঃখীর কথা। ... দুখুই হলেন আমাদের আপন কবি কাজী নজরুল ইসলাম।[১৭৫]

ত্রয়োবিংশতম পাঠ 'ছোট রবি' তে লেখা হয়েছে –

> রবি গান লেখে। কবিতা লেখে। লেখে মায়াময় পৃথিবীর কথা। গানে গানে ভরে যায় তার খাতা। লিখতে লিখতে রবি একদিন বড় হয়ে ওঠে। রবি হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১৭৬]

প্রাইমারটির বিষয়বস্তুর বিন্যাসটি লক্ষ করতে হবে এখানে। সময়কাল এবং রচনা বৈচিত্র্যের নিরিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুল অপেক্ষা অনেক বেশি অগ্রবর্তী। অথচ পাঠ্যপুস্তকে তাঁদের অন্তর্ভুক্তি এবং অগ্রপশ্চাৎ অবস্থান একটি বিশেষ সমাজের মানুষের কাছে তাঁদের গৃহীত হওয়ার কাঠামোটিকে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম। উপরন্তু যখন আমরা দেখি 'দুখু ... লেখে দেশের কথা। লেখে গরিব দুঃখীর কথা। ... দুখুই হলেন আমাদের আপন কবি কাজী নজরুল ইসলাম' তখন আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না, যে 'আমাদের আপন' এই শব্দবন্ধে ইসলামি আত্ম কতখানি প্রকট।

আবার ষষ্ঠবিংশতম পাঠে আমরা লক্ষ করি, মহাত্মা গান্ধির আদর্শ প্রাচারের মধ্যে দিয়ে পাঠকের মনে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করার চেষ্টা। যেখানে ইসলামি তরিকা বর্জন করে মনীষীর জন্মদিন পালনের ছবিও আমরা লক্ষ করি –

> আজ মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। তাই পাড়ায় উৎসব। ... উন্নত দেশ গড়ে তোলা ছিল গান্ধীজীর আকাঙ্ক্ষা। তত্ত্বকথা নয়, কাজে পরিণত করে দেখানোই ছিল জীবনের মন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী আমাদের সম্পদ।[১৭৭]

এই জায়গায় এসে আমাদের মনে হয় ইসলামি প্রাইমারের মুসলমানি 'আত্ম' সর্বদা একরৈখিক কোনো নিয়ম মেনে চলেনি। ধর্মীয় পরিচিতিকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ম চিহ্নিত 'আত্ম' নির্মিত হয়েছে বটে, কিন্তু সেই একপেশে 'আত্ম' পরক্ষণেই প্রশ্ন ও সংশয়ের

মুখোমুখি হয়েছে। তাই ইসলামি প্রাইমারে ইসলামি 'আত্ম' নিটোল নির্ভেজাল কোনো আত্ম নয়, তা বহুলাংশে জোড়-বাঁধা বা 'হাইফেনেটেড সেলফ'।[১৭৮]

অতঃপর প্রশ্ন উঠবে ঐতিহাসিকভাবেই মুসলমানের 'আত্ম' যখন জোড়-বাঁধা 'আত্ম', তখন কীভাবেই বা পাশ কাটিয়ে যায় তার নিকটতম প্রতিবেশীকে? চাইলেও কি পারে তাকে 'অপর' করে দিয়ে এককভাবে টিকতে? নিশ্চয়ই না। কেননা সেই শক্তি অর্জন করবার মত সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য এদেশের মুসলমানের নেই। আর সেই কারণেই অনিবার্যভাবেই ইসলামি প্রাইমারগুলিতে মুসলমানের 'আত্ম' নির্মাণের প্রক্রিয়ায় ঘুরে ফিরে আসে তার প্রতিবেশীর অনুসরণ ও অনুকরণ। বর্তমান আলোচনার শেষ পর্যায়ে আমরা অনুসারী ও অনুকরণকামী এবং 'জোড়-বাঁধা' মুসলমানি আত্ম'র কয়েকটি নমুনা দিয়ে বিষয়টি বোঝবার চেষ্টা করতে পারি।

৪.০৩. ইসলামি প্রাইমারে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও অনুসারী আত্ম

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা এদেশে প্রচলিত প্রাইমারের প্রত্যাঘাত হিসেবে বাংলা ভাষায় রচিত ইসলামি প্রাইমারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তৎপর হয়েছে। প্রসঙ্গত দেখিয়েছি, প্রচলিত প্রাইমারসমূহে হিন্দু আত্ম ও মুসলমান অপরত্বের বিন্যাস এবং অনুরূপভাবে ইসলামি প্রাইমারগুলিতে মুসলমান আত্ম ও হিন্দু অপরত্বের বিন্যাস। তবে আমাদের প্রকল্পিত পাঠে আমরা লক্ষ করেছি প্রচলিত প্রাইমারসমূহে হিন্দুর আত্ম যত বেশি খাঁটি, নির্ভেজাল এবং একক; ইসলামি প্রাইমারে মুসলমানের 'আত্ম' ঠিক ততখানি নির্ভেজাল নয়। বরং অনেকবেশি অনুসারী এবং অনুকারী। বহুক্ষেত্রে জোড়-বাঁধা। এক্ষেত্রে এই 'হাইফেনেটেড সেলফ' ঐতিহাসিকভাবেই স্বীকৃত এবং কাঙ্ক্ষিত। তাই সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাংলার হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি?' শীর্ষক প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের নির্ভেজাল সত্তা নিয়েই যেন প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে –

> সাড়া ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বিদেশী মুসলমানদের বংশধরদের অস্তিত্ব বিশেষ নেই, যাঁরা আছেন তাঁরা হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশে খাঁটিত্ব হারিয়েছেন। ভারতের অধিকাংশ মুসলমান, বিশেষ করে বাংলার ও দক্ষিণভারতের মুসলমানরা, জাতির দিক থেকে বিচার করলে, মুলত হিন্দু জাতি বললেও ভুল হয় না। ... বাঙালী হিন্দুদের যেমন বিশুদ্ধ আর্যদের বংশধর মনে ভাবা ভুল, তেমনি বাঙালী মুসলমানদেরও বিশুদ্ধ আরবী তুর্কী ইরানীদের বংশধর মনে ভাবা ভুল। বহু প্রাগার্য জাতি-উপজাতির সঙ্গে আর্যদের সংমিশ্রণের ফলে যেমন ভারতের হিন্দুদের মতন বাঙালী হিন্দুদের উৎপত্তি,

তেমনি নানাবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে বিদেশী মুসলমানদের মিশ্রণের ফলে ভারতের ও বাংলার 'আশরাফ' বা অভিজাত মুসলমানদের উৎপত্তি।[১৭৯]

আর এই জাতিগত, সংস্কৃতিগত সংমিশ্রণের জন্যই এদেশে ইসলামি 'আত্ম' পৃথক ও স্বতন্ত্র কোনো আত্ম নির্মাণ করতে পারেনি বলেই আমাদের মনে হয়। বরং ইতিহাসের সূত্র ধরেই তাঁরা হয়ে উঠেছে পূর্বের অনুসারী ও অনুকারী। আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে আমারা বহুক্ষেত্রে লক্ষ করেছি যে, আরবি-তুরকি-ইরানিদের অনুকরণে আত্ম নির্মাণের প্রচেষ্টা হয়েছে এবং তাঁদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু সেদেশের আদর্শ সর্বদা এদেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। বরং ইসলামি প্রাইমারগুলিতে মুসলমান বালক-বালিকার আদর্শ হিসেবে যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা হলেন প্রচলিত বাংলা প্রাইমারে বর্ণিত চরিত্রগুলির নবতর ইসলামি সংস্করণ। অর্থাৎ একই অবয়ব তাঁদের; কেবল বদলে গেছে পোশাক, ধর্মীয় কৃত্যালি আর মুখে বসেছে আরবি ফার্সি বা উর্দু কিছু শব্দ। যেমন আমরা বর্ণপরিচয়ের গোপালের অনুরূপ পেয়েছি রমজান গাজী কিংবা রফিকের মতো সুবোধ পড়ুয়া বালককে। আবার 'সহজপাঠ' এর আদ্যনাথ বাবুর মত দানধ্যানী মানুষের মতো পেয়েছি 'ফুলকুঁড়ি দ্বিতীয় পাঠ' এর রহমান সাহেবকে কিংবা বর্ষাতি পরা কর্তাবাবুর সাদৃশ্যে পেয়েছি কর্তাবাবু জামাল মীর্জাকে। লক্ষণীয় বিষয়, বদলেছে কেবল ধর্ম আর কদাচিৎ পোশাকটা; কর্ম ও আদর্শে তাঁরা পূর্বসূরিদেরই অনুরূপ। তাই ইসলামি প্রাইমারে মুসলমানি 'আত্ম', অনুসারী এবং অনুকারী 'আত্ম' বলেই আমাদের মনে হয়। প্রাসঙ্গিক কয়েকটি পাঠ পাশাপাশি রেখে বিষয়টি বিচার করা যাক :

অনুসারী আত্ম : নমুনা – ১

মদনমোহন তর্কালঙ্কার 'শিশুশিক্ষা -১'	মীর মশাররফ হোসেন 'মুসলমানের বাঙ্গালা ভাষা'
'তোমার হাতে কি পুঁথি?' রমানাথ । 'আমার হাতে শিশুশিক্ষা'	মীর মশাররফ হোসেনের প্রাইমারে জনৈক ওসমানের জিজ্ঞাসা : ওসমান । 'তোমার হাতে কি কেতাব?' রমজান । 'আমপারা'

লক্ষণীয় 'বই' এর স্থানে 'কেতাব', রমানাথের স্থানে 'রমজান', 'শিশুশিক্ষার' স্থানে 'আমাপারা' ।

অনুসারী আত্ম : নমুনা – ২

'বর্ণপরিচয়'-এর গোপাল	'কচিকাঁচা'র রফিক
গোপাল বড়ো সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন, সে তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভাল খাব, ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না। গোপাল আপনার ছোটো ভাই ভগিনীগুলিকে বড় ভাল বাসে। সে কখনও তাদের সহিত ঝগড়া করে না, তাদের গায়ে হাত তুলে না। এ কারণে তার পিতামাতা অতিশয় ভাল বাসেন। গোপাল যখন পড়িতে যায় পথে খেলা করে না। সকলের আগে পাঠশালায় যায়। পাঠশালায় গিয়া, আপনার জায়গায় বসে। আপনার জায়গায় বসিয়া, বই খুলিয়া পড়িতে থাকে, যখন গুরু মহাশয় নূতন পড়া দেন, মন দিয়া শুনে। খেলিবার ছুটি হইলে, যখন সকল বালক খেলিতে থাকে, গোপালও খেলা করে। আর আর বালকেরা খেলিবার সময়, ঝগড়া করে, মারামারি করে। গোপাল তেমন নয়। সে একদিনও কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করে না। পাঠশালার ছুটি হইলে, বাড়ি গিয়া, গোপাল পড়িবার বইখানি আগে ভাল জায়গায় রাখিয়া দেয়; পরে কাপড় ছাড়িয়া, হাত পা মুখ ধোয়। ... সে পাঠশালায় যাহা পড়িয়া আইসে, বাড়িতে তাহা ভাল করে পড়ে; পুরাণ পড়া গুলি দুবেলা আগা গোড়া দেখে। ... গোপালকে যে দেখে, সেই ভাল বাসে। সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত।	রফিক খুব সুবোধ বালক । সে রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে। ফজরের নামাজ শেষে কিছু সময় মসজিদে বসে। ইমাম সাহেবের কাছে আরবি পড়া শেখে। বাড়ি ফিরে ভাই-বোনদের সাথে পড়তে বসে। সে ভাই-বোনদের সাথে মারামারি করে না। রফিকের মা যখন যা কিছু খেতে দেয়, সে তাই খায়। খেতে বসে এটা খাব ওটা খাবো বলে সে উৎপাত করে না। পড়া শেষ হলে মায়ের সাথে কাজ করে। সে সদা পিতা-মাতার কথা শোনে। তাই তার পিতা-মাতা তাকে খুব ভালবাসে। সে রোজ বেলা দশটার সময় অপর বালকদের সাথে পড়তে যায়। যাবার সময় পথে খেলা করে না । কোনদিনও পড়া কামাই করে না। না বলে কারো জিনিসের হাত দেয় না । টিফিনের ছুটি হলে নিজের জায়গায় বসে পুরানো পড়াগুলো দেখতে থাকে। পড়ার ছুটি হলে সে হইচই করে ছোটাছুটি করে না । বই খাতা গুছিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ি ফেরে। হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসে। বৈকালে অপর বালকদের সাথে খেলা করে। খেলার সময় কাউকে গালি দেয় না। মাগরিবের আজান হলে নামাজ সেরে তাড়াতাড়ি পড়তে বসে। রাতে সব পড়া সারা হয়ে গেলে, সে ঘুমাতে যায়। পরিবারের কেউ পীড়িত হলে তার সেবা করে। সে জানে, দুঃখী মানুষের সেবা করলে নেকী হয়। সকলে রফিককে অতিশয় ভালোবাসে।

নিম্ন রেখাঙ্কিত বাক্যগুলি পাঠ করলে আমরা গোপাল এবং রফিকের সঙ্গে মৌলিক তেমন কোনো তফাৎ লক্ষ করবো না। ব্যতিক্রম লক্ষণীয় কেবল ধর্মীয় আচরণবিধি পালনের ক্ষেত্রে।

অনুসারী আত্ম : নমুনা – ৩

সহজপাঠ প্রথম ভাগ	ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২
ষষ্ঠ পাঠের বিষয় "... তারপর খেলা হবে।। একা খেলা যায় না। ... ঐ যে আসে শচী সেন, মণি সেন, বশী সেন, মধু শেঠ, খেতু শেঠ। ফুটবল খেলা হবে খুব। বল নেই গাছ থেকে ঢেলা মেরে বেল পেড়ে নেব।" পঞ্চম পাঠের বিষয় ছিল – "আজ বুধবার, ছুটি। নুটু তাই খুব খুশী। ... চড়িভাতি হবে। ঝুড়ি নিতে হবে। তাতে কুল ভরে নিয়ে বাড়ি যাব।"	"আজ রবিবার । আজ ছুটির দিন। ... সারাদিন খেলা হবে। আয় নিলু আয় আযাদ আয়। চল গড়ের মাঠে ফুটবল খেলি। বাপি আর সালাম কই? তারা বিলের মাঠে কুল পাড়তে গেছে। এই কুল পাড়তে যাবি? চল, ওদের গাছে বড় বড় কুল। না যাবনা। অপরের গাছ থেকে ঢেলা মেরে কুল পাড়তে নেই। না বলে কিছু নিলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় গুনাহ।"

অনুসারী আত্ম : নমুনা – ৪

সহজপাঠ	ফুলকুঁড়ি দ্বিতীয় পাঠ
বর্ষা নেমেছে। গর্মি আর নেই। ... বেচারা গোরুগুলোর বড়ো দুর্গতি। চাষিদের কাজকর্ম সব বন্ধ ... কর্তাবাবু বর্ষাতি পরে চলেছেন। ... গর্ত সব ভরে গিয়ে ব্যাঙের বাসা হল।	কর্তাবাবু জামাল মীর্জা। সতর্কে হাঁটছেন। শরীরটা দুর্বল। ... তাছাড়া বর্ষাকাল। গর্তে গর্তে সর্পের বাসা। কর্তাবাবুর মাথায় ছাতা। বর্ষাতি পরেন না। কৃষকদের বড়ো দুর্গতি। তাঁদের কাজকর্ম নেই। তিনি তাদের দেখতে চলেছেন।

উপরের সারণী চারটি থেকে নিশ্চয় ইসলামি প্রাইমারে অনুসারী আত্ম'র কাঠামোটি স্পষ্ট হবে। যেখানে আমরা লক্ষ করেছি। তবে 'অপরত্ব' সূচক বয়ান যে এই পাঠগুলির ভেতরে ছিল তা আমরা যথাস্থানে দেখিয়েছি।

এখন আমরা দেখে নেবো এই প্রাইমারগুলিতে মুসলমান-হিন্দুর আত্ম-অপরত্বর ব্যবধান ঘুচিয়ে কীভাবে একটি সহজ সুন্দর পরিবেশ রচনার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

ক.

গ্রামের নাম প্রভাতপুর। এই গ্রামেই আক্রামের বাড়ি। ... ওখানে বিদ্যালয় আছে। ... আক্রাম এখানেই পড়ে। বর্ষাকালে আক্রামের খুব অসুবিধা হয়। অনেক ঘুরে যেতে হয়। ধ্রুব ও সুব্রত ওর সাথে পড়ে।[১৮০]

খ.

মুহাম্মদ ও চিন্ময়ের ব্যবসা আছে। হিরন্ময়ের ব্যবসা। যুগ্মভাবে দেখাশোনা করে।[১৮১]

গ.

বৈশাখ মাস। বৈকাল বেলা। নৈশ হতে আর বেশি দেরি নেই। কৈখালি থেকে চৈতালি এল। মৈনুল আর তৈয়ব তাকে দেখে হৈ হৈ করে ছুটে এল।

... সৈয়দ সাহেব বড় ভালো লোক। সব সময় বৈধ খান। বলেন নৈতিকতাই বড় ধন। ... দিনু বৈরাগীও এসে গেছেন। তাঁর গৈরিক পোশাক অপরূপ। দুজনেই একসাথে বের হয়। দৈবাৎ ঝড় ওঠে। সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়।[১৮২]

ঘ.

অনন্ত আর করিম দুই বন্ধু। তারা খুব শান্ত। পড়াশোনায় মনযোগী। গুরুজনদের মান্য করে। সত্য সন্ধানে তৎপর। এখন থেকে ধর্মগ্রন্থ পড়ে। ... অন্ধকার রাত্রি ওঁরা হেঁটে চলেছে। যাবে আনন্দের বাড়ি। আনন্দ নন্দীর ছেলে। ওদের সাথে পড়ে। তার দন্তশূল। ...তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে... সেদিন এক পান্থকে ওরা সাহায্য করেছে। পান্থর নাম শ্রীকান্ত। অনন্ত আর করিমের ব্যবহারে সবাই আনন্দ পায়। সবাই বলে ওরা মন্দ দূর করবে। অন্ধদের জন্য ওরা সাহায্য পাঠায়।[১৮৩]

প্রথম উদাহরণটিতে দেখিয়েছি আক্রামের সঙ্গে ধ্রুব ও সুব্রতদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চিত্র, দ্বিতীয় নমুনাটিতে লক্ষ করছি পারস্পরিক প্রত্যয় ও ঘনিষ্ঠতা এতটা গভীর হয়েছে যে, চিন্ময় এবং মুহাম্মদ একসঙ্গে স্বর্ণ ব্যবসায় নেমেছেন। তৃতীয় নমুনাতে আমরা দেখছি চৈতালি-মৈনুল আর তৈয়ব নাম পরিচয়ে পৃথক ধর্মীয় সমাজের হলে তাদের অন্তরঙ্গতার প্রগাঢ়তা। সেইসঙ্গে কাল বৈশাখীর বিকেলে সৈয়দ সাহেব ও দিনু বৈরাগীর একসঙ্গে পথ চলার অঙ্গীকার হিন্দু-মুসলমানের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানেরই পরিবেশ রচনা করেছে। চতুর্থ নমুনাটি অনন্ত আর করিমের বিরল বন্ধুত্বের ছবিকে ফুটিয়ে তুলেছে। যে বন্ধুত্বের মর্মমূলে আছে গভীর আস্থা, পারস্পরিক পথ

চলার অঙ্গীকার ও সমাজের অন্ধকার দূর করবার দারুন সংকল্প। তাই তারা অন্ধকার রাত্রে 'পান্থ শ্রীকান্ত'কে পথ দেখায়, নন্দীদের ছেলে আনন্দকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্বভাবত 'অনন্ত আর করিমের ব্যবহারে সবাই আনন্দ পায়'। এই সবাই নিশ্চয় হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ম ও সমাজের মানুষ। আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলি এই সম্মিলনের পথটি উন্মুক্ত করে তার একপেশে বয়ানের বাইরে সুকৌশলে এক সুস্থ সমন্বয়মূলক সমাজ নির্মাণেরও স্বপ্ন দেখিয়েছে। ফলে আত্ম – অপর সম্পর্ক কাঠামোর প্রচলিত ছকটি নস্যাৎ করে গড়ে উঠেছে মানব বন্ধনের এক প্রত্যাশিত পরিসর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রণোদনা থাকলেও এখানেই এই প্রাইমারগুলির সার্থকতা ও প্রাসঙ্গিকতা বলে আমাদের মনে হয়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. গুপ্ত. অতুলচন্দ্র, *কাব্যজিজ্ঞাসা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, আশ্বিন ১৪১৭, পৃ. ৯

২. ঐ, ঐ, ঐ

৩. চট্টোপাধ্যায়. সুনীতিকুমার, 'জাতীয় জীবন গঠনে সাহিত্যের স্থান', *সাংস্কৃতিকী,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, আগস্ট ২০১৯, পৃ. ৪৩৪

৪. চট্টোপাধ্যায়. সুনীতিকুমার, 'সংস্কৃতি', *সাংস্কৃতিকী,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, আগস্ট ২০১৯, পৃ. ৮

৫. ঐ, ঐ, ঐ

৬. খাস্তগীর. আশিস (সম্পা), *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬ – ১৮৫৪),* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬ পৃ. ১৩

৭. খাস্তগীর. আশিস 'উনিশ শতকের বাংলা বই', স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পা), *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি,* পুস্তক বিপণী, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৩৪৫

৮. ঐ, পৃ. ৩৪৭

৯. ঐ, ঐ, ঐ,

১০. কর. আবীর, 'ঈশ্বরের নামে জালিয়াতি', *বইয়ের দেশ,* কলকাতা (সম্পাদক) সুমন সেনগুপ্ত, জুলাই – সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ১১৬

১১. রায়. গোপালচন্দ্র, 'বাংলা বইয়ের ব্যবসা', *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন,* চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮১, পৃ. ৩৫১ – ৩৬৩

১২. খাস্তগীর. আশিস, 'উনিশ শতকের বাংলা বই', স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পা), *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি,* পুস্তক বিপনি, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৩৪৯

১৩. খাস্তগীর. আশিস (সম্পা), *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬ – ১৮৫৪),* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬ পৃ. ২১

১৪. হোসেন. মীর মশাররফ, 'সৎপ্রসঙ্গ', *প্রবন্ধ সংকলন,* বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ অগাস্ট, ২০০৪, পৃ. ২০ – ২১

১৫. রায়. বিশ্বজিৎ, 'দুই বাঙালির কিস্যা : উচ্চপর্যায়ে বাংলাচর্চার ইংরেজ উপনিবেশী পর্ব', *যত বেশি জানে তত বেশি মানে,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১০৪

১৬. *The Bengal Academi of Literature*, Vol. I, No. 2 Sept 1, 1893, p. 5

১৭. নাথ. রাখাল চন্দ্র, *উনিশ শতক : ভাব সংঘাত ও সমন্বয়,* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৬, পৃ. ৩৩ – ৪১

১৮. রায়. অলোক, 'উনিশ শতকে বঙ্কিম বিরোধিতা',*উনিশ শতক,* প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ ২২২ – ২২৩

১৯. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ ২২৩

২০. নাথ. রাখাল চন্দ্র, *উনিশ শতক : ভাব সংঘাত ও সমন্বয়,* কে পি বাগচী অ্যান্ড কম্পানী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৬, পৃ. ৯৪ – ১১৪

২১. চক্রবর্তী. রমাকান্ত, 'হিন্দু পুনরুত্থানের তত্ত্বাবলী', দেখুন. সৃষ্টি সম্পাদনা পর্ষৎ (সম্পা.), *জাতি হিন্দু ধর্ম ও আরও কিছু জিজ্ঞাসা,* সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০১, পৃ. ১৬ – ১৮

২২. দে. অমলেন্দু, *বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ,* প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৩৪

২৩. বসু. প্রদীপ (সম্পা), 'বাঙ্গালার লোকসংখ্যা', *সাময়িকী: পুরনো সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ সংকলন,* প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৪৭২

২৪. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪৭২

২৫. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪৭২ - ৪৭৩

২৬. চক্রবর্তী. অঞ্জন, ধর. অনুপ, 'হিংস্রতার উদ্‌বর্তন, উদ্‌বর্তনের হিংস্রতা', *অবভাস প্রবন্ধ সংকলন* পার্থ চক্রবর্তী (সম্পা.), জানুয়ারি – মার্চ ২০০৫, কলকাতা, পৃ. ১৬৪

২৭. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৬৩

২৮. সিন্‌হা. রাজ্যেশ্বর (সম্পা.), *আপন হতে বাহিরে : মুসলমান বাঙালি সম্পাদিত সাময়িকপত্রের ভাষা ও সাহিত্য বিষয় নির্বাচিত রচনা সংকলন ১৯০০ – ১৯৩০,* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ১৫৩ – ১৯০

২৯. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৫৪ – ১৫৫

৩০. বসু. শ্রী রাজনারায়ণ, *হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা,* জাতীয় যন্ত্রে মুদ্রিত, কলিকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত। পৃ. ৭ – ৫৮

৩১. দে. অমলেন্দু, *বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ,* প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৩৫ – উদ্ধৃত

৩২. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৩৫

৩৩. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৩৫

৩৪. লাহিড়ী. আশীষ, ‘ধর্ম যখন ইতিহাসের বাহন’, *ইতিহাস্যকর সংখ্যা, রোববার,* অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), ১১ জুন ২০২৩, পৃ. ৮

৩৫. লাহিড়ী. আশীষ, ‘ধর্ম যখন ইতিহাসের বাহন’, *ইতিহাস্যকর সংখ্যা, রোববার,* অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), ১১ জুন ২০২৩, পৃ. ৮

৩৬. ভদ্র. গৌতম, ‘প্রাক-রামমোহন যুগে কোম্পানির শাসনের প্রতি কয়েকজন বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মনোভাব’, মুখোপাধ্যায়, অনির্বাণ (সম্পা.) *নিবন্ধ বৈচিত্রের তিন দশক,* চর্চাপদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৯৫

৩৭. বসু. স্বপন (সংকলিত ও সম্পাদিত), *সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ,* বুকস স্পেস, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯, পৃ. ২৯০

৩৮. লাহিড়ী. আশীষ, ঐ, ঐ, ঐ

৩৯. দে. অমলেন্দু ‘*বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ’,* প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৯৯

৪০. ঐ, ঐ, ঐ, ঐ

৪১. আহমদ. ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা,* বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৫ – ৩৬

৪২. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য,* প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৩১

৪৩. বসু. স্বপন (সংকলিত ও সম্পাদিত), 'বঙ্গের মুসলমান' *সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ,* বুকস স্পেস, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯, পৃ. ৩৩৮

৪৪. ইউসফজী, নওসর আলি খাঁ, *বঙ্গীয় মুসলমান,* বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা, আগস্ট ২০১০, পৃ. ২৪

৪৫. ইউসফজী, নওসর আলি খাঁ, *বঙ্গীয় মুসলমান,* বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা, আগস্ট ২০১০, পৃ. ২৪ – ২৫

৪৬. বসু. স্বপন (সংকলিত ও সম্পাদিত), 'অহংকারী ও অভিমানী কাহারা?' *সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ,* বুকস স্পেস, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯, পৃ. ৩৪১

৪৭. ঘোষ, বিনয়, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, অক্টোবর ২০০৯, পৃ. ১৮৭

৪৮. আহমদ. ওয়াকিল, *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা,* বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৪১৩

৪৯. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪১১

৫০. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪৪০

৫১. আহমদ. ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা,* বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৪৬৯

৫২. দে. অমলেন্দু '*বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ',* প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১১৮

৫৩. ইউসফজী, নওসর আলি খাঁ, *বঙ্গীয় মুসলমান,* বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা, আগস্ট ২০১০, পৃ. ৩ – ৪

৫৪. দে. অমলেন্দু '*বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ',* প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১১৮

৫৫. আহমদ. ওয়াকিল, নবনূর, বৈশাখ ১৩১০, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা,* বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৪১০ গ্রন্থে উদ্ধৃত।

৫৬. নুর-অল-ইমান, ভাদ্র ১৩০৭, আহমেদ. ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা,* বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৫১১ গ্রন্থে উদ্ধৃত।

৫৭. বসু. স্বপন (সংকলিত ও সম্পাদিত), 'ভাষা সম্বন্ধে' *সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ,* বুকস স্পেস, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯, পৃ. ৫৫০-৫৫১

৫৮. আনিসুজ্জামান, ইসলাম-প্রচারক, জানুয়ারি ১৯০৩, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৮৩১ – ১৯৩০),* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ.৬২

৫৯. হাকিম. মোহাম্মদ আবদুল, 'বঙ্গ-সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা এবং জাতীয় সাহিত্যের আদর্শ', সিন্‌হা. রাজ্যেশ্বর, (সম্পা.) *আপন হতে বাহিরে : মুসলমান বাঙালি সম্পাদিত সাময়িকপত্রের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক নির্বাচিত রচনা সংকলন,* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ১৩০ – ১৩১

৬০. হাকিম. মোহাম্মদ আবদুল, পূর্বোক্ত পৃ. ১৩৪

৬১. সিরাজী, 'সাহিত্য শক্তি ও জাতি সংগঠন', সিন্‌হা. রাজ্যেশ্বর, (সম্পা.) *আপন হতে বাহিরে : মুসলমান বাঙালি সম্পাদিত সাময়িকপত্রের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক নির্বাচিত রচনা সংকলন,* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ১৪০

৬২. সিরাজী, 'সাহিত্য শক্তি ও জাতি সংগঠন', সিন্‌হা. রাজ্যেশ্বর, (সম্পা.) *আপন হতে বাহিরে : মুসলমান বাঙালি সম্পাদিত সাময়িকপত্রের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক নির্বাচিত রচনা সংকলন,* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ১৪২

৬৩. হাকিম. মোহাম্মদ আবদুল, পূর্বোক্ত পৃ. ১৩২

৬৪. হাকিম. মোহাম্মদ আবদুল, পূর্বোক্ত পৃ. ১৩২

৬৫. এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যাবে প্রদীপ বসু সম্পাদিত 'সাময়িকী' (দুই খণ্ড) গ্রন্থে। এই গ্রন্থে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নানাবিধ প্রবন্ধের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন বাঙালি হিন্দুর চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, যৌনতা, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভূগোল, ভাষা, সঙ্গীত, পরিবার, জননী, দাম্পত্য, গৃহস্থালি, শিশু ও শিশুপালন প্রভৃতি নানা বিষয়। যার মধ্যে দিয়ে উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দুর আত্ম নির্মাণের পথটি স্পষ্ট অনুধাবন করা যাবে।

দ্রষ্টব্য : বসু, প্রদীপ, (সম্পা.) *সাময়িকী : পুরনো সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ সংকলন (১ ও ২),* আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (প্রথম খণ্ড ১৯৯৮, দ্বিতীয় খণ্ড ২০০৯), কলকাতা।

৬৬. আহমদ. ওয়াকিল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৬

৬৭. আহমদ, ওয়াকিল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮২ উদ্ধৃত

৬৮. 'হাফেজ', জানুয়ারি ১৮৯৭, দেখুন. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৮৩১ – ১৯৩০),* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান, নভেম্বর ১৯৬৯, পৃ. ১৭

৬৯. 'নবনূর', বৈশাখ ১৩১০, দেখুন. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৮৩১ – ১৯৩০),* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান, নভেম্বর ১৯৬৯, পৃ. ৬৮

৭০. এই 'দোআঁশলা সেল্‌ফ' বা 'হাইব্রিড সেল্‌ফ'কে অনিরুদ্ধ লাহিড়ী বলেছেন 'হাইফেনেটেড বা জোড়-বাঁধা সেল্‌ফ', সলমান রাশদি বলেছেন 'ট্রান্সলেটেড সেল্‌ফ'। এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন অনিরুদ্ধ লাহিড়ী। দেখুন. লাহিড়ী, অনিরুদ্ধ, *তত্ত্বতালাশ,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ২৫০ – ২৫২

৭১. আহমদ. ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা,* বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ১১৬

৭২. আহমেদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, পৃ. ১১৮

৭৩. আহমদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, পৃ. ১১৮ – ২১৬

৭৪. আচার্য. পরমেশ, 'শিক্ষাচিন্তায় সাম্প্রদায়িক বিভাজন', *বাঙালির শিক্ষাচিন্তা,* দে'জ পাবলিশার্স, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮, কলকাতা, পৃ. ৯৮

৭৫. Chaterjee. Partha, *Nationalist thought And the Colonial World : A Derivative Discourse,* Oxford University Press, Delhi, 1988, পৃ. ৭২ – ৭৭

৭৬. চট্টোপাধ্যায়. পার্থ, 'ইতিহাসের উত্তরাধিকার', দেখুন. সৃষ্টি সম্পাদনা পর্ষৎ (সম্পা.), *জাতি হিন্দু ধর্ম ও আরও কিছু জিজ্ঞাসা,* সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৫৪

৭৭. হোসেন, মীর মশাররফ, *আমার জীবনী,* মুন্সী সাদেক আলী দ্বারা প্রকাশিত, কালিকা যন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৩৩৫ সাল ১ লা আশ্বিন, পৃ. ১৭৮ – ১৮০

৭৮. 'ইসলাম প্রচারক', ফাল্গুন – চৈত্র ১৩০৮, দেখুন, আহমদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, পৃ. ৪৯০

৭৯. ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী ১৮৮৬ – ৮৭ সালের অনুষ্ঠানপত্র, দেখুন, আহমেদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, পৃ. ৫১৫

৮০. নূর-অল-ইমান, শ্রাবণ ১৩০৭, দেখুন, আহমদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, পৃ. ৫১৫

৮১. শিরাজী. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন, *শিরাজী উপন্যাস সমগ্র,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯৪২, পৃ. সাত

৮২. বাসনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬, দেখুন, আহমদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, পৃ. ৫১৫

৮৩. আহমদ. ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা,* বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৫১৬

৮৪. আনিসুজ্জামান. *স্বরূপের সন্ধানে,* দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৯, পৃ. ৮১ – ৮২

৮৫. বন্দ্যোপাধ্যায়. শিবাজী, *আবার শিশুশিক্ষা,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৫৮

৮৬. তর্কালঙ্কার. মদনমোহন, *শিশুশিক্ষা,* খাস্তগীর. আশিস (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১০৬

৮৭. ঘোষ. নির্মাল্য, 'বর্ণপরিচয়' – এর বিদ্যাসাগর', ভৌমিক. তাপস (সম্পা.) *কোরক সাহিত্য পত্রিকা,* শারদীয় সংখ্যা, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১১২

৮৮. রাকিব, *মাদ্রাসা শিক্ষায় প্রচলিত বাংলা প্রাইমার : ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ,* থেকে পি এইচ ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ৩৫০

৮৯. দত্ত. মিলন, 'বাঙালি মুসলমানের নাম', *চলিত ইসলামি শব্দকোষ,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ২৪৩

৯০. খাস্তগীর. আশিস (সম্পা), *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬ – ১৮৫৪),* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬ পৃ. ২০

৯১. আচার্য. পরমেশ, 'শিক্ষাচিন্তায় সাম্প্রদায়িক বিভাজন', *বাঙালির শিক্ষাচিন্তা,* দে'জ পাবলিশার্স, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮, কলকাতা, পৃ. ৯৮

৯২. ঘোষ, বিনয়, (সম্পা.), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ খণ্ড,* পাঠভবন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ২৬৭ – ৬৮

৯৩. ঐ, ঐ, ঐ পৃ. ২৬৮

৯৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র, কথামালা, *বিদ্যাসাগর রচনাবলী,* সত্যম, কলকাতা, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫২৮ – ৫২৯

৯৫. চৌধুরী, দেওয়ান মোহাম্মদ আবহাব, 'আমাদের মাতৃভাষা', দেখুন. ইসলাম. মুস্তাফা নূরউল, *সাময়িক পত্র জীবন ও জনমত (দ্বিতীয় খণ্ড),* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৩৪৬ – ৩৪৭

৯৬. সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, *হাসিখুসি* (প্রথম ভাগ), শৈবা গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশকাল অনূক্ত।

৯৭. সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, *হাসিখুসি* (দ্বিতীয় ভাগ), সিটি বুক সোসাইটি, ৩২ শ সংস্করণ, কলকাতা, পৃ. ১৩

৯৮. সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৫

৯৯. সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৭

১০০. সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, ঐ, ঐ, পৃ. ২৩ – ৩১

১০১. ঠাকুর. শ্রীরবীন্দ্রনাথ, 'মুসলমান ছাত্রের বাঙ্গালা শিক্ষা', দেখুন. বসু. স্বপন (সংকলিত ও সম্পাদিত), *সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, বুকস স্পেস, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯, পৃ. ৫৫৪-৫৫৬

১০২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সহজপাঠ (প্রথমভাগ),* ওয়েস্টবেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা, সংশোধিত সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ২২

১০৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২৩ – ২৪

১০৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩০

১০৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৫

১০৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৯

১০৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সহজপাঠ (দ্বিতীয়ভাগ),* ওয়েস্টবেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা, সংশোধিত সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৮

১০৮. ঠাকুর. শ্রীরবীন্দ্রনাথ, 'মুসলমান ছাত্রের বাঙ্গালা শিক্ষা', দেখুন. বসু. স্বপন (সংকলিত ও সম্পাদিত), *সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, বুকস স্পেস, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯, পৃ. ৫৫৪-৫৫৬

১০৯. সরকার, পবিত্র, 'বর্ণপরিচয় থেকে কিশলয় : বাংলা প্রাইমারের নানা দিক', *ভাষা দেশ কাল,* মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪২২, পৃ. ১১৭

১১০. রাও, সুখলতা, *নিজে পড়ো*, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ২১.

১১১. রাও, সুখলতা, *নিজে পড়ো*, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ২২

১১২. রাও, সুখলতা, *নিজে পড়ো*, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ৪৪

১১৩. সরকার, পবিত্র, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১১৯

১১৪. *কিশলয়* (প্রথম শ্রেণি), পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ১৪

১১৫. *কিশলয়* (প্রথম শ্রেণি), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪২

১১৬. *কিশলয়* (প্রথম শ্রেণি), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪৪

১১৭. *কিশলয়* (প্রথম শ্রেণি), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৫৪

১১৮. *কিশলয়* (প্রথম শ্রেণি), পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, নব পর্যায় সংস্করণ, ১৯৯৯ এর পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৪৬

১১৯. *কিশলয়* (প্রথম শ্রেণি), পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ৪৬

১২০. *কিশলয়* (দ্বিতীয় ভাগ), পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, নবপর্যায় প্রথম সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, ২০০৫, পৃ. ৩১

১২১. *কিশলয়* (দ্বিতীয় ভাগ), পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, নবপর্যায় প্রথম সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, ২০০৫, পৃ. ৫০

১২২. মিঞা, বন্দে আলি, 'আমাদের গ্রাম', *কিশলয়* (দ্বিতীয় ভাগ), পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, নবপর্যায় প্রথম সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, ২০০৫, পৃ. ৫

১২৩. *কিশলয়* (দ্বিতীয় ভাগ), পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, নবপর্যায় প্রথম সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, ২০০৫, পৃ. ২৬ – ২৮

১২৪. *আমার বই* (প্রথম শ্রেণি), পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ মার্চ ২০১৭, পৃ. প্রাককথন

১২৫. *আমার বই* (প্রথম শ্রেণি),, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২৩১

১২৬. *আমার বই* (প্রথম শ্রেণি), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২৪১

১২৭. *আমার বই* (প্রথম শ্রেণি), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩১৪

১২৮. *আমার বই* (প্রথম শ্রেণি, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৩৮

১২৯. *আমার বই,* (প্রথম শ্রেণি), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪২১

১৩০. *আমার বই,* (প্রথম শ্রেণি), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪৩৮

১৩১. *আমার বই,* (প্রথম শ্রেণি), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪৯০

১৩২. *আমার বই,* (প্রথম শ্রেণি), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪৯৭

১৩৩. *আমার বই,* (প্রথম শ্রেণি), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৫০৮

১৩৪. *আমার বই* (দ্বিতীয় শ্রেণি), পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ মার্চ ২০১৭, পৃ. প্রাককথন

১৩৫. *আমার বই* (দ্বিতীয় শ্রেণি), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩

১৩৬. *আমার বই* (দ্বিতীয় শ্রেণি), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১২৭

১৩৭. *আমার বই* (দ্বিতীয় শ্রেণি), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৪৭

১৩৮. *আমার বই* (দ্বিতীয় শ্রেণি), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৩৭

১৩৯. *আমার বই* (দ্বিতীয় শ্রেণি), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২৭৮

১৪০. *আমার বই* (দ্বিতীয় শ্রেণি), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৭১

১৪১. *আমার বই* (দ্বিতীয় শ্রেণি), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৮২

১৪২. *আমার বই* (দ্বিতীয় শ্রেণি), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৫৭৪

১৪৩. মান্নান. কাজী আবদুল (সম্পা.), *মশাররফ রচনা সম্ভার*, পঞ্চম খণ্ড, 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা', প্রথম ভাগ, প্রথম অংশ, ঢাকা, জুন ১৯৮৫, পৃ. ৫২৮

১৪৪. মান্নান. কাজী আবদুল, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৫৩০

১৪৫. মান্নান. কাজী আবদুল, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৫৩০ – ৫৩৬

১৪৬. খান. ইব্রাহিম, 'লাল ইস্তেহার', Ghosh. Nityapriya & Mukhopadhyay. Ashoke Kumar (Ed.) *Partition of Bengal: Significant Signposts 1905-1911,* Shishu Sahitya Samsad, Kolkata, 2005, P.158

১৪৭. Ghosh. Nityapriya & Mukhopadhyay. Ashoke Kumar (Ed.) ঐ, ঐ, পৃ. ১৫৩

১৪৮. Ghosh. Nityapriya & Mukhopadhyay. Ashoke Kumar (Ed.) ঐ, ঐ, পৃ. ১৫৭

১৪৯. মাবুদ. আবদুল, *আমাদের প্রিয় নবী,* বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাষ্ট, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০ পৃ. ৪

১৫০. মোল্লা. নিযাম উদ্দীন, *ছোটদের দুআ,* বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাষ্ট, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯ পৃ. ৩

১৫১. মোল্লা. নিযাম উদ্দীন, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪

১৫২. আলিয়াভী. অধ্যাপক মাওলানা হাফেজ শাইখ আইনুল বারী, *সালাফী বর্ণ পরিচয়* (প্রথম ভাগ), সূফিয়া প্রকাশনী, কলকাতা, পরিবর্জিত নতুন সংস্করণ, মে ২০১৯, পৃ. ১

১৫৩. আলিয়াভী. অধ্যাপক মাওলানা হাফেজ শাইখ আইনুল বারী, *সালাফী বর্ণ পরিচয়* (প্রথম ভাগ), ঐ, ঐ, পৃ. ১৫

১৫৪. আলিয়াভী. অধ্যাপক মাওলানা হাফেজ শাইখ আইনুল বারী, *সালাফী বর্ণ পরিচয়* (প্রথম ভাগ), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৬

১৫৫. আলিয়াভী. অধ্যাপক মাওলানা হাফেজ শাইখ আইনুল বারী, *সালাফী বর্ণ পরিচয়* (প্রথম ভাগ), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩১

১৫৬. আলিয়াভী. অধ্যাপক মাওলানা হাফেজ শাইখ আইনুল বারী, *সালাফী বর্ণ পরিচয়* (দ্বিতীয় ভাগ), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২.

১৫৭. আলিয়াভী. অধ্যাপক মাওলানা হাফেজ শাইখ আইনুল বারী, *সালাফী বর্ণ পরিচয়* (দ্বিতীয় ভাগ), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২.

১৫৮. মোঃ কেফায়াতুল্লাহ. হযরত মুফতী, *তা'লীমূল ইসলাম, (প্রথম ভাগ)*, আহমদ পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ১৯৯২ পৃ. ৩

১৫৯. মোল্লা. মশিয়ার রহমান, *কচিকাঁচা (১),* পুস্তক ভারতী, হাওড়া, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২১,পৃ. ২

১৬০. বিদ্যাসাগর. শ্রীঈশ্বরচন্দ্র, *বর্ণপরিচয় (প্রথম ভাগ),* দ্বিষষ্টিতম সংস্করণ, সংস্কৃত প্রেস, কলকাতা, ১৮৭৬, পৃ. ৩২ – ৩৪

১৬১. মোল্লা. মশিয়ার রহমান, *কচিকাঁচা (১),* পুস্তক ভারতী, হাওড়া, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২১, পৃ. ৩৮

১৬২. মোল্লা. মশিয়ার রহমান, *কচিকাঁচা (১),* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৬

১৬৩. *ফুলকুঁড়িদের অ আ ক খ,* ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃ. ২

১৬৪. *ফুলকুঁড়িদের অ আ ক খ,* ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২

১৬৫. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৭

১৬৬. ঐ, ঐ , ঐ, পৃ. ৮

১৬৭. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, *ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ১,* ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১

১৬৮. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, সেখ. নাসিরুদ্দীন আহমদ, *ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২,* ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৩২

১৬৯. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, সেখ. নাসিরুদ্দীন আহমদ ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৩

১৭০. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৩

১৭১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সহজপাঠ (প্রথমভাগ),* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৪ – ৩৭

১৭২. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, সেখ. নাসিরুদ্দীন আহমদ ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৫

১৭৩. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, *ফুলকুঁড়ি প্রথম পাঠ,* ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৬

১৭৪. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, *ফুলকুঁড়ি প্রথম পাঠ,* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২০

১৭৫. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, *ফুলকুঁড়ি প্রথম পাঠ,* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪৩

১৭৬. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, *ফুলকুঁড়ি প্রথম পাঠ,* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪৫

১৭৭. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, *ফুলকুঁড়ি প্রথম পাঠ,* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৫২

১৭৮. এই 'দোআঁশলা সেল্‌ফ' বা 'হাইব্রিড সেল্‌ফ'কে অনিরুদ্ধ লাহিড়ী বলেছেন 'হাইফেনেটেড বা জোড়-বাঁধা সেল্‌ফ', সলমান রাশদি বলেছেন 'ট্রান্সলেটেড সেল্‌ফ'। এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন অনিরুদ্ধ লাহিড়ী। দেখুন. লাহিড়ী, অনিরুদ্ধ, *তত্ত্বতালাশ,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ২৫০ – ২৫২

১৭৯. ঘোষ. বিনয়, 'বাংলার হিন্দু মুসলমান দুই জাতি?', দেখুন. দত্ত. মিলন (সম্পা.) *হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক : ঐক্যের দ্বন্দ্বের ধন্দের,* ছোঁয়া, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩২৯ – ৩৩১

১৮০. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, সেখ. নাসিরুদ্দীন আহমদ, *ফুলকুঁড়ি দ্বিতীয় পাঠ,* ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ১২

১৮১. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, সেখ. নাসিরুদ্দীন আহমদ, *ফুলকুঁড়ি দ্বিতীয় পাঠ,* ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ১৫

১৮২. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, *ফুলকুঁড়ি প্রথম পাঠ,* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২০

১৮৩. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, সেখ. নাসিরুদ্দীন আহমদ, *ফুলকুঁড়ি দ্বিতীয় পাঠ,* ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ২২

পঞ্চম অধ্যায়

নীতিশিক্ষা ও ইসলামি প্রাইমার

শিশুপাঠ্যপুস্তকে অক্ষর-বর্ণ-শব্দ-বাক্য যোগে ভাষা শিক্ষার সমান্তরালে নীতিশিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হিসেবে গৃহীত হয়। আমাদের আলোচ্য ইসলামি প্রাইমারগুলিতে আমরা লক্ষ করেছি ভাষা শিক্ষা অপেক্ষা উক্ত প্রাইমারগুলির ধর্ম শিক্ষার প্রতি অনুরাগ অধিক। যে কথা প্রাইমারগুলির 'প্রাক্‌কথন' অংশে রচিয়তারা স্পষ্ট করেছেন। অনুরূপভাবে আমরা যদি প্রাইমারগুলিতে নীতিশিক্ষার পাঠ পর্যবেক্ষণ করি তাহলে লক্ষ করবো যে, এই প্রাইমারগুলিতে নীতিশিক্ষার একটি বিশেষ আদর্শ বা ফ্রেমকে অবলম্বন করা হয়েছে। বৃহত্তর অর্থে আমরা যাকে 'নীতি' বা 'Ethics' বলি আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে তার পূর্ণ রূপের প্রতীতি পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে ইসলামি প্রাইমারে নীতিতত্ত্ব বা নীতিবিদ্যার প্রয়োগ একপেশে বলেই আমাদের মনে হয়েছে। প্রসঙ্গত আমরা নীতিতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা বিশ্লেষণ করবো এবং তারপর ইসলামি প্রাইমারে নীতিশিক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণে অগ্রসর হবো।

১.০ : নীতি নৈতিকতা ও নীতিশাস্ত্র

মানুষ মাত্রই অপূর্ণ। সুতরাং যে মানুষ অপূর্ণ, সেই মানুষ নানাভাবে পথভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট বলেই আমাদের ধারণা। কেননা জীবন ধারণ করলেও সেই মানুষ তার জীবনের আদর্শ জানে না। আধুনিক নীতিবিদ্যা বিশ্বাস করে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন মানুষের কাছে জীবন শুধু ধারণ করার জন্য নয়, জীবনকে গঠন করতে হয়। তাই জীবনকে গঠন করবার জন্য একটি আদর্শের প্রয়োজন হয়, যেটি হল নৈতিক। কিন্তু যে নৈতিক আদর্শের আলোকে মানব জীবনকে সুন্দর করে তোলা যায় তা সাধারণ মানুষের অজানা। তাই নীতি দার্শনিকেরা এই নৈতিক আদর্শ নিরূপণের দায়িত্বভার গ্রহণ করে থাকেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যেখানেই নীতিশাস্ত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সেখানেই আমরা দেখি নীতি দার্শনিক এমন এক একটি জগৎ ও জীবন রচনা করতে আগ্রহী, যা কল্যাণময়, সুন্দর। এই সুন্দর জীবন লাভের জন্যই দার্শনিকরা নানা বিকল্প নৈতিক আদর্শ উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করাই নীতিশাস্ত্রের শেষ কাজ নয়। মানুষ এবং তার সমাজকে কীভাবে নীতিগতভাবে সুন্দর করা যায় তার পথ নির্দেশ করাই নীতিশাস্ত্রের কাজ।[১]

বাংলায় যাকে 'নীতি' বলা হয়, তার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Ethics'. এই 'Ethics' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'ethicos' বা 'ethos' থেকে। 'Oxford English Dictionary' মতে 'Ethics' শব্দটির অর্থ হল - 'জনতা বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান প্রচলিত মনোভাব বা অনুভূতির আলোচনা।'[২] এই দিকটি বিচার করে পাশ্চাত্য দার্শনিক ম্যাকেঞ্জি নীতিবিদ্যা সম্পর্কে বলেছেন –

> নীতিবিদ্যা হচ্ছে আচরণের ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, সম্পর্কিত আলোচনা। ...এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম, আচার-আচরণ, অনুভূতি ও প্রবণতার ন্যায় বা অন্যায়, ভাল বা মন্দ, কর্তব্য বা অকর্তব্য, ঔচিত্য বা অনৌচিত্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা বা পর্যালোচনা করে।[৩]

এখন বিষয় হলো অনেকেই মনে করেন নীতিতত্ত্ব হলো সর্বদা – ন্যায়, ভালো, উচিত ইত্যাদির সমাহার এবং এই অর্থে অনেকেই 'Ethics' শব্দটির সমার্থক হিসেবে 'Morals' শব্দটি ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'Morals' ও 'Ethics' একই বিষয় নয়। 'Morals' শব্দটি নির্দেশ করে ব্যক্তির আচরণকে; বিশেষত ব্যক্তির সেই আচরণকে, যে আচরণ ন্যায় অথবা সেই ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি ভালো সেই দিককে। কিন্তু অন্যদিকে 'Ethics' নির্দেশ করে নৈতিক আচরণ সম্পর্কিত পঠন – পাঠন ও আলাপ আলোচনাকে বা মানুষ যে সকল নৈতিক কোড অনুসরণ করে, নৈতিক কাজ করে সেগুলিকে।[৪] অর্থাৎ এখানে উচিতের সমান্তরালে অনুচিত, ভালোর পাশে মন্দ, এবং ন্যায়ের পাশে অন্যায়কেও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়।

১.১ : নীতিবিদ্যার শ্রেণি

সাধারণভাবে নীতিবিদ্যাকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা –

ক. আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা

খ. পরানীতিবিদ্যা

নীতিবিদ্যার এই দুটি শাখার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেই আমরা প্রাইমারসমূহে প্রযুক্ত নীতিকথা ও নীতিশিক্ষার প্রকৃতি নির্ণয় ও তার বর্গীকরণ করতে পারবো।

১.১.ক।। আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা

আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার প্রধান কাজ হলো নৈতিক নিয়মাবলি ও নৈতিক মানদণ্ডসমূহ অনুসন্ধান, অনুশীলন, ব্যাখ্যা ও চিহ্নিত করা। এই শাখায় দেখানো হয় যে, নৈতিক নিয়মাবলি ও নৈতিক মানদণ্ডসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজেদের জীবনকে কীভাবে

সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন এবং নিজেদের জীবনকে যথার্থ দিক নিরদেশ্না প্রদান করতে পারেন। অর্থাৎ এটি নৈতিকতার মূল্যায়ন বিষয়ক কাজ করে। এটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো মূল্যায়নমূলক ও পরামর্শমূলক কাজ করে মানুষকে কল্যাণ ও আদর্শের পথ বাতলে দেওয়া।

আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যাকে আবার দুটি শাখায় ভাগ করা হয়। সে'দুটি হলো –

ক. তাত্ত্বিক আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা

খ. প্রায়োগিক আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা

তাত্ত্বিক আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যায় নীতিবিদ্যার তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। যার কাজ হলো মানুষের চারিত্রিক আচরণ ও নৈতিক নিয়মাবলির ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের জন্য যে সকল নৈতিক মানদণ্ড ও নিয়মাবলি প্রয়োজন সেগুলির অনুসন্ধান ও অনুশীলন করা।

অন্যদিকে প্রায়োগিক আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা নীতিবিদ্যার প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। সেক্ষেত্রে প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার প্রধান কাজ হলো নৈতিক মানদণ্ড ও নিয়মাবলি প্রয়োগ করে সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন ব্যক্তিগত এবং সামজিক সমস্যাসমূহকে মূল্যায়ন ও সমাধানের চেষ্টা করা।

১.১.খ. পরানীতিবিদ্যা

পরানীতিবিদ্যা নীতিবিদ্যার নৈতিক ভাষার গঠনগত দিক নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে। সেদিক থেকে পরানীতিবিদ্যার প্রধান কাজ হলো নৈতিকতার ভাষার বিশ্লেষণ, যৌক্তিকতা প্রদর্শন এবং নৈতিক যুক্তির স্বরূপ, যুক্তির আকার এবং নৈতিক জ্ঞানবিদ্যার ধারণাগত ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ করা। অর্থাৎ পরানীতিবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যায় ব্যবহৃত পদ, শব্দ, প্রত্যয় এবং নৈতিক কাঠামোর ধারণাগত ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে।

নীতিবিদ্যা সম্পর্কিত উপরোক্ত বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি শিশুপাঠ্যপুস্তকে নীতিশিক্ষার যে আদর্শ অনুসৃত হয় তা 'প্রায়োগিক আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা'র অন্তর্গত। যার মূল লক্ষ্য নৈতিক মানদণ্ড ও নিয়মাবলি প্রয়োগ করে সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন ব্যক্তিগত এবং সামজিক সমস্যাসমূহকে মূল্যায়ন ও সমাধানের চেষ্টা করা।

১.২ নীতিশিক্ষা কেন?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, মানব জীবনে নীতির বিশেষ ভূমিকা আছে। নৈতিক শিক্ষা মানবজীবনের গতিপথ নির্মাণে সদর্থক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই নৈতিক মানদণ্ড ও নিয়মাবলির প্রয়োগ কি সার্বভৌমিক ও সর্বকালীন? নাকি আপেক্ষিক? এঙ্গেলস দাবি করেছিলেন "শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নৈতিকতা সর্বদা সেই সমাজেই শাসক শ্রেণীর নৈতিকতা।"[৫] অর্থাৎ শাসক শ্রেণি নিজের অনুকূলে নীতি প্রণয়ন করেন। একথা যে ভিত্তিহীন নয় তার প্রমাণ 'গীতা'য় উক্ত সব থেকে জনপ্রিয় নীতিবাক্য 'কর্মেই তোমার অধিকার, কখনোই ফলে নয়'। তাহলে কি শ্রমিক শ্রেণিকে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দানে উৎসাহিত করা হচ্ছে নীতিবাক্যের দ্বারা? গীতায় উক্ত এই নীতি বয়ানের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক খোলস উন্মোচন করে তার প্রকৃত রাজনৈতিক অভিসন্ধি আবিষ্কার করে ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব বলেছেন –

> উত্তর ও উত্তরপশ্চিম ভারতে যে জনপ্রিয় একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তা শ্রমিক সমাজের সঞ্চরণশীলতা গ্রামে ও নগরে ব্যাপ্ত করে তুলছিল, যেমন গ্রামাঞ্চলে জাঠদেরও এতে তাদের কতকটা সম্মান বাড়িয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে উচ্চবংশীয় বিত্তবান মুখপাত্র হয়ে কৃষ্ণ বলেন, "কর্মেই তোমাদের অধিকার, কখনোই ফলে নয়।" কারণ এঁরা সকলেই কর্মি বা কোনো নির্দিষ্ট শ্রমের শ্রমিক – উচ্চবিত্তশালীরাই ফলের অধিকারী।[৬]

অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর 'গীতা কেন?' গ্রন্থে গীতায় উক্ত এই শ্লোকটির রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে বলেছেন – 'যে শ্লোকটি যুগে যুগে মানুষকে প্রভাবিত করে এসেছে তা হল : "কর্মেই তোমার অধিকার কর্মফলে কখনো নয়"।[৭] এটিকে আমরা কেবলমাত্র একটি সাদামাটা শ্লোক হিসেবে দেখবো না, আবহমানকালের হিন্দু এই 'শ্লোক'টিকে তাঁদের ধর্মীয় জীবনের মূল নীতি বলে মনে করে এসেছেন। কেবলমাত্র 'হিন্দু'ই নয়, এই নীতিবাক্য অন্যান্য ধর্মের মানুষের কাছেও গৃহীত হয়েছে ভগবান/ ঈশ্বর/ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের চাবিকাঠি হিসেবে। এই নীতিবাক্যকে অবলম্বন করে মালিক শ্রেণি মেহনতি মানুষের শ্রম নিংড়ে স্বল্প পারিশ্রমিকে কখনো বা বিনা মজুরিতে খাটিয়ে নিয়েছে। ধর্মগুরু বা পুরোহিত, মোল্লা, মৌলবীরা ধর্মীয় অনুদান – যাকাত, ফিত্‌রা আদায়ের নামে গতরখাটা মেহনতি মানুষের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে যাবতীয় রসদ।

আমরা জানি যে দেশে দেশে কালে কালে রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিজের অনুকূলে একদল বুদ্ধিজীবী এবং পুরোহিততন্ত্র গড়ে তোলেন যাঁরা রাষ্ট্রযন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে এবং তাকে সুবিধা পাইয়ে দেবার জন্য নানাবিধ নীতি প্রণয়ন করেন। গ্রামশি দেখিয়েছেন 'উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের 'সম্মতি' বা 'আস্থা' গড়ে তোলার কাজে বুদ্ধিজীবী এবং পুরোহিতশ্রেণির ভূমিকা কতোখানি ফলপ্রসূ

হয়েছে।[৮] আসলে বুদ্ধিজীবী ও পুরোহিত শ্রেণি প্রবর্তিত ও প্রচলিত নীতিকথাই এখানে আস্থা অর্জনের আয়ুধ হিসেবে সক্রিয় থেকেছে। আর একারণেই গীতার মতো 'দেশ গঠনকারী' গ্রন্থে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই নীতি প্রণীত হয়। ত্রিপুরাশঙ্কর দেবশাস্ত্রী বলেছেন – 'কর্মই গীতার মধ্যবিন্দু"[৯] কিন্তু যে কর্মে কর্মীর অধিকার আছে, সেই কর্মফলে কদাপি অধিকার নেই। শ্রমিক শ্রেণিকে এভাবে কর্মে ডুবিয়ে রাখবার তৎকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বিচার করে অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্য আরো বলেছেন – "কুষাণ সাম্রাজ্য থেকে আদি মধ্যযুগ পর্যন্ত কর্মের সংজ্ঞা ও তাৎপর্যের গুরুত্ব বেড়েছে। দেশে তখন কৃষির প্রসার ঘটেছে আর শিল্পেরও এবং এরই সঙ্গে চলেছে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য। এসবের ভিত্তিভূমি হল নানাবিধ কর্ম।"[১০] অতএব কর্মই প্রধান হয়ে উঠলো এবং এই কর্মে যাতে নিবিড় নিষ্ঠা আরোপিত হয় তাই পুনরায় ঘোষিত হলো নীতি – "অতএব যোগে নিযুক্ত হও, যোগ হলো কর্মে কুশলতা।"[১১] ইন্দ্রিয় দমন যোগ সাধনার বড়ো অঙ্গ বলে বিবেচিত সর্বদেশে সর্বকালে। তাই খানিক পরেই আবার বলা হয়েছে – 'যার ইন্দ্রিয়গুলি নিজের বশে আছে তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।'[১২] এখানে লক্ষণীয় বিষয় 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ' করে কর্মে প্রবিষ্ট হওয়ার 'বাণী' ঘোষিত হচ্ছে। উপরোক্ত এই কর্মনীতির চমৎকার সাফল্য লক্ষ করা গিয়েছিল সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার' কবিতার চিঠির থলি বাহক রানারের জীবনে। কর্মনীতির রবরবা তাঁকে এতটাই সম্মোহিত / নিয়ন্ত্রিত করেছিল যে, তাঁর ঘরেতে তীব্র অভাব অথচ পিঠেতে টাকার বোঝা, 'তবু এই টাকা যাবে না ছোঁয়া'। কর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান এই 'রানার' শুধু কি এইভাবেই নিজেকে সংযত করেছিল? 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ' করেও কি সে তাঁর কর্ম কুশলতার পরিচয় দেয়নি? দিয়েছে বৈকি। তবেই না তাঁর স্ত্রী –

অনেক দুঃখে বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে,

ঘরে তার প্রিয়া একা সজ্জায় বিনিদ্র রাত জাগে।[১৩]

রাষ্ট্র এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাতন্ত্র সর্বদা চায় তার অনুগত শ্রমিক ও মেহনতি মানুষ, যাদেরকে দিয়ে স্বল্প পারিশ্রমিকে নিজের মুনাফার পারদকে ঊর্দ্ধগামী করা যায়। তাই 'জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে'।[১৪] 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ' করা সংযমী মানুষ না হলে তাঁদের জীবনের রাত্রিগুলিকে রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান কিনবে কীভাবে? এভাবে বিশ্রামের অবসরটুকু গ্রাস করবার তাগিদেই গীতার মোক্ষম বাণী – 'অন্যান্য প্রাণীদের পক্ষে যেটা রাত্রি, সে সময়ে সংযত মানুষ জেগে থাকে, আর অন্যান্য প্রাণীকুল যখন জেগে থাকে তখনই সংযমী ব্যক্তি ঘুমিয়ে থাকে'[১৫] লক্ষ করবার বিষয় আত্ম-বিসর্জন এবং 'ইন্দ্রিয় সংযম' এর মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের ফাঁদে ব্যক্তির যাবতীয়

স্বাধীনতা, আশা আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা অনিচ্ছাকে বিকিয়ে দেবার যে ষড়যন্ত্র ফুকো তাকে বলেছিলেন রাষ্ট্রের 'বায়ো পলিটিক্স'। ফুকোর মতে, 'বায়ো পলিটিক্স' (Bio – Potics) - এর বৈশিষ্ট্য হলো এর মাধ্যমে সমগ্র পপুলেশন বা জনসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। অন্যকথায় ক্ষমতা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এখানে কাজ করে 'উপযোগী' ও 'বশ্য' শরীর সৃষ্টির কাজে।[১৬]

অতঃপর এই অধ্যায়ে ইসলামি প্রাইমারে নীতিশিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে আমরা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে চাই যে, নীতিশিক্ষা কেবলমাত্র 'সুনাগরিক' কিংবা 'বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যাক্তি' নির্মাণের জন্যই প্রযুক্ত হয় না। বরং থাক-বন্দি সমাজ কাঠামোয় নীতি প্রণেতারা আপন স্বার্থ চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে 'অনুগত', 'বশ্য' এবং 'উপযোগী' 'বান্দা' নির্মাণের কাজেও নীতিশিক্ষার আখ্যান রচনা করতে পারেন।

২. বাংলা সাহিত্যে ও পাঠ্যপুস্তকে নীতিশিক্ষার ইতিবৃত্ত

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল ধর্ম নির্ভর। তাই ধর্মীয় বিশ্বাসকে মজবুত করবার উদ্দেশ্যে সেই সময় থেকেই সাহিত্যে নীতিকথা ব্যবহারের প্রচলন ছিল। উনিশ শতকে মুদ্রণ ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক প্রভুর সুবিধার্থে বাজারে নানা ধরণের গদ্যগ্রন্থের আমদানি শুরু হয়। ঔপনিবেশিক মস্তিষ্ক থেকেই 'শিশু'কে নিয়ে আলাদাভাবে ভাবনা চিন্তা শুরু হয় এবং শিশুর 'শূন্য চিত্ত' (Tabula Rasa) দখলের জন্য তৈরি হয় সাহিত্যের নতুন বর্গ – 'শিশুসাহিত্য'। ইতিপূর্বে যে ভারতীয় সাহিত্যে শিশুকেন্দ্রিক রচনা ছিল না, তা নয়। যেগুলি ছিল সেগুলিকে সুকুমার সেন শিশুলীলার সাহিত্য বলেছেন।[১৭] সেখানে আমরা শিশুকে উদ্দেশ্যহীন লীলাখেলায় মগ্ন দেখি। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে 'শিশুকে' উদ্দেশ্যমূলক স্বার্থে দেখা হয়নি, যে দর্শনটা লক্ষ করা যায় ঔপনিবেশিক জমানায়। অধ্যাপক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য' গ্রন্থে শিশু এবং উপনিবেশের প্রজাকে একটি সুতোয় অন্বিত করে সেই সমীকরণটি স্পষ্ট করেছেন : শিশু + উপনিবেশের প্রজা = উপনিবেশের শিশু।[১৮] অতঃপর শিশুমনের গঠন প্রকৃতি নির্ধারণ এবং তাকে 'মানুষ' করার যাবতীয় কৃৎ-কৌশল অনুসৃত হয় ঔপনিবেশিক মস্তিষ্ক থেকেই। ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের ২ অক্টোবর তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ময়রা শিশু 'মানুষ' করবার জন্য নিদান দিলেন – 'উঠতি প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মনের অর্গল খুলতে হবে, গাড়তে হবে তাদের চৈতন্যে খ্রিষ্টীয় মতবাদের আশায়সমূহ যাতে অভিভাবকেরা অযথা উত্তেজিত বা সন্ত্রস্ত না হন।[১৯] সুতরাং 'অভিভাবকদের সন্ত্রস্ত' না করে টমাস

ব্যাবিংটন মেকলের মধ্যস্থতায় সাহিত্যই হয়ে উঠলো ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির প্রধান স্তম্ভ। লীলা মজুমদার লিখেছেন –

> শিক্ষা দেওয়াই যখন প্রধান উদ্দেশ্য, তখন নীতিকথা, হিতোপদেশ, ইতিহাসমালা ইত্যাদি গ্রন্থই প্রথম প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে থাকবে তাতে আর আশ্চর্যের কি? শ্রীরামপুর মিশন প্রথম এই জাতীয় বই ছাপতে আরম্ভ করেন, তারপর কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ১৮১৮ – ১৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে একাজ শুরু করেছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই এই ধরনের আরও অনেকগুলি বই প্রকাশিত হল, এগুল্লিকেই ছোটদের জন্য লেখা বাংলার প্রথম সাহিত্যের বই বলে ধরা হয়। তখন পাঠ্যপুস্তক আর সাহিত্যের বইয়ের মধ্যে এইটুকুমাত্র তফাৎ ছিল যে পাঠ্যপুস্তকে বড় বেশী নীরস তথ্য আর নীতিকথা থাকত...[২০]

অর্থাৎ উনিশ শতকের গোঁড়ায় যে পাঠ্যপুস্তকের বিপুল বাজার গড়ে উঠলো, তার প্রধান অবলম্বন ছিল নীতিকথা।

আশিস খাস্তগীর তাঁর 'বাংলা গদ্যে নীতিকথা' গ্রন্থে উনিশ শতকের বাংলা পাঠ্যপুস্তকে নীতিশিক্ষার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় নীতিশিক্ষার পাঠ শুরু হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক থেকে। কলেজের পাঠ্য বইয়ের মধ্যে ছিল হিতজপোপদেশ, বত্রিশ সিংহাসন, তোতা ইতিহাস, পুরুষ পরীক্ষা, বেতাল পঞ্চবিংশতি ইত্যাদি।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মতোই নীতিশিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছিল মিশনারি গোষ্ঠী। শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনারী সম্প্রদায় ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে এক পুস্তিকা প্রয়াস করেন সেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নীতিশিক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। গদ্যের মাধ্যমে নীতিশিক্ষাকে তাঁরা শিশু পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন।

শাসকের রাজনৈতিক স্বার্থে সংস্কৃত থেকে যে সমস্ত নীতিশিক্ষার বইপত্র অনুবাদ করে ছাপা হতো সেই ধারাটি বদলে যায় ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। এই সময় স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশন নীতি অনুসারে ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়, পরিবর্তে ধর্ম নিরপেক্ষ শাশ্বত নীতিবোধ নির্ভর পাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়।

এরই মধ্যে ধর্মীয় নীতিশিক্ষা প্রচারে এগিয়ে আসে আরো কয়েকটি মিশনারি সোসাইটি। যেমন ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট অ্যান্ড বুক সোসাইটি (১৮২৩), ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান স্কুল বুক সোসাইটি (১৮৩৯)। দুটি সংস্থাই খ্রিষ্টীয় আদর্শভিত্তিক নীতিশিক্ষার গ্রন্থ প্রকাশ করতে থাকে।

একদিকে বাংলাভাষীদের মধ্যে মিশনারিদের খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে আগ্রহ, আর অন্যদিকে ত্রি-ধা বিভক্ত হিন্দু সমাজের (রক্ষণশীল, ব্রাহ্ম, উদারমতাবলম্বী) নিজ নিজ মতবাদ প্রচারে অত্যধিক

মনোযোগ – এই দুই মিলে নীতিশিক্ষার অঙ্কুরটি অচিরে মহীরুহে পরিচত হলো। এর পাশাপাশি চলতে থাকলো নীতি চর্চার উদ্দেশ্যে সভা সমিতির প্রতিষ্ঠা। যা নীতিশিক্ষার চর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক গৌরব দান করলো। সাময়িক পত্র পত্রিকাগুলিও পিছিয়ে থাকলো না। লোকশিক্ষা, লোকের হিত এবং নীতিশিক্ষার স্বার্থে নতুন সব সাময়িকপত্র পত্রিকাও প্রকাশিত হতে থাকলো। আশিস খাস্তগীর জানাচ্ছেন ১৮১৮ থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত এরকম নীতিশিক্ষা নির্ভর সাময়িকপত্রের সংখ্যা ছিল ২২ টি।[২১] এমনকি ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে সরকারিভাবে নীতিশিক্ষার উদ্যোগে লাগাম পরাবার চেষ্টা হলে এই সমস্ত পত্রপত্রিকা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। হিন্দু কলেজের পাঠক্রমে নীতিশিক্ষার গুরুত্ব যথাযথভাবে না থাকায় অনেকে বিক্ষুব্ধ হলেন। তবে লক্ষ করবার বিষয় সময়ের ক্রম বিবর্তনে নীতিশিক্ষার বিষয় বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। আশিস খাস্তগীরের তথ্য থেকে আমরা জানতে পারছি ১৮০২ – ১৮৫৬ সালের মধ্যে কেবলমাত্র 'হিতোপদেশ' গ্রন্থটিই বাংলা গদ্যে অনূদিত হয়েছে অন্তত ১৫ টি, 'বত্রিশ সিংহাসন' ৭ টি, 'তুতিনামা' থেকে অনূদিত হয়েছে 'তোতা ইতিহাস', 'শুক সপ্ততি', 'শুকেতিহাস' ইত্যাদি।[২২]

বাংলায় নীতিশিক্ষামূলক বইপত্র লিখে যারা খ্যাতি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, দ্বারকানাথ রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, রামচন্দ্র মিত্র, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন প্রমুখ। এছাড়া বিদেশি লেখকদের মধ্যে আছেন উইলিয়ম কেরি, উইলিয়ম ইয়েটস্, জে.সি মার্শম্যান, জেমস্ লঙ প্রমুখ।

প্রাথমিক পর্যায়ে গল্প আখ্যানের মধ্যে দিয়ে এই নীতিশিক্ষার পাঠদান করা হতো। কিন্তু পড়ে পরে নীতিশিক্ষা প্রাইমারেও জায়গা করে নিল। এ প্রসঙ্গে আশিস খাস্তগীর বলেছেন – 'নীতিবাক্যের মাধ্যমে বর্ণযোজনা, বর্ণশিক্ষা, বাক্যরচনা ইত্যাদিতে শিশু অভ্যস্থ হলো। ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ দু'ধরণের নীতিশিক্ষাই বাংলা প্রাইমারে দেখা গেল।'[২৩]

এখন লক্ষ করবার বিষয় মধ্যযুগ থেকে বাংসা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদের হাতে যে ধারাটি বিকশিত হয়েছিল তা ছিল মারফতি চিন্তাভাবনা প্রসূত সুফি ঘরানার। সেখানে মুক্ত উদার চিত্তে সাধক সচ্চিদানন্দময় অনুভূতি এবং সাধনার গুহ্য চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কাজে কাজেই সেখানে নীতিকথার প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কিন্তু উনিশ শতকে ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে বাংলা তথা ভারতে শরিয়িত চিন্তা চেতনার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ সম্ভব হলো। এই শরিয়িতি

ধারা ছিল মারফতি ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ধর্মীয় ধারা। ওয়াহাবিরা রসনির্ভর সাহিত্যের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, তাই শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপর মুসলমানদের হাতে গড়ে ওঠা বাংলা সাহিত্যের ধারাটি খানিকটা শিথিল হয়ে পড়ে।[২৪] অধ্যাপক আনিসুজ্জামান তাঁর 'স্বরূপের সন্ধানে' গ্রন্থে দেখিয়েছেন বাঙালি মুসলমানের ভাবজগতের এই শূন্যতা থেকে মুক্ত হতে বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল এবং ১৮৭০ এর সমসময় পর্ব থেকে নতুনভাবে পরিবর্তন লক্ষিত হয়।[২৫] আর এই সময় থেকেই তাঁরা বাংলায় রচিত গ্রন্থগুলির বিরোধিতা করতে শুরু করেন। আবদুল লতিফের মতো জ্ঞানী মানুষও বলতে দ্বিধা করেন না, যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার দুহিতা; সুতরাং সংস্কৃত থেকে আগত শব্দ পরিহার করাই বিধেয়। এই ধরণের সাংস্কৃতিক ব্যবধান ও বিচ্ছিন্নতার আবহে মুসলমানের হাতে যে সাহিত্য রচিত হতে থাকে তা ইসলামের অতীত ইতিহাস নির্ভর সাহিত্য। যা মূলত ধর্ম, নীতি ও তত্ত্বজ্ঞানে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লো। ওয়াকিল আহমেদ তাঁর 'উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা' গ্রন্থে এই সময়কার সাহিত্যের প্রকৃতি নির্ণয় করে বলেছেন –

> মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন শিল্প চর্চার কথা না ভেবে খ্রিষ্টান বাউল ও ব্রাহ্মদের অপপ্রচার থেকে সমাজকে রক্ষা করবার জন্য তাঁরা ধর্ম পুস্তক রচনা, পত্রিকা সম্পাদনা এবং ধর্মসভায় বক্তৃতা দান, ধর্মশিক্ষামূলক সমিতি গঠন ইত্যাদির প্রতি বেশি মনযোগী হয়েছেন। ... সুতরাং তাঁদের প্রথম ও প্রধান কাজ হল ধর্ম নীতি জ্ঞান ও তত্ত্বমূলক গ্রন্থের অনুবাদ অথবা মুসলিম ইতিহাস ও কৃষ্টি ও মহাপুরুষদের মাহাত্ম্যকীর্তন করা।[২৬]

অর্থাৎ যুগের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান লেখকরাও ইসলামি ধর্ম, শাস্ত্র ও নীতিকথার প্রচারকে অনিবার্যভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আমাদের মনে হয় উনিশ শতকে মুসলমানদের হাতে রচিত প্রাইমারগুলিও ইসলামের ধর্মীয় নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখেই রচিত হয়। এ প্রসঙ্গে আমরা প্রচলিত প্রাইমারে ইসলামি নীতির অভাব জনিত কারণে তৎকালীন মুসলমান সমাজের হতাশার ছবি লক্ষ করি। ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় রেয়াজুদ্দীন আহমেদ লিখেছেন –

> মুসলমান বালক ও যুবকের পক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী নিরাপদ নহে। এই শিক্ষার দোষে ইংরাজি শিক্ষিত মুসলমানদিগের মধ্যে অনেক গুরুতর দোষ প্রবেশ করিয়াছে। প্রধান দোষ ধর্মাচারবিহীনতা ও নীতিজ্ঞানপরিশূন্যতা। ধর্মবিশ্বাসেও অনেকের ত্রুটি আছে। অনেকের ধর্মমত নাস্তিকের কাছকাছি।[২৭]

অর্থাৎ সেকালে মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক নীতিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যেমন অনুভূত হয়, তেমনই মুসলমানদের নীতিশিক্ষার জন্য পৃথক ধারার সাহিত্যও রচিত হয়। প্রসঙ্গত আমরা ইসলামি নীতির স্বরূপ স্বরূপ আলোচনা করবো এবং ইসলামি বাংলা প্রাইমার সেই নীতিশিক্ষা কীভাবে প্রয়োগ হয়েছে তা বিচার করে দেখবো।

৩. কোরান হাদিসের প্রেক্ষিতে ইসলামি নীতিশিক্ষার মূলসূত্র

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম' গ্রন্থটির শেষ তথা পঞ্চদশ অধ্যায় 'ইহ্সান ও আখলাক'। 'ইহ্সান' আরবি শব্দ, যার অর্থ – 'সুন্দর ব্যবহার'। 'আখলাক' শব্দটিও আরবি, এর অর্থ 'চরিত্র'।

ইসলামের পরিভাষায় 'ইহ্সান' হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উত্তম রূপে ইবাদত বা আল্লাহর ধ্যান করা, এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা।[২৮] অন্যদিকে 'আখলাক' সম্পর্কে বলা হয়েছে – "এর আভিধানিক অর্থ চরিত্র, স্বভাব, সদাচার, সৌজন্যমূলক আচরণ ইত্যাদি। মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে যেসব আচার-ব্যবহার, চাল-চলন এবং স্বভাবের প্রকাশ পায়, সেসবের সমষ্টি হলো 'আখলাক'। শরীআতের পরিভাষায় আখলাক হলো, মানুষের সাথে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে সদাচার ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা।'[২৯]

উপরের বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে বলা চলে যে, একজন মুসলমানের আদর্শ চরিত্রের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশিত হয়েছে এই 'ইহ্সান ও আখলাক' অধ্যায়টিতে। স্বাভাবিকভাবেই নীতিশিক্ষা ও নৈতিকতার নমুনাসমূহ কোরান ও হাদিস থেকে এখানে সংকলিত করা হয়েছে। 'ইহ্সান ও আখলাক' এর আলোচনা থেকে আমরা ইসলামি নীতির যে সূত্রগুলি আবিষ্কার করি সেগুলি নিম্নরূপ –

৩.১ 'ইহ্সান' অর্থাৎ সুন্দর ব্যবহার গড়ে তোলবার নীতিসমূহ :

ক. 'তাসাউফ' বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান

খ. 'ইখলাস ও নিয়্যত' বা আন্তরিকতার সঙ্গে কর্ম

গ. 'তাওবা ও ইস্তিগফার' বা অনুতাপের সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা

ঘ. 'তাকওয়া' বা বিরত থাকা অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা

ঙ. 'তাওয়াক্কুল' বা একমাত্র আল্লহর উপর ভরসা রাখা

চ. 'যিক্‌র-আযকার' বা মনে প্রাণে আল্লাহর নাম স্মরণ করা

ছ. 'দুয়া' অর্থাৎ আদবের সঙ্গে কাকুতি মিনতিসহ আল্লাহর কাছে চাওয়া

জ. 'রিয়া' অর্থাৎ লোক দেখানো কাজ ও খ্যাতির লিপ্সা পরিহার

ঝ. 'কল্‌বে সালীম' বা আত্মার পরিশুদ্ধি[৩০]

৩.২ 'আখলাক' অর্থাৎ আদর্শ চরিত্র/সদাচার গড়ে তোলবার নীতিসমূহ :

এর দুটি ভাগ। একটি হল – 'আখলাকে হাসানা' আর অপরটি হল 'আখলাকে সায়্যিআ। এই দুই নীতির মূল কথাগুলি নিম্নরূপ -

ক. সততা ও সত্যবাদিতা

খ. 'সবর' অর্থাৎ ধৈর্য ও সহমর্মিতা

গ. 'শোক্‌র' অর্থাৎ অনুগ্রহ লাভের জন্য হৃদয়, মুখ বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রদান

ঘ. 'আদল' অর্থাৎ ইন্সাফ, সুবিচার ও বা ন্যায়পরায়নতা

ঙ. 'আফউ' বা ক্ষমা ও উদারতা

চ. বিনয় ও সরলতা

ছ. দানশীলতা ও বদান্যতা

জ. আমানতদারী অর্থাৎ হকদারকে তাঁর আমানত প্রত্যার্পন করবার মানসিক দৃঢ়তা

ঝ. অঙ্গীকার রক্ষা করা

ঞ. সৃষ্টির সেবা অর্থাৎ বিশ্বে আল্লাহর সৃষ্ট সকল বস্তুর সেবা করা

ট. বীরত্ব ও সাহসিকতা

ঠ. আত্মসংযম ও আত্মমর্যাদাবোধ

ড. অন্যের প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করা

ঢ. লজ্জাশীলতা

ণ. অহংকার ও আত্মম্ভরিতা ত্যাগ

ত. সম্মান ও সম্পদের মোহ ত্যাগ

থ. দুনিয়ার মহব্বত ত্যাগ

দ. অপব্যয় ও অপচয় রোধ

ধ. ক্রোধ ও রাগ বর্জন

ন. হিংসা বিদ্বেষ পরিত্যাগ। ইত্যাদি।[৩১]

মুসলমান সমাজে 'কোরান'কে 'পবিত্র' এবং সম্পূর্ণ 'জীবনবিধান' বলে বিশ্বাস করা হয়। তাই সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে কোরানের নীতিসমূহকে ধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। অবশ্য এরসঙ্গে আছে হাদিসের বিশেষ গুরুত্ব; যেখানে নৈতিকতার প্রসঙ্গে নবীজির দেখানো জীবন, নামাজ, রোজা এবং সৎ চরিত্র গঠনের কথা বলা হয়েছে।নিচে কয়েকটি নমুনার সাহায্যে হাদিসে বর্ণিত নৈতিকতার স্বরূপটি স্পষ্ট করা হলো।

১. ইমামা মালেকের বর্ণনা থেকে জানতে পারি – 'মহানবী (দ.) বলেন – আমি মানুষের নৈতিক গুণাবলীকে পূর্ণতা দান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।'[৩২]

২. হযরত 'আয়েশা আবু দাল্‌দ' এর বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি – 'আমি মহানবী (দ.) বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই একজন মোমিন ব্যক্তি তাঁর উত্তম চরিত্র গুণে সমস্ত 'আবেদ মানুষের মর্যাদা লাভ করতে পারে। যাঁরা সারারাত নামাযে কাটায়, এবং সারা বছরই রোজা রাখে।'[৩৩]

৩. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর, বুখারী মুসলিম হাদিসে নৈতিকতার গুণ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন – 'তোমাদের মধ্যে সেই-ই সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি। যে চরিত্রের দিক থেকে উত্তম।'[৩৪]

৪. হযরত মোয়ায কর্তৃক বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি - 'একদা আমি মহানবী (দ.) পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি উত্তরে আমাকে বলেন – উত্তম চরিত্রই হল পুণ্য এবং যে কাজ তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং মানুষের নিকট তা প্রকাশ হওয়াটা তুমি পছন্দ করো না, তাই পাপ।'[৩৫]

আমাদের আলোচ্য ইসলামি প্রাইমারগুলিতে বর্ণিত নীতিকথাগুলি যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে লক্ষ করবো এখানে নীতিশিক্ষার কাঠামো রচিত হয়েছে তার বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে কোরান এবং হাদিসের প্রাধান্য। তবে সবথেকে অদ্ভুত ব্যাপারা হলো কোরান এবং হাদিসের বহু নীতিকেই এখানে অবিকৃত অবস্থায় রাখা হয়নি। কোরান হাদিসের নীতি যেখানে সর্বজনীন সেখানে বহুক্ষেত্রে নীতিকথা চালিত হয়েছে শরিয়তের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে। কোরান হাদিসের নীতিকে বিকৃত করে শরিয়তের নামে চালানোর মধ্যে নিশ্চয় একধরণের শরিয়তি শাসনতান্ত্রিকতা আছে। সে এক স্বতন্ত্র্য আলোচনার বিষয়। বর্তমান গবেষণায় আমরা নির্বাচিত ইসলামি প্রাইমারগুলিতে কোরান হাদিস ও শরিয়তের নির্দেশ মোতাবেক যে নীতিশিক্ষার বয়ান রচিত হয়েছে সেদিকেই গুরুত্ব আরোপ করবো এবং বিশ্লেষণ করবো।

৪. ইসলামি প্রাইমারে নীতিশিক্ষার প্রকরণ :

প্রসঙ্গত এখন আমরা ইসলামি বাংলা প্রাইমারগুলিতে নীতিশিক্ষার প্রকরণ ও তা প্রয়োগের দিকটি আলোচনা করবো। এক্ষেত্রে আমরা আশিস খাস্তগীর প্রণীত নীতিশিক্ষার বিন্যাসটিকে এখানে গ্রহণ করবো, তবে তিনি মোট চার ধরণের নীতিশিক্ষার প্রয়োগ দেখিয়েছেন, আমরা তাঁর সঙ্গে একমত, কিন্তু ইসলামি প্রাইমারে নীতিশিক্ষার বিষয়টি বিশদ বিশ্লেষণের জন্য আমরা এর সঙ্গে আরও একটি বিভাগ সংযুক্ত করতে চাই, তা হলো – 'ধর্মীয় নীতিশিক্ষা'। সবমিলিয়ে আমরা মোট পাঁচটি বর্গে ইসলামি প্রাইমারে নীতিশিক্ষার বিষয়টি আলোচনা করবো। সেগুলি –

ক. ব্যক্তিগত নীতিশিক্ষা

খ. পারিবারিক নীতিশিক্ষা

গ. সামাজিক নীতিশিক্ষা

ঘ. রাষ্ট্রিক নীতিশিক্ষা

ঙ. ধর্মীয় নীতিশিক্ষা

এখন আমরা এই পাঁচ প্রকার নীতিশিক্ষা আমাদের নির্বাচিত ইসলামি প্রাইমারগুলিতে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা করবো।

৪.ক।। ব্যক্তিগত নীতিশিক্ষা :

পরিবার সমাজ এবং দেশের ক্ষুদ্রতম একক হল ব্যক্তি। অর্থাৎ ব্যক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে পরিবার, সমাজ এবং বৃহৎ দেশ। তাই ব্যক্তি যদি সৎ, ন্যায়পরায়ণ, যুক্তিবাদী, প্রতিভাবান এবং সমর্থ্য হন তাহলে তার উপর ভিত্তি করে একটি সুস্থ সবল এবং সুন্দর পরিবার, সমাজ ও দেশ গড়ে উঠবে। সুতরাং পারিবারিক, সামজিক এবং রাষ্ট্রিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রথমেই ব্যক্তির উন্নয়ন, ব্যক্তির 'হয়ে ওঠা' একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। আর এই কারণেই ব্যক্তির শিক্ষার সঙ্গে নৈতিক শিক্ষাকে সব দেশে সবকালে গুরুত্বের সঙ্গে অন্বিত করা হয়েছে। সুতরাং ব্যক্তিগত নীতিশিক্ষায় যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন প্রসঙ্গ। যেমন – ব্যক্তি হবে সুশিক্ষিত, সৎ, শৃঙ্খলাপরায়ণ, উদ্যোগী, পরিশ্রমী, নম্র, ভদ্র, সাহসী, সহিষ্ণু এবং বুদ্ধিমান। এর সঙ্গে ব্যক্তিকে যে সমস্ত বিষয় বর্জন করতে হবে সেগুলি হলো – আলস্য, অহংকার, লোভ, অতি উচ্চাশা, মোহ, ভীরুতা, কৃপণতা, মূঢ়তা, কাপুরুষতা, দীর্ঘসূত্রিতা, দাম্ভিকতা, প্রগলভতা, অপব্যায়, দর্প, আত্মপ্রসাদ, আত্মশ্লাঘা, অবিবেচনা, স্বেচ্ছাচারিতা, এমনকি দিবানিদ্রা।

আমাদের আলোচ্য প্রাইমারে ব্যক্তিগত নীতিশিক্ষার পরিসরে উপরোক্ত বিষয়গুলি কীভাবে ধরা পড়েছে তা দেখানো হলো।

৪.ক.১।। সুশিক্ষা / জ্ঞান :

ক. বই পড়লে জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.৯]*

খ. রসুলের উপর প্রথম অহী / লেখাপড়ায় হও আগ্রহী *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.১০]*

গ. যার আছে বিদ্যা আর সত্য ব্যবহার / সেই ধন্য মান্য গণ্য বরেণ্য সবাকার *[সালাফী বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ.৩]*

ঘ. তোমরা শয়তানের বন্ধু মূর্খ হবে না। লেখাপড়া শিখে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং হাযার হাযার ফেরেশতা এবং জ্ঞানী গুনীদের প্রিয় হবে তা এখন থেকেই ভাব এবং সেইভাবে কাজ করার চেষ্টা কর। *[সালাফী বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ.২৮]*

ঙ. ছাত্রদের একমাত্র ব্রত পড়াশোনা। *[সালাফী বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ.৪]*

চ. ইলমে দ্বীন শিক্ষা কর । দ্বীন ইসলামের খেদমত কর। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ২]*

ছ. তালিম নাও মাদ্রাসাতে / সঠিক জ্ঞান পাবে তাতে। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৫]*

জ. হাদিস কোরান কেতাব পড় / নবীর সুন্নত হয় বড়। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৭]*

ঝ. তালিম নাও মাদ্রাসায়। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ৮]*

ঞ. লেখাপড়ায় ভালো না হলে জীবনে কেউ বড়ো হতে পারে না। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ৩৩]*

ট. লেখাপড়া না শিখলে জীবনে অনেক দুঃখ পাবে। ... নবীজি সকলকে পড়ার কথা বলেছেন। লেখাপড়া শিখতে সুদূর চীন দেশও যেতে হবে। *[কচিকাঁচা-১, পৃ. ৪]*

ঠ. জ্ঞান অর্জন করা ফরয। *[ফুলকুঁড়ি, প্রথম পাঠ, পৃ. ৫০]*

ড. লেখাপড়া করবে যে জ্ঞানীগুণী হবে সে। *[ছড়া ছবিতে একের ভিতরে তিন, পৃ. ৭]*

৪.ক.২।। সততা :

ক. ছলনাকারীর পরিণাম / জান্নাত নয় জাহান্নাম *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.৭]*

খ. পরের ধন দৌলতে প্রলুব্ধ হবে না। *[সালাফী বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ.৮]*

গ. সৎ পথে তুমি চললে ভাই / বিপদ তোমার কোথাও নাই। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৮]*

ঘ. সৎ লোকের সাথী হও / হিংসা ঘৃণা ভুলে রও। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ১২]*

ঙ. ঘুষ নিওনা ঘুষ দিও না / ঘুষ যে বড়ো পাপ

ঘুষের গোনাহ্ বড়ো গোনাহ্ / নেইকো ইহার মাফ। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ৩২]*

চ. ঠকবাজদের কাটো মূল *[কচিকাঁচা-১, পৃ. ৪]*

ছ. আয় করো হালাল পথে। *[কচিকাঁচা-১, পৃ. ১৩]*

জ. সত্যের পথে সংগ্রাম কর। তবেই জীবন ধন্য হবে। *[ফুলকুঁড়ি, প্রথম পাঠ, পৃ. ৪৮]*

ঝ. অসৎ কর্ম ত্যাগ কর। *[ফুলকুঁড়ি, প্রথম পাঠ, পৃ. ৪৮]*

ঞ. সৎ পথে চলে যারা / সবার প্রিয় হয় তারা। *[ছড়া ছবিতে একের ভিতরে তিন, পৃ. ৭]*

৪.ক.৩।। সদাচার ও শৃঙ্খলপরায়নতা :

ক. ডান হাতে খাওয়া সুনন্ত / ঢোল তবলায় খোদার লা'নত *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.৮]*

খ. তিল কভু তাল করো না। *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.৮]*

গ. ষড়যন্ত্রে দুশমনী বাড়ে / সালাম দিলে প্রীতি বাড়ে *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.১১]*

ঘ. বাজে কথা বলতে মানা *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ. ১০]*

ঙ. মিলিমিশি করি কাজ / হারিজিতি নাহি লাজ *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.১৭]*

চ. করিও না কারো গ্লানি পরের অহিত / হইও না কারো দুঃখে কভু আহ্লাদিত। *[সালাফী বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ.৫]*

ছ. ঋণ নেবো না সুদের টাকায় *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ৪]*

জ. দম্ভ করা ভালো নয় / ধার্মিকেরা এটাই কয়। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ৮]*

ঝ. সুদ খাওয়া বৈধ নয়। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ২৫]*

ঞ. না বলে কিছু নিলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় গুনাহ্। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ৩৫]*

ট. লটারি জুয়া দূর করো। *[কচিকাঁচা-১, পৃ. ৪]*

ঠ. চুরি করা মহাপাপ / দোযখে পাবে দুঃখ তাপ। *[ছড়া ছবিতে একের ভিতরে তিন, পৃ. ৩]*

৪.ক.৪।। উদ্যোগী :

ক. উঠে পড় খুব সকালে *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.৬]*

খ. উঠ উঠ মুসলমান / ফজরের হয় আযান *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ২]*

গ. আজান শোনার সাথে সাথে / ধর জামাত দিনে রাতে। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ২]*

ঘ. ঊষাকালে ওজু করে / কোরআন পড় মধুর সুরে। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ২]*

ঙ. ঔষধ খাও সময় মত। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ৪]*

চ. ঘণ্টা বাজে ঘড়িতে / নামাজ পড়ো জামাতে। *[ছড়া ছবিতে একের ভিতরে তিন, পৃ. ৩]*

৪.ক.৫।। পরিশ্রমী :

ক. বিনা পরিশ্রমে লব্ধ ধন উড়িয়ে দিও না। *[সালাফী বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ.৮]*

খ. পরিশ্রমী কখনো মৃয়মাণ হয় না। *[সালাফী বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ.৪]*

গ. ঘুমিয়ে নামাজ করলে কাযা / পেতে হবে কঠিন সাজা *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৩]*

ঘ. রাঙা ভোরের আগে জাগো / ফজরকালে রহম মাগো। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ৫]*

ঙ. বেলাল আযান দেয় ঐ দূর মীনারে / ঘর ছেড়ে বের হও অলসতা নাহিরে। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ২৫]*

চ. অলসতায় অধঃপতন আসে। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ৩০]*

ছ. নির্মলবাবু চলেছেন আদর্শ বিদ্যাপীঠে। তাঁর শরীর খুবই দুর্বল। তবুও তিনি বিস্রা, নেন না। তিনি বলেন, কর্মই ধর্ম। *[ফুলকুঁড়ি, প্রথম পাঠ, পৃ.৪৮]*

৪.ক.৬।। নম্র / ভদ্র :

ক. ক্রোধে মাথা গরম ক্রোধ কর পরিহার / সকলের সাথে কর নম্র ব্যবহার *[সালাফী বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ.৪]*

খ. ঠাণ্ডা মাথায় দিনের কাজ / গড়তে হবে ইসলামী সমাজ। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৪]*

গ. উস্তাদকে মান্য কর। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ৩]*

৪.ক.৭।। সাহসী :

ক. ডর করো না মুসলমান / আল্লার পথে হও কুরবান। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৫]*

খ. একদম ভয় নয়। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ১০]*

গ. হক বল পথ চল / আর নয় ভয়। / এস বস পড় বই / কর সব জয়। *[ফুলকুঁড়ি, প্রথম পাঠ, পৃ. ৪]*

ঘ. ঢাল – তলোয়ার লও রে ভাই / আসছে শত্রু ধেয়ে তাই। *[ছড়া ছবিতে একের ভিতরে তিন, পৃ. ৫]*

ঙ. ভয় পেয়ো না বিপদ দেখে / আল্লাহ আছেন হৃদয় মেখে। *[ছড়া ছবিতে একের ভিতরে তিন, পৃ. ৫]*

৪.ক.৮।। সহিষ্ণুতা :

ক. দুঃখ ও শোকে বিহ্বল না হয়ে ধৈর্য ধারণ কর। *[সালাফী বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ.৫]*

খ. দুঃখ এলে করবে সবর *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ১২]*

গ. বিপদ কালে সবর করো। *[কচিকাঁচা-১, পৃ. ১০]*

উপরিউক্ত নীতিকথাগুলির উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি, মূলধারার প্রচলিত বাংলা প্রাইমারগুলিতে নীতিশিক্ষার যে উদ্দেশ্য আমরা লক্ষ্য করি; ইসলামী প্রাইমারে নীতিশিক্ষা প্রযুক্ত হয় স্বতন্ত্র্য উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ প্রচলিত বাংলা প্রাইমারগুলিতে ব্যক্তিগত নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইহজাগতিক উন্নয়নকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। লেখাপড়ার অগ্রগতির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সুখের ইঙ্গিত থাকে, তা হলো অর্থনৈতিক জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। যেমন 'শিশুশিক্ষা'য় আমরা দেখেছি মদনমোহন বলছেন –

ক. সদা মন দিয়ে পড়িবে, তাহা হইলে শেষে সুখে থাকিবে।

খ. লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।

'বাল্যশিক্ষা' প্রাইমারটিতে বলে হয়েছে –

গ. বিদ্যা অমূল্য ধন। বাল্যে বিদ্যাভ্যাস করিবে। ...

ঘ. দ্যাখো জগদীশ কেমন লেখাপড়া শিখিয়াছে। লেখাপড়ার গুণেই জগদীশ বড়োলক হইয়াছে। এখন জগদীশ গাড়ি, ঘোড়া চরিতেছে, কত লোকের উপকার করিতেছে। ... দ্যাখো সুরেশ, লেখাপড়ায় কেমন গুণ। যদি মন দিয়া লেখাপড়া শেখো, তবেও তমুই জগদীশের মতো বড়োলোক হইতে পারিবে ও সমাজে আদরণীয় হইবে।

'হাসিখুশি' তে আমরা দেখি শিশু পাঠকের ব্যক্তিগত জীবনের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বলা হয়েছে –

ঙ. বাপ ধন ধন ধনা !

পুঁথি হাতে পড়বে মাণিক,

দুলবে কানে সোনা।

উপরিউক্ত নমুনাগুলিতে শিক্ষার মূল লক্ষ্য হিসেবে ইহজাগতিক সুখ ও সমৃদ্ধিকেই স্পষ্ট ভাষায় ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য ইসলামি প্রাইমারগুলিতে ব্যক্তিগত নীতিশিক্ষা দেবার সময় ইহজাগতিক সুখ, সমৃদ্ধি এবং সাফল্যকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বরং তার সুশিক্ষা বা জ্ঞান, সততা, সাহসিকতা, মেহনতি মানসিকতা, সহিষ্ণুতা, নম্রতা, ভদ্রতা সমস্ত কিছুই চালিত হয়েছে 'সাচ্চা মুসলমান' হওয়ার লক্ষ্যে। অর্থাৎ পরকালের সাফল্যের লক্ষ্যে। এ প্রসঙ্গে 'ইসলামী পদ্ধতিতে সন্তানের লালন পালন' গ্রন্থে 'নেক সন্তানের' যে তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যথা – সত্য বচন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, সেবা[৩৬] – তার বাইরে এই প্রাইমারগুলির ব্যক্তিগত নীতিকথা বড়ো বেশি রচিত হয়নি। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, 'ইসলামী পদ্ধতিতে সন্তানের লালন পালন' গ্রন্থে বলা হয়েছে –

> বাচ্চাকে সর্বপ্রথম আরবী ভাষা শেখান। আরবি ভাষার প্রতি আমাদের মোহাব্বতের প্রয়োজন কেননা কুরআন আরবী ভাষাতে অবতীর্ণ হয়েছে। ... জান্নাতের মধ্যে সমস্ত মানুষ আরবী ভাষায় কথা বলবেন। এই কারণে প্রত্যেক কলমা পড়নেওয়ালা মুসলমান ভাইকে আরবী ভাষা শেখার প্রয়োজন।[৩৭]

লক্ষ করবার বিষয় এখানে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান কিংবা সাহিত্য দর্শন চর্চার উদ্দেশ্যে যুগোপযোগী কোন ভাষা চর্চার কথা বলা হচ্ছে না। এমনকি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্যও কোনো অনুপ্রেরণা জোগানো হচ্ছে না। বরং, 'জান্নাত' লাভের বাসনাকে উস্কে দিতেই আরবি ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হচ্ছে। যা কখনোই একটি জাতিকে প্রতিযোগিতামূলক সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার উপযোগী করে তুলতে পারে বলে আমাদের মনে হয় না।

৪.খ. পারিবারিক নীতিশিক্ষা

নীতিশিক্ষার একটি গুরুত্ব পূর্ব পরিসর পরিবার। স্বাভাবিক কারণেই প্রাইমারেও পারিবারিক নীতি শিক্ষার প্রসঙ্গ এসেছে। যেহেতু একজন ব্যক্তি পরিবার এবং বৃহত্তর সমাজের সদস্য তাই ব্যক্তির সঙ্গে পরিবার সমাজ ও দেশের এক প্রকার অন্তর্নিহিত সম্পর্ক রয়েছে। কেমন হবে একটি

পরিবার অথবা একটি সমাজ গঠনে একটি পরিবার কী ধরণের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে সে ব্যাপারে বিস্তর নীতিকথার সন্ধান পাওয়া যায় সাহিত্যে - এমনকি প্রাইমারগুলিতে। স্বাভাবিকভাবেই প্রাইমারে বর্ণিত নীতি শিক্ষাগুলিতে প্রথমেই আসে সন্তানের সঙ্গে মাতা পিতার সম্পর্ক এবং সাংসারিক ও পারিবারিক সুখ ও শান্তির নানা রকমের আদর্শের কথা।

আশিস খাস্তগীর তাঁর 'বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষা' গ্রন্থে এই বর্গের নীতিশিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন - সকল ধর্মেই পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং অনুরক্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। পিতা-মাতার পর আসে ভাই বোনের প্রসঙ্গ। এদের সঙ্গেও স্নেহময় মধুর সম্পর্ক বজায় রাখার উপদেশ আছে। সকল গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শনও পারিবারিক জীবনের প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করা হয়। এই শ্রেণির নীতিশিক্ষায় ব্যক্তির কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে অন্বিত করা দেখানো হয়। সেসব গুণের মধ্যে সত্য কথা বলা, ন্যায়ের পথে চলা, সকলের সঙ্গে প্রিয় বাক্য ব্যবহার, পরোপকার, পরহিত, দান, দয়া, আতিথিয়তা, মিত্রতা রক্ষা, শিষ্টাচার কৃতজ্ঞতাবোধ, সর্ব জীবে প্রেম ইত্যাদি প্রসঙ্গ যেমন যুক্ত হয়। তেমনই সামাজিক স্থিতি ও সামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে নানা রকম পারিবারিক দায়িত্বও অর্পিত হয়। শ্রী খাস্তগীর তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে হিন্দুর পারিবারিক জীবনে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস জীবনে নানা প্রকার দায় দায়িত্ব এবং সেই সংক্রান্ত নীতিশিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু আমাদের আলোচ্য ইসলামিক প্রাইমারগুলিতে পারিবারিক জীবন পুনর্গঠন ও 'শরিয়তি' ভাবনায় তাকে সুদৃঢ় করবার উপদেশাবলি রচিত হলেও সেভাবে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ইত্যাদি আলাদা ভাগের কোন উল্লেখ নেই এবং তৎ-সংক্রান্ত নীতিশিক্ষারও কোনো পরিসর তৈরি হয়নি। তবে যে সমস্ত দোষ একটি পরিবারের কাঠামোকে ধ্বংস করে দিতে পারে, সেই সমস্ত দোষগুলি পরিত্যাগ করবার যাবতীয় নির্দেশ এবং নীতি এই প্রাইমারগুলিতে আমরা লক্ষ্ করি। নিচে ইসলামি প্রাইমারে বর্ণিত পারিবারিক নীতিকথাগুলির কিছু নমুনা দেওয়া হলো।

ক. মায়ের চরণ তলে জান্নাত / যতনে তাহার পাইবে নাজাত *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ. ১০]*

খ. কাউকে কু পরামর্শ দিও না।

গ. সাক্ষাৎ হলে সালাম কর / ভালো মন্দ জিজ্ঞাসা কর। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৭]*

ঘ. বংশ গৌরব ও বড়াই / কখনো করো না ভাই। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৮]*

ঙ. মায়ের মত কেউ যে নাই / তাঁরই সেবা করবো ভাই। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ৯]*

চ. গৃহ বিবাদ ভালো নয়। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ২৩]*

ছ. কৃপণতা ভালো নয়। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ২৩]*

জ. সৈয়দ সাহেব ঐ বৈঠক করে / নৈতিকতা শেখান ঘরে ঘরে। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ২৫]*

ঝ. বড়দের কদর করো। ছোটদের ভালবাসো। বড়দের সামনে উঁচু জায়গায় বসবে না। কখনো কাউকে হিংসা করবে না। হিংসা মানুষের পতন ঘটায়। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ৩৩]*

ঞ. চাঁদ দেখে তারিখ গোনো / মাতা পিতার কথা শোনো। *[কচিকাঁচা-১, পৃ. ১৩]*

ট. রফিক খুব সুবোধ বালক। ... পরিবারের কেউ পীড়িত হলে তার সেবা করে। *[কচিকাঁচা-১, পৃ. ৩৮]*

ঠ. ঝগড়া বা গালাগালি করলে সকলে ঘৃণা করে। ... ভাইবোনদের সাথে মিলেমিশে থাকবে। কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। তাঁদের সাথে মারামারি করলে সকলে খারাপ বলবে। কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। মিথ্যা কথা বলা বড় গুনাহ্। সবসময় পিতামাতার কথা শোনা উচিত। পিতা মাতা পরম গুরুজন। পিতামাতার কথা নাসুনলে আল্লাহ নারাজ হন। *[কচিকাঁচা-১, পৃ. ৩০]*

আমাদের আলোচ্য ইসলামিক প্রাইমারগুলিতে আমরা লক্ষ করছি পারিবারিক নীতিশিক্ষা প্রসঙ্গে মাতৃভক্তিকে প্রশংসিত কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তেমনি ইসলামি রেওয়াজ অনুযায়ী সালাম জানানো, কুশল জিজ্ঞাসা, বড়দেরকে সম্মান এবং ছোটদেরকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া প্রাসঙ্গিকভাবে পরিবারের পীড়িত সদস্যদের সেবা করার কথা বলা হয়েছে। যে প্রসঙ্গটি 'ইসলামিক পদ্ধতিতে সন্তান লালন পালন' গ্রন্থে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। 'নেক সন্তানের তিনটি বৈশিষ্ট্যের' মধ্যে একটি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

> বাচ্চাকে খিদমত করার এহ্মিয়াত বোঝাবেন। বাড়ির কাজ করলে তাঁর জন্য কী আযর আছে তা বোঝাতে হবে। পিতামাতার খিদমত, শিক্ষকের খিদমত, বড়োদের খিদমত ইত্যাদি। ছতবেলা থেকেই

বাচ্চার মধ্যে খিদমত করার যাজবা তৈরি করতে হবে। কী জানি, কবে কোন নেক লোকের খিদমত করবে, আর তার উপর দোয়া লেগে যাবে।[৩৮]

অর্থাৎ এখানেও শিশুর শিশুর কৃতকর্মের ফল হিসেবে জান্নাত – জাহান্নামের কথা এসেছে। সোজাকথায় ধর্মের দ্বারাই চালিত হয়েছে উপরোক্ত পারিবারিক নীতিশিক্ষাটি। পারিবারিক নীতিশিক্ষায় অন্যান্য প্রসঙ্গ হিসেবে এসেছে গৃহবিবাদ-কৃপণতা-বংশ গৌরব- কু-পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি নেতিবাচক কর্মকাণ্ডকে পরিত্যাগ করবার উপদেশ। অর্থাৎ পারিবারিক স্থিতি ও শান্তি বজায় রেখে ইসলামি তরিকায় সংসার জীবনের প্রতিই নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে।

৪.গ. সামাজিক নীতিশিক্ষা

সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যেই সামাজিক নীতিশিক্ষা প্রণীত হয়। এই ধরনের নীতি শিক্ষার প্রধান উপজীব্য বিষয়গুলি হল সামাজিক ন্যায়নীতি রক্ষা, সামাজিক সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য প্রত্যেকটি ব্যক্তির অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা। স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক নীতিশিক্ষাতে একজন ব্যক্তিকে সামাজিক 'হয়ে উঠবার' যাবতীয় পরামর্শ ও তালিম দেওয়া হয়। এরই পাশাপাশি পরিবর্তনশীল সামাজিক ব্যবস্থায় একজন শিশু কীভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে তার যাবতীয় নীতি বা পথও বাতলে দেবার দায়িত্ব নিয়ে থাকে প্রাইমারগুলি। যেভাবে আমরা লক্ষ করেছি প্রাচীনকালে আমাদের শিক্ষা অর্থকরী ছিল না, তাই সেখানে বিদ্যার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ভয় থেকে অভয়ে নিয়ে যাওয়া, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাওয়া। দার্শনিক অরিন্দম চক্রবর্তী তাঁর 'কোন বিদ্যার আরাধনা' প্রবন্ধে আদিকালের বিদ্যার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'আত্মজ্ঞান' লাভের কথা বলেছেন।[৩৯] সমালোচক কার্তিক লাহিড়ী তাঁর 'শিশুপাঠ্য পুস্তকের সমাজতত্ত্ব : ১' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন পরিবর্তিত সমাজ কাঠামোয় উনিশ শতক থেকে কীভাবে অর্থকরী শিক্ষার বাজার তৈরি হলো এবং এই অর্থকরী শিক্ষাকেই কীভাবে প্রাইমারগুলিতে 'প্রজেক্ট' করা হলো এবং সেই মোতাবেক নীতিকথাও রচিত হলো।[৪০]

অন্যদিকে সামাজিক নীতিশিক্ষায় ব্যক্তিকে সমাজ উপযোগী করে তোলবার জন্য তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত, সৃষ্ট মার্জিত এবং পরিশীলিত করে তোলবার নির্দেশ দেওয়া হয়। বলা হয় তার আচার-আচরণের মধ্যেই ফুটে ওঠে তার ব্যক্তিত্ব তাই সমাজের ভালো-মন্দ সম্বন্ধে সে যেমন সচেতন থাকবে তেমনই সমাজকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তাকে বহন করতে হবে। সুতরাং সামাজিক মানুষ হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে সে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে, আচরণ ও

ব্যবহারকে আদর্শ স্থানীয় করে তুলবে – পরোপকারিতা, পরহিতব্রত পালন ও শিষ্টাচার প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে।

কোরানে সমাজকে অখণ্ড মানব সমাজ হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে এবং সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণের ক্ষেত্রে নিরবছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলা হয়েছে।[৪১] অর্থাৎ কেবলমাত্র মুসলমানের জন্যই সামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে এমন খণ্ডদৃষ্টি সেখানে যেমন নেই, তেমনই 'মুসলমানের জন্যই সমাজ গঠন' এমন ভাষ্যও কোথাও নেই। আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে এক্ষেত্রে আমরা মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করি। সামাজিক স্থিতি, উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণের প্রসঙ্গে এখানে যেমন সর্বজনীন অখণ্ড দর্শন গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনই কেবলমাত্র 'ইসলামি সমাজ' গঠনের কথাও এসেছে। প্রসঙ্গত নির্বাচিত প্রাইমারগুলিতে সামাজিক নীতিকথার কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হলো।

ক. দানের জিনিস যায় না বৃথা *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.৮]*

খ. ঋণের গোনাহ্ মাফ হয় না *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.৪]*

গ. ওজনে ফাঁকি মহাপাপ / ঔষধে ভেজাল অভিশাপ *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.৫]*

ঘ. ঠগবাজী বেঈমানী কাজ *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.৭]*

চ. পথের কাঁটা সরালে নেকী *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.৯]*

ছ. ষড়যন্ত্রে দুশমনী বাড়ে / সালাম দিলে প্রীতি বাড়ে *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.১১]*

জ. শ্রমিকের প্রাপ্য তার ঘাম শুকোবার আগেই মিটিয়ে দাও *[সালাফী বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ.৪]*

ঝ. ওজনেতে দিলে ফাঁকি / হতে হবে মহাপাপী। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৩]*

ঞ. ঔষধে ভেজাল মহাপাপ / পাবে সবার অভিশাপ। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৩]*

ট. ঝগড়া ফ্যাসাদ ত্যাগ করো / আল্লার হুকুম মান্য কর। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৪]*

ঠ. দুঃখী জনের পাশে দাঁড়াও / ইসলামী আদর্শ ভুলে না যাও। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৮]*

ড. নিঃসহায় মানুষের পাশে থেকো। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ৩০]*

ঢ. কাহাকেও মনঃপীড়া দিও না।। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ৩০]*

ণ. ঋণ করলে শোধ করো। *[কচিকাঁচা-১, পৃ. ৪]*

ত. দুঃখী জনে বাসো ভালো। *[কচিকাঁচা-১, পৃ. ১৩]*

থ. ঝগড়া ছেড়ে মৈত্রী গড়ো। *[কচিকাঁচা-১, পৃ. ৭]*

দ. কাউকে ঘৃণা করা ঠিক নয়। অসহায় মানুষকে কৃপা করা দরকার। *[ফুলকুঁড়ি, প্রথম পাঠ, পৃ. ১৬]*

ধ. অন্ধ ও রুগ্ন মানুষদের ভালবাসতে হবে। যাঁদের অন্তরে স্নেহ ভালোবাসা নেই তাঁরা আল্লাহর বন্ধু নয়। *[ফুলকুঁড়ি, প্রথম পাঠ, পৃ. ৭]*

ন. ধার্মিক লোক বেশী তর্ক করে না। ... ধার্মিক মানুষ সর্বদা আল্লাহর উপর নির্ভর করে। *[এসো পড়তে শিখি, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৯]*

প. ইসলাম ধর্ম মেনে চলো / কোরান হাদিসের সমাজ গড়। *[ছড়া ছবিতে একের ভিতরে তিন, পৃ. ১]*

ফ. ঊষার সময় কোরআন পড়ি / আল কোরআনের সমাজ গড়ি। *[ছড়া ছবিতে একের ভিতরে তিন, পৃ. ১]*

লক্ষ করবার বিষয় আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে সামাজিক নীতিশিক্ষা চালিত হয়েছে দুই ধরণের সমাজ কাঠামো ও আদর্শকে সামনে রেখে। একদিকে আছে অখণ্ড, সর্বজনীন মানব সমাজের আদর্শ, অন্যদিকে আছে ইসলামি বা মুসলমান সমাজ নির্মাণের অভিপ্রায়। প্রথম সমাজ কাঠামোটিতে আবশ্যিকভাবে সকল মানবের জন্য নির্ধারিত সামাজিক নীতির কথা আছে। ফলে অসাধু উপায় বর্জন, ন্যায় নীতির পথানুসরণ, মানবতাবোধের জাগরণ, সামাজিক সাম্য বজায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে সমস্ত নীতিকথা ঘোষিত হয়েছে সেগুলিতে আমরা উন্নত ও অখণ্ড মানবাদর্শকেই খুঁজে পাই। কিন্তু পরক্ষণেই খণ্ড 'ইসলামি' বা 'মুসলমান' সমাজের স্বপ্নও দেখি। আর এই ধরণের সামাজিক নীতিকথার মূল লক্ষ্য 'ইসলামের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষার্থীদের নিকট স্পষ্ট করে তোলা' এবং তার ভিত্তিতে 'মুসলিম দার্শনিক, মুসলিম বৈজ্ঞানিক, মুসলিম শাসক, মুসলিম বিচারক, মুসলিম অর্থনীতিবিদ, মুসলিম সেনাপতি, মুসলিম রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি সৃষ্টি করা...'[৪২] তাই

আমাদের মনে হয় সামাজিক নীতিকথা প্রণয়নে ইসলামি প্রাইমারগুলিকে আরো বেশি করে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে অন্বিত করবার আয়োজন করতে হবে। একরৈখিক মুসলমান সমাজের ভাবকল্পনায় শিশুর কল্পজগতকে সৃজন করবার মধ্যে দিয়ে আসলে এক ধরণের বিকল্পহীন এবং বিরোধীহীন অবাস্তবতাকেই জায়গা দেওয়া হয়ে যাচ্ছে, যা বর্তমানের প্রেক্ষিতে মোটেও স্বাস্থ্যকর চিন্তাভাবনা নয়।

৪.ঘ : রাষ্ট্রীয় নীতিশিক্ষা

পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সর্বদাই রাষ্ট্রীয় চিন্তাভাবনার ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার অনুকূল যাবতীয় নীতি পাঠ্যপুস্তক এর মধ্যে দিয়ে চিরকাল উপস্থাপিত হয়েছে। রাষ্ট্র তার অধীনস্থ প্রজার থেকে কী ধরণের আচরণ প্রত্যাশা করে কিংবা রাষ্ট্রের কাছে প্রজার অবস্থানটি কীরকম তার সবটাই ধরা পড়ে সরকার নিয়ন্ত্রিত পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যে দিয়ে। যে কারণে অধুনা যুক্তি প্রতিষ্ঠার নামে 'এন সি ই আর টি' (ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং) এর তরফে স্কুল পাঠ্যক্রম থেকে বিস্তর ঝাড়াই বাছাই করে সরান হয়েছে 'শাসক' ও 'গণতন্ত্র' এর মতো শব্দগুলি, আবার মুছে ফেলা হয়েছে 'বর্ণাশ্রম' বিষয়ক অনুচ্ছেদগুলি, বিলোপ করে দেওয়া হয়েছে মুসলমানদের ঐতিহ্যশালী অতীত ইতিহাসগুলিকে।[৪৩] অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তককে নিজের অনুকূলে দেখানোর প্রয়াস সবসময় শাসকের থাকে এবং আধিপত্যবাদ নির্মাণের এই কুললক্ষণ থেকেই রচিত হয় রাষ্ট্রের অনুকূল নীতিকথাও। যেমন রাজাকে মান্য করার কথা কথা, তাকে যথাসময়ে কর প্রদানের কথা এবং তার শাসনব্যবস্থাকে ইজ্জত করবার কথা বলা হয় সেই সঙ্গে যে রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বসবাস করা হয় তার গুণকীর্তনও করা হয় উক্ত বচনসমূহে।

প্রাইমার আদতে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ হলেও এর পরতে পরতে লুকিয়ে আছে ক্ষমতার ঘ্রাণ, আনুগত্য লাভ ও আধিপত্য কায়েমের সূক্ষ্ম বয়ান। 'স্কুল' নামক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা ব্যবস্থার জাঁতাকলে মানুষ তৈরির অদৃশ্য অস্ত্র বহন করে এই প্রাইমারগুলি। শৈশবেই শিক্ষার্থীকে সমঝে দেওয়া হয় কী তার করণীয় আর কী বা তার করা অনুচিত। ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের ছড়ি হাতে বসে প্রাইমার শিক্ষার্থীকে সর্বদা শাসিয়েই যায়। স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ক্ষমতা কাঠামোর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের তালিম দিয়ে শিশুকে গোপাল নামক সুবোধ প্রজাতিতে পরিণত করা হয়। গোপালদের অন্যান্য সম্ভাব্যতাকে খারিজ করে কেবলমাত্র দুধে ভাতে সুখী ভীতু নাগরিক হয়ে উঠতে সাহায্য করে প্রাইমারগুলি। কী হবে শিশুর আচরণ তার চাবিকাঠি হাতে নিয়ে তাকে

পরিচালনার দায়িত্ব নেয় প্রাইমার। সেদিক থেকে ক্ষমতা ও শাসনতান্ত্রিকতার (Governmentality) বাইরে রাখা যায় না প্রাইমারগুলিকে।

মিশেল ফুকো তাঁর বিভিন্ন লেখায় 'governmentality'র সংজ্ঞা দিয়েছেন – 'Conduct of conduct' বলে; বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে 'আচরণের পরিচালনা'। অর্থাৎ গভর্নমেন্ট বলতে আমরা এমন এক কার্য প্রণালী বোঝাই যার উদ্দেশ্য হল মানুষের আচরণকে গড়ে পিঠে নেওয়া, তাকে পরিচালনা ও প্রভাবিত করা। ফুকো বলবেন এই কার্যপ্রণালীর ক্ষেত্র বিস্তৃত - তা সেল্‌ফ বা আত্মনের সঙ্গে আত্মনের সম্পর্ক নিয়ে হতে পারে, প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত জীবনের নিয়ন্ত্রন নিয়ে হতে পারে, সর্বোপরি রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে।[৪৪] প্রাইমারের ক্ষেত্রে আমরা কার্যত শিশুর আচরণ গড়ে পিঠে নেবার প্রচেষ্টা লক্ষ করি এবং তা অনেকাংশেই রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কাজে কাজেই প্রাইমারের সঙ্গে রাজনীতির পারস্পরিকতাকে যেমন কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না, তেমনই প্রাইমারে বর্ণিত নীতিশিক্ষায় রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহের জটিল বিন্যাসকেও অস্বীকার করা যায় না।

আর একারণেই আজ থেকে একশো পঁচাত্তর বছর আগে বাঙালি শিশু পাঠকের বইয়ের পাতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন রাজনীতির প্রাথমিক নীতি ও পাঠ

শিশুশিক্ষা (২) নির্বাচিত কিছু অংশ থেকে তার নমুনা দেওয়া গেল –

পরের গ্লানি করা বড় দোষ।

অসতের দুর্নাম ভয় নাই।

মূঢ়ের দিগ্বিদিক্ বোধ নাই।

দুর্ব্বলের বৃথা রোষ।

যথার্থ মিত্র অতি দুর্লভ।

অনুচিত প্রশ্ন করা অনুচিত।

মানি/মানীর অপমান শিরশ্ছেদনতুল্য।

কাহারও উপর খড়্গহস্ত হইও না।

আপন কাজে সত্বর হও।

রাজার রাজস্ব অবশ্য দেয়।

নির্ধনের আদর নাই।

আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই।

সকল বাঞ্ছা সফল হয় না। (নজরটান সংযোজিত)

নজরটান অংশ লক্ষণীয় এই কারণে যে এই সমস্ত পঙক্তির মধ্যে দিয়ে উপনিবেশের শিশুর কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বেশ কিছু বার্তা। এই সকল বার্তা সমকালের শাসক ও প্রজার সম্পর্ক কাঠামো নির্ধারণে যথেষ্ট। 'রাজার রাজস্ব অবশ্য দেয়' - রাজার (ইংরেজ) প্রতি দায়িত্বসচেতনতা। 'মানীর অপমান শিরশ্ছেদনতুল্য' – এখানে মানী হলেন ইংরেজ। তাঁর প্রতি অপমান গ্রাহ্য শুধু নয়, দণ্ডনীয় অপরাধ। এখানেই শেষ নয়; মদনমোহনের প্রাইমারে দাসত্যসূচক সবচেয়ে নির্লজ্জ আত্মঘোষণাও শোনা যাবে।

পাকা পান টাকা দান

বার মাস তার দাস

বার মাস কার দাস? একথা স্পষ্ট বলা নেই। পাকা পান আর টাকা দান করবে কাকে? এই সওয়ালেরও যোগ্য কোনো উত্তর নেই কিন্তু আমরা কি বুঝে নিতে পারি না একথা শাসকের উদ্দেশ্যে।

আমরা যদি আমাদের প্রকল্পিত ইসলামি প্রাইমারগুলিতে প্রভু-ভৃত্য, শাসক-শাসিতের সম্পর্কের বিন্যাস রাষ্ট্রীয় নীতিতত্ত্ব অনুসন্ধান করি তাহলে লক্ষ করবো এখানে প্রভু ভৃত্যের ঠাস বুনোট অদৃশ্য নয়। এখানে কে প্রভু আর কে ভৃত্য? কে শাসক কে শাসিত? তার সহজ জবাব কোরান হাদিসপ্রাজ্ঞ মোল্লাতন্ত্র এই প্রাইমারগুলির প্রভু – সমাজের চালক। আর তাঁদের নির্দেশ ও আনুগত্যবহনকারী হলেন সাধারণ মানুষ। ধর্মীয় নির্দেশ, আদেশ ও উপদেশের ঘেরাটোপে এঁরা মানব জীবনকে স্বহস্তে শাসন করারও দায়িত্ব পালন করে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের নির্বাচিত প্রাইমারগুলিতে সেই সমস্ত নির্দেশ ও আদেশের কথা ঘুরে ফিরে এসেছে নীতির ছলে। নিচে কয়েকটি নমুনা প্রদান করা হলো।

ক. দেশের ম্যাপ বুঝে নাও / যেথায় যাও মিলিয়ে নাও। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৫]*

খ. পতাকা হল দেশের মাণ / রক্ষা করবো এর সম্মান। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৬]*

গ. শরিয়তের বিধান চাই / খোদার পথে চলবো ভাই। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ১০]*

ঘ. শরীয়ত ছাড়া পথ নাই। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ১৯]*

ঙ. আমরা ভারতবাসী। ভারত আমাদের মাতৃভূমি। তাই আমরা একে ভালোবাসি। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ৩৭]*

চ. চীন আমার আরব আমার, / ভারত আমার নয়কো পর।

বিশ্বজোড়া মুসলিম আমি / সাড়া বিশ্বে বেঁধেছি ঘর। *[কচিকাঁচা-১, পৃ. ৬]*

ছ. শরিয়তের বিধান মেনো / সিভিল কোডে পতন জেনো।

জ. ভারত একটি মহান দেশ। ... আমদের উচিত এই মহান দেশের মহান মানুষ হওয়া। *[কচিকাঁচা-১, পৃ. ৩৬]*

উপরিউক্ত নমুনাগুলি ছাড়াও প্রত্যেকটি প্রাইমারে কমবেশি এক বাএকাধিক গল্প/ গদ্য রয়েছে যেখানে মুসলমান রাজা, শাসক বা খলিফার শাসনকে মহান, আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠ শাসন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবেই আরব দুনিয়া, বাগদান, ইরাক, ইরানের রাজা মহারাজা, ভারত থেকে ঔরঙ্গজেব প্রমুখদের উৎকৃষ্ট শাসনের নমুনা পেশ করা হয়েছে। এমনকি ঔরঙ্গজেবকে 'জিন্দাপীর' পর্যন্ত বলা হয়েছে। আবার দেশের ম্যাপ ছড়াটিতে ভারতের ম্যাপের কথা এসেছে, দেশভক্তি হিসেবে ভারতপ্রীতির কথা এসেছে, বিশ্বাত্মাবোধ জাগরিত হয়েছে বটে, কিন্তু তারই বিপরীতে আবার লক্ষ করা যায়, একমাত্র শরিয়তি আইনকেই মান্যতা দেবার কথা। জেখানে বলা হয় 'শরিয়ত ছাড়া পথ নাই' অথবা 'শরিয়তের বিধান মেনো / সিভিল কোডে পতন জেনো' সেখানে যেন প্রচলিত সাংবিধানিক আইন ব্যবস্থাকেই চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দেওয়া হয়। মনে হয় যেন প্রচলিত রাষ্ট্রীয় শাসনের বাইরে 'ইসলামি শাসন' ব্যবস্থাই প্রত্যাশা করেন তাঁরা। এই বাসনা অবশ্য স্পষ্ট প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে অধ্যাপক গোলাম আযম রচিত 'শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামী রূপরেখা' নামক ছোট্ট পুস্তিকাটিতে। সেখানে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামি রাষ্ট্রব্যস্থার অনুকূলে গড়ে তোলার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

> সে শিক্ষা লাভ করার ফলে শিক্ষার্থীদের মন মগজ ও চরিত্র এমনভাবে গড়ে উঠবে, যাতে ইসলামের আদর্শে একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। ... এ শিক্ষা ব্যক্তিজীবন হতে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত সকল দিকেই আদর্শ কে মানব রচিত সকল আদর্শ হইতে উন্নত ও প্রগতিশীল বলে প্রমাণিত করবে। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা হতে উচ্চতর মান পর্যন্ত শিক্ষার সকল

> স্তরেই এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের সকলে শাখা প্রশাখারই কুরআন অসুন্নাহর আলোকে যাবতীয় শিক্ষা ডান করেত হবে। ইসলামের রাস্ত্রব্যবস্থা, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কনীতি এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে, যাতে মানব রচিত মতবাদসমূহের সাথে তুলনা করে ইসলামের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষার্থীদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৪৫]

লক্ষ করবার বিষয় এখানে ইসলামের রাষ্ট্রব্যস্থাকে ঐশ্বরিক রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে কল্পনা করা হচ্ছে এবং মানব রচিত রাষ্ট্রব্যবস্থা অপেক্ষা শুধুমাত্র উন্নতই ভাবা হচ্ছে না, ভাবা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ নির্বিকল্প। সেইসঙ্গে সেই রাষ্ট্রবয়স্থা কায়েমের বাসনা ব্যক্ত হয়েছে সর্ব স্তরে। এই জন্যই কি ইসলামি প্রাইমারে নীতির আশ্রয় নিয়ে বলতে হয় – 'শরিয়ত ছাড়া পথ নাই' কিংবা 'শরিয়তের বিধান মেনো / সিভিল কোডে পতন জেনো'?

উপরিউক্ত নীতিশিক্ষার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, রাষ্ট্রিক নীতিশিক্ষা প্রণয়নে ইসলামি বাংলা প্রাইমারগুলিতে 'সিনথেটিক হেজিমনি' প্রযুক্ত হয়েছে ব্যাপকভাবে। এই 'সিনথেটিক হেজিমনি' প্রসঙ্গে অজিত চৌধুরী একটি প্রবন্ধে বলেছেন – সিনথেটিক হেজিমনি হলো সেই বিশেষ ধরণের আধিপত্যবাদ যেটি সরসারি বিদেশি কোনো শাসক প্রয়োগ করেন না। বরং বিদেশের সেই শাসননীতি আমাদের দেশীয় কোনো শাসক/বুদ্ধিজীবীর হাতফেরতা হয়ে আমাদের উপর লাগু হয়।[৪৬] এক্ষেত্রে কোরান ও হাদিসে বর্ণিত বিদেশী জীবন বিশেষত আরব পারস্যের মুসলমানের জীবন কাঠামোর ছকে ফেলে এদেশের শিশুর জীবন গড়ে তোলার তালিমও দেওয়া হয়েছে এই প্রাইমারগুলিতে এবং সেক্ষেত্রে জীবন গঠনের (অস্যার্থে শাসনের) পরামর্শগুলি কেবল শাস্ত্রীয় বিধি থেকেই গৃহীত হয়নি। বরং দেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ মুসলমান লেখক বুদ্ধিজীবী, মৌলবি কিংবা মৌলবাদী একটি গোষ্ঠীর মস্তিষ্ক থেকে তা নির্মিত হয়েছে। ফলে দেশীয় লেখকের হাতফেরতা এই প্রাইমারগুলি একটা 'সিনথেটিক হেজিমনি'ই গড়ে তুলেছে। কেননা তার অবয়ব রচিত হয়েছে দেশীয়দের হাতে।

উনিশ ও বিশ কিংবা একুশ শতকের প্রাইমার অনেকাংশ জুড়ে প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব ফলাবার ময়দান হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই নীতি প্রতিষ্ঠার নাম করে লেখক সেখানে শাসকের পক্ষেই বয়ান রচনা করেছেন এবং শিশুকে তাঁর আনুগত্য স্বীকার ও সহ্য করবার তালিম দিতে থাকেন।

আমাদের মনে হয়, আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে শাসন কিংবা ধর্মীয় ক্ষমতাতন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি কল্পনায় কাউন্টার হেজিমনি গড়ে তুলে প্রভুর কর্তব্য, তার অর্ধসত্য (অতিকথা, বিজ্ঞান ও রূপক) – এর মুখোশ খুলে দেওয়ার কোনো প্রচেষ্টা নেই। নেই শিশুপাঠকের চিত্তে সত্যানুসন্ধানী

বিজ্ঞান বোধ জাগ্রত করে ক্ষমতা কাঠামোকে বিরোধিতা করবার সাহস জোগানোর প্রয়াস। অথচ এই শিশু পাঠ্যপুস্তকগুলির দ্বারাই গোপনে জারি রাখা যেত কোনো এক অদৃশ্য যুদ্ধ; যার দ্বারা অন্তত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ও ক্ষমতাতন্ত্রের বাইরে গিয়ে মানুষ এক উদার আকশ পেতেন। কিন্তু তা হয়নি। হিন্দু বাঙালির হাতে রচিত মূল ধারার প্রাইমার এবং ইসলামি বাংলা প্রাইমার সর্বক্ষেত্রেই দেখি শিশুকে ক্ষমতাতন্ত্র ও ব্যবস্থার অনুকূলে *প্রশিক্ষিত ভৃত্য* হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রাইমারগুলি বৃহৎক্ষেত্র জুড়ে শাসনভীরু গোপাল রফিক ও রমজানদের আনাগোনা চলে। আর তাঁদের হাতেই আরোপিত হয় সমাজের, সম্প্রদায়ের ও দেশের শাসনদণ্ড এবং যুগ যুগ ধরেই তাঁরাও নিজেদের শাসকশ্রেণির[৪৭] আসনটিকেও পাকা করবার প্রয়াস জারি রাখেন শাস্ত্র ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় নীতির আড়ম্বরে।

৪.ঙ: ধর্মীয় নীতিশিক্ষা

ধর্মীয় নীতিশিক্ষা আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে অন্যান্য নীতিশিক্ষা অপেক্ষা অধিক এবং সর্বগ্রাসী। অর্থাৎ নীতিশিক্ষার ক্ষেত্র জুড়ে ধর্মীয় অনুশীলনই প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। বিষয়টিকে একটু তলিয়ে ভাবলে আমরা লক্ষ করবো ইসলামি প্রাইমারগুলির প্রাণকেন্দ্রেই অবস্থান করছে ধর্ম। আর সেই ধর্ম হল – ইসলাম; 'দ্বীন-ই-ইসলাম'। তাই যে শিক্ষা ব্যবস্থায় এই 'ইসলামি' নীতির অনুসরণ নেই, তা মুসলমানের কাছে চরমভাবে পরিত্যজ্য বলে মনে করা হয়েছে।[৪৮] আর এই কারণেই ইসলামি প্রাইমারে ধর্মীয় নীতিমালা সুসজ্জিত করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক, ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রিক কিংবা পারিবারিক যে কোনো নীতি শিক্ষার ক্ষেত্রেই ধর্মীয় অনুষঙ্গকে বারংবার সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত নিচে কয়েকটি নমুনা দেওয়া হলো –

ক. ডান হাতে খাওয়া সুনন্ত / ঢোল তবলায় খোদার লা'নত *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.৮]*

খ. কুরআন পড় সাঁঝ সকালে / খোদার রহম পাবে তাহলে *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.৬]*

গ. অযূ কোরে পাক হও / আল্লার নাম লও *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.৩]*

ঘ. ঘরে সুন্নত পড়া ভাল *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.৬]*

ঙ. ঝড় তুফানে দোআ পড় *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.৭]*

চ. ধনীর ঘরে যাকাত ফরজ *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.৮]*

ছ. কুরআন শোনায় এই পয়গাম / মানুষ কেবল খোদারই গোলাম *[সালাফী বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, পৃ.৯]*

জ. অজু করে নামাজ পড় / ঈমান আমাল শক্ত কর। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ২]*

ঝ. খানা পিনা হালাল খাও / মাকরুহগুলি এড়িয়ে যাও। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৩]*

ঞ. কোরআন পড় দিনে রাতে / সাফায়াত পাবে আখেরাতে। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৩]*

ট. যতনে ধন বৃদ্ধি পায় / যাকাত দিলে আরো হয়। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৬]*

ঠ. রাসুল নামে দরুদ সালাম / মেনে চলো হালাল হারাম। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৬]*

ড. শরিয়তের বিধান চাই / খোদার পথে চলবো ভাই। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ১০]*

ঢ. মানুষের সেবা করলে নেকী হয়। *[কচিকাঁচা-১, পৃ. ৩৮]*

ণ. ধনী লোকদের হয করা ফরয। *[কচিকাঁচা-১, পৃ. ৩২]*

ত. হাদীসে আমীর গরীব সবাই সমান। হাদিস পড়া দরকার। *[ফুলকুঁড়ি, প্রথম পাঠ, পৃ. ১০]*

থ. ভোগ-বিলাশ আর লোভ থাকলে রোজা হয় না। *[ফুলকুঁড়ি, প্রথম পাঠ, পৃ. ২২]*

দ. তালিম নাও মাদ্রাসাতে / সঠিক জ্ঞান পাবে তাতে। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৫]*

ধ. হাদিস কোরান কেতাব পড় / নবীর সুন্নত হয় বড়। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ৭]*

ন. আজান শোনার সাথে সাথে / ধর জামাত দিনে রাতে। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ২]*

প. ঊষাকালে ওজু করে / কোরআন পড় মধুর সুরে। *[ইসলামী বর্ণপরিচয়, পৃ. ২]*

ফ. ধার্মিক লোক বেশী তর্ক করে না। ... ধার্মিক মানুষ সর্বদা আল্লাহর উপর নির্ভর করে। *[এসো পড়তে শিখি, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৯]*

ব. ইসলাম ধর্ম মেনে চলো / কোরান হাদিসের সমাজ গড়। *[ছড়া ছবিতে একের ভিতরে তিন, পৃ. ১]*

আমরা উপরিউক্ত নমুনাগুলিতে আমরা লক্ষ্য করেছি প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ধর্মীয় কৃত্যালীর যোগাযোগ আছে। কেবলমাত্র এখানেই সীমাবদ্ধ নেই ধর্মীয় নীতিসমূহ। এর সঙ্গে প্রাইমারে গদ্য পাঠ ও গল্প পাঠ অংশগুলিতে বর্ণিত চরিত্র ও আখ্যানের মধ্যে দিয়েও নিবিড়ভাবে ধর্মীয় নীতিশিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত অজু করে পাকসাফ হওয়া, পাঁচবার নামাজ পড়া, কোরান পাঠ, আরবি ভাষা শিক্ষা, হাদিস পাঠ, পর্দা মেনে চলা, শরিয়তের যাবতীয় নির্দেশকে যথাযথ পালন করা, রোজা রাখা, হারাম হালাল বেছে খাওয়া, যাকাত দেওয়া, হজ করতে যাওয়া, কলেমা পাঠ ও ইসলামকে পূর্ণভাবে জীবনে প্রয়োগ করার ব্যাপারে আত্মনিবেদন প্রভৃতি বিষয় প্রাইমারগুলিতে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

এখন বিষয় হল ধর্মীয় নীতি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কোন একটি ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন এবং তা মেনে চলবার নির্দেশ প্রদান। এক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রাইমারগুলিতে ধর্মীয় নীতিশিক্ষার যে পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে শিশুকে কট্টর ইসলামী তরিকায় মানুষ করবার কথা বারবার শোনা যায়। শিশুর লক্ষ্য 'আমি হবো সাচ্চা মুসলমান'। ইসলামি প্রাইমারে ধর্মনিষ্ঠ, আবেগহীন, দায়িত্ব পরায়ণ শিশুপাঠক শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ মান্য করতে করতে অল্প বয়সেই হয়ে পড়ে হাসি-আনন্দহীন জড়বস্তু। তাই তার কাছে গল্প, আড্ডা, আনন্দময় পরিবেশ অসহ্য মনে হয়। সেইরকম এক নিরানন্দ শিশুর স্বরূপ ফুটে উঠেছে 'শিশুকথা দ্বিতীয় ভাগ' এর সপ্তম পাঠে। লেখক যেন এই ছোট্ট শিশুটির মধ্যে দিয়ে মুসলমান বালকের ধর্মীয় নীতিবোধকেও আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চান। দেখা যাক সেই ধর্মীয় নীতি পালনকারী বালকের স্বরূপ :

> আমি ছোট্ট শিশু। খাঁটি মুসলিম হওয়াই আমার উদ্দেশ্য। তাই আমি ঠাট্টা ভালোবাসি না। অট্টহাসি হাসি না। আড্ডা দিয়ে সময় অপচয় করি না। সদা সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে মত্ত থাকি। পিতামাতা ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা করি। সুন্দর কিছু দেখলে আলহামদুলিল্লাহ্ পড়ি। ভালো কাজে বিলম্ব করি না। দম্ভ প্রকাশ করে নিজের পরকালকে পণ্ড করতে চাই না।[৪৯]

এই পাঠের 'খাঁটি মুসলিম' বালকটি পূর্বের রফিকের যোগ্য উত্তরসূরি। ধর্ম ও শাস্ত্রের শৃঙ্খলিত জগতের মধ্যেই তার চলাফেরা। তাই হাসি-আড্ডা এহ বাহ্য, সময়ের জ্ঞানও তার প্রবল। শিশুসুলভ কোনো সারল্য তাকে কব্জা করতে পারেনি, তাই পরকালপ্রেমিক এই বালকের ইহজাগতিক যাবতীয় কর্ম পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় জান্নাত প্রাপ্তিকে সামনে রেখেই। আলোচ্য প্রাইমারের এই বালকই মুসলমান শিশুর আদর্শ। বলে মনে করেন ইসলামি প্রাইমারের নীতি প্রণেতারা।

উপপত্তি :

আমরা জানি শিশুপাঠ্য পুস্তকে বর্ণ, শব্দ, বাক্যের পাশাপাশি যে জগত থরে থরে সাজানো থাকে তার উপর ভিত্তি করে শিশু পাঠকের 'মন' তৈরি হয়, তৈরি হয় তার ব্যক্তিত্ব। এক্ষেত্রে বিন্যস্ত ও সংকলিত নীতিশিক্ষাগুলি তার মনের গড়ন তৈরি করে। নীতি, নৈতিকতা শুভ; কিন্তু নীতিশিক্ষা ততটা উপভোগের বিষয় নয়। নীতি উপদেশ দেওয়া অনেকটা নিয়মিত ওষুধ খাওয়ানোর মতো নিষ্প্রাণ ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গতভাবেই বলেছিলেন –

> নীতি উপদেশ জিনিসটা একটা বিরোধ। ইহা কোনোমতেই মনোরম হইতে পারে না। যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয় তাঁহাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। উপদেশ হয় তাহার মাথা ডিঙাইয়া চলিয়া যায়, নয় তাহাকে আঘাত করে। ইহাতে যে কেবল চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহা নয়, অনেক সময় অনিষ্ট করে।[৫০]

উনিশ শতকের বাংলা প্রাইমারে নীতিশিক্ষার বহর এতটাই প্রবল ছিল যে, তার দাপটে গোপালদের মতো সুবোধ ও 'সুবিধা সচেতন' সুবালকদের নিত্য আনাগোনা বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ছেলেগুলি পাশ করিয়া ভালো চাকরি বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে।'[৫১] একালের একজন সমাজতাত্ত্বিকের মতে, উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দুর যে মনের গড়ন, তা খানিকটা গড়ে উঠেছিল সেকালের হিন্দু বাঙালির হাতে রচিত প্রাইমারের ভাষ্য থেকে।[৫২] কার্তিক লাহিড়ী এ'প্রসঙ্গে তাঁর 'শিশুপাঠ্য পুস্তকের সমাজতত্ত্ব : ১ / ২' প্রবন্ধ দুটিতে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, আর্থিক সমৃদ্ধির এবং সাফল্যের যে আদর্শ প্রাইমারগুলিতে বর্ণিত হয়েছে তার ভিত্তিতে হিন্দু বাঙালির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে উঠেছে। তিনি দেখিয়েছেন সেই সমস্ত শিশুপাঠ্য পুস্তকের পাঠ ও অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে একটি জাতি কীভাবে আত্মসচেতন ও সমাজ-রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছে এবং তার ভিত্তিতে নিজেদের ইহজাগতিক জীবনপথ মসৃণ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে আমরা লক্ষ করবো মুসলমান শিশুর জন্য প্রণীত ইসলামি প্রাইমারে যে জগত, জীবন এবং চরিত্রকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় তারসঙ্গে বাস্তবের মিল একবারেই শূন্য। আর্থিক সামাজিক জীবনের উন্নয়ন অপেক্ষা তাঁরা কেবলমাত্র পারলৌকিক সুখ লাভের বাসনায় মগ্ন, মত্ত, সম্মোহিত। আর এখান থেকেই মুসলমান সমাজ প্রচলিত শিক্ষার আদর্শ, নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন একটি পৃথক শিক্ষর লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। উনিশ শতকে ইংরাজি শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে মুসলমান সমাজ এক ঐতিহাসিক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যার ফল মোটেও সুখকর হয়নি। আজ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে ইসলামি নীতি ও তত্ত্ব

নির্ভর যে সমান্তরাল আরেকটি বিকল্প শিক্ষা কাঠামো ও ভিন্ন প্রাইমার বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা যে কতোখানি 'অনিষ্টকর' ইতিহাস তার জবাব দেবে নিশ্চয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন নীতিশিক্ষা ক্ষেত্রবিশেষে কতটা অনিষ্টকর হতে পারে। আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে প্রস্তাবিত নীতিকথা মুসলমান শিশুকে যেভাবে হাস্য-সরলতাবিহীন ধ্যানগম্ভীর 'মৌলবী'র অবয়ব দান করেছে তা সমাজ সভ্যতা ও জাতির পক্ষে কতোখানি সুবিধার হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. গুপ্ত. দীক্ষিত, *নীতিশাস্ত্র,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৩

২. খালেক. এ. এস. এম. আবদুল, *প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা,* অনন্যা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৫

৩. খালেক. এ. এস. এম. আবদুল, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৫

৪. খালেক. এ. এস. এম. আবদুল, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৫

৫. সিঙ্গার. পিটার, (রায়. ড. প্রদীপ, অনূদিত) *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা,* অবসর, ঢাকা, মার্চ ২০১৫, পৃ. ৬

৬. ভট্টাচার্য. সুকুমারী, *গীতা কেন?,* ক্যাম্প, কলকাতা, জুলাই ২০১৫, পৃ. ৯ – ১০

৭. ভট্টাচার্য. সুকুমারী, ঐ, ঐ ,ঐ, পৃ. ১৪

৮. গ্রামশি. আনতোনিও, *বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা,* বন্দ্যোপাধ্যায়. শমীক, ও ভট্টাচার্য. সৌরীন, (সম্পা. ও অনূদিত) অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২০

৯. ভট্টাচার্য. সুকুমারী, ঐ, ঐ ,ঐ, পৃ. ১৪

১০. ভট্টাচার্য. সুকুমারী, ঐ, ঐ ,ঐ, পৃ. ১৪ – ১৫

১১. ভট্টাচার্য. সুকুমারী, *গীতা কেন?,* ক্যাম্প, কলকাতা, জুলাই ২০১৫, গ্রন্থে উদ্ধৃত, ১৪

১২. ভট্টাচার্য. সুকুমারী, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৪

১৩. ভট্টাচার্য. সুকান্ত, 'রানার', *সুকান্ত সমগ্র,* সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৬৪, পৃ. ৭৬

১৪. ভট্টাচার্য. সুকান্ত, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৭৭

১৫. ভট্টাচার্য. সুকুমারী, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৪

১৬. বসু. প্রদীপ, 'জীবনের রাজনীতি : জৈব ক্ষমতা ও জৈব রাজনীতি', দেখুন. *রাজনীতির তত্ত্ব তত্ত্বের রাজনীতি,* চর্চাপদ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১১৩ – ১১৫

১৭. সেন. সুকুমার, শিশুলীলা, *সুকুমার সেন প্রবন্ধ সংকলন,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ.

১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়. শিবাজী, *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য,* কারিগর, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ১২১

১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়. শিবাজী, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১২২

২০. মজুমদার. লীলা, 'ছোটদের জন্য বই', দেখুন. বন্দ্যোপাধ্যায়. চিত্তরঞ্জন (সম্পা.) *বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন,* বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, জুন ১৯৮১, পৃ. ২৪০

২১. খাস্তগীর. আশিস, *বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষা,* পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১০

২২. খাস্তগীর. আশিস, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১০

২৩. খাস্তগীর. আশিস, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১১

২৪. আহমেদ. ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাংলা মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা,* রীডার্স কর্নার, কলকাতা, ১৩৯৬, পৃ. ২১০

২৫. আনিসুজ্জামান, স্বরূপের সন্ধানে, দে'জ, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৯।

২৬. আহমেদ. ওয়াকিল, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২১৬

২৭. 'ইসলাম প্রচারক', ফাল্গুন – চৈত্র ১৩০৮, দেখুন, আহমদ. ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা,* বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৪৯০

২৮. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, পৃ. ৬৮৫

২৯. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ঐ, ঐ, পৃ. ৭১৫

৩০. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ঐ, ঐ, পৃ. ৬৮৬ – ৭১৪

৩১. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ঐ, ঐ, পৃ. ৭১৫ – ৭৪৪

৩২. গনী. ড. ওসমান, *চরিত্র ও সমাজ গঠনে হাদীস শরীফ,* পারুল, কলকাতা, প্রথম পারুল সংস্করণ ২০০৮, পৃ. ৩৩৪

৩৩. গনী. ড. ওসমান, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৩৪

৩৪. ঐ, ঐ, ঐ

৩৫. ঐ, ঐ, ঐ

৩৬. আহমেদ. ড. শেখ ফিরদৌস, *ইসলামিক পদ্ধতিতে সন্তানের লালন পালন,* জাভেদ পাবলিকেশন্স, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃ. ৩

৩৭. আহমেদ. ড. শেখ ফিরদৌস, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৫১

৩৮. আহমেদ. ড. শেখ ফিরদৌস, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪

৩৯. চক্রবর্তী. অরিন্দম, 'কোন বিদ্যার আরাধনা', দেখুন. *এ তনু ভরিয়া : দর্শন আপাদমস্তক,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২২, পৃ. ১৪২

৪০. লাহিড়ী. কার্তিক, 'শিশুপাঠ্য পুস্তকের সমাজতত্ত্ব : ১, দেখুন. *কলকাতার গ্রাম্যতা ও বাঙালি বুদ্ধিজীবী,* প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৪২ – ৪৬

৪১. গনী. ড. ওসমান, *ইসলামি চিন্তা চেতনার ও ক্রমবিকাশ,* পারুল, কলকাতা, প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১৮, পৃ. ২৯৭ – ২৯৮

৪২. আযম. অধ্যাপক গোলাম, *শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামী রূপরেখা,* বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ. ১৯

৪৩. রায়. কুমকুম, 'যুক্তি প্রতিষ্ঠা না ধাপ্পাবাজি', দেখুন. 'ইতিহাস্যকর সংখ্যা', *প্রতিদিন রোববার,* (সম্পা. অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়), ১১ জুন, ২০২৩, পৃ. ৯ – ১২

৪৪. বসু. প্রদীপ, *রাজনীতির তত্ত্ব তত্ত্বের রাজনীতি,* চর্চাপদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃ. ৭০

৪৫. আযম. অধ্যাপক গোলাম, *শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামী রূপরেখা,* বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ. ১৮ - ১৯

৪৬. চৌধুরি. অজিত, উপনিবেশের হেজিমনি : বাদামি প্রাচ্যবাদের সমালোচনার দিকে, *অবভাস প্রবন্ধ সংকলন জানুয়ারি – মার্চ ২০০৪,* পার্থ চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা, মার্চ ২০০৪, পৃ. ২

৪৭. প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য : রুদ্র, অশোক 'বুদ্ধিজীবী একটি শাসকশ্রেণী', দেখুন. *সমাজে নারী পুরুষ ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃ. ১১৩ – ১২৫

৪৮. দেখুন. আযম. অধ্যাপক গোলাম, 'প্রচলিত ধুনিক শিক্ষা ব্যস্থার মৌলিক গলদ', *শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামী রূপরেখা,* বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ. ১৭ – ১৮

৪৯. রহমান, জামান মুস্তাফিজুর, *শিশুকথা* (দ্বিতীয় ভাগ), আদর্শ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃ. ৩৭

৫০. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, 'শিক্ষা সমস্যা', দেখুন. *রবীন্দ্র রচনাবলি,* জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, পৃ. ৫৬৩

৫১. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, 'বিদাসাগর চরিত', দেখুন. রবীন্দ্র রচনাবলি, জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, পৃ. ৩৩৯

৫২. লাহিড়ী. কার্তিক, 'শিশুপাঠ্য পুস্তকের সমাজতত্ত্ব : ১ / ২, দেখুন. *কলকাতার গ্রাম্যতা ও বাঙালি বুদ্ধিজীবী,* প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৪২ – ৬২

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্ত্রী শিক্ষা ও নারী ভাবনায় ইসলামি প্রাইমার

প্রাচীন ভারতে নারীকে একাধিক নানা বয়ানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমরা যখন শুনি মানুষ হল 'অমৃতস্য পুত্রা' তখন তার মধ্যে অন্তত কোনো নারী পুরুষ ভেদ জ্ঞান পাই না। অর্থাৎ সেখানে নারী এবং পুরুষ অভিন্ন এবং সকলেই এই অভিধায় ভূষিত। কিন্তু এই ডিসকোর্স তেমন বেশি জনপ্রিয়তা পায়নি বরং পুরুষের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নারীকে পৃথক ও স্বতন্ত্র্যভাবে ব্যাখ্যা করার তাগিদ অনুভূত হল সমাজে, যার মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্যই ক্ষমতাহীনকে কোণঠাসা করে দেওয়া বা প্রান্তিক (Marginalized) মানবে পরিণত করা। আর সেই সূত্র ধরেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত সময়ের নানা অভিঘাতে নারীকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় আমরা হিন্দু ও মুসলমানের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে নারীকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তার একটি রূপরেখা বিশ্লেষণ করবো এবং প্রসঙ্গত আমাদের পাঠ্য ইসলামি প্রাইমারগুলিতে নারীর পরিচয়ের (identity)র যে সমস্ত মাত্রা উঠে এসেছি সেগুলি সম্পর্কে পর্যালোচনা করবো। সেইসূত্রে স্ত্রীশিক্ষা ও নারী ভাবনায় আলোচ্য প্রাইমারগুলির অবস্থান বিচার করবো।

১. নারীত্বের প্রাচীন সংজ্ঞা : হিন্দুর শাস্ত্রে

দেশে দেশে কালে কালে প্রতিটি ধর্মেই নারীকে এক স্বতন্ত্র ভাবনা-চিন্তা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। জৈবিকভাবে যদিও পুরুষ এবং নারীর চিহ্নগত সামান্য দু'একটি তফাৎ ব্যতীত আদতে সেরকম কোনো ফারাক নেই, তথাপি পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধর্মেই নারীকে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে যেহেতু ধর্ম এবং শাস্ত্রের ভাষ্য রচয়িতারা পুরুষ, তাই নারীর সংজ্ঞা রচিত হয়েছে পুরুষের দৃষ্টিতে। সুতরাং পুরুষের দ্বারা সংজ্ঞায়িত নারী যে একপেশে, কোণঠাসা ও সমাজের পিছড়েবর্গ হিসেবে চিহ্নিত হবেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অতঃপর দেখা যাক পুরুষ শাস্ত্রকারদের হাতে নারী কীভাবে সংজ্ঞায়িত হলেন -

ক. বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৬।৪।৭) – এ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন –

> কোনো স্ত্রী যদি তার পতির শয্যায় আসতে অসম্মতি জানায়, (প্রথমে) মিষ্টিকথায় তাঁকে আদর ও অনুনয় করা যেতে পাররে, তাতে কাজ না হলে গয়নাপত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে 'কিনে নেওয়া' যেতে পাড়ে, আর তার পরও যদি রাজি না হয় তাহলে পতির উচিত লাঠ্যৌষধি কিংবা চড় থাপ্পর প্রয়োগ।[১]

এখানে স্ত্রীজাতিকে পুরুষের অধীন ভোগ্যবস্তু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যাকে উপভোগ করবার ক্ষেত্রে কোনোরকম বাধা সৃষ্টি হলে প্রহার পর্যন্ত করা যেতে পারে। এই একই ভাষ্য হাদিসেও আছে। যথাসময়ে আমরা সে প্রসঙ্গে আলোচনা করবো।

খ. মৈত্রায়নী সংহিতায় (৩।৬।৩, ৪।৬।৭, ৪।৭।৪, ১০।১০।১১) বহুবার বলা হয়েছে–

> নারী শরীর নারীর নিজের নয়, তাই যৌন নিপীড়ন থেকে তার নিজেকে বাঁচানোর সুযোগ নেই।[২]

এখানেও আমরা নারীকে স্বাতন্ত্রহীন, অক্ষম ও দুর্বল প্রাণী হিসেবে পাই। যে এতটাই অক্ষম এবং অসহায় যে, সে নিজেকে বাঁচাবার সুযোগটুকু থেকেও বঞ্চিত হবে।

গ. আপাস্তম্বধর্মসূত্রের ২৩।৪ নং ও হিরণ্যকেশি গৃহ্যসূত্রের ১।১৪।২ নং শ্লোকে বলা হয়েছে –

> কোনো নারী পরপুরুষের শয্যাসঙ্গী হলে তাঁর নির্দিষ্ট অঙ্গে কাঁকড়া বিছে ঢুকিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে।[৩]

এই জায়গায় নারীর স্বাধিকার সাংঘাতিকভাবেই খর্ব হয়েছে। সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার অভিপ্রায়ে নারীর জন্য কঠোর শাস্তির আয়োজন করা হয়েছে।

ঘ. খাদির গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে –

> নারীমাত্রই অশুভ প্রতীক গণ্য হতেন, যেমনটা ছিল কুকুর, শকুনির মতো অশুভ পাখি, বেজি, ইঁদুর ও শূদ্রের বেলায়। এঁদের মধ্যে যে কোন একটির হত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ছিল সমান।[৪]

নারীর অবস্থা এখানে আরো সঙ্গীন। তাকে এবার সরাসরি মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং চরমতম লজ্জার বিষয় হলো, উপরোক্ত মানবেতর প্রাণীগুলিকে যেমন হত্যা করা যায়, তেমনই নারীকেও হত্যা করা যায়; শর্ত একটিই উভয়ের ক্ষেত্রে সমান প্রায়শ্চিত্ত প্রযোজ্য।

ঙ. তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২।৩, ১০। ৭) স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে –

> নারী কেবলমাত্র যৌন সম্ভোগের বিষয়। গোরু জমি এবং নারীকে অতিমাত্রায় ব্যবহার করা ঠিক নয় – অন্যথায় তাঁরা হয় মরবে নয়তো রুগ্ন হয়ে পড়বে।[৫]

উক্ত শাস্ত্রীয় বচনে নারীকে পুনরায় ভোগ্যবস্তুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে নারীর উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীর ব্যবহারিকতা প্রাধান্য পেয়েছে। জীবনানন্দের ভাষায় – 'ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত'।

চ. 'শতপথব্রাহ্মণ' এর ৪।৪।২।১৩ নং শ্লোক থেকে জানা যায় –

> অগ্নি পত্নীবৎ অনুষ্ঠানে একটা লাথি দিয়ে ঘিয়ের উপর আঘাত করা হত। নির্মম স্পষ্টতায় এই প্রতীক ব্যাখ্যা করে গ্রন্থটি জানাচ্ছে যে – "স্ত্রীকে এইভাবে মারা দরকার যাতে তাঁর শরীর কিংবা সম্পত্তির উপর তাঁর কোনো অধিকার না বর্তায়।[৬]

এখানেও নারী পুরুষের হাতের খেলনা হিসেবে দেখা হয়েছে; যে তার প্রয়োজন মতো তাকে শাসন করতে পারে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক যাবতীয় ক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

ছ. মহাভারতে ভীষ্ম শরশয্যায় যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিচ্ছেন –

> যদি দাঁড়িপাল্লা নিয়ে তার একদিকে সাপ, বারবানল, ক্ষুরধার ছুড়ি, ইত্যাদি নেওয়া হয় এবং অন্যদিকে স্ত্রীজাতি বা নারীকে রাখা হয় তাহলে ভয়ংকর অর্থে নারী পূর্বোক্ত অস্ত্র আগুন ও বিষাক্ত সাপ অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন হবে না।[৭]

ভীষ্মের উপরিউক্ত উক্তিতে স্ত্রী জাতিকে পূর্বের শ্লোকগুলির মতো দুর্বল ভীরু বা কমনীয় ভাবা হয়নি; পরিবর্তে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নেতিবাচকতার নানামাত্রা। যেখানে স্ত্রী জাতি ভয়ংকরতার সমার্থক। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'কঙ্কাল' গল্পের নায়িকাকে তার শ্বশুর শাশুড়ি অনুরূপ ভয়ংকরতা আরোপ করতে 'বিষকন্যা' বলে অভিহিত করেছিলেন।

উপরিউক্ত শ্লোক পরম্পরা থেকে আমরা অন্তত এ'টুকু অনুমান করতে পারি যে সেকালে পুরুষের শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে নারী হলেন –

১. জন্মগতভভাবে পরাধীন – পুরুষের হাতের পুতুল

২. সামাজিকভাবে প্রান্তিক (Marginal)

৩. পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন ভোগ্যবস্তু – যাকে ইচ্ছে মতো ব্যবহার করা যায়, এবং অপচয়ের ভয়ে ব্যবহারে স্থগিত দেওয়া যায়।

৪. অন্যান্য জাগতিক বস্তুর থেকে সাংঘাতিক এবং ভয়ঙ্কর বস্তু যা অতি সহজেই ধ্বংসাত্মক কিছু ক্ষতি সাধন করতে পারে।

প্রাচীন ভারতে নারীত্বের এই সংজ্ঞা নির্মাণের ধারা আজো সমানভাবে বহমান। এক্ষেত্রে আমাদের আধুনিকোত্তর সামাজিক চিন্তা এবং সাংস্কৃতিক রুচি খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। তার কয়েকটি নমুনা আমরা বুঝে নেবার চেষ্টা করবো এযুগের জনপ্রিয় কয়েকটি সঙ্গীতের ভাষা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে।

১.২ : নারীর আধুনিক সংজ্ঞা : জনপ্রিয় সঙ্গীতে

প্রাচীনকালে সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্র, মহাকাব্য এবং মৌখিক সাহিত্যের নানা পরিসরে 'নারী'কে যেমন ভোগ্যবস্তু, পণ্য, ভয়ংকর, কখনো বা দুর্বল; পুরুষের হাতের তাস বলে গণ্য করা হয়েছে তেমনই এযুগেও নারীকে তুলনা করা হয়েছে পুরুষের ভোগ্য বস্তু হিসেবেই। এ ব্যাপারে সেল্যুলয়েডের সঙ্গীত নারীর এই আধুনিক সংজ্ঞায়নের পথটি পাকা করেছে। বর্তমান যুগের মূলধারার হিন্দি ও বাংলা চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন সংগীতের কথাগুলি পরখ করলে আমরা এই ব্যাপারটি স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারবো। সেল্যুলয়েডের অপার্থিব মায়াময় জগত মানুষকে - বিশেষত স্ত্রীজাতিকে 'চিজ', 'মাল' বা ভোগ্যপণ্যে পরিণত করেছে। আমরা আমাদের আলোচনায় এই ধরণের কয়েকটি (হিন্দি ও বাংলা) সঙ্গীতের নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করে বুঝে নেবার চেষ্টা করবো নারী শরীর পণ্যায়নে ও 'নারী' নির্মাণে এযুগের মানুষের মনের কথাগুলি কীভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত আমরা সর্বভারতীয় প্রেক্ষিত বুঝতে দুটি হিন্দি গান এবং নারীর সংজ্ঞা নির্মাণে বাঙালি চিত্তের প্রমাণ পেতে দুটি বাংলা গানের উল্লেখ করবো।

১.২.ক।। ১৯৯০ এর জনপ্রিয় হিন্দি ছবি ইন্দ্র কুমার পরিচালিত 'দিল'। অভিনয় করেছেন আমির খান ও মাধুরী দীক্ষিত। এই ছবির বিখ্যাত সঙ্গীত –

খাম্বে জ্যায়সে খাড়ি হে

ল্যাড়কি হ্যায় ইয়া ছাড়ি হে

শোলা হ্যায় ফুলঝড়ি হ্যায়

পাট্‌ঠা খে কি লাড়ি হ্যায়। (নজরটান নিজস্ব সংযোজন)

এখানে লক্ষ করুন 'খাম্বে', 'ছাড়ি', 'ফুলঝড়ি', 'লাড়ি' এই সমস্ত বস্তুবাচক শব্দ দ্বারা মেয়েটিকে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে। এমনকি সন্দেহ অলঙ্কার প্রয়োগ করে সংশয় জ্ঞাপন করা হচ্ছে যে, ল্যাম্পপোস্টের মতো দাঁড়িয়ে আছেন তিনি আসলে মেয়ে নাকি একটি লাঠি? আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না আধুনিক মানুষের চিন্তায় স্ত্রী জাতির স্বরূপটি কী।

১.২.খ।। ১৯৯৪ সালে মুক্তি পাওয়া 'ত্রিমূর্তি ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড' প্রযোজিত 'মোহরা' চলচ্চিত্রটির আরেকটি গানে নারী দেহকে সরাসরি 'চিজ' বা বস্তু হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হল। এর আগে এত সরাসাসরি এবং প্রত্যক্ষভাবে নারী দেহকে সে'ভাবে বস্তু বলা হয়নি। 'অল টাইম ব্লকবাস্টার' এই ছবিতে অভিনয় করেছেন সুনীল শেট্টি, অক্ষয় কুমার, রবিনা ট্যাণ্ডন এবং নাসিরউদ্দি শাহ। এই গানের কথায় আসা যাক –

তু চিজ বাড়ি হে মস্ত মস্ত

তু চিজ বাড়ি হে মস্ত

নেহি তুঝকো কোই হোস হোস

উস পার যৌবন কা জোশ

নেহি তেরা কোই দোষ দোষ

মাদহোশ হে তু হর ওয়াক্ত ওয়াক্ত। (নজরটান নিজস্ব সংযোজন)

এই গানটিতে স্ত্রী দেহকে 'চিজ' এবং 'যৌবন কা জোশ' বলে দাগিয়ে দিয়ে স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণের যে অভিপ্রায় রয়েছে তা নিশ্চয় স্ত্রীকে পুরুষের সম্ভোগের বস্তু হিসেবেই ইঙ্গিত করে?

স্ত্রী দেহকে পণ্য এবং উপভোগের বস্তু হিসেবে নির্মাণের এই যে অভিপ্রায় তা আরো ব্যাপকতর আকার ধারণ করেছে একুশ শতকে। এই শতকের গোঁড়া থেকে চলচ্চিত্রে আইটেম সং এর ব্যবহার যেমন বেড়েছে তেমনই দেহ প্রদর্শনের মানসিকতাও অনেক উর্ধমুখী হয়েছে জনরুচির কথা মাথায় রেখে।

১.২.গ।। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি পায় সলমান খান ও সোনাক্ষী সিংহ অভিনীত জনপ্রিয় ছবি 'দাবাং'। এই ছবির 'আইটেম সং' - এ নৃত্য করেছেন নৃত্যপটীয়সী করিনা কাপুর। এই গানের কথাগুলির প্রতি একটু নজর দিন। এখানে একজন নারী কণ্ঠে গানের শুরুতেই জানানো হচ্ছে যে – তিনি সমস্ত 'হোসআলে' কে 'মাদহোস' ক'রে দেবার জন্যে যথেষ্ট এবং তারপর জানান –

মে তো কাব সে হুঁ রেডি তৈয়ার

পাটালে সাঁইয়া মিস কল সে

যেন খাবার তৈরি হয়ে বসে আছে, মিসডকল মারফৎ অর্ডার এলেই উপভোক্তা তা লাভ করবেন। এরপর এই গানেই পুরুষ কণ্ঠে সলমান খান গেয়ে ওঠেন –

প্যার কর লে তু আজ আঙ্গুর কি ডটার সে

নাসিহাত (উপদেশ) ভুল জায়েগা তু এক কোয়ার্টার সে।

এরপর নারী কণ্ঠে যে সাংঘাতিক উচ্চারণ শোনা যায় সেখানে আধুনিক সমাজে নারীর স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে –

ম্যা তো তান্দুরি মুরগি হুঁ ইয়ার

গাটকালে সাঁইয়া অ্যালকোহল সে

(I am a barbecue hen / swallow me with alcohol , o my beloved)

এখানেই শেষ নয়। এরপর আরো বলা হয় –

লোগ ক্যাহেতে হে মুঝে ম্যায় তো হুঁ নামকিন বাটার

কাট দুঙ্গি মে দিখো মেরি জাবানি হে কাটার। (নজরটান নিজস্ব সংযোজন)

লক্ষ করুন, মেয়েটির বয়ানে তিনি জানাচ্ছেন যে, তিনি একটি **তান্দুরি মুরগি** যাকে অ্যালকোহলের সঙ্গে গিলে ফেলা হোক। সেইসঙ্গেও এও জানাচ্ছেন যে, লোকে তাঁকে বলেন তিনি নাকি **'নামকিন বাটার'** – নোনতা মাখন। প্রত্যেকটি শব্দের অনুষঙ্গে নারী এবং খাদ্যপণ্য কোথাও যেন এক হয়ে গেছে। কোথাও যেন নারী শরীরের প্রতি এক স্পষ্ট ইশারা ঝলসে উঠছে যাকে ভোগের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ রাখা যায়।

১.২.ঘ।। মূলধারার আধুনিক বাংলা গানও যে জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমার গানের মতোই নারী দেহকে পণ্যের আকারে বোতলে পুরে ফেলেছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। ২০১১ সালে মুক্তি পেয়েছিল সৌমিক চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত এবং সোহম ও শ্রাবন্তী অভিনীত জনপ্রিয় ছবি 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে'। এই সঙ্গীতটিতে আপাত ভোলাভালা সোহম নায়িকা শ্রাবন্তীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন –

যতই বল আমায় বোকাভোলা

কাল হবি তুই আমার কোকাকোলা

এই গানটির আরেকটি জায়গায় খুব স্পষ্ট ভাষায় স্ত্রী কণ্ঠে বলা হয় –

হাঁ হাঁ আমি শিলা যে সেক্সি শিলা যে

খালি দেখলে হবে খরচা আছে হেব্বি (নজরটান নিজস্ব সংযোজন)

অর্থাৎ পুরুষের দৃষ্টিতে এখানে একজন নারী 'কোকাকোলা' নামক বহুজাতিক পানীয় সদৃশ্য। পিপাসার্ত নায়ক-পুরুষ কোমল পানীয় সদৃশ্য সেই নারী শরীরীকে পান করবেন আকণ্ঠ। আপাতভাবে নিরীহ মনে হলেও এই বয়ানের মধ্যে যৌনতার ও দেহ সম্ভোগের অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে, পরের লাইনে যেখানে মেয়েটি নিজেকে 'সেক্সি শিলা' বলে পরিচয় করাচ্ছে সেখানে। সেই সঙ্গে তার দেহ যে খরচা দিলে মেলে এই তথ্য জ্ঞাপনের জন্য নির্লজ্জের মতো ব'লেও দিচ্ছে – 'খালি দেখলে হবে খরচা আছে হেব্বি'। সেল্যুলয়েডের এই সঙ্গীতটির মধ্যে কোথাও কি এই ইশারা পাওয়া যাচ্ছে না যেখানে খরচা দিলে নারী শরীর মেলবার ইঙ্গিত রয়েছে?[৮]

উপরিউক্ত সংগীতগুলিকে যদি আমরা খোলা চোখে বিচার করি তাহলে সেকালের শাস্ত্রকারদের সঙ্গে একালের জনপ্রিয় সংগীত রচিয়তাদের নারী ভাবনার এক চমৎকার সাদৃশ্য খুঁজে পাবো। যার প্রেক্ষিতে আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে গণপরিসরে 'নারী' সংক্রান্ত ভাবনাগুলির সঙ্গে এখনো পূর্বের নেতিবাচক দিকগুলি কোনো এক অনিবার্য বন্ধনে যেমন অন্বিত হয়ে আছে।

২. নারীর সংজ্ঞার্থ ও স্বরূপ : কোরান-হাদিস ও শরিয়তে

ভারতীয় প্রেক্ষিতে শাস্ত্রীয় ভাষ্য থেকে নারীর যে সংজ্ঞা ও স্বরূপ আমরা চিহ্নিত করেছি তা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের সকল স্ত্রীর লোকের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়েছে এবং বর্তমানেও বহুক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কিন্তু এখন আমরা বিচার করতে চাই ইসলাম ধর্মে 'স্ত্রী' জাতিকে শাস্ত্রকাররা কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন সেইদিকটি।

ইসলামে নারীর সংজ্ঞা পাওয়া যায় কোরান - এর নানা আয়াতে এবং হাদীস শরীফের একাধিক ভাষ্যে। এ প্রসঙ্গে এই সময়কার একজন খ্যাতনামা সমাজতাত্ত্বিকের বক্তব্য কোরানে

অন্যান্য সামাজিক বিষয় অপেক্ষা নারী অধিক গুরুত্বসহ আলোচ্য বিষয়। যেখানে সাধারণ মানুষের ধারণা 'কোরানে নারী হচ্ছে অর্ধ মানব', তিনি সেই ধারণার পরিবর্তে দেখাতে চেয়েছেন কোরান নারীকে অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা অধিক সুরক্ষিত স্থান দিয়েছে। ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইসলামিক স্টাডিজ' বিভাগের অধাপিকা আমিনা ওয়াদুদ এ'প্রসঙ্গে তাঁর 'ইসলামে নারী অধিকার আন্দোলন' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন - "কোরআনে নারী বিষয়ে যতগুলো আয়াত রয়েছে – ব্যক্তি হিসেবে, পরিবারের সদস্য হিসেবে, সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে – আর সকল সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত আয়াত জড়ো করলে সেগুলোর সংখ্যা কম"[৯] অর্থাৎ কোরানে আলোচনার বিষয় হিসেবে 'নারী' পৌনঃপুনিকভাবে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। কিন্তু সেই ফিরে ফিরে আসা কি নারীকে পূর্ণ সম্মান জানাবার তাগিদে? নারীর ক্ষমতায়নের অভিপ্রায়ে? নাকি নারীর দুর্বলতা, অক্ষমতা, অপারগতা, পরনির্ভরশীলতা ও সামাজিকভাবে প্রান্তিক অবস্থানকে চিহ্নিত করবার উদ্দেশ্যে? এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক আমিনা ওয়াদুদ 'বিশ্বাসী'র দৃষ্টিভঙ্গিতে গোটা বিষয়টির মূল্যায়ন করেছেন। কিন্তু আমরা একান্তই বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামে নারীর সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিচার করবার চেষ্টা করবো এবং নারী সংক্রান্ত এই বোধগুলি কীভাবে আমাদের নির্বাচিত ইসলামি প্রাইমারগুলিতে জায়গা করে নিয়েছে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করবো।

নারী জাতিকে কোরান, হাদিস এবং পরবর্তীকালে শরিয়তে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানে কোরান, হাদিস এবং শরিয়তে নারী সংক্রান্ত যে ধারণাগুলি একত্রিত করেছি সেখানে নির্দিষ্ট কোনো একটি ধারণাতে শাস্ত্রগুলি সীমাবদ্ধ থাকেনি। অর্থাৎ সেগুলিতে নারী সংক্রান্ত একাধিক ধারণা দান করা হয়েছে এবং সেগুলির মধ্যে ব্যাপক স্ববিরোধও লক্ষ করা গিয়েছে। কখনো নারী সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য করা হয়েছে, কখনো বা সেই ইতিবাচকতাকে নাকচ করে নারীকে সমালোচনার আগুনে ঝলসে ফেলা হয়েছে; যেখানে তার অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়না। এখন আমরা সেইসমস্ত নানামুখীন ভাষ্যগুলি উপস্থাপন করে ইসলামে নারীর সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয় করার চেষ্টা করবো।

২.ক।। কোরানে নারীর সংজ্ঞার্থ

কোরআনে নারী সংক্রান্ত আলোচনা সব থেকে বেশি হয়েছে 'সুরা আন নিসা'তে। এটি কোরআনের চতুর্থ সুরা; যার অর্থ – নারীগণ। এই সুরাতে নারীর সামাজিক, পারিবারিক অধিকার তার সঙ্গে যাবতীয় দায়িত্বকে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তার

সীমাবদ্ধতাগুলিকেও এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমেই নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নারীর স্বাধিকারকে খণ্ডিত করে বলা হয়েছে –

> ক. পুরুষগণ রমণীগণের উপর কর্তাস্বরূপ। ৪ : ৩৪[১০]

অর্থাৎ নারীগণের উপর কর্তৃত্ব প্রদর্শনে নারীর নিজস্ব অধিকার খর্ব হলো, পরিবর্তে পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো, যার মধ্যে নারীকে দুর্বল, অক্ষম এবং অপারগ বলে ভাবনার অবকাশ আছে বলে আমাদের মনে হয়।

খ. সূরা নূর ২৪ : ৩১ – এ বলা হয়েছে -

> রমণীগণ যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের যৌন অঙ্গের হিফাজত করে রাখে, যা স্বতঃপ্রকাশিত হয়, তাছাড়া তারা যেন বেশ বিন্যাস প্রদর্শন না করে ও তারা যেন স্ব স্ব বক্ষসমূহের উপর আবরণী স্থাপন করে।[১১]

এখানেও স্পষ্টত নারীর দৃষ্টি খর্ব করার মধ্যে দিয়ে তার অধিকারকে খর্ব করা হচ্ছে এবং 'যৌন অঙ্গের হিফাজত' এর আদেশের মধ্যে দিয়ে গোঁড়াতেই তাকে লিঙ্গ চিহ্ন দ্বারা পৃথক করে দেওয়া হচ্ছে। সেইসঙ্গে যেন ঠারেঠোরে একথাও বোঝানো হচ্ছে যে, নারী যৌন সামগ্রী ও সৌন্দর্যের পাহারাদার হিসেবেই নিয়োজিত থাকবে। প্রশ্ন হলো তাহলে নারীর উপর যার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হলো সেই কর্তার দায়িত্ব কেন ঘোষিত হলো না? তবে কি সেই পুরুষকে গোঁড়াতেই সম্ভোগের ও নারী নির্বাচনের অনুমোদন দিয়ে দেওয়া হলো?

গ. সূরা নিসাতে ৪ : ১ - এ প্রাসঙ্গিকভাবে আরো বলা হয়েছে যে –

> হে মানবগণ তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন।[১২]

অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে নারী – পুরুষ একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্ট বা জাত। কিন্তু এই কথাটির আবার ভিন্ন অর্থও লক্ষিত হয়, যেখানে বলা হয়েছে –

> স্ত্রীকে স্বামীর বাম পার্শ্বে শয়ন করা উত্তম। কেননা আদম (আ) – এর পার্শ্বের অস্থি হতে মা হাওয়ার সৃষ্টি।[১৩]

এই কথাটির অর্থ দাঁড়ায় আদম আগে সৃষ্ট হয়েছেন এবং আদমের শরীরের অস্থি থেকে পরবর্তীকালে তাঁর স্ত্রী হাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সেই বিচারে আদি নারী হাওয়ার জন্ম উৎস আদি

পুরুষ আদমের শরীর। এখানে কিন্তু আমরা সুরা নিসার পূর্ব উদ্ধৃত বক্তব্যের বিকৃতি লক্ষ করছি; যেটির উদ্দেশ্য নারীকে পুরুষের বশ্যতা স্বীকারের প্রাথমিক পাঠ দান। কেননা আর যাইহোক, নারী পুরুষেরই অংশ থেকে জাত।

ঘ. সুরা বাকারা (২: ১৮৭) তে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিকতা এবং নির্ভরতার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

> স্ত্রীগণ স্বামীগণের পোশাক এবং স্বামীগণ ও স্ত্রীগণের পোশাক।[১৪]

প্রসঙ্গত সুরা বাকারা (২:২২৩) - তে আরো বলা হয়েছে -

> তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো।[১৫]

এখানে লক্ষ করবার বিষয় (২. ১৮৭) নং আয়াতে নারী – পুরুষের পারস্পরিকতার কথা বলা হলেও (২.২২৩) এ পুরুষের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নারীকে পূর্ববৎ ভোগ্য আবাদি জমি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যা লিঙ্গ বৈষম্য তো বটেই সেইসঙ্গে পুরুষের কর্তৃত্বকে আরো জবরদস্ত করে তোলে, যখন বলা হয় ' –'তোমরা তোমাদের ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো।' প্রকৃতপক্ষে এর থেকে বড়ো স্বেচ্ছাচারের অনুমোদন আর কী হতে পারে?

ঙ. নারীর উপর যে পুরুষ কর্তৃত্ব ফলাবে এবং স্বেছাচারের অবলম্বন করতে পারবে সেই অধিকারকেও প্রতিষ্ঠা (সুপ্রতিষ্ঠা) দেওয়া হয়েছে সুরা নিসার আরেকটি আয়াতে। যেমন (৪:৩৪) আয়াতে বলা হয়েছে –

> পুরুষগণ মহিলাগণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত (কর্তা)। যেহেতু আল্লাহ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[১৬]

লক্ষ করবার বিষয় কর্তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিহিত থাকে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের রাজনীতি। তাই কোরানে স্ত্রীদের উপর পুরুষদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে আসলে প্রভু – ভৃত্য সম্পর্ক কাঠামকেই মজবুত করা হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়।

চ. কোরআনের 'সুরা আহ্যাব' - এ আমরা নারীর অন্য এক স্বরূপ আবিষ্কার করি। সেখানে বলা হয়েছে –

> নবী বিশ্বাসীদের নিকট তাঁদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর, এবং তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতাস্বরূপ।[১৭]

লক্ষ করবার বিষয় এখানে বিশ্বাসীদের কাছে নবীর অবস্থান যে, নিজের থেকেও অধিক এই বার্তা ঘোষণার মধ্যে দিয়ে নবীর কাজে মানুষকে আত্মোৎসর্গ দানে যেমন প্রাণিত করা হয়েছে, তেমনই সাধারণ ভক্তকুল (উম্মতদের) কুদৃষ্টি থেকে নবীর পত্নীদের সুরক্ষিত রাখতে একটা বর্ম গ্রহণ করা হয়েছে, তা হল – নবীর পত্নীগণ তাদের মাতাস্বরূপ। অর্থাৎ এখানে নারী বলে নবীর পত্নীদের প্রতি কোনোভাবেই দুর্বল হওয়া যাবে না, আমাদের ভাষায় কোনোরকম পৌরুষ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। খুব মুক্তদৃষ্টিতে বিচার করলে আমরা লক্ষ করবো এখানে শাসকের সুবিধার্থে, শাস্ত্রকারদের নিরাপত্তার খাতিরে, নিজেদের অবস্থানকে আরো বেশি সুরক্ষিত এবং সুনিশ্চিত করতে এক প্রকার নিরাপত্তা বলয় (Safe Zone) গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। যেহেতু পূর্বেই বলা হয়েছে 'পুরুষগণ মহিলাগণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত (কর্তা)।' এবং 'আল্লাহএকের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন' ফলে সেই প্রতিষ্ঠা এবং কর্তৃত্ব থেকে বিপর্যয় আসতেই পারে, অতএব আগেভাগে সুরক্ষা বলয় নির্মাণ করে বলে দেওয়া হলো – 'নবী বিশ্বাসীদের নিকট তাঁদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর, এবং তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতাস্বরূপ।' এই সুরক্ষা বল্য যে সকল নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল তা মোটেও নয়। তাই নারীর এই বিশেষ স্বরূপটিকে আমরা এক প্রকার 'এলিট ক্যাপচার' বলে ধরে নেবো।

ছ. এই অধিকার অনধিকার প্রসঙ্গে শাস্ত্রকার এবং সমাজ নির্মাতারা যেভাবে সুযোগ পান এবং নারী তাদের কাছে যেভাবে ব্যবহার যোগ্য পণ্যে পরিণত হন তার আরেকটি নমুনা পাওয়া যাবে 'সুরা আহযাব' এর (৩৩:৫০) সংখ্যক আয়াতে। সেখানে বলা হয়েছে –

> হে নবী আমি আপনার জন্য বৈধ করেছি আপনার স্ত্রীগণকে যাদের আপনি দেনমোহর দান করেছেন এবং বৈধ করেছি, আপনার অধিকারভুক্ত দাসীগণকে, যাদের আমি দান করেছি এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি - আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফুতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি ও খালাতো ভগ্নি, যারা আপনার সঙ্গে দেশ ত্যাগ করেছে এবং কোন বিশ্বাসী নারী নবীর (আপনার) নিকট নিজেকে নিবেদন করলে, এবং নবী আপনি তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও আপনার জন্য বৈধ। এ (ব্যবস্থা) বিশেষ করে আপনার জন্য, অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয়, যাতে আপনার কোন অসুবিধা না হয়।[১৮]

এই আয়াতটির শেষ বাক্যে নবিকে সাধারণ মানুষের থেকে অধিক বিবাহ করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অনেক তাত্ত্বিকের মতে, তা সেই সময়কালের পরিস্থিতির নিরিখে। এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা অনেককে বলতে শুনেছি যে, অসহায় এতিম নারীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কিংবা বহুক্ষেত্রে জেহাদের ময়দানে নিহত সৈনিকদের স্ত্রীদের পুনর্বিবাহ করে স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা দেবার জন্যই এখানে বহুবিবাহের অনিমদন দেওয়া হয়েছে। এটি একটি প্রচলিত ভাষ্য। কিন্তু আমাদের

মনে হয়, কেবল কি ঐ সমস্ত স্ত্রীদের 'মর্যাদা', 'সামাজিক সুরক্ষা' দেবার জন্যই ইসলামের প্রাগপর্বে এক পুরুষের একাধিক স্ত্রীগ্রহণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল? নাকি এর পেছনে ছিল অন্য কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য? মনে রাখতে হবে যে কোনো ধর্ম গোষ্ঠী এবং জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করে তার মেজরিটি বা সংখ্যাগুরু গৌরবের উপর। ইসলামের প্রাকপর্বে বিপুল সংখ্যক জনগণকে ইসলামের আওতায় আনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বৈকি। আর সেই সংখ্যা ভরানোর দায়িত্ব অবশ্যই গ্রহণ করেছিলেন সেকালের বিশ্বাসীরা। তাই কিনা বিশ্বাসীদের স্বার্থেও সুবিধার্থে বলে দেওয়া যায়, 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো।'[১৯] আর লক্ষ করুন উপরের আয়াতটিতে নবীর একাধিক নারী গ্রহণকে অনুমোদন করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে – 'এ (ব্যবস্থা) বিশেষ করে আপনার জন্য, অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয়, যাতে আপনার কোন অসুবিধা না হয়।' কিন্তু একথা বলার পরেও আমরা লক্ষ করবো 'অন্য বিশ্বাসীদের'ও একাধিক অর্থাৎ চারটি বিবাহের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ফলে নারীকে গ্রহণ এবং তাকে আবাদি খেত হিসেবে গ্রহণ করবার মধ্যে এক ধরণের রাজনৈতিক অভিসন্ধি তো ছিলই, যার মূল লক্ষ্য স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক 'বিশ্বাসীর' জন্ম দেওয়া এবং রাজনৈতিকভাবে মুসলমানের 'মেজরিটি' বা 'সংখ্যাগুরুত্ব' প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের মনে হয় ইসলামি ইতিহাস পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আদিপর্বে নারীকে ব্যবহার এবং তাদের নিয়ে রচিত শাস্ত্রীয় বচনসমূহকে রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ব্যতিরেকে বিশ্লেষণ অসম্ভব। তাই নারীর সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয়ে আমরা উক্ত বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবো। অবশ্যই এরপরে আমরা এই ধরণের শাস্ত্রীয় বচনকেও উদ্ধার করবো, যেখানে লক্ষ করবো বলা হয়েছে –

> নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দ মতো দুটো, তিনটি কিংবা চারটে বিয়ে করো। কিন্তু যদি আশঙ্কা কর যে, তাঁদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে পারবে না। তবে একটি মাত্র বিয়ে করবে। (সুরা নিসা, ৪:২)।[২০]

আবার ঐ সুরাতেই একাধিক বিবাহের নিষেধ করে বলা হয়েছে -

তোমরা যত ইচ্ছাই কর না কেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবে না।

এখন লক্ষ করবার বিষয়, প্রথম বলা হলো চারটি পর্যন্ত বিবাহ করতে পারবে। সেটি শর্তসাপেক্ষ, তা হল সকল স্ত্রীর সঙ্গে সমান ব্যবহার করা। কিন্তু মানুষ যে চারজনের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে পারবে না শাস্ত্র সে ব্যাপারেও নিশ্চিত। শাস্ত্রের এই বচনে অনেকেই আপ্লুত এবং

গর্বিত হয়ে বলেন, সত্যিই তো কোরআনে একটিমাত্রই বিবাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে এই সময়ের নারীবাদী তাত্ত্বিকের যুক্তিও শুনেছি, যিনি উপরোক্ত সুরা নিসার পূর্বোক্ত আয়াতটির নির্যাস ব্যাখ্যা করে, শাস্ত্রের পক্ষ নিয়েই বলেছেন –

> ইসলামের মূল আদর্শ ন্যায় বিচার। বিবাহ পদ্ধতির মধ্যেও তাই সমব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একাধিক স্ত্রীর প্রতি সমান আচরণ করা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। অতি শোভন ভাষায় নীতিটি গ্রথিত হয়েছে সুরা 'নিসা'য়। ... কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলমান পুরুষ এই শর্তাধীন ব্যবস্থাপনার কথা বেমালুম ভুলে যায়। মনে করে বহুপত্নীগ্রহণ ইসলামসম্মত। ... ভিন্ন সমাজের মানুষ ভুল বোঝে। দায়ী করে ধর্মকে। তত্ত্বকথা কে জানতে চায়।[২১]

কিন্তু প্রশ্ন হলো স্ত্রীদেরকে সমান অধিকার দান ও তাদের সঙ্গে সমব্যবহার যখন অসম্ভবই একাধিক বিবাহের কথাটা আসছেই বা কোত্থেকে? আর তা যখন নিষেধ করাই উদ্দেশ্য তাহলে তা সরাসরি বলা হতো, এত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না। এবার এই শাস্ত্রীয় বচনসমূহের শব্দের মারপ্যাঁচ, হরেক কিসিমের গেরো অতিক্রম করে আমরা যদি 'অবিশ্বাসী'র দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন করি যে, এখানেও পুরুষের ইচ্ছাকেই ঘুরপথে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কোনো পুরুষ চাইলেই পরীক্ষামূলকভাবে একেরপর এক মোট চারটি বিবাহ করে দেখতেই পারেন। সেক্ষেত্রে যখন তাঁর মনে হবে যে, তিনি সমান ব্যবহার করতে পারছেন না, তখন তিনি বিরত থাকবেন। কেননা শাস্ত্র নির্দেশ দিয়েছে – 'নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দ মতো দুটো, তিনটি কিংবা চারটে বিয়ে করো। কিন্তু যদি আশঙ্কা কর যে, তাঁদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে পারবে না। তবে একটি মাত্র বিয়ে করবে।'

লক্ষ করবার বিষয় এই 'যদি ... তবে' র জটিল বাক্য বিন্যাসের মধ্যেই নিহিত আছে পুরুষের ইচ্ছা, অভিপ্রায়, পছন্দ-অপছন্দের জটিল গণিত। শাস্ত্র এখানে যেন ঠারেঠোরে বলতে চায়, পুরুষের 'পছন্দ মতো' সে একাধিক বিবাহ করতে পারে। লক্ষণীয় এই 'পছন্দ মতো' শব্দটি, যেখানে উল্টোদিকের মানুষটির পছন্দ-অপছন্দকে কোনোরকমভাবে তোয়াক্কা না করেই সে ক্ষমতার জোরে অধিগ্রহণ করতে পারে নারীজমিকে। আমাদের মনে হয় এই ধরণের শাস্ত্রীর কূটাভাসগুলির মধ্যে দিয়ে আসলে ক্ষমতাবান পুরুষের ও শাস্ত্রকারের জীবনভোগের ভাষ্যটিই অদৃশ্যে খেলা করে যায়। অবশ্য আমিনা ওয়াদুদ প্রমুখদের মতো তাত্ত্বিক যাঁরা মনে করেন ইসলামি আইন হলো ঐশ্বরিক, সেখানে পিতৃতান্ত্রিক ব্যখ্যা অপ্রাসঙ্গিক[২২] - তাঁদের সঙ্গে আমাদের বিস্তর বিতর্কের জের থেকে গেল। কেননা, আমরা যে কোনো আইন বা শাস্ত্রীয় নির্দেশকে মনুষ্য সৃষ্ট বলেই মনে করি, যেখানে এক শ্রেণির মানুষ নিজেদের শাসন ব্যবস্থাকে অটুট রাখতে এবং

জীবনের চলার পথকে মসৃণ করতে এই ধরণের আইন প্রণয়ন করেন, যার ফলে আরেক শ্রেণির মানুষের জীবনের স্বাভাবিক গতি ব্যহত হতেই থাকে। ইতিহাসের ধারায় বারবার তাই এই দুই বিপরীতমুখী শক্তির সংঘর্ষও লক্ষ করা যায়। কিন্তু ইসলামে এই শাস্ত্রীয় আইন এত নিবিড় এত জটিলভাবে বুনে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যাঘাত উঠে আসাটা বিরল এবং ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত এই সূত্রে আমরা বিভিন্ন প্রকার হাদিসে নারীর যে সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্দেশ করা হয়েছে তা আলোচনা করবো।

২.খ : হাদিসে নারীর সংজ্ঞার্থ ও স্বরূপ

'হাদিস' শব্দের আক্ষরিক অর্থ কাহিনি বা প্রতিবেদন, বাণী, উপদেশ। সেদিক থেকে বলা চলে যে, কোরান অবতীর্ণ হওয়ার পর এবং নবীর মৃত্যুর পর কোরআনের বাণীসমূহকে সর্বজনের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তার একটি সহজবোধ্য ভাষ্য নির্মাণ করা হয়; যেখানে কোরআনের যুগোপযোগী করে তুলতে সময়ের প্রেক্ষিতে সেগুলিকে বিন্যস্ত করা হয়। তাইই হল হাদিস। এ প্রসঙ্গে মনে করা হয় -

> কোরানের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয়াতসমূহ অনেক সময় ছিল রূপকাশ্রিত এবং সাংকেতিক। তাছাড়া আয়াতের অনেকগুলই সাধারণের জন্য সহজবোধ্য নয়। সাধারণের কাছে স্পষ্ট না হওয়ায় কোরআনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হচ্ছিল। ... এই অসম্পূর্ণতা দূর করবার জন্য প্রয়োজন হয় হাদিসের। সেক্ষেত্রে হাদিসকে কোরআনের সম্পূরক গ্রন্থও বলা যেতে পারে। কোরআনের আয়াতগুলিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সহজ করে বোঝানোর জন্য হাদিস গ্রন্থগুলো অপরিহার্য।[২৩]

তবে আরবি 'হাদিস' শব্দের প্রকৃত অর্থকে খানিকটা খাটো করে এনে ইসলামে মহম্মদের নথিভুক্ত আদেশ, নির্দেশ কথা ও কাজকেই হাদিস বলা হয়। নবীর অনুমোদিত অন্যের কথা ও কাজ হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। হাদিস বলে দেয় মহম্মদ কেমন পোশাক পরতেন, চুল আঁচড়াতেন, দাড়ি ছাঁটতেন, কীভাবে দাঁড়াতেন, বসতেন, হাঁটতেন এবং কথা বলতেন – সবই বলা হয়েছে। কীভাবে তিনি হাত মুখ ধুতেন, খিলাল বা দাঁত পরিষ্কার করতেন, পাগড়ি বাঁধতেন ইত্যাদি নবীর ব্যক্তিগত জীবনের ছোটখাটো দিকগুলিও পাওয়া যায় হাদিসে। এগুলো মুসলমানদের কাছে অতি পবিত্র দৃষ্টান্ত। মুসলমানরা এগুলি জীবন যাপনের প্রতি পদে নকল বা অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করে। নবীর জীবনের এইসব দৃষ্টান্তকে বলা হয়েছে সুন্নত। এই সমস্ত যাবতীয় সুন্নতের সন্ধান পাওয়া যায় হাদিস শরিফে। স্বাভাবিকভাবে নারীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও হাদিস অবহিত করেছে। আমরা হাদিসে নারীকে যেভাবে পাই তার দু'একটি নমুনা পেশ করলাম। -

রহমানিয়া লাইব্রেরী প্রকাশিত আব্দুল হামিদ কাসেমী প্রণীত 'সর্ববৃহৎ হাক্কানী নামাজ ও মাসআলা শিক্ষা' গ্রন্থে নারী সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস সংকলিত হয়েছে। মুসলমান সমাজে একাধিক হাদিস প্রচলিত থাকলেও তাদের মূল বক্তব্যকে এই বইতে এত সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, বাজার চলতি হাদিসগুলির থেকেই এই বইটির বিক্রিবাটা অনেক বেশি। এমনকি যেহেতু সংখাগুরু মুসলমান আরবি জানেন না এবং কোরানের মর্ম উদ্ধার করতে পারেন না, তাই এই শ্রেণির বইয়ের উপর অধিক ভরসা করেন। আমরা ইসলামি প্রাইমারগুলি অনুসন্ধান ও সংগ্রহের পাশাপাশি বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন ধরণের ইসলাম ধর্মীয় বইপত্রের হদিশ করেছিলাম। সেখানে লক্ষ করেছি, কোরান হাদিস প্রত্যেক বাড়িতে পঠিত না হলেও বাংলা ভাষায় এই বইটির ব্যাপক কাটতি এবং প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতেই এক আধ কপি 'সর্ববৃহৎ হাক্কানী নামাজ ও মাসআলা শিক্ষা' পাওয়া যাবে। যে কারণে আমাদের মনে হয়েছে সামাজিক, ধর্মীয় এবং পারিবারিক শিক্ষাদানে এই বইটির ভূমিকা অপরিহার্য। বাংলার মুসলমানের মন নির্মাণেও এই বইটির বিশেষ ভূমিকা আছে। এই বইটিতে বিভিন্ন হাদিসের নীতি উপদেশকে একত্রিত করে পাঠকের দরবারে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এখান থেকেই মারা আলোচনার সুবিধার্থে হাদিসে বর্ণিত নারী বিষয়ক মূল উপাত্তগুলিকে বিন্যস্ত করলাম।

ক. স্ত্রীকে স্বামীর বাম পার্শ্বে শয়ন করা উত্তম। কেননা আদম (আ) এর পার্শ্বের অস্থি হতে মা হাওয়ার (আ) সৃষ্টি।

খ. ইসলামি মতে স্বামী তার স্ত্রীর উপর পার্থিব ও ধর্মীয় ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গতভাবে আদেশ ও উপদেশ দেওয়ার অধিকারী।

গ. স্বামীকে সামর্থানুযায়ী নিজ স্ত্রীর যাবতীয় ভরণ-পোষণের ও পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে চাকরও রাখতে হবে।

ঘ. স্ত্রীর উপর ক্রীতদাসীর মতো শারীরিক অত্যচার হাদিস পাকে নিষেধ করা হয়েছে।

ঙ. একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে আহার বিহার, পোশাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহারের সমতা রক্ষা করা জরুরী।

চ. প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শাসন করার অধিকার আছে। প্রথমে মুখে বলবে, তারপর বিছানা পৃথক করে দেবে, তারপর প্রহার (যৎসামান্য) মুখ ও মাথা বাদ দিয়ে, অবশেষে এক তালাকে রেজঈ প্রদান করতে হবে।

ছ. নারীগণ বক্র অস্থি হতে সৃষ্টি। বেশি কাড়াকাড়ি করো না ভেঙ্গে যাবে। বেশী ঢিলও দিও না আরও বেঁকে যাবে।

জ. হাদিসে বলা হয়েছে – 'আমি যদি কাউকে সাজদা করার জন্য আদেশ করতাম তাহলে নিশ্চয়ই স্ত্রীকে আদেশ দিতাম যে সে যেন তার স্বামীকে সাজদা করে।'

ঝ. 'যে কোনো স্ত্রীলোক শরীয়ত মতে জীবন যাপন করার পর স্বামীর সন্তুষ্টির মধ্যে থেকে মরে যায় সে বেহেশতে যাবে।' তাই বলা হয়েছে স্বামীর পায়ের তলায় বেহেশত।

ঞ. ... যে নারী তার স্বামীর একনিষ্ঠ আশেক সে জান্নাতে যাবে।

ট. স্বামী গৃহে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর জন্য নফল রোযা, নামায করা, বিনা অনুমতিতে কোথাও যাওয়া, এমনকি নিজ পিত্রালয়ে গমন। টাকা পয়সা ধান চাল কাউকে দেওয়া, দান করাও জায়েজ নয়।

ঠ. সন্ধ্যাবেলার স্বামীকে নারাজ করলে সকাল অবধি একজন ফেরেশতা তার উপর অভিসম্পাৎ করতে থাকে।

ড. স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানবতার খাতিরে স্বামীর মা-বাপের সেবা করার স্ত্রীর জন্য বাঞ্ছনীয়

ণ. স্বামীর যাবতীয় জিনিসপত্র হেফাজত করা স্থির কর্তব্য এমন কি দোষ ত্রুটি গোপন করা কর্তব্য।[২৪]

ত. হাদিস শরিফে আছে – 'প্রিয় নবী (স.) বলেছেন, স্ত্রীলোক গোপন রাখার বস্তু। যখন সে বাহির হয় শয়তান তাকে ছায়া করে। উক্ত কুরআন ও হাদিসের নিরদেশের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের জন্য শরঈ পর্দা ফরয। উপরন্তু আরো জানা যায় যে, যেমন পর পুরুষকে দেখা হারাম, তেমনি পর পুরুষ আড়াল থেকে দেখাও হারাম।'[২৫]

এই ধরণের আরও হাজার খানেক নমুনা দেওয়া যেতো। আমরা কেবলমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি নমুনা নির্বাচন করেছি এবং তার মধ্য দিয়ে হাদিসে বর্ণিত নারীর স্বরূপ বোঝবার চেষ্টা করেছি। এখন উপরের নির্দেশগুলি যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে লক্ষ করবো, খ, গ, ঘ এবং ঙ তে বর্ণিত নির্দেশ ও বাণীসমূহ নারীর মানবিক অধিকারের পক্ষে কথা বলেছে। বাকি

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একজন মানুষ হিসেবে নারীর অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। স্ত্রীকে স্বামীর বাম পার্শ্বে শয়ন করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। সম্ভবত এই বামদিকে তার অবস্থান থেকেই এদেশেই মেয়েদের আরেকটি নাম 'বামা'। তবে ইসলামে নারীদের বাম অবস্থান মোটেও মর্যাদার নয়। কেননা, বাম অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে এখানে অশুচি ভাবা হয়। যার দরুন দেখা যায় যে, অজু করার সময় আগে ডান হাত ডান পা ধুয়ে পরিষ্কার করা হয় এবং এক্ষেত্রে নানারকম কৌশলও গৃহীত হতে দেখা যায়।

শাসন করার প্রসঙ্গে হাদিসের উপরোক্ত বচনটির সঙ্গে 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদের নিম্নোক্ত বচনটির সাদৃশ্য পাওয়া যায়, যেখানে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন –

> কোনো স্ত্রী যদি তার পতির শয্যায় আসতে অসম্মতি জানায়, (প্রথমে) মিষ্টিকথায় তাকে আদর ও অনুনয় করা যেতে পাররে, তাতে কাজ না হলে গয়নাপত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে 'কিনে নেওয়া' যেতে পাড়ে, আর তার পরও যদি রাজি না হয় তাহলে পতির উচিত লাঠ্যৌষধি কিংবা চড় থাপ্পর প্রয়োগ।[২৬]

অনুরূপ আখ্যান শুনতে পাওয়া যাবে ইসলামি শাস্ত্রে। হাদিসে ফিকহ্‌বিদগণ স্ত্রীকে প্রজার করবার প্রশ্নে চারটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই চারটি বিষয়ের অন্যথা হলে স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করতে পারবেন। যথা –

> ১. স্ত্রীর সাজসজ্জা পরিহার করা অথচ স্বামী তা চায়।
>
> ২. সহবাসে আহ্বান করার পর বিনা কারণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন
>
> ৩. নামায না আদায় করা
>
> ৪. স্বামীর অনুমতি ব্যাতিত ঘরের বাইরে যাতায়াত করা।[২৭]

স্বভাবতই এখানে নারীর অনধিকারের বৃত্তান্ত রচিত হয় এবং তাকে দমন পীড়নে পুরুষের অধিকার শাস্ত্রীয় অনুমোদন পেয়ে যায়।

হাদিসে নারীকে দেখা হয়েছে ভীরু, দুর্বল প্রাণী হিসেবে। যে জন্য বলা হয়েছে – 'নারীগণ বক্র অস্থি হতে সৃষ্টি। বেশি কাড়াকাড়ি করো না ভেঙ্গে যাবে। বেশী ঢিলও দিও না আরও বেঁকে যাবে।' অর্থাৎ নারীর স্বাধীনতাকে সব দিক থেকে খর্ব করে তার উপর কেবল শাসনতান্ত্রিক নির্দেশ বলবৎ করা হচ্ছে। 'বক্র অস্থি' হতে সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে নারীর বাঁকা স্বভাবকেও যেন ইঙ্গিত করা হচ্ছে। তার সঙ্গে সেই নারী যে দুর্বল একথা বলে যেমন তার আত্মবিশ্বাস ভেঙে দেবার

প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে, তেমনই 'ঢিল' দিলে বেঁকে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে নারীর বিপথগামী হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হাদিসে যখন বলা হয়, 'আমি যদি কাউকে সাজদা করার জন্য আদেশ করতাম তাহলে নিশ্চয়ই স্ত্রীকে আদেশ দিতাম যে সে যেন তার স্বামীকে সাজদা করে', তখন আমাদের বুঝে নিতে বাকি থাকে না যে এখানেও পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে স্ত্রী বা নারীদের আনুগত্য প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে। সেইসঙ্গে এই আনুগত্য প্রকাশের মধ্যে দিয়েই মুসলমান নারী বেহেশত দখল করবে বলে লুব্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ পতি পরায়নতা বেহেশতে পৌঁছোবার চাবিকাঠি বলে গণ্য হয়েছে। এই ব্যাপারটির মধ্যেও পুরুষের অনুকূল ও আরামদায়ক পরিবেশ রচনায় নারীর আত্মবলিদানকে শাস্ত্রীয় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমরা লক্ষ করবো বেহেশতের স্বপ্নে প্রলুব্ধ করে নারীশ্রমকে পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করে তার ফায়দা ওঠাতে চেয়েছেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। অথচ তার মজুরিহীন এই কাজকে 'কাজের' স্বীকৃতিই দিতে চায় না প্রচলিত সমাজ কাঠামো। এই ধরণের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ আদিকাল থেকেই লক্ষ করেছেন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এবং এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থে মনে করেছেন এই ধরণের পারিবারিক বঞ্চনা থেকেই শুরু হয় বৃহত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বঞ্চনার পরিসর।[২৮] একালের দার্শনিক শ্রী অরিন্দম চক্রবর্তীও এই ধরণের মজুরি ও স্বীকৃতিহীন শ্রম ব্যবহারের মানসিকতাকে বিপজ্জনক ও মূর্খতা বলেছেন।[২৯] নারীর শ্রম দান ও তার স্বীকৃতিহীনতার এই ইতিহাস খানিকটা পর্যালোচনা করেছেন ঈশিতা মুখোপাধ্যায় তাঁর 'নারী ও শ্রম' শীর্ষক প্রবন্ধে।[৩০]

নারীর অধিকারকে বহুক্ষেত্রে এতটাই খর্ব করে দেওয়া হয়েছে যে, বলা হয়েছে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্ত্রী ধর্মাচরণ করতে পারবেন না, সেইসঙ্গে দান খয়রাত বা অন্যান্য কোনো সামাজিক কাজকর্মে অধিকার পাবেন না। এককথায় গৃহকর্তার প্রভুত্বকে সম্মান করেই এগিয়ে যেতে হবে মুসলমান নারীকে। সেক্ষেত্রে সময় বুঝে স্বামীর সুবিধার্থে সত্য গোপন করার কৌশলও তাঁকে আয়ত্ত করতে হবে। অর্থাৎ কিনা – 'স্বামীর যাবতীয় জিনিসপত্র হেফাজত করা স্থির কর্তব্য এমন কি দোষ ত্রুটি গোপন করা কর্তব্য'। তবে কি স্বামীর অত্যাচার, পীড়ন কিংবা যে কোনো ধরণের বঞ্চনাকেও অপ্রকাশিত রেখে মুখ বুজে সহ্য করবার শাস্ত্রীয় নিদান দেওয়া হচ্ছে? ব্যাপারটাকে একটু তলিয়ে দেখলে তাইই দাঁড়ায়। এখানেও আমরা পুরুষ-নারীর মধ্যে প্রভু-ভৃত্য কিংবা শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের এক দ্বান্দ্বিক অন্তর্বয়ান লক্ষ করি।

হাদিসের যে অংশে আমরা দেখি এরকম বলা হয় যে, 'স্ত্রীলোক গোপন রাখার বস্তু। যখন সে বাহির হয় শয়তান তাকে ছায়া করে। তাই পর্দা স্ত্রীদের জন্য ফরয।' তখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে স্ত্রীলোকের উপরে যে শয়তানরা ছায়া ফেলে সেই শয়তানদের তাদের নিবারণের জন্য বা শায়েস্তা করবার জন্য শাস্ত্র কতটা নীতি বা আইন প্রণয়ন করেছেন? কিংবা 'যেমন পর পুরুষকে দেখা হারাম, তেমনি পর পুরুষ আড়াল থেকে দেখাও হারাম।' এই একইরকম নীতি বা আদেশ পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো না কেন? তাহলে কি পুরুষের ক্ষেত্রে পরস্ত্রীকে সোজাসুজি কিংবা আড়ালে আবডালে দেখা শাস্ত্রীয় অনুমোদন পায়?

উপরোক্ত বিষয়গুলির নিরিখে আমরা যদি মুসলমান সমাজে নারীর অবস্থান বিচার করি তাহলে লক্ষ করবো, বেশ কিছু ক্ষেত্রে নারী অধিকারের প্রশ্নে কোরান হাদিস উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন – পৈতৃক সম্পত্তির অংশ লাভের ক্ষেত্রে মেয়েদের অধিকার স্বীকৃত। অথবা যে হাদিসে কন্যার আগমনকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয় –

> যদি কোনো ব্যক্তি তাঁর দু'টি কন্যাকে সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করে, তাহলে সে এবং আমি [নবী] কেয়ামতে এমনভাবে আগমন করবো যেমন আমার দুটি আঙুল একত্রে আছে।[৩১]

আবার কন্যা সন্তানকে স্বীকৃতি দিয়ে যখন বলা হয় –

> যদি কারো কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সে তাদের প্রতিপালন করে, তাহলে তাঁরা তাঁর জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে।[৩২]

এখানে আমরা লক্ষ করি যে সমাজে মেয়েদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায়; বিশেষত যে সময়ে কন্যা সন্তানকে অকালে হত্যা করে মেরে ফেলা হতো সেই সামাজিক অবক্ষয়ের মুহূর্তে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম সহায়ক হয়েছে। আবার নারীর পার্থিব শিক্ষা লাভের প্রসঙ্গে যখন হাদিসের অনুমোদন পাই –

> জ্ঞানার্জন নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য ফরয।[৩৩]

কিংবা দাসিদের শিক্ষা দেওয়ার প্রসঙ্গে বলা হয় –

> যার নিকট কোনো দাসী আছে এবং সে তাঁকে ভালভাবে বিদ্যা শিক্ষা দান করে, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয়, অতঃপর তাঁকে স্বাধীন করে বিয়ে করে তাঁর জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে।[৩৪]

এই ধরণের শাস্ত্রীয় বচন শুনে আমাদের মনে হয়, সত্যই তো সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সকলের সমান অধিকার ও সমান প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থাকা দরকার।

এবং শাস্ত্রে যখন এই ধরণের সামাজিক ক্ষেত্রগুলিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করেছে, এবং সামাজিক গতিশীলতা (Mobility)র প্রশ্নে নারী পুরুষ উভয়ের সমানাধিকারকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, তখন সকলের স্বার্থে তা দ্রুত বলবৎ হওয়া মঙ্গল। কিন্তু মুসলমান জন জীবনের ইতিহাসে যদি আমরা একটু আলো ফেলি তাহলে দেখবো সামাজিক গতিশীলতার এই আখ্যানগুলিকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা হচ্ছে গণমন থেকে। পরিবর্তে গণমনকে দীক্ষিত করা হচ্ছে একমাত্র ধর্মীয় আখ্যানের বয়ানসমূহকে কাজে লাগিয়ে। এক্ষেত্রে নারীকেও ঠিক সেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে। আর এই কাজটি সোচ্চারে করছে উগ্র মৌলবাদী একটি গোষ্ঠী – যারা আরেক নাম শরিয়ততন্ত্র। অতএব নির্ণয় করা যাক শরিয়তে মুসলমান নারীর সংজ্ঞা ও স্বরূপ।

২.গ : শরিয়তে নারীর সংজ্ঞার্থ ও স্বরূপ

'শরিয়ত' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যে পথ জলের দিকে গিয়েছে। ধর্মীয় অর্থে শরিয়ত হল আল্লাহর সেই পথ যা সার্থক ও সুস্থ মানবোচিত জীবনের জন্য অনুসরণ করা আবশ্যক। শরিয়তকে আল্লাহর পথ বলা হয় এই কারণে যে তাতে বিধৃত হয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশসমূহ। অনেকে মনে করেন শরিয়ত হল কোরান হাদিসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটা আইনি ব্যবস্থা। মুসলমানদের গোটা জীবন এবং জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশ রয়েছে শরিয়তে। তাঁদের মতে মানব জীবনের এমন কোনো বিষয় নেই যা শরিয়তের অন্তর্গত নয়। ইসলামিক বিশ্বাস থেকে কোরান শরিফ আল্লাহর আইন, হাদিস হলো মোহাম্মাদের ব্যক্তিগত জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যা করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন তার সংকলন। আর এই দুইয়ের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে শরিয়ত। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক মুসলমানের পারিবারিক জীবন, সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা এমনকি তার যৌন জীবনও নিয়ন্ত্রিত হয় এই শরিয়তের দ্বারা। তাই শরিয়তকে অনেকেই ইসলামি আইন বলে থাকেন। কিন্তু বিষয়টি মোটেও ঠিক নয়। কেননা শরিয়তে এমন অসংখ্য ভাবনা চিন্তার প্রক্ষেপ ঘটেছে যা আদিতে কোরান বা হাদিসে ছিল না এবং এক্ষেত্রে এক শ্রেণির মৌলবাদী মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত অশুভ চিন্তা চেতনা ও শরিয়তে জায়গা করে নিয়েছে।

কোরানে 'শরিয়ত' শব্দটি একেবারেই এসেছিল। এ প্রসঙ্গে 'সূরা জাসিয়া' (৪৫:১৮) তে বলা হয়েছে –

> এরপর আমি তোমাকে শরিয়তের বিধানে প্রতিষ্ঠা করেছি সুতরাং তুমি তা অনুসরণ কর অজ্ঞদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করোনা।[৩৫]

কিন্তু দেখা গেছে পরবর্তীকালে কোরান শরিফ এবং হাদিসকে অনেকাংশে বিকৃত করে শরিয়ত অজ্ঞদের কারখানাতেই পরিণত হয়েছে।

আদিতে শরিয়তের উৎস ছিল কোরান ও হাদিসকে অনুসরণ কিন্তু পরে ফিকাহ্ গ্রন্থগুলোকে শরিয়তের উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। আরো পরবর্তীকালে শরিয়তের আরো দুটি উৎস ইজমা ও কিয়াস অন্তর্ভুক্ত হয়।

কোন সমস্যার সমাধান যদি কোরান ও হাদিসে পাওয়া না যায় তাহলে এক জায়গায় বসে সবাই মিলে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করাকে বলে 'ইজমা'। অন্যদিকে 'কিয়াস' হল যুক্তি তর্কের মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। আমাদের মনে রাখতে হবে এই যুক্তি তর্ক বলে যেগুলিকে চালিয়ে দেওয়া হয় তা আসলে প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীলতার ঘেরাটোপে আবদ্ধ কিছু চিন্তা প্রস্থান। আর এখানেই শরিয়ত মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিসরটিকে টুঁটি টিপে ধর্মীয় সংস্কারে রূপান্তরিত করেছে। স্বাভাবিকভাবেই দেখা গেছে নারী সমস্যার সমাধানে এবং নারীকে নতুন সামাজিক ও বৈশ্বিক পরিবেশে সংজ্ঞায়িত করবার ব্যাপারে শরিয়ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি।

শরিয়তের ক্ষেত্রে 'কিসাস' এমন একটি উল্লেখযোগ্য দণ্ডবিধি যেখানে চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক এবং হত্যার বদলে হত্যার মতো শাস্তি দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত একটি জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে শরিয়তের উগ্র সমর্থকরা দেখাচ্ছেন যে, শরিয়তকে বলবৎ করতে মুহাম্মদ নিজে এক মহিলা চোরের হাত কেটে নিয়েছিলেন। তার একজন সাহাবী মেয়েটির জন্য ওকালতি করলে তিনি বলেছিলেন আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছে সে কি তা সংশোধন করতে চায়? শরিয়তের সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর কন্যা ফাতেমা যদি চুরি করতো তাহলে তিনি তাঁর আপন কন্যারও হাত কেটে দিতেন। এই জায়গাগুলিতেই আমাদের সব থেকে বেশি আপত্তি, সব থেকে জোরালো প্রশ্ন উঠে আসে। তবে যে, ইসলাম ধর্মে শান্তি, ক্ষমাশীলতা ও 'সবর' অর্থাৎ সহিষ্ণুতার কথা বার বার ফিরে ফিরে আসে তা কি কেবলই তাত্ত্বিক পরিসরেই সীমাবদ্ধ? সামাজিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ কি সঙ্কুচিত? তা নইলে অপরাধের প্রশমনে বা নিরসনে পুনরায় আরেকটি 'পরিকল্পিত অপরাধ' কেন করতে হয়? আর শাস্ত্রই বা তাকে কেন অনুমোদন দেয়?

আবার উপরিউক্ত দৃষ্টান্তটি বিচার করলে এই প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়, যে নবী নারী জাতির প্রতি এত সদয়, এত অনুকূল তিনি সামান্য একটা 'চুরি'র ঘটনায় একজন 'স্ত্রীলোকের' হাত কেটে দিতে পারেন? নাকি নবীর নামের সঙ্গে এই ধরণের আখ্যান জুড়ে দিয়ে শরিয়তের

গাঁথুনিকে আরো পোক্ত করবার চেষ্টা করা হয়েছে? আমাদের মনে হয় শরিয়ত মেয়েদের স্বাধীনতা হরণ করবার উদ্দেশ্যে সেই সমস্ত সুরাগুলিকেই সংকলন ও প্রচার করতে আগ্রহী হয় যেখানে মেয়েদেরকে আরো অন্ত্যেবাসী করে তোলা যায়। যেমন উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, সূরা নূর (২৪:২) এ বলা হয়েছে –

> যারা সাধ্বী নারীর ওপর অপবাদ আরোপ করে ও স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত না করে ও তাদের প্রত্যেককে আশিবার কষাঘাত করবে এবং কখনো ওদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না।[৩৬]

শরিয়তের এই নীতিটিতেও নারীর অবস্থান প্রান্তবাসী। কারণ এই ধরণের কোনো নীতি পুরুষের ক্ষেত্রে আমরা প্রযুক্ত হিতে দেখি না। দ্বিতীয়ত, যে বা যারা অপরাধ সংঘটনে পটু তাদের পক্ষে চারজন সাক্ষী জোটানো কোনো সমস্যার ব্যাপার নয়। লক্ষ করবার বিষয় এখানে যে নারীটিকে ‘সাধ্বী’ বলা হয়েছে, তার কোনো কণ্ঠ এখানে মূল্য পাচ্ছে না। কেননা অপবাদকে যেন গোঁড়াতেই মান্যতা দিয়ে তাঁকে ‘অপরাধী’ সাব্যস্ত করা হয়ে গিয়েছে। আসলে শরিয়তের এই ধরনের ভাষ্য এবং সেগুলির প্রচারের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে মেয়েদের স্বাধীনতাকে নানা দিক থেকে খর্ব করা হয় এবং তাদের কণ্ঠরোধ করা হয় বলেই আমাদের মনে হয়।

প্রসঙ্গত আমাদের মনে রাখতে হবে, ভারতে মুসলমানদের জন্য যে দেওয়ানি আইন প্রচলিত আছে তা ১৯৩৬ সালের ‘মুসলিম পার্সোনাল ল’। সে আইন বিধিবদ্ধ নয়; শরিয়ত আইন দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু শরিয়ত আইন ভারতে বিধিবদ্ধ নয়, স্থানীয় মৌলবীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তার প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি শরিয়তি আইন ভারতে এদেশের মেয়েদের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে নানা দিক থেকে বাধা সৃষ্টি করেছে। যার নমুনা শাহবানু, মুক্তারন বাঈ ও ইমরানা বেগমের উপর বিচারের নামে প্রহসন।

ডক্টর ওসমান গনি তার ‘ইসলামে চিন্তা ও চেতনার ক্রমবিকাশ’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন শরিয়ত মানুষের মনগড়া একপ্রকার মানব অভিধান, যা বহু ইমামের উদ্যোগে এবং তৎপরতায় রচিত হয়েছে এবং যা বহু ক্ষেত্রেই কুরআন ও হাদিসের পরিপন্থঈ। তাঁর বক্তব্য হযরত মুহাম্মদ ইসলামের প্রধান প্রসারক এবং প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর অন্তরে ছিল এক আল্লাহ। তাঁর এক চোখে ছিল হতদরিদ্র অসহায় মানুষ এবং অন্য চোখে ছিল সেকালের দৃষ্টিতে ‘ভোগ্যপণ্য’ অভাগা রমণীকুল। তিনি এই হতভাগ্য রমণীগণকে উদ্ধার করবার জন্য ইসলামকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। অথচ পরবর্তীকালে অনেকেই আল্লাহর বাণী কোরান ও মানুষের মনগড়া তৈরি শরিয়তের ব্যবধান বুঝতে না পেরে কোরান এবং শরিয়তকে মনে করেছেন অভিন্ন। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়।

শরিয়ত মানুষের হাতে রচিত হয়েছে; বিশেষত একশ্রেণির শাসক শ্রেণির মানুষের শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে শরিয়তকে ব্যবহার করা হয়েছে। ইসলামি পর্দা প্রথা প্রচলনে শরিয়তের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. গনি স্পষ্টতই জানিয়েছেন - নরনারীর যৌন জীবন সম্পর্কে কোরান প্রথম নরকুলকে সাবধান ও সংযত হতে বলেছে। এমনকি পর্দা কেবলমাত্র স্ত্রী লোকের জন্য নয়, পুরুষের জন্যও ফরয একথা বলা হয়েছে। কিন্তু তথাকথিত 'শরিয়ত' নরকে অর্থাৎ পুরুষকে 'খোদার খাসিরূপে খোলা ময়দানে ছেড়ে দিয়ে যত বাধা, যত বন্ধন, যত বিধি, যত বিধান সবকিছুই যেন প্রাণ উজাড় করে দুর্বল নারীকুলের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে।'[৩৭] এক্ষেত্রে তিনি শরিয়তের অনুশাসনের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে প্রশ্ন তুলে বলেছেন –

> শরিয়ত তার ফরমান ও ফতোয়া জারি করে যে নারী ঘরের মধ্যেই থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন হল কোরআন যে পুরুষকে রাস্তাঘাটে তাদের দৃষ্টিতে সংযত করতে বলল এই সংযত করাটা কার বা কাদের জন্য ? নারী যদি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে তাহলে নরের সংযত থাকবার প্রয়োজনটা কথায়? তাঁরা কি রাস্তার কিছু মাদী ছাগলের জন্য আত্মসংযম পালন করবে?[৩৮]

খুব সঙ্গত, স্বাভাবিক এবং প্রাসঙ্গিক এই প্রশ্ন। 'কোরান রাস্তাঘাটে পুরুষের দৃষ্টিকে সংযত রাখতে বলেছে' একথার মধ্যেই যে সত্যটি নিহিত আছে তা হলো রাস্তাঘাটে মেয়েদের চলাফেরা নিষিদ্ধ ছিল না। এমনকি আমরা হাদিস ও ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে জানতে পারি যে, আরবীয় স্ত্রীলোকেরা ব্যবসা বাণিজ্য করবারও স্বাধীনতা ভোগ করতেন। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মনে পড়বে নবিস্ত্রী খাদিজার কথা, যিনি বিধবা অবস্থায় স্বামীর ব্যবসা বাণিজ্য সামলাতেন। তাহলে সাধারণ নারীর ক্ষেত্রে অবরোধ প্রথা এত তীব্র আকার ধারণ করছে কোন স্বার্থে? এখানেই শরিয়তে নারী শাসনতন্ত্রের প্রসঙ্গটি বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

প্রকৃতপক্ষে শরিয়ত ইসলামি নারী নির্মাণের এক সুপরিকল্পিত প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যেখানে যাবতীয় মানবিক অধিকারসমূহকে খর্ব করে তাকে প্রশ্নহীন এক জড়বস্তুতে পরিণত করবার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই প্রকল্প মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত নানাভাবে বলবৎ হয়ে এসেছে। আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে শরিয়তের নিরিখেই নারী নির্মাণ প্রকল্প গৃহীত হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে নারীর এক বিশেষ অবয়বও আমরা লক্ষ করেছি। প্রসঙ্গত আমরা শরিয়ত কল্পিত সেই নারীর বিশেষ স্বরূপটি চিহ্নিত করবো এবং তারপর আমাদের নির্বাচিত প্রাইমারগুলিতে সেই প্রকল্প বাস্তবায়নে যে আখ্যান বা বয়ান রচিত হয়েছে সেগুলির বিশ্লেষণ করবো।

২.ঘ : শরিয়তে প্রকল্পিত নারী

শরিয়তে নারী নির্মাণ প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। কেননা শরিয়তি মুখপাত্রদের মতামত থেকে আমরা অনুমান করতে পারবো তাঁরা কী ধরণের নারী কল্পনা করেন অর্থাৎ তাঁদের কাছে নারীর প্রত্যাশিত স্বরূপটি কী? এই প্রশ্নের অনুসন্ধানে আমরা শরিয়তের মদতপুষ্ট বিভিন্ন রচনাবলি, বই পুস্তক এবং পত্রপত্রিকার সন্ধান পেয়েছি যেগুলিতে নারী নির্মাণের উদ্দেশ্যে লাগাতার প্রচার চালানো হয়। সেগুলি থেকেই দু' একটি নমুনা তুলে ধরলে আমরা শরিয়তে নারীর কাঙ্ক্ষিত স্বরূপটি বুঝতে পারবো।

আব্দুল হামিদ কাসেমী প্রণীত 'সর্ব-বৃহৎ হাক্কানী নামাজ ও মাসআলা শিক্ষা' এই ধারার একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই বইটিতে নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ প্রভৃতি মুসলমানের অবশ্য পালনীয় বা কর্তব্য বিষয়গুলির আলোচনার পাশাপাশি মুসলমান নর নারীর পোশাক আশাক, খাদ্য সামগ্রী, হারাম – হালাল থেকে শুরু করে সঙ্গী নির্বাচন, বিবাহ এবং যৌন জীবনের নানা বর্ণনা দেওয়া আছে। সেইসঙ্গে মুসলমান শিশুর খেলা, শিক্ষাসহ প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। এই বইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ 'কীরূপ স্ত্রী কাম্য'। এই অধ্যায়ে স্ত্রীর প্রত্যাশিত স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

> চারটি গুণ দেখে বিবাহ করো : ১. ধনবতী ২. সৌন্দর্যময়ী ৩. উচ্চবংশীয় ৪. ধর্মপ্রাণা। এই গুণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ধর্মপ্রাণাকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছে শরীয়তে। কাজেই যে ব্যক্তি ধর্মপ্রাণা দেখে বিবাহ করে সেই ভাগ্যবান।[৩৯]

লক্ষ করবার বিষয় এই চারটি গুণের বাইরে নারীর যেন আর কোনো গুণ নেই, থাকতে পারে না। শিক্ষিত বা সংস্কৃতিবতী নারী যেন সম্ভব নয়; আর থাকলেও যেন তা গুণের মধ্যে পড়ে না। শরিয়তে এই শিক্ষিত প্রশ্নবাণ বালিকা, মেয়ে, স্ত্রী, নারী যে নিষিদ্ধ সে বিষয়ে ফতোয়া শোনাতে বিলম্ব করেন না লেখক। তাই উপরের চারটি গুণের কথা উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গেই 'ইংরেজ জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মেরী ম্যাকুলের মন্তব্য' বলে লেখক সোচ্চারে ঘোষণা করেন –

> আপনি যদি সুশীলা স্ত্রী চান, তবে উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করবেন না। এমন একটি মেয়ে বিয়ে করুন যার উচ্চ শিক্ষার প্রতি উদগ্র আগ্রহ নেই।[৪০]

কেন নারীর উচ্চশিক্ষার প্রতি এরকম বিরূপ মানসিকতা? উচ্চশিক্ষিত মেয়ে হলে সমস্যাটা কোথায়? সে কি প্রশ্ন করে কিংবা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় মত্ত হয়ে সামাজিক স্থিতিকে ধ্বংস করে দেবে? লেখকের ফরমান –

> যে মেয়ে জ্ঞান পিপাসু নয় সে প্রেমময়ী হবে। স্বল্প শিক্ষিতা মহিলাদের পক্ষে বিবাহ ও সন্তান কামনা ছাড়া কোন কামনাই থাকে না। উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাগণ সমালোচনার মনোবৃত্তি লাভ করেন। বিবাহিত জীবনকে সমঅধিকারের দাবী এবং সমালোচনার চোখে দেখে থাকেন। তারা সব সময় জাহাবাজ হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে সাধারণ মনোবৃত্তি সম্পন্ন বালিকাদের নারী সুলভ সব গুণই থাকে।[৪১]

শরিয়তি মুসলমান সমাজ যেন নারীকে গড়েপিঠে নিতে চায় পুরুষের আরাম আয়েশের স্বার্থে। বিবাহ ও সন্তান কামনার বাইরে তাই তারা নারীর বৃহত্তর জীবন বাসনাকে নিষিদ্ধ বলে মনে করে। আর প্রশ্নহীন আনুগত্যের একরৈখিক সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর শ্রমকে ব্যবহার করে সে গড়ে তুলতে চায় পিতৃতান্ত্রিক এক সুখরাষ্ট্র। স্পষ্টতই সেখানে নারীর সমানাধিকার ও স্বীকৃতির প্রশ্ন অবান্তর। তাই শিক্ষিত প্রশ্নশীল সমালোচনাপ্রবণ নারীও তাদের কাছে বিপজ্জনক। প্রসঙ্গত নারী শিক্ষা প্রাপ্ত হলেই সে নারীত্ব থেকে চ্যুত হয়, সুতরাং নারীকে যথাসম্ভব শিক্ষা থেকে দূরে রাখাই শ্রেয় বলে মনে করে শরিয়ত। তাই নারী পুরুষের বুদ্ধির তুল্যমূল্য বিচার করে তাঁদের জোরালো সওয়াল –

> মহিলাদের মগজের ওজন ও পরিমাণ পুরুষের চেয়ে অনেক কম। দীর্ঘ মেয়াদী পুরুষালী কলেজী শিক্ষার চাপ তাঁদের হালকা মগজে পড়ে দেহে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনেক পরিবর্তন ঘটায়। এতে নারীত্বের হানি ঘটতে থাকে, ইহাতে বিজ্ঞানীগণ একমত।[৪২]

কোন বিজ্ঞানী কোথায় একথা বলেছেন তার কোনো সূত্র নেই। অথবা 'বিশ্বাসী' মুমিন বিজ্ঞানের মতই বা কেন মান্য করবে তারও কোনো সদুত্তর নেই। কিন্তু জনগণকে ভাবিয়ে তুলতে, তাকে বিভ্রান্ত করতে এবং অবশেষে পরাজিত দুর্বল সাধারণ দেহাতী মানুষদের মনরাজ্যের সম্পূর্ণ দখল নিতে এই ধরণের শরিয়তি বিধানের রবরবা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। যা সমাজ এবং সভ্যতার পক্ষে মোটেও শুভ সংকেত দিচ্ছে না বলেই আমাদের প্রত্যয়।

পিতৃতান্ত্রিক এই শরিয়তি ধারাটি তাঁদের উদ্দেশ্যকে আরো পোক্ত এবং পরিব্যপ্ত করবার লক্ষ্যে সদাজাগ্রত। তাই তাঁরা সোচ্চারে ঘোষণা করছেন –

> নারী স্বাধীনতা ও প্রগতির সামাজিক তত্ত্বকে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে নারীদেরকে খোদা প্রদত্ত কল্যাণকর জীবন বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, সীমালংঘন ও উচ্ছৃঙ্খল

> আচরণকারিণী সাব্যস্ত করেছে। ফলতঃ সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে শান্তি ও সুস্থিতি নষ্ট হচ্ছে। মহিলাদেরকে তার প্রকৃতিগত অবস্থান থেকে বের করে আনার পরিণতিতে আধুনিক মনোভাবাপন্ন দম্পতিদের পারস্পরিক হৃদয়ের নিগড়বন্ধন শিথিল হওয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। ... পারিবারিক জীবনে ভাঙন ও বিপর্যয় সৃষ্টি করছে।[৪৩]

আমাদের মনে হয় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভাঙনের ভয় দেখিয়ে নারীসমাজকে আতঙ্কিত করে এঁরা আসলে পিতৃতান্ত্রিক প্রভুত্ববাদকেই প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী। আমরা জানি শিক্ষা ও স্বাধিকার মানুষকে মুক্ত মনে বেঁচে থাকবার, কাজ করবার এবং স্বাধীন জীবন উপভোগের প্রতিবেশ করে সামাজিক গতিশীলতা (Social Mobility) অব্যাহত রাখে। তা নারী পুরুষ সকলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।[৪৪] তাহলে নারীর শিক্ষা ও নারীর প্রগতিকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করবার উদ্দেশ্যটা কী?

'পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন'[৪৫] কবিতায় প্রখ্যাত জার্মান কবি ও নাটককার বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট দেখিয়েছিলেন 'পড়তে জানা' বা পারার সক্ষমতার মধ্যে দিয়ে কীভাবে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ নিজেদের মৌল দাবিগুলি গণপরিসরে উত্থাপন করতে পারে। শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে কীভাবে তারা তাঁদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক এবং সম্মান বুঝে নিতে পারে। নিরন্তর প্রশ্ন ও পরিপ্রশ্নের মধ্যে দিয়েই মানুষ পৌঁছতে পারে তার ন্যায্য দাবিতে, রচনা করতে পারে গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহ। আর সেই প্রশ্ন তোলার সাহস দিতে পারে শিক্ষা। শরিয়তসহ পৃথিবীর ক্ষমতালোভী প্রত্যেকটি প্রভুতন্ত্রই তাই শিক্ষার ঘোর বিরোধী। তাই নারীকে তাঁরা 'মগজ' নয় 'দেহ' দিয়েই নির্মাণ করতে চান। আর এই কারণেই নারীর 'মগজ' বা মস্তিষ্ক তাঁদের কাছে হালকা। আর এই 'হালকা মগজ' যদি তার 'বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন' আনে অর্থাৎ দেহ ও মনকে বদলে দেয় তাহলে 'দেহসর্বস্ব নারী'র কোন জমিটুকু দখল করবেন পিতৃতন্ত্রের ধ্বজাধারী এই সমস্ত 'পুরুষেরা'? সুতরাং তাঁদের দৃষ্টিতে 'মগজহীন' অনুগত নারীভূমিই কাঙ্ক্ষিত।

২. ঙ : শরিয়তের নারী : প্রত্যাঘাতের পাঁচ কাহন

শরিয়তকে আশ্রয় করে নারী অবমাননা ও তার অধিকার খর্ব করবার এই প্রবণতা বর্তমান বিশ্বে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। নারী নির্মাণের এই প্রক্রিয়া যে দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে না, তার সঙ্কেত ইতিউতি চারিদিক থেকে পাওয়া যাচ্ছে। পাকিস্তানের মতো দেশে শরিয়তি আইনের সংস্কার শুরু হয়েছে এবং শরিয়তের ছেঁদো যুক্তিগুলি বাংলাদেশ, পাকিস্তানের মতো ইসলাম নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রও বাতিল করতে শুরু করেছে।[৪৬] সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গেও কিছু মানবকল্যাণকামী সংগঠন এই কাজে

নারীদেরকে সংগঠিত করছে এবং সংঘবদ্ধভাবে 'মুসলিম পার্সোনাল ল' পরিবর্তনের পক্ষে মত দিচ্ছেন। নারীর অধিকার রক্ষায় এই পরিবর্তন কতটা জরুরী নিচের তথ্য থেকে তা বোঝা যাবে।

২০১৫ সাল নাগাদ 'ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন' নামে মুম্বাইয়ের একটি সংগঠন পশ্চিমবঙ্গসহ দশটি রাজ্যে প্রায় পাঁচ হাজার মুসলমান মহিলাকে নিয়ে একটি সমীক্ষা করেছিলেন। তার রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ৮৩.৩ শতাংশ মহিলা তিন তালাকের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে শরীয়ত নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত আইনের সংস্কার চেয়ে মত প্রকাশ করেছেন। তিন তালাক ছাড়াও বহুবিবাহ, বিয়ের দেনমোহর এবং দত্তক সংক্রান্ত যাবতীয় শরিয়তি বিধানকে বিচার বিভাগ এবং সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় এনে বিধিবদ্ধ আইন চান ঐ মহিলারা।

ঐ সমীক্ষায় উঠে এসেছে মূলত গরিব এবং নিরক্ষর সমাজেই শরিয়তি আইনের প্রতাপ সর্বাধিক। অবশ্যই সব জায়গায় সমস্যা সমান নয়। তাই সমীক্ষায় দেখা গেছে, শিক্ষিত এবং সম্পন্ন বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তালাক বা বহবিবাহ নেই বললেই চলে। কিন্তু রাজ্যের অনেক জেলাতেই নিম্ন আয়ের এবং নিম্ন সামাজিক অবস্থার মুসলমানদের মধ্যে তালাকের চল বেশি। আবার, যে সমস্ত অঞ্চলে মহিলারা বিড়ি বেঁধে, জরির কাজ করে বা অন্য কোনো উপায়ে উপার্জন করে খানিকটা স্বাবলম্বী, সেখানে তালাকের প্রবণতা কম।[৪৭] অর্থাৎ মেয়েরা স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী হলেই শরিয়ত তার দাঁত নখ ফোটাতে ব্যর্থ। আর এই জন্যই সম্ভবত নারীর প্রগতিকে অস্বীকার করে নারীকে বারবার অবরোধবাসিনী করে রাখবার ফতোয়া দিয়ে এসেছে শরিয়ত।

শরিয়তি আইনের খাঁড়ায় নারীর অনধিকারের প্রসঙ্গে সংগঠনটির বক্তব্য –

> এমন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা হবে কেন, যা দেশের আইনের ঊর্ধে গিয়ে পুরুষকে একতরফা ভাবে তালাক দেওয়ার অধিকার দেবে? অথচ তালাক নিয়ে শরিয়তের অপপ্রয়োগ বন্ধ করতে বাংলাদেশে এমনকি পাকিস্তানেও মুসলিম ব্যক্তি গত আইনের ব্যাপক সংস্কার করে ১৯৬১ সালে তৈরি হয় মুসলিম পারিবারিক আইন। ... সেদেশে তালাক দেওয়ার চটজলদি ব্যবস্থা আর নেই। প্রথম স্ত্রীর লিখিত অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়েও করা যায় না। কিন্তু এখানে [ভারতে] তালাকের বা বহুবিবাহের ওপর বিচারবিভাগ বা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন মুসলিম মহিলারা, শিশুরা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ছে।[৪৮]

মহিলাদের এই সামূহিক ক্ষতি ও শিশুদের নিরাপত্তাহীনতার এই অভিযোগকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে দিয়েছেন জামাআতে ইসলামি হিন্দের পশ্চিমবঙ্গে শাখার তৎকালীন 'আমির-এ-হালকা' (সভাপতি) মহম্মদ নুরুদ্দীন। এই নামটির সঙ্গে আমরা ইতিপূর্বেই পরিচিত হয়েছি। আমাদের

প্রকল্পিত গবেষণায় আমরা যে সমস্ত ইসলামি প্রাইমার সংগ্রহ ও নির্বাচন করেছি, তার অধিকাংশই রচিত হয়েছে এই মহম্মদ নুরুদ্দিনের হাতে অথবা বাদবাকিগুলি তাঁরই পরামর্শে, পরিচালনায় ও সহযোগিতায়। মনে রাখতে হবে এই প্রাইমারগুলি রচনার উদ্দেশ্য যে আরেকভাবে শরিয়তি আইনের প্রচলন ও তা বলবৎ করা, খুব সহজেই তা অনুমান করা যায়। যাইহোক, যে শরিয়তি বিধি এ দেশের নারীর অধিকারকে খর্ব করে সেই শরিয়ত নিয়ন্ত্রিত মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের সংস্কার সম্ভব কিনা? সে প্রসঙ্গে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড সে দাবি আগেই বাতিল করে দিয়েছে এবং এই প্রশ্নের উত্তরে মহম্মদ নুরুদ্দিন 'শরিয়তের ন্যূনতম সংস্কারের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে' সাফ জবাব দেন – 'এইসব নারী সংগঠনের আন্দোলন আসলে অভিন্ন দেওয়ানি আইনের দাবিকেই জোরদার করছে।'[৪৯] অর্থাৎ মহম্মদ নুরুদ্দিন প্রমুখ শরিয়তকেই আঁকড়ে ধরে সমাজ কাঠামো নির্মাণ করতে চান। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মন থেকে এই সংশয় সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়ে যায় যে, ইসলামি বাংলা প্রাইমারগুলির যে বহুস্তরীয় বয়ান – কখনো তা ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ, কখনো নারী শিক্ষার আদর্শ, কখনো বা স্বদেশপ্রেমের আদর্শ নির্মাণ করে; এগুলি আসলে তার ছদ্ম আদর্শ নির্মাণ। এক এবং একমাত্র আদর্শ হলো শরিয়তের ভিত্তিতে সমাজ, দেশ এবং জাতি গঠন। আর এই জন্যই সম্ভবত আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে ঘুরে ফিরে আসে শরিয়তের প্রতিষ্ঠাসূচক ঘোষণা –

'শরিয়ত ছাড়া পথ নাই' *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ১৯]*[৫০]

'শরিয়তের বিধান মেনো / সিভিল কোডে পতন জেনো' *[কচিকাঁচা – ১, পৃ.১১]*[৫১]

শরিয়তের বিধান চাই / খোদার পথে চলবো ভাই। *[ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২, পৃ. ১০]*[৫২]

ইত্যাদি আখ্যান।

সুতরাং যেখানে মানুষ প্রণীত ও পরিকল্পিত শরিয়তের এত দাপট সেখানে নারীর অধিকার তো খর্ব হবেই। কিন্তু ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলনের রাজ্য শাখার আহ্বায়ক রহিমা খাতুনের বক্তব্য অন্যরকম। তাঁরা মনে করেন শরিয়ত তাঁদের উপর বল্গাহীন অনুশাসন চাপিয়ে দিচ্ছে। তাই তাঁরা কোরানের ভিত্তিতে আইন চান, শরিয়তের পিতৃতান্ত্রিক আইন নয়। এ প্রসঙ্গে তাঁদের সাফ জবাব –

> কোরানে যে বিধান রয়েছে তার ভিত্তিতেই আইন হোক, যে আইনে একসঙ্গে তিনবার তালাক বলে বউকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া যাবেও না, বউয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে যে আইন স্বামীকে আদালত পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারবে, ফয়সালা হবে আদালতেই।[৫৩]

মুর্শিদাবাদের 'রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমতি'র নেত্রী খাদিজা বানু আরো অনেকটা এগিয়ে এদেশের শরিয়তি আইনের স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন –

> মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে যদি শরিয়ত আইনের সংস্কার সম্ভব হয় তাহলে ভারতের মতো একটা সেকুলার দেশে হবে না কেন?[৫৪]

তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট –

> ব্যাঙ্ক বিমা বা ফৌজদারির ক্ষেত্রে মুসলমান যদি শরিয়ত সরিয়ে রেখে দেশের আইনে চলতে পারে তাহলে তালাক, সম্পত্তির উত্তরাধিকার বা দত্তকের জন্যও শরিয়ত আইনের প্রয়োজন হবে কেন![৫৫]

চিত্রটা বিরল হলেও একথা সত্য যে, প্রশ্নটা উঠতে শুরু করেছে। শরিয়তের প্রবল প্রতাপে দীর্ঘকাল অবরোধবাসিনী নারী যাবতীয় অনাচার 'সবর' করে এসেছে। কিন্তু শিক্ষার আলোয় স্নাত হয়ে 'পড়তে জানা এমন এক মজুরের প্রশ্নের' মতো মুসলিম মেয়েরাও কণ্ঠ ছাড়তে শুরু করেছে। যদিও সমাজ কলঙ্কিত হচ্ছে জেনেও শিক্ষিত মুসলমান পুরুষ কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সমাজের এই ক্ষতটা আড়াল করতে ব্যস্ত। কিন্তু এই ক্ষত সারিয়ে তুলতে এবং খাদ থেকে প্রত্যাঘাত ছুঁড়ে দিতে মুসলিম মেয়েদের সব থেকে বড়ো আয়ুধ হলো শিক্ষা। অতএব ইসলামে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে প্রচলিত চিন্তাভাবনার বিচার ও বিশ্লেষণে আমরা অগ্রসর হবো।

৩. ইসলামে নারী শিক্ষা : তত্ত্বে ও প্রয়োগে

ইসলামি শিক্ষাতাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ ও ক্ষেত্রগুলি এক এক বিশেষ বর্ণের মানুষদের জন্য কুক্ষিগত থাকলেও ইসলামে তা হয়নি। বরং সকলেই শিক্ষার সমান অধিকার পেয়েছেন ইসলামে। তাঁদের মতে –

> মহানবী (সা) শিক্ষা অর্জন করাকে প্রত্যেক নরনারী নির্বিশেষে সকলের জন্য ফরয বা অবশ্য কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন।[৫৬]

শুধু তাই নয়, শিক্ষাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিদ্বানের কলমের কালিকে শহিদের রক্তের চেয়েও মূল্যবান মনে করা হয়েছে।[৫৭]

এখানে লক্ষ করবার বিষয় পুরুষের পাশাপাশি নারীর শিক্ষার কথাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র তাইই নয় মনে করা হয় সমস্ত বিশ্ব যখন অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কার আর অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জমান ছিল তখন মাহানবী নারীর মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে নারী শিক্ষার কথা বলেছেন। নারীকে আত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীর চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য হিসেবেই দৈহিক সত্তার বিকাশের পাশাপাশি তার বিবেক এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে উৎকর্ষের উপর মহানবী বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।[৫৮] কেউ কেউ মনে করেছেন মহম্মদ অনুভব একটি সফল, পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী সমাজ কাঠামোর জন্য নারী পুরুষ সকলের সমান অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তাই তিনি নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন -

> মহানবী (সা.) পুরুষদের যেভাবে তা'লীম[৫৯] দিতেন মহিলাদেরও অনুরূপভাবে তা'লীম দিতেন। ঈদের মাঠে দেখা যেত তিনি পুরুষদের সামনে ভাষণ শেষ করে নারীদের সমাবেশে চলে যেতেন এবং সেখানে বক্তব্য রাখতেন।[৬০]

জানা যায় যে, নারীদের সুশিক্ষিত করে তোলবার জন্য তিনি অভিবাবকদের উৎসাহিত করতেন এবং এই বিষয়ে বলেছেন –

> যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান ও বোনকে লালন পালন করে। তাদেরকে আদব কায়দা শিক্ষা দান করে, তাঁদের সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করে, এমনকি তারা আর তার মুখাপেক্ষী থাকে না, তার জন্য আল্লাহ জান্নাত অবধারিত করে দেন।[৬১]

এখানে কন্যা সন্তানের গুরুত্বের কথা এবং সমান্তরালভাবে তাদের শিক্ষার কথাকে বলা হচ্ছে। এরই পাশাপাশি বলা হচ্ছে যে, শুধুমাত্র গৃহস্থ স্ত্রীদেরকে নয়; ঘরের 'বাদী-দাসীদের'কেও শিক্ষার আলোকে আনবার প্রচেষ্টা বলবৎ ছিল। সেকালে 'আসমাউর রিজাল' শীর্ষক জীবনী সংকলন-গ্রন্থের কথা জানা যায় যেখানে প্রায় এক হাজার সাহাবিদের মধ্যে দেড়শত বিদুষী নারীর জীবনী সংকলিত হয়েছিল। এর থেকেও কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, তৎকালীন নারীশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব ছিল বলেই নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।[৬২] তবে নারীশিক্ষার প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি পড়েছিল উমাইয়া যুগে, যেখানে নারীদের জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা আরব ইতিহাসের জ্ঞানচর্চার কথা জানা যায়। মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন –

> ইসলামী সমজের মহিলারা দীন সম্পর্কে জরুরী জ্ঞান লাভ করুন – রাসূলে করীম (সা) – এর এই ছিল বাসনা। কেবল নীতিগত জ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য ছিল না; সেইসঙ্গে বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষা দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল অনিবার্যভাবে।[৬৩]

উপরিউক্ত কথাগুলি ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস নির্মাণে বিশেষভাবে সহায়ক বটে তবে এই শিক্ষার আলোটুকু যে সমাজের সবস্তরের মানুষ পেয়েছেন সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। কেননা সমাজের অবতলের মানুষদের কথা এই ইতিহাসের মধ্যে সে'রকম ভাবে জায়গা করে নিতে পারেনি। আজকের দিনে যাকে বলে 'জনশিক্ষা' ইসলামে সেই জনশিক্ষার ভিত্তি রচিত হয়েছিল কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কাজে কাজেই ইসলামি শিক্ষায় নারীর অধিকার স্বীকৃত থাকলেও তা যে সর্বজনীন ছিল না তা আমরা জোর দিয়েই বলতে পারি। তবে একথা ঠিক যে আনুগত্য, পতিপরায়ণতা, ধর্মভীরুতা ইত্যাদি বিশেষ দোষ ও গুণের সমাহারে সেকালের নারী নির্মিত হয়েছে।

এখন উপরিউক্ত তাত্ত্বিক পরিসর ছেড়ে আমরা যদি বর্তমানের বাস্তবের মাটিতে নেমে আসি তাহলে নারী শিক্ষা সম্পর্কে এযুগের মুসলিম সমাজের মানসিকতা অনুধাবন করতে পারবো। উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে আমরা লক্ষ করেছি গৃহ পরিবেশের বাইরে নারী শিক্ষার গুরুত্বের কথা স্বীকৃত হয়েছে, এমনকি কারিগরি শিক্ষার প্রতিও অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে; যা নারী মুক্তির পথকেই প্রশস্ত করে বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু আধুনিককালের তাত্ত্বিকরা অনেকেই নারীমুক্তির এই দিকটিকে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে নারীকে গৃহবন্দী দেখতেই পছন্দ করেন। তাই তাঁরা প্রচার করেন –

> যেখানেই নারীরা তাদের কর্মক্ষেত্র (পড়ুন 'গৃহ') ছেড়ে বাইরে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছে সেখানেই দেখা দিয়েছে চরম অশান্তি। ... আমাদের দেশের তথাকথিত নারীমুক্তির হোতারা 'নারী সমস্যা নারী সমস্যা' জিগির তুলে বাস্তবেই একটা জটিল সমস্যা সৃষ্টি করেছে।[৬৪]

অর্থাৎ এঁদের দৃষ্টিতে নারীকে অবরোধবাসিনী করে রাখাই শ্রেয়। আর বাইরের শিক্ষা ও কর্মের জগৎ যেন নারীর জন্য নিষিদ্ধ। তাই আধুনিক নারীমুক্তির প্রস্তাবকে এঁরা 'নারী নির্যাতন' বলেই মনে করেন –

> যে সমস্ত নারী মুক্তিকামীরা (?) নারীকে বাইরের জগতে টেনে আনছে, নারীদেরকে তাদের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল স্তন্যদান, সন্তান পালন ইত্যাদির মত কঠিন দায়িত্ব পালন করার পরও যদি তাকে জীবিকার্জনের চেষ্টায় পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াতে হয়, তবে সেটা নারীমুক্তি নাকি নারী নির্যাতন?[৬৫]

এই প্রশ্ন তোলবার সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্ত তাত্ত্বিকরা 'পাশ্চাত্য মনীষীর' উদ্ধৃতি দিয়ে 'নারীকে নারীত্বের অর্গলেই' আঁটকে রেখে দিতে চান। লক্ষ্য করবার বিষয় যেখানে ইসলামি তাত্ত্বিকরা সুযোগ পেলেই পাশ্চাত্যের ভাব ও চিন্তার দাসত্যমুক্ত হতে চান,[৬৬] তাঁরাই আবার কেন যে দরকারে

অদরকারে ‘পাশ্চাত্যের মনীষীদের’ সমর্থন গ্রহণ করেন তা আমরা বুঝে উঠতে পারি না। আমাদের মনে হয়, পাশ্চাত্যের আদর্শকে এঁরা আধুনিক আদর্শ বলে মনেও করেন, আবার পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করতেও এঁরা পিছপা হও না। অর্থাৎ এঁদের নিজেদেরই অবস্থানই একটা স্ববিরোধী জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সেক্ষেত্রে এঁদের ভাবনা চিন্তা চালিত হয় রাজনৈতিকভাবে শরিয়তি আদর্শকে বলবৎ করবার লক্ষ্যে। যাইহোক, অতঃপর পাশ্চাত্য ‘মনীষীর সমর্থনে’ এযুগের ইসলামি তাত্ত্বিকের বক্তব্য –

> পাশ্চাত্য মনীষীদের মতে, ‘নারীকে নারীই থাকতে হবে’। যদি তারা তাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে তখন তারা আর নারী থাকবে না। অথচ নিজেদের দৈহিক দিকও তারা বাদ দিতে পারবে না। ফলে তারা না নারী না পুরুষ, তারা একটা তৃতীয় শ্রেণীর আজব জীবে পরিণত হয়।[৬৭]

লক্ষ করবার বিষয় এখানেও নারীকে গৃহে বন্দী রাখবার বাসনাই বিধৃত হয়েছে। আর তার সঙ্গে ‘নারী’কে ‘দেহ’র বাইরে এঁরা কল্পনাই করতে পারেননি। তাই একথাটি বারংবার পুনরুক্ত হচ্ছে ‘নিজেদের দৈহিক দিকও তারা বাদ দিতে পারে না’ অথবা ‘তৃতীয় শ্রেণীর আজব জীবে পরিণত হয়’।

এক্ষেত্রে নারীর উচ্চশিক্ষার অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রকে ছকে দিতে এগিয়ে আসেন এযুগের ইসলামি চিন্তকরা। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য –

> আপনি যদি সুশীলা স্ত্রী চান, তবে উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করবেন না। এমন একটি মেয়ে বিয়ে করুন যার উচ্চ শিক্ষার প্রতি উদগ্র আগ্রহ নেই।[৬৮]

উচ্চশিক্ষিত জ্ঞান পিপাসু মেয়েদের এঁরা কলহপ্রিয়, সমালোচনাপ্রবণ, প্রেম ও সংসারের পক্ষে বিপজ্জনক বলে দাগিয়ে দিয়ে বলেন -

> যে মেয়ে জ্ঞান পিপাসু নয় সে প্রেমময়ী হবে। স্বল্প শিক্ষিতা মহিলাদের পক্ষে বিবাহ ও সন্তান কামনা ছাড়া কোন কামনাই থাকে না। উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাগণ সমালোচনার মনোবৃত্তি লাভ করেন। বিবাহিত জীবনকে সমঅধিকারের দাবী এবং সমালোচনার চোখে দেখে থাকেন। তারা সব সময় জাহাবাজ হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে সাধারণ মনোবৃত্তি সম্পন্ন বালিকাদের নারী সুলভ সব গুণই থাকে।[৬৯]

অতঃপর ‘নারী সুলভ সব গুণ’ সম্পন্না নারীর কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য –

> একটা পুরুষ সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে কার জন্যে? তার স্ত্রী পরিবারের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে নয় কি? অনুরূপভাবে স্ত্রীও সংসারটাকে সুন্দর সুচারুরূপে গুছিয়ে রাখে কর্মক্লান্ত স্বামীকে একটু

> শান্তি দেওয়া জন্যে। সেবায় যত্নে ভরিয়ে তোলে সে। সে মমতাময়ী, স্নেহময়ী, গৃহের রাণী। মোটকথা, প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী এঁরা একে অপরের পরিপূরক।[৭০]

উপরের এই তত্ত্বকথার মধ্যে আছে নারীকে বিনা পারিশ্রমিকে গৃহশ্রমে আত্মবিসর্জন দেবার এক সুচারু ষড়যন্ত্র। লক্ষ করুন উপরের কথাগুলি : 'পুরুষের হাড়ভাঙা পরিশ্রম' কিন্তু নারীর 'সংসারটাকে সুন্দর সুচারুরূপে গুছিয়ে রাখা'। পুরুষের পরিশ্রমের সঙ্গে কঠোর মেহনতের অনুভব জড়িয়ে আছে আর নারীর 'সংসারটাকে সুন্দর সুচারুরূপে গুছিয়ে রাখা' যেন মেহনতহীন এক মজার খেলা। পুরুষের শ্রমের বিশেষণ হিসেবে এসেছে পুরুষ 'কর্মক্লান্ত' আর নারীর ক্ষেত্রে 'সে মমতাময়ী, স্নেহময়ী, গৃহের রাণী'। ব্যাপারটা কি এতই সহজ? গৃহশ্রম দিতে দিতে নারী কি 'রাণী' হিসেবে থাকতে পারেন? থাকা যে সম্ভব নয় তার আদর্শ নমুনা খুঁজে পাওয়া যাবে বাংলা ভাষায় লেখা নারীর প্রথম আত্মজীবনী রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন' তে।[৭১] এরই পাশাপাশি খুব সম্প্রতি হওয়া স্যাপের রিপোর্টটিতে।

২০১১ সালের জনগণনার রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারি ২০০১ এর মতোই মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমবর্ধমান। আমরা জানি এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিরক্ষরতা, দারিদ্র, অনুন্নয়নের তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত। দেখা যাচ্ছে, এ রাজ্যে হিন্দু মেয়েদের স্বাক্ষরতার হার ৬৩. ১ শতাংশ, আর মুসলমান মেয়েদের ৪৯.১ শতাংশ। সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের সংখ্যা নামমাত্র যথা ৪.১ শতাংশ[৭২]। শুভ্রনীল চৌধুরী ও শাশ্বত ঘোষ ২০১৬ সালের ১৭ মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় 'মুসলমানদের বাদ দিয়ে উন্নয়ন হবে না' শীর্ষক উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে স্যাপের রিপোর্টের ভিত্তিতে যে তথ্য তুলে ধরেছে তা পশ্চিমবঙ্গ তো বটে, ভারতের মুসলমান সমাজের সামনে একটা অশুভ বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। উক্ত রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে –

> রাজ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মাত্র ২.৭ শতাংশ মানুষ স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষা পেয়েছেন, হিন্দুদের মধ্যে সেই হার ১০.৭ শতাংশ। গোটা দেশের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের অবস্থাটা আরো সঙ্গিন, কেননা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার সংখ্যাটা ৪.৬ %।[৭৩]

আরও বিপজ্জনকভাবে যে তথ্যটি উঠে এসেছে তা হল –

> স্যাপের রিপোর্ট বলছে, যে সমস্ত ব্লকে মুসলমান সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ৫০ % বা তার বেশি, সেই ব্লকে প্রতি ১০,০০০ মানুষে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ৭.৭ টি। যে ব্লকে মুসলমানের জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১৫ % বা তার কম, সে সব ব্লকে এই সংখ্যা ১১.৩। মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের

ক্ষেত্রেও মুসলমান-প্রধান ব্লকে এঁদের সংখ্যা গড়ের তুলনায় অনেক কম। অর্থাৎ মুসলমান প্রধান এলাকায় সরকার পর্যাপ্ত শিক্ষার পরিকাঠামো গড়তেই ব্যর্থ।[৭৪]

অর্থাৎ সোজা হিসেব মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষার হার অমুসলমান এলাকার শিক্ষার হারের থেকে অনেক কম। তাহলে কি শরিয়তপন্থী যে রক্ষণশীল ধারাটি এদেশের শিক্ষা, আধুনিকতা ও প্রগতির প্রবহমানতাকে রুদ্ধ করতে চাইছে, সেই ধারাটিই মুসলমান সমাজের নিয়ামক হয়ে উঠছে ক্রমশ? এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সমাজে শিক্ষার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সরকারি উদ্যোগ যে ব্যর্থ হয়েছে তা স্পষ্টও। তবে কি সরকারের টিকে থাকার স্বার্থে শরিয়তের প্রভুত্ববাদকেও অনুমোদন করা হচ্ছে এ রাজ্যে? আমরা লক্ষ করেছি রাজ্যে কুড়ি হাজারেরও বেশি ইমামকে মাসে আড়াই হাজার টাকা ও প্রায় সমসংখ্যক মোয়াজ্জিনকে মাসে দেড় হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন রাজ্য সরকার। সেইসঙ্গে যে সব এলাকায় দশ শতাংশের বেশি উর্দুভাষী মানুষের বাস সেখানে উর্দুকে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা করা হয়েছে।[৭৫] এই বিষয়টিকে অনেকেই মনে করেছেন যে, সরকারও মুসলমান সমাজকে রাজনীতির 'ভোটব্যঙ্ক' হিসেবেই ব্যবহার করে চলেছে। যে কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে এ রাজ্যের মুসলমানরা তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতির লোকদের থেকেও পিছিয়ে। এ প্রসঙ্গে সাচার কমিটির রিপোর্টের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করে '*মুসলমানদের উন্নতির জন্য কী করতে হবে*' শীর্ষক গ্রন্থে মুসলমান সমাজের করণীয় কর্তব্যগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন আই পি এস আধিকারিক ড. নজরুল ইসলাম।[৭৬]

এখন খুব প্রাসঙ্গিকভাবে যে বিষয়টি উঠে আসছে তা হলো নারী শিক্ষা ও নারীর প্রগতি নিয়ে রক্ষণশীল মুসলমান সমাজ এবং সমাজের গতি নির্ধারকেরা যেভাবে প্রাচীনপন্থী ভাবনা চিন্তায় নিজেদেরকে বন্দি করে রেখেছেন এবং একটি সমাজকে অচল করে রাখবার অভিপ্রায় পোষণ করে চলেছেন তা একটা জাতির পক্ষে মোটেও মঙ্গলজনক হয়ে উঠবে না। অন্তত যেখানে এদেশে হাজারে হিন্দু মহিলার থেকে মুসলমান মহিলার সংখ্যা অনেকটাই বেশি। 'অ্যাসোসিয়েশন স্ন্যাপ ও গাইডেন্স গিল্ডের' যে রিপোর্ট 'লিভিং রিয়ালিটি অব মুসলিমস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' তাতে দেখা যাচ্ছে যে, শূন্য থেকে ছয় বছরের শিশুদের মধ্যে প্রতি এক হাজার পুরুষে মুসলমান সমাজে নারীর সংখ্যা ৯৬১ জন, যেখানে হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা ৯৫৩ জন।[৭৭] অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান নারীর তুলনামূলক সংখ্যার বিচারে মুসলমান নারীর আধিক্য প্রমাণিত। এই তথ্যে অনেক মুসলামানকে গর্বে ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুক ফুলিয়ে বলতে শুনেছি যে, ইসলামে ভ্রূণ হত্যা নিষিদ্ধ এবং ইসলামে নারীর অধিকার অধিকতর স্বীকৃত তাই নিকটতম প্রতিবেশী হিন্দু অপেক্ষা

মুসলমানদের এই অগ্রগতি লক্ষণীয়। কিন্তু বিষয় হলো এই অধিক সংখ্যক নারী শিশুকে কি প্রকৃতই মানবিক অধিকার দেবার ব্যাপারে মুসলমান সমাজ সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছে? 'নারী'কে 'রাণী' করে রাখা তো দূরের কথা, তার প্রাপ্য নাগরিক অধিকার সে কতোখানি লাভ করতে পেরেছে? অথবা গৃহ পরিবেশে সেই নারী কতোখানি আরাম আয়েশে থেকেছে? এই প্রশ্নগুলিরও উপযুক্ত জবাব খুঁজে পাওয়া যাবে স্ন্যাপের প্রাগুক্ত রিপোর্টটিতে। সেখানে দেখা যাচ্ছে-

> মুসলমান সম্প্রদায়ের কর্মরত মানুষের মধ্যে ক্ষেত মজুরের অনুপাত যেখানে ৩১.৩%, হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা ২৮.২%। মুসলমান সম্প্রদায়ের ১২.৬% মানুষ যেখানে গৃহশিল্পের সঙ্গে যুক্ত, হিন্দুদের ক্ষেত্রে মাত্র ৬.৫% মানুষ এই কাজে নিযুক্ত আছেন। ... অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা মূলত কায়িক শ্রম ও ঠিকা কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে থাকেন।[৭৮]

লক্ষ করুন, বহু পূর্বেই আমরা শাস্ত্রীয় বচনসমূহ উদ্ধৃত করে আমরা দেখিয়েছিলাম, শাস্ত্রকারেরা আপামর মুসলমানকে 'দেহ' দ্বারা তার অস্তিত্ব নির্মাণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, 'মস্তিষ্ক' বা 'মগজ' তাঁদের কাছে অবান্তর। নারী কল্পনার ক্ষেত্রে তো তাঁরা স্পষ্টতই 'মগজহীন' নারীকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, যার ফল এখানো ভুগতে হচ্ছে কোটি কোটি মানুষকে কেবলমাত্র 'কায়িক শ্রম' দানে জীবিকা নির্বাহের মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বচনসমূহ এবং ধর্মের নীতি প্রনেতাদের সৌজন্যে মুসলমান সমাজ ক্রমশ একটা গতর খাটা মজুর শ্রেণিতে পরিণত হচ্ছে। আর খুবই লজ্জার যে, সেই গতরখাটা মেহনতি মানুষেরাও যুগ যুগ ধরে 'অসংগঠিত'। শ্রমিকেরা যত বেশি অসংগঠিত হবে, নারী যতবেশি অশিক্ষার অন্ধকারে একক এবং বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করবে শাসক তত বেশি আরামের সঙ্গে বাধাহীনভাবে তার শাসন ও শোষণের কালো হাতকে বিস্তৃত করবে ও মজবুত করবে। আর সেই শাসক যদি সমাজ ও সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরেই থাকে, তাহলে প্রতিরোধ বা প্রতিবাদটাই বা করবে কে? সুতরাং কর্মক্ষেত্রে মুসলমানদের ভবিতব্য ঠিকা শ্রমিক, ঝি – চাকর ইত্যাদি। রিপোর্টের বয়ান অনুযায়ী –

> জানা গেছে, মুসলমান সমাজের ৪২.৬ শতাংশ মানুষ কাগজ কুড়ুনি, ঝি চাকর, নির্মাণ শ্রমিক, কুলি, মজুর জাতীয় দিন আনা দিন খাওয়া গোছের কাজের সাথে যুক্ত।[৭৯]

মনে রাখতে হবে উপরের এই ৪২.৬% কর্মী মানুষের মধ্যে মুসলমান নারীর সংখ্যা ১৪%।[৮০] যেটি যেটি পুরুষের সম পরিমাণ শ্রম দানে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণের চিত্রটিকে স্পষ্ট করে তোলে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, এই বাইরেও 'গৃহ শ্রমের' সঙ্গে যুক্ত একটা বিপুল সংখ্যক নারী আছেন। একটু তলিয়ে বিচার করলে আমরা লক্ষ করবো এঁদের শ্রমের উপরেই

নির্মিত হচ্ছে মুসলমান সমাজের বনিয়াদ। পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, অর্থনীতির প্রত্যেকটি উপরিসৌধও পুষ্ট হচ্ছে এই নারী শ্রমের স্বীকৃতিহীন আত্মত্যাগে। স্বীকৃতিহীনতা ও অসহিষ্ণুতার এই পরিবেশকে সামনে পেছনে, উপরে নিচে ধারণ করেই একলাটি পথ চলতে হয় মুসলমান নারীকে। একলা পথ চলার এই আক্ষেপ নিয়েই তাই উত্তরবঙ্গের এক সমাজকর্মী হামিদাকে বলতে হয় –

> ভারতীয় মুসলমানের উভয়সঙ্কট। বাইরে বেরোলে 'জাতীয়তাবাদ' আমাদের গলায় ঝুলিয়ে ঘুরতে হয়। আর সমাজের ভিতরে একই রকম করে 'ইসলাম' গায়ে জড়িয়ে রাখতে হয়। কোনও পক্ষেরই বিন্দুমাত্র সহিষ্ণুতা নেই।[৮১]

জনৈক হামিদার পক্ষে কথাগুলি বলা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সমাজের অবতলে ডুবে থাকা কত লক্ষ কোটি হামিদা এই কথাগুলি উচ্চারণের সাহসই পাননি। সাহস যে পান না, তারও তালিম দেওয়া হয় মুসলমান মেয়েদের শৈশবে। আর প্রশ্নহীন, ধর্মভীরু মুসলমান মেয়ের সেই আদর্শ নির্মাণে এগিয়ে আসে ইসলামি প্রাইমারগুলি। প্রসঙ্গত এখন আমরা ইসলামি প্রাইমারে নারীর সেই ভাষ্য ও তার অবয়ব আবিষ্কারের চেষ্টা করবো।

৪. ইসলামি বাংলা প্রাইমার : নারী ভাষ্যের প্রস্তাবনা

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে অবরোধবাসিনী নারী আবহমানকালের শৃঙ্খল মোচন করে ক্রমে ক্রমে মুক্তির স্বপ্ন দেখছিল - মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা'য় তা স্পষ্ট। আলোকপ্রাপ্তির এই যুগ পরিবেশে হিন্দু নারী আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসারণের ক্ষেত্রে হিসেবে বেছে নিচ্ছিল পত্রপত্রিকাকে – যেখানে তাঁরাও পুরুষদের পাশাপাশি সাহিত্য রচনায় সামিল হচ্ছিলেন। নাটক নভেল থেকে শুরু করে বটতলা সাহিত্য – সমস্ত কিছুকেই এক বিশেষ বর্গের হিন্দু রমণী অধিগত করতে সক্ষম হচ্ছিলেন। আবার প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল উভয় শ্রেণির হিন্দু লেখকদের হাতে এই সময়েই নারীর আদর্শ নির্মিত হচ্ছিল। কিন্তু লক্ষ করবার বিষয় এই সময়ে মুসলিম নারীর কথা বাংলা সাহিত্যে তুলনামূলকভাবে কম উপস্থাপিত হয়েছে। উপেক্ষিতা এই মুসলিম অন্তঃপুর যেটুকু সাহিত্যে উঠে আসে তা খুবই সীমিত – বিশেষত রাজ-অন্তঃপুর; মোঘল হারেম। কিন্তু এই বিরলতার মধ্যেও যেটুকু লক্ষ করা গেল সে'টুকুও লজ্জা ও ঘৃণা ব্যাতীত আর কিছু নয় –

> নিতান্ত পরিতাপ ও ক্ষোভের বিষয়, কতিপয় বঙ্গ সাহিত্যিক বা ঔপন্যাসিক মুসলমান রমণীর চরিত্র চিত্রণে যেরূপ সংকীর্ণতা ও একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিলে লজ্জায় ও ঘৃণায় ম্রিয়মান হইতে হয়। ... তিনি [বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়] দয়া করিয়া তাঁহার উপন্যাসে যে সকল

> মুসলমান রমণীকে স্থান দান করিয়া তাহাদিগকে অমর করিয়াছেন, আমাদিগের দূরদৃষ্ট নিবন্ধন তাহার একটিকেও আমরা আমাদের কুলরমণী রূপে বরণ করিয়া লইতে পারি না। ... তাঁহার অমর লেখনী-প্রসূত বা উদ্ভট কল্পনা-বিজম্ভৃত প্রত্যেক মুসলমান রমণীই বাঙ্গালার আবহাওয়ার গুণে এমনই কিম্ভূতকিমাকার ধারণ করিয়াছে যে, তাহাদিগকে চিনিয়া বাহির করা অতীব দুসাধ্য।[৮২]

'আল-এসলাম' পত্রিকার বৈশাখ ১৩২২ বঙ্গাব্দের প্রথম ভাগ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক আবদুল মালেক চৌধুরীর কণ্ঠে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান রমণীর অবস্থান সম্পর্কে যেমন আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে তেমনই বলা হয়েছে যে, উপন্যাসে দৃশ্যমান মুসলমান রমণীদের সঙ্গে মুসলমান সমাজের বাস্তবিক কোনো সামঞ্জস্য নেই। এর থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান নারীর যে আদর্শ নির্মিত হয়েছে তা মুসলমান সমাজের পরিপন্থী –

> মুসলমান নারীচরিত্র মাধুরী কোথায় লুক্কায়িত আছে, তাহা হিন্দু বঙ্কিমবাবু বুঝিবেন কিরূপে? তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিজের সীমাবদ্ধ ভুয়োদর্শনকে খেয়ালের রঙ্গে রাঙ্গাইয়া "যবন"-বিদ্বেষ-বিষে অভিষিক্ত করিয়াই লিখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অঙ্কিত চিত্রে মুসলমান সমাজের আদর্শ চরিত্র অনুসন্ধান করা পণ্ডশ্রম মাত্র।[৮৩]

মুসলমান সমাজের আদর্শ চরিত্র নির্মাণে হিন্দু লেখককুলের এই ব্যর্থতা বহুক্ষেত্রেই পরিদৃশ্যমান। সমাজতত্ত্ববিদরা মনে করেন এর পেছনে লেখকের সমাজ ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। বঙ্কিমের উপন্যাসেই কেবলমাত্র মুসলমান নারী কলঙ্কিত হয়নি, শিশুপাঠ্য পুস্তকের মধ্যেও মুসলমান শিশুর অনুকূল ও আদর্শস্থানীয় কোনো চরিত্র ছিল না বলে ইসলামি বিদ্বৎসমাজের দাবি। কারণ উনিশ শতকের শেষার্ধে তাঁদের রচনায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের যে ভাব দেখা দিয়েছিল তা কোনোভাবেই অনুমোদন করতে পারেননি মুসলমানেরা। এমনকি যে বিদ্যাসাগর মহাশয় নারী শিক্ষা ও নারী প্রগতির কথা বলে এসেছেন, তাঁর রচনায় প্রতিনিধিস্থানীয় মুসলমান বালক বালিকা তো নেইই, বরং 'কথামালা'র একটি আখ্যানে একজন লোভী, মূর্খ, নির্বোধ বিধবার কথা জানা যায়। যা মুসলমান সমাজকে বেশ আহত করেছিল। 'কথামালা'র গল্প 'বিধবা ও কুক্কুটী'টিতে বিদ্যাসাগর লিখছেন –

> কোনো গ্রামে এক দরিদ্র মুসলমান বিধবা বাস করিত। সে কয়েকটি কুক্কুট কুক্কুটী পুষিয়াছিল। কুক্কুটীরা প্রত্যহ যে ডিম পাড়িত, সে ঐ ডিম লইয়া নিকটস্থ হাটে বিক্রয় করিত। ... সকল কুক্কুটী অপেক্ষা একটি কুক্কুটীকে ঐ দরিদ্র রমণী ভালবাসিত, কারণ ঐ কুক্কুটী প্রত্যহ প্রভাতে একটি করিয়া ডিম পাড়িত। বিধবা এইজন্য উহাকে অনান্য কুক্কুটী অপেক্ষা প্রত্যহ অধিক ধান খাইতে দিত। একদিন বিধবা ভাবিল যদি ঐ সামান্য ধান খাইয়া কুক্কুটী একটি করিয়া ডিম পাড়ে, তাহা হইলে যদি সে প্রত্যহ উহার আহারের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেয়, তাহা হইলে কুক্কুটী নিশ্চিতই প্রত্যহ

> দুইটি করিয়া ডিম পারিবে, আর তাহা হইলে সে সেই ডিম বিক্রয় করিয়া দ্বিগুণ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবে। ভবিষ্যতে অধিক অর্থ উপার্জন করিতে পারিবে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া, বিধবা সেইদিন হইতে সেই প্রিয় কুক্কুটীর আহারের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিল। প্রথম দুই তিন দিন কুক্কুটী পূর্ববৎ ডিম পাড়িল। কিন্তু তাঁহার পর অধিক আহারের ফলে ক্রমে যতই হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিল, ততই দুই একদিন অন্তর ডিম পাড়িতে লাগিল। শেষে কুক্কুটী এতই অধিক হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পড়িল যে, একেবারে ডিম পাড়া বন্ধ করিয়া দিল। তখন বিধবা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, হায়! আমি বুদ্ধি দোষে লোভ করিতে গিয়া সব হারাইলাম।[৮৪]

গল্পের প্রতিপাদ্য অবশ্যই মুসলমান বিধবার নির্বুদ্ধিতা, অনিষ্টকারী লোভ এবং হীনবৃত্তি।

আমরা এই আলোচনায় পূর্বের অধ্যায়ে দেখিয়েছি বিদ্যসাগরের 'বর্ণপরিচয়'এ একটিও মুসলমান চরিত্র নেই, নেই হিন্দুর বাইরে অপর কোনো সমাজ জীবনের কথা। অথচ তাঁর বইয়ের পাঠক শুধু হিন্দু সমাজের মানুষ নন, বৃহত্তর মুসলমান পাঠকও। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানরা তাঁর প্রকল্পিত ভাবনাবৃত্তে শুধু অনুপস্থিতই নয়, কঠোরভাবে অপাংক্তেয়, কোণঠাসা। 'কথামালা'র নির্বোধ, লোভী, মুসলমান বিধবা রমণীটি আজো তাই তাঁর দিকে তর্জনী তুলে জানান দিচ্ছেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁদের নন।

আর এই কারণেই হিন্দুর রচিত সাহিত্যগুলি তথা শিশু-পাঠ্যপুস্তকগুলি সম্পর্কে মুসলমান সমাজে অভিযোগ ঘনীভূত হতে থাকে। প্রচলিত সাহিত্য সম্পর্কে সেই আপত্তির দিকগুলি নির্দেশ করেছেন আনিসুজ্জামান মহাশয় :

> এক, মুসলমানের নিত্যব্যবহার্য আরবি, ফারসি ও হিন্দুস্থানি শব্দ আধুনিক সাহিত্যের ভাষায় স্থান পায়নি; দুই, এই সাহিত্যে মুসলিম জীবনের কোনো পরিচয় নেই; তিন তার চেয়েও শোচনীয় ব্যাপার এই যে, ইতিহাসাশ্রিত যেসব কাব্য-নাটক-উপন্যাসে মুসলমান চরিত্র স্থান পেয়েছে, সেসব রচনায় মুসলমানের শ্রদ্ধেয় বহু ঐতিহাসিক চরিত্র কলঙ্কিত হয়েছে।[৮৫]

বিদ্যাসাগর যে 'বর্ণপরিচয়' রচনা করেছিলেন মুসলমান সমাজে তা ছিল গুরুত্বশূন্য এবং পরিতাপের কারণ। সে সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ মুসলমান চিত্তের তাই সোচ্চার ঘোষণা -

> আমাদের (পড়ুন মুসলমানদের) শিশুগণকে প্রথমেই রাম শ্যাম গোপালের গল্প পড়িতে হয়। সে পড়ে গোপাল বড়ো ভালো ছেলে। কাসেম বা আবদুল্লা কেমন ছেলে সে তাহা পড়িতে পায় না। এখান হইতেই তাহার সর্বনাশের বীজ বপিত হয়। তারপর সে পাঠ্যপুস্তকে রামলক্ষ্মণের কথা, কৃষ্ণার্জুনের কথা, সীতাসাবিত্রীর কথা, বিদ্যাসাগরের কথা, কৃষ্ণকান্তের কথা ইত্যাদি হিন্দু মহাজনদিগের আখ্যান পড়িতে থাকে। স্বভাবতই তাহার ধারণা জন্মিয়া যায় যে, আমরা মুসলমান ছোটো জাতি, আমাদের মধ্যে বড়ো লোক নাই। হিন্দু বালকগণ ঐ সকল পুস্তক পড়িয়া মনে করে আমাদের অপেক্ষা বড়ো কেহ নয়। মুসলমানরা নিতান্ত ছোটো জাতি। তাহাদের মধ্যে ভালো লোক জন্মিতে পারে না।

> ... মক্তবে ও মুসলমান বালিকা বিদ্যালয়েও আমাদের শিশুগণকে হিন্দুর লিখিত পুস্তক পড়িতে হয়, তদপেক্ষা আর কি কলঙ্কের কথা আছে? আমরা কি এতই মুর্খ যে তাহাদের জন্য পুস্তক রচনা করিতে পারি না? ... মূল পাঠ্য ইতিহাসে হিন্দু রাজাদের সম্বন্ধে অগৌরবজনক কথা প্রায় ঢাকিয়া ফেলা হয়। আর মুসলমানদিগের বেলায় ঢাকঢোল বাজাইয়া প্রকাশ করা হয়। গুণের কথা বর একটা উল্লখিত হয় না। ফল দাঁড়ায় এই, ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িয়া ছাত্ররা বুঝিল, মুসলমান নিতান্তই অপদার্থ অবিশ্বাসী এবং নিষ্ঠুর জাতি। পৃথিবীর মধ্যে তাহাদের লোপ হওয়াই প্রয়োজন।[৮৬]

'আল-এসলাম' পত্রিকায় একথা লিখছেন ভাষাবিদ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি সবার নিচে সবার পিছে ও সবহারা মুসলমানকে এবার ঘুরে দাঁড়াতে হলে গড়ে তুলতে হবে বিকল্প বয়ান – প্রয়োজন বিকল্প প্রাইমার থেকে বিকল্প পাঠ্যপুস্তক। রাম, শ্যাম, গোপালের সমান্তরালে কাসেম ও আবদুল্লাদের আখ্যান হয়ে উঠলো জরুরি।

মোহম্মদ ফকিরউদ্দিন সরকার ১৩১৬ বঙ্গাব্দে 'বাসনা' পত্রিকার দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যায় আরো স্পষ্টভাবে পাঠ্য পুস্তকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সমস্যার কথা তুলে ধরলেন। লিখলেন :

> প্রথম বর্ণ পরিচয় কাল হইতেই আমাদের বালকগণ রামের গল্প, শ্যামের কথা, হরির কাহিনি, কৃষ্ণের চরিত্র ইত্যাদি পড়িতে থাকে। যদু-মধু, শিব-ব্রহ্মা, রাম-হরি ইত্যাদি নামের পাঠ আরম্ভ করিতে হয়। কাজেই আমাদের সরলমতি কোমলপ্রকৃতি শিশুগণ বিদ্যালয় পঠিত হিন্দুগণের উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং আমাদের জাতীয় পবিত্র শাস্ত্র ও ইতিহাস উপাদান ধর্মকর্মাদির বিষয় অপরিজ্ঞাত হইয়া থাকে।[৮৭]

অতএব মুসলমানের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের প্রাথমিকশর্ত ও প্রয়োজনীয়তাগুলি হল –

ক. মুসলমানের অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যকে পৃথিবী এবং মানবের মন থেকে লোপ পাওয়া থেকে রক্ষা করা।

খ. ইসলাম ধর্মের গৌরব ও গুণের কথাপ্রকাশ করা

গ. মুসলমানের 'জাতীয় পবিত্র শাস্ত্র ও ইতিহাস উপাদান ধর্মকর্মাদির বিষয়' সম্পর্কে অবগত করা।

উনিশ শতকে বাঙালি হিন্দুর হাতে রচিত বাংলা প্রাইমার সমূহ সম্পূর্ণভাবে মুসলমান চরিত্র বিবর্জিত। তারই প্রত্যুত্তরে মুসলমান সমাজে যে সমস্ত ইসলামি প্রাইমার রচিত হল সেখানে গোপাল-রাখাল-যাদব-মাধবদের আগ্রাসী অবস্থানের বিরুদ্ধে সেখ-পাঠান বালক যথা রহিম-করিম প্রমুখদের আগমন। শুধুমাত্র তাইই নয়, ইসলামি বাংলা প্রাইমারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিনবত্ব

এখানে যে, বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে গেলেও সেখানে কোনো আদর্শ স্ত্রী চরিত্র নেই। কিন্তু ইসলামি বাংলা প্রাইমারের প্রথম প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা' বইতে বালকের পাশাপাশি বালিকারও শিক্ষার কথা ব'লে তাঁর প্রাইমারের সম্ভাব্য পাঠককে চিহ্নিত করছেন। তবে তাঁর সেই প্রাইমার জুড়ে কোনো আদর্শ বালিকার নমুনা আমরা পাইনি। আমাদের আলোচ্য বিশ শতকের শেষ দশক ও একুশ শতকের প্রথম দুটি দশকে যে সমস্ত ইসলামি বাংলা প্রাইমার রচিত হয়েছে সেখানেও আদর্শ বালিকা তথা স্ত্রী চরিত্র বলতে সেরকম কেউ নেই। দু'একটি প্রাইমারে বালক ও বালিকা দুই বর্গের শিশুকে বোঝাতে 'আমরা' ব্যবহৃত হলেও পরক্ষণেই সেখানে পুরুষের কণ্ঠই প্রাধান্য পাচ্ছে। আবার অনেকক্ষেত্রে ইসলামি বাংলা প্রাইমারে স্ত্রীর ভাষ্য বলতে যা পাওয়া যাচ্ছে তা হলো নবীর স্ত্রী কিংবা নবীর কোনো সাহাবীর স্ত্রীর আদর্শ চরিতকথা। এখন প্রশ্ন হল আধুনিক যুগে দাঁড়িয়েও এই সমস্ত প্রাইমারগুলি তবে কি আধুনিক নারীর ভাষ্য রচনায় ব্যর্থ হচ্ছে? অথবা নারীর আদর্শ বলতে ইসলামি সমাজ ও সংস্কৃতি যা বোঝে তা কি কেবলমাত্র সেই দেড় হাজার বছরের পুরনো স্ত্রী-চরিতেই সংরক্ষিত? এই প্রশ্নটিকে সামনে রেখে অনেকেই মনে করেন যে ইসলামি প্রাইমার সেভাবে হয়তো স্ত্রীর আদর্শ নির্মাণে পারঙ্গমতা দেখাতে পারেনি। প্রসঙ্গত আমরা আমাদের এই গবেষণায় নির্বাচিত কয়েকটি প্রাইমারে স্ত্রীর ভাষ্য নির্মাণের চেষ্টা করবো। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রতিপাদ্য –

- নারী-পুরুষ সহাবস্থান : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়
- লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাতিত্ব
- নারীর আধুনিকতা ও পিছুটান
- নারী শিক্ষা ও নারী অধিকার
- সৎ নারীর আদর্শ নির্মাণ ইত্যাদি।

৬. ইসলামি প্রাইমারে নারী ভাষ্য : বিরলতায় দুর্লক্ষ

আমরা জানি সাহিত্যের অঙ্গন বিশেষভাবে পুরুষ শাসিত ও পুরুষাধিপত্যে ভরপুর। উনিশ শতকে রচিত বাংলা প্রাইমারের আঙিনাতেও তাই নারীর উপস্থিতি বিরলতায় দুর্লক্ষ। প্রচলিত প্রাইমারগুলিতে তাদের আসা-যাওয়া এতটাই স্বল্প এবং বিরল যে, তা দেখে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা শিশুসাহিত্যে ছোটোমেয়েরা' গ্রন্থে বলেছেন –

> ভুবনবিখ্যাত সব শিক্ষাবিদ ও শিশু-মনস্তাত্ত্বিকদের মতে, ছেলেবেলার তুলনায় মেয়েবেলার আয়ুষ্কাল বেশ কম; কৃত্রিম যত কৌশলেই বিস্তৃত, প্রলম্বিত হোক না শৈশব-পরিধি, নিদেন্ন মতাদর্শের নিরিখে, নিরভার আমোদের সে ঠাম থেকে প্রবেশের পর-পরই দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয় মেয়েদের; খোকাদের মতো রয়ে-বসে থাকার তেমন ফুরসত নেই খুকিদের। তাৎপর্য : 'শৈশব'-এর গঠনতন্ত্র ছেলেদের বেলায় *স্থান* দ্বারা এবং মেয়েদের বেলায় *কাল* দ্বারা অতি-নিরূপিত; অথচ, 'শৈশব' এর আধুনিক নির্মিতি, মাত্রাগুণে ততটা কালিক নয় যতটা স্থানিক; সুতরাং 'শৈশব' জড়িত আখ্যান – উপাখ্যানে মেয়েদের জায়গা যে সীমিত সংকুচিত হবে, এতে অবাকের কী আছে।[৮৮]

আর এই কারণেই প্রচলিত প্রাইমারেও "মেয়েদের শৈশব-স্থান গঠনটি এত অপূর্ণাঙ্গ, এত নমো নমো হলো যে, তাদের নাম থেকে পদবি চিহ্ন খসা দূরস্থান, প্রাইমারলোক থেকে মুছেই গেল তাদের নাম – হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে এসে, হঠাৎই বিদায় নিলে তারা?"[৮৯] আর এই অসুরক্ষিত, নিরাপত্তাহীন অবস্থানের জন্যই মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর বিখ্যাত প্রাইমার 'শিশুশিক্ষা'য় তাও বা যে 'সামা' ও 'বামা'কে সৃজন করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় কুক্ষণে তাঁদের লিঙ্গান্তর ঘটিয়ে 'রাম' ও 'শ্যাম' - এ রূপান্তর করেছিলেন।[৯০] অবশ্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত ইসলামি প্রাইমারগুলিতে নারীর উপস্থিতি কতটা ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু ইসলামি বাংলা প্রাইমারের প্রথম প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা' বইতে বালকের পাশাপাশি বালিকারও শিক্ষার কথা ব'লে তাঁর প্রাইমারের সম্ভাব্য পাঠককে চিহ্নিত করছেন। তবে সেখানে কোনো আদর্শ স্ত্রীচরিত্র অনুপস্থিত।

আমাদের আলোচ্য বিশ শতকের শেষ দুটি দশক ও একুশ শতকের প্রথম দুটি দশকের মধ্যে রচিত প্রাইমারগুলিতে অবশ্য নারী চরিত্র ও স্ত্রীর ভাষ্য নির্মাণে বেশ কিছুটা সক্রিয়তা দেখিয়েছেন এযুগের ইসলামি প্রাইমার লেখকরা। আমরা নির্বাচিত প্রাইমারের মধ্যে থেকে এই স্ত্রী ভাষ্যের স্বরূপ বোঝবার চেষ্টা করবো।

৬.ক: আমাদের প্রিয় নবী: প্রসঙ্গ নারী ভাষ্য

আমাদের নির্বাচিত আলোচ্য পুস্তকটি প্রাইমারের পরিপূরক একটি ফলো–আপ। এখানে মুসলমান বালকের আদর্শ নির্মাণের বিষয়টি যতটা গুরুত্বের সঙ্গে বিচার্য হয়েছে ততখানি বালিকা বা স্ত্রী চরিত্রের প্রতি গুরুত্ব নেই। বইটির ভূমিকাতেই সে'কথা স্পষ্ট হয়েছে। লেখক জানিয়েছেন –

> প্রিয় নবীর জীবনকথার চাইতে ভালো উপহার কচি – কিশোরদের জন্য আর কি হতে পারে! জীবন গঠনের জন্য প্রিয় নবীর জীবনের চাইতে ভালো আদর্শ আর কি হতে পারে![৯১]

‘কচি – কিশোর’ অর্থাৎ কিশোরী বা বালিকা নয় কিন্তু। ফলে ভূমিকাতেই রয়েছে লিঙ্গ ভিত্তিক পক্ষপাতিত্বের এক সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র। কাজে কাজেই এই বইতে নারী প্রসঙ্গ নেই বললেই চলে। বইটির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নামহীন মুসলমান ‘কিশোর’ ‘বালকের’ উদ্দেশ্যেই যাবতীয় নীতি উপদেশ বর্ষিত হয়েছে। যে দুটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে আমরা নারীর উপস্থিতি লক্ষ করেছি তা হলো –

‘জান্নাত মায়ের পদতলে অবস্থিত।’[৯২]

এরপর স্ত্রীলোকের কাঙ্ক্ষিত পোশাকের চিহ্ন নির্ধারণ করে দিয়ে আলোচ্য ফলো-আপটিতে গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে –

যে সব মেয়ে পুরুষের বেশভূষা পরিধান করে তাদের উপরও খোদার অভিশাপ বর্ষিত হয়।[৯৩]

আরেকটি ক্ষেত্রে নারীর লজ্জাশীলতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

“লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ।”[৯৪]

লক্ষ করবার বিষয় এই পুস্তকেই কিশোরের ‘বড়ো হওয়া’ প্রসঙ্গে নানা পরামর্শ দেওয়া হলেও নারীর ক্বচিৎ দু’চারটি কথা বলেই লেখক দায় মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে অবশ্যই ‘মাতৃত্ব’ নারীর আদর্শ হিসেবে সম্মানিত হয়েছে। বাদবাকি দুটি ক্ষেত্রে নারীকে শাস্ত্রীয় নির্দেশে চালনার প্রবণতা লক্ষণীয়।

৬.খ. সালাফী বর্ণ পরিচয় (প্রথম ভাগ) : প্রসঙ্গ নারী ভাষ্য

অধ্যাপক মাওলানা হাফেয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী রচিত এই প্রাইমারটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে। ২০১৯ এ প্রাইমারটির ত্রয়োদশ প্রকাশ ‘পরিমার্জিত নূতন সংস্করণ’ হিসেবে। ৩২ পৃষ্ঠার এই সালাফী বর্ণ পরিচয় (প্রথম ভাগ) – এ মোট চারটি জায়গা ছাড়া আর কোথাও নারী বা স্ত্রীর কোনো অনুষঙ্গ আসেনি। সেই জায়গা চারটি হল –

ক/১. সুফিয়ার নূপুরটি রূপার গহনা।

ক/২. ভোর হল দোর খোল। খোকা খুকু ওঠোরে। (নজরটান প্রাবন্ধিকের)

ক/৩. হযরত ফাতেমা যাঁতা চালাতেন।

ক/৪. আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা / পড়বি কে রে আয়, / সালাফী ঢঙে বের হয়েছে/ বর্ণ পরিচয়।[৯৫]
(নজরটান প্রাবন্ধিকের)

এই চার জায়গা ছাড়া আর কোথাও কোনো স্ত্রী / নারীর বয়ান নেই। যদিওবা এই চার জায়গাতেই নারীর ভূমিকা সমান নয়। ৪ নং উদাহরণে আমরা লক্ষ করবো ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের পড়ার স্বপ্ন উস্কে দেওয়া হলেও ৩ নং উদাহরণে 'ফাতেমা'র যাঁতা চালানোর আদর্শকেও সামনে আনা হয়েছে। অবশ্যই এর মধ্যে দিয়ে নবীকন্যার কঠোর জীবন যাপন ও সহনশীলতার তালিম দেওয়া হচ্ছে বালিকাদের মগজে।

৬.গ. সালাফী বর্ণ পরিচয় (দ্বিতীয় ভাগ) : প্রসঙ্গ নারী ভাষ্য

'সালাফী বর্ণ পরিচয়' এর প্রথম ভাগের শেষ হয়েছিল দু'জনকেই পড়ালেখার আহ্বান জানিয়ে। কিন্তু এর দ্বিতীয় ভাগের প্রারম্ভেই বানান শিক্ষার তালিম দিতে গিয়ে 'মেয়ে'দেরকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। 'র-ফলা যোগে শব্দ ও বাক্য গঠনে'র শেষ পঙ্‌ক্তি –

খ/১. "ছাত্রদের একমাত্র ব্রত পড়াশোনা।" (পৃ. ৪)

ছাত্রী নেই এখানে আর।

এরপর সমগ্র প্রাইমারটিতে যেভাবে পরোক্ষে নারীর কথা; বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বালিকাদের কথা এসেছে সেগুলি খানিকটা এ'রকম –

খ/২. হযরত ফাতেমা সতী ও সাধ্বী নারী। (পৃ. ৫)

খ/৩. মাতৃস্নেহের তুলনা হয় না। (পৃ. ৬)

খ/৪. একজন পাপী নারী একজন তৃষ্ণার্ত কুকুরের তৃষ্ণা নিবারণ করে স্বর্গের সুসংবাদ পান। (পৃ. ৭)

খ/৫. নবীজীর দুগ্ধামাতার নাম হালিমা। (পৃ. ৮)

খ/৬. লজ্জা নারীর সজ্জা। (এই পৃষ্ঠাতেই অন্য একটি বাক্যে আছে 'মেধাবী ছাত্ররাই বৃত্তি পায়') (পৃ. ১০)

খ/৭. কচিকাঁচা ছেলে মেয়ে আমরা হে নাথ / তোমার সকাশে প্রভু তুলিয়াছি হাত। (পৃ. ১৭)

খ/৮. দেখ আমিনা মায়ের কোলে / দোলে শিশু ইসলাম দোলে। (পৃ. ১৮)

খ/৯. বেগম রোকেয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মহিলা ছিলেন। তাঁর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতারই ফলে বাঙালী মুসলিম নারীদের শিক্ষাদীক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। নারীদের উৎকর্ষ সাধনে তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল খুবই উচ্চ। (পৃ. ১৯)

উপরের নয়টি উদাহরণে প্রত্যক্ষভাবে কোথাও কোনো নারীর ভাষ্য নেই। পরোক্ষে নারীকে বিভিন্ন প্রকরণে চিহ্নিত করা হয়েছে; বিশেষত তাঁদের গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে। যেমন -

হজরত ফতেমা = সতী সাধ্বী নারীর আদর্শ

অতুলনীয় মায়ের আদর্শ = স্নেহপরায়ণতা

পাপী নারীর মুক্তির আদর্শ = পরোপকার / ক্ষুধার্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্তকে জল

প্রকৃত নারীর আদর্শ = লজ্জাশীলতা

শ্রেষ্ঠ মায়ের আদর্শ = মা আমিনা (নবী মহম্মদের মা)

শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী প্রগতিশীল মহীয়সী নারীর আদর্শ = রোকেয়া

আমরা খুব সহজেই অনুমান করতে পারছি প্রাইমারটি এখানে আর শব্দ বর্ণ বাক্য শিখন অনুশীলনেই সীমাবদ্ধ নেই। লেখক তাঁর নিজস্ব দর্শন অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে ধর্ম, কর্ম ও আচার ব্যবহারের তালিম দিয়ে যাচ্ছেন সুকৌশলে।

'সালাফী বর্ণ পরিচয়' এর দ্বিতীয় ভাগের একটি চমৎকার গল্পে আমরা আরেকটি বালিকার আখ্যান আমরা পেয়ে যায় যে গোয়ালিনীর কন্যা হওয়া সত্ত্বেও সততার গুণে রাজরাণীতে গোত্রান্তরিত হয়।

এক বৃদ্ধা গোয়ালিনী তাঁর কন্যাকে নিয়ে থাকতেন। একদা সেই বৃদ্ধা তাঁর কন্যাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন অধিক লাভ করবার জন্য দুধে 'পানি' মেশাতে। কিন্তু মেয়েটি তাঁর সততার উপর ভর করে বলেছিলেন – "তা কি হয় মা? কারণ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের মানা কোনো কিছুতে

ভেজাল দিও না" গোপনে এই কথা শুনেছিলেন রাজ্য টহলরত দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক। অতঃপর ধার্মিক খলিফা মেয়েটির সততায় মুগ্ধ হলেন এবং নিজের পুত্র কাসেমের সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন। 'এভাবে গোয়ালিনীর মেয়ে তার আল্লাহ – ভীতির বদৌলতে রাজরাণীতে পরিণত হল'

উপরের আখ্যানটি রচিত হয়েছে 'সুরা তালাক' এর ভিত্তিতে। এখানে ২ – ৩ নং আয়াতের নীতিবাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে – "যে ব্যাক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে তিনি (সবরকম ঝামেলা থেকে) তার বেরোবার পথ তৈরি করে দেন এবং এমনভাবে রুযী দেন যে, সে ভাবতেও পারে না।"[৯৬]

'সালাফী বর্ণ পরিচয়' (দ্বিতীয় ভাগ) এর শেষ গল্পটি 'হক বিচারের মর্যাদা' – নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বিচার প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই গল্পটিতে রচনাকার নারীকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা সত্যিই ব্যতিক্রমী। গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বাংলার শাসক সুলতান গিয়াসুদ্দিনের ন্যায়পরায়ণতা ও কাজির বিচারের সততা হলেও এখানে আমরা এক অদৃশ্য নারী শক্তির কথা পাই।

সুলতান গিয়াসুদ্দিন একদা তীর চালনা অভ্যাস করছিলেন। হঠাৎ তাঁর হাত ফস্কে একটি তীর একটি ছেলের গায়ে গিয়ে বিঁধল। ছেলেটির বাবা ছিল না; সে ছিল বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। ছেলেটির বিধবা মা কাজীর নিকট সুলতানের বিরুদ্ধে নালিশ জানালো। কাজি সাহেব দ্বিধান্বিত হলেও শেষ পর্যন্ত সৎ বিচারের স্বার্থে সুলতানের নামে সমন জারি করলেন। কাজি সাহেব তাঁর সামনে বিধবার অভিযোগ শোনালেন এবং সুলতান তা নিজকণ্ঠে স্বীকার করলেন। 'অতঃপর সুলতান গিয়াসদ্দীন বহু টাকা পয়সা দিয়ে বিধবার সাথে আপোষে রফা করে ফেললেন।' বিধবা তাঁর অভিযোগ তুলে নিলেন – "হুজুর সুলতান আমাকে খুশি করেছেন তাই তাঁর বিরুদ্ধে মার কোনো অভিযোগ নেই।"[৯৭]

অধিকার বুঝে নেওয়ার প্রখর দাবিতে যে বিধবাকে এই গল্পে পাওয়া গেল তিনি সত্যিই সাহসিকতায়, বীরত্বে ভারতীয় পুরাণের জনার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন। প্রিয় পুত্র প্রবীরের মৃত্যুতে শোক-সন্তপ্ত জনা ক্রোধাগ্নিতে জ্বলে উঠেছিলেন। সন্তানের মৃত্যুর প্রতিবিধান চেয়ে তাই স্বামী নীলধ্বজকে হাজারো কথায় জাগাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই গল্পের মা 'বিধবা'। তাই অধিকার বুঝে নেবার দায়িত্ব ও বিচার চাইবার দায়িত্ব তাঁর একার ঘারেই বর্তায়। তিনি নিজে তাই নির্দ্বিধায় শক্তিমান সুলতানের বিরুদ্ধেই আঙুল তুলেছেন।

প্রাইমার রচয়িতা নিজের অলক্ষ্যেই নারীর এই যে অবয়বটি এখানে নির্মাণ করেন সেখানে তাঁর বৈধব্যের কোনো অসহায়তা বা ভীরুতা আমাদের চোখে পড়ে না। তিনি পর্দা কিংবা হিজাবের আড়ালে অবগুণ্ঠিতা কিনা তাও আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু তিনি যে অবরোধবাসিনী নন, তিনি যে মুক্তিকামী, বিচারকামী এবং প্রতিবাদী সত্তার তর্জনী উঁচিয়ে পুরুষের সামনে আরেকজন পুরুষেরই কৃতকর্মের জন্য বিচার প্রত্যাশী – এই ছবিটি আমাদের মনে আজন্ম লালিত মুসলিম নারীর ছকটিকে ভেঙে ফেলে। নারীর আদর্শকে বহুবিধ প্রাচীন সংস্কারে বেঁধে ফেললেও এই ছবিটিই নারী আদর্শের আধুনিক স্বরূপটিকে মুক্তির পথে নিয়ে যায়। এখানেই প্রত্যাঘাতটা সার্থক হয়ে ওঠে।

৬.ঘ. সালাফী সাহিত্যবিথী: প্রসঙ্গ নারী ভাষ্য

'পশ্চিমবঙ্গের সিনিয়র মাদ্রাসা, বেসরকারি ও প্রাইমারী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত' এই প্রাইমারটিতেও নারীর ভাষ্য বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। ব্যতিক্রম শুধু একটি গল্প। 'আল্লামা ওয়াকেদীর ঈদ' শীর্ষক সেই গল্পে আমরা দেখি ওয়াকেদী কঠোর দারিদ্রেও কীভাবে অবিচল জীবন যাপন করেন। সেই সঙ্গে সেই দারিদ্র্যের পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিয়ে তাঁর 'বিবি' পতিভক্তির প্রমাণ দেন। গল্পটির তাৎপর্য যেন এই, সংসারী নারীর প্রকৃত লক্ষ্য পতিভক্তি, সংসারের যাবতীয় দুঃখে অটল অবিচল থাকা এবং স্বামীর প্রতি বিশ্বাস বজায় রাখা।[৯৮]

৬.ঙ. কচিকাঁচা – ১: প্রসঙ্গ নারী ভাষ্য

মশিয়ার রহমান মোল্লা রচিত 'কচিকাঁচা' (১) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৯ সালে কিন্তু এই প্রাইমারটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০২১ সালে। নতুন সংস্করণে শিশুপাঠ্য পুস্তকটিকে সম্পূর্ণ নতুন বিষয় ভাবনা ও আঙ্গিকে গড়ে তোলা হয়েছে।

ছড়া ও ছবিতে ভরপুর এই বইটিও প্রথানুসারে শুরুই হয়েছে বর্ণ পরিচয়ের মাধ্যমে। যার 'অ' বর্ণে শিশুকে শেখানো হচ্ছে – 'অহী এলো হেরার গুহায়' এবং 'আ' বর্ণের প্রতিপাদ্য – 'আল্লাহ দিল হুকুম ধরায়। ক – "কোরান হল খোদার বাণী' খ – "খোদা সবার মালিক জানি।"[৯৯] শুরু থেকেই আল্লাহ-খোদা ও কোরান এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে জ্ঞান দানের ফাঁকেফোঁকরে এই বইও নারীর আদর্শ নির্মাণের কথা শুনিয়ে যায় তার 'টার্গেট রিডার' বা অভিপ্রেত পাঠককে।

যেমন :

'প' বর্ণের নির্মিত বাক্য হল – 'পর্দা ঢাকে নারীর সতর।'[১০০] 'সতর' শব্দের অর্থ হল – লজ্জা।

অর্থাৎ ইসলামে পর্দাপ্রথার যে অনিবার্য অনুশাসনের কথা বলা হয়েছে শিশু পাঠককে গোঁড়াতেই সে সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া হল।

এ- কার যোগে শব্দ শিক্ষা ও বাক্য গঠন শিক্ষাকালে এই বইতে লেখা হয়েছে –

> "কেতাব পড়ো। সেজদা করো। ফেৎনা হঠাও। ইজতেমাতে হেদায়েত নাও। ... বেলাল একজন সাহাবী। মেয়েদের হেজাব ফরজ।... সবার আগে ঈমান আনে হজরত খাদেজা।"[১০১]

লক্ষ করবার বিষয় এখানে শুরুতেই শিশু পাঠককে বই পড়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তবে তার পাশাপাশি এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, হিজাব মেয়েদের ক্ষেত্রে 'ফরজ' অর্থাৎ আবশ্যিক। আমরা অনুমান করতেই পারি যে, এই প্রাইমারের 'টার্গেট রিডার' নিশ্চয় মুসলমান সমাজের কন্যা শিশুরাও – যাঁদের আগাম তালিম দেওয়া হচ্ছে ইসলামি পর্দাপ্রথা এবং ব্যবহারিক জীবনবিধান সম্পর্কে। এরই পাশাপাশি লক্ষণীয় শেষ বাক্যটি, যেখানে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে 'হযরত খাদিজা'র অবদান স্বীকৃত। এর মধ্যে দিয়ে খাদিজার মতো আদর্শ নারী হয়ে ওঠবার প্রেরণাও কি নেই? আছে বৈকি। আসলে ইসলামি প্রাইমার গোঁড়াতেই তার ধর্মীয় জ্ঞান ও সামাজিক আচার সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে দিতে চায় যাতে করে শৈশবের শিক্ষা ভবিষ্যৎ সমাজের ইমারত গড়ে নিতে পারে সহজে।

'কচিকাঁচা -১' এ 'আমাদের পড়া' দশম পাঠে আছে সেই আশ্চর্যজনক ভাষ্য। এই পাঠে হাসান নামে এক গৃহস্থের দুঃখ দারিদ্রের কথা বর্ণিত হয়েছে সমকালীন প্রেক্ষিতে। সেখানে আমরা দেখি আম্পান ঝড় ও কোভিড সমকালীন অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও কর্মহীনতার ছবি। এরই মধ্যে একটি মেয়ে আমিনার বইখাতার অভাবের কথা। প্রসঙ্গত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই যে, এখানে নারী শিক্ষার আদর্শ নির্মাণের চেষ্টা আছে। সেইসঙ্গে বালিকার শিক্ষা উপকরণের জন্য পিতার দুশ্চিন্তা শিক্ষার প্রতি অনুরাগই ব্যক্ত করে :

> হুগলী নদীতে বান ডেকেছে। মাঠে ধান হাবুডুবু। ... অনেকদিন হল কারখানায় কাজ নেই। তাই হাসানের মাথায় হাত। তার দুঃখের অবধি নেই। বড়ছেলে নজরুলের তিনদিন অসুখ। এক্ষুনি ঔষধ কেনা দরকার। ছোটোমেয়ে আমিনার বইখাতা নেই। হাসানের হাতে এক পয়সাও নেই। বাজারে অনেক দেনা। কাজের খোঁজে সে দৌড়ঝাঁপ করে। কাল থেকে আবার লকডাউন।[১০২]

হাসানের এই দুর্ভোগ মুক্তি সম্ভব হয় সিরাজ হাজী প্রদত্ত যাকাতের অর্থ দ্বারা –

> সেই টাকা পেয়ে হাসান হাটে গেল। ভোলা কবিরাজের দোকান থেকে ওষুধ কিনলো। আমিনাকে কিনে দিল বইখাতা ও একজোড়া সালোয়ার কামিজ। তাই আমিনা খুব খুশি।[১০৩]

উপরের বয়ানটিতে অতিসাম্প্রতিককালের দরিদ্র মানুষের জীবন যাপনের কথাকে চমৎকার ভাবেই ফুটিয়ে তুলেছে ইসলামি বাংলা প্রাইমারটি। কিন্তু লক্ষণীয় এখানে আর সবকিছুকে অতিক্রম করে আমিনার লেখাপড়ার পরিসরটি বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা জানি মুসলমান সমাজ চিরকাল শিক্ষার অভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়েছে - একথা সত্য ও প্রমাণিত। সেই পিছিয়ে পড়া সমাজে স্ত্রীশিক্ষা ছিল আকাশকুসুম স্বপ্ন। কিন্তু আজকের ইসলামি সমাজ সেই দৈনদশা থেকে যে উত্তরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে তার নমুনা পাওয়া যায় উপরের পাঠে আমিনার পড়ালেখার প্রসঙ্গে। তাই যাকাতের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করেও সেই অর্থ হাসান ব্যয় করেছে কন্যার শিক্ষার জন্য। স্ত্রী শিক্ষার মাধ্যমে আদর্শ নারীর নতুন রূপ নির্মাণে আজকের দিনের প্রাইমার কি তবে নতুন দিশা দেখাতে চলেছে? ইসলামি বাংলা প্রাইমারে নারীর ভাষ্য ও নারীর ভুবন নির্মাণের প্রচেষ্টাকে তাই কেবলমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই চলবে না, বরং সমপ্রাণতার সঙ্গে বিচার ও মূল্যায়ন করতে পারলে আমরা তার মধ্যে এক অচেনা অদেখা অজানা জগতের সন্ধান পাবো – যার মধ্যে উত্তরণের বাসনা নিরন্তর সক্রিয়।

৬.চ : ফুলকুঁড়ি সিরিজ: প্রসঙ্গ নারী ভাষ্য

'ফুলকুঁড়ি' সিরিজের একাধিক প্রাইমার বাজারে প্রচলিত। এই 'ফুলকুঁড়ি' সিরিজের প্রাইমারগুলির রচয়িতা হলেন মুহাম্মদ নুরুদ্দীন। যিনি জামাআতে ইসলামি হিন্দের পশ্চিমবঙ্গে শাখার 'আমির-এ-হালকা' বা সভাপতি। এঁর রচিত অনেকগুলি প্রাইমারের মধ্যে 'ফুলকুঁড়ি' সিরিজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেহেতু তিনি জামাআতে ইসলামি হিন্দের সভাপতি তাই তাঁর প্রাইমারগুলির মধ্যে দিয়ে অনেকাংশে পশ্চিমবঙ্গে জামাআতের আদর্শগুলিও প্রচারিত হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। এই সিরিজের প্রাইমারগুলিতে নারীর অবস্থান আলোচনা করা হলো।

৬. চ. ১।। ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ১ : প্রসঙ্গ নারী ভাষ্য

'ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ১' এ নারীর কোনো প্রসঙ্গ নেই বললেই চলে। 'বীর যায় ধীর পায় / চাষী ঐ গীত গায়' এরকম পৌরুষ চিহ্নিত আখ্যান এই পাঠে রচিত হলেও মেয়েদের প্রসঙ্গ এসেছে একেবারে শেষ পৃষ্ঠায়। তাও মাত্র এক বার। যথা –

> ছেলে মেয়ে করে খেলা । মাঠে ঘাটে সারা বেলা।[১০৪]

এইমাত্র। এছাড়া এই বইতে ছবি সব সৈনিক, একটি হাস্যরত বালক এবং টুপি দাড়ি সজ্জিত জাকির নায়েকের উল্লেখ থাকলেও নারীর আদর্শ নির্মাণের কোনো নিদর্শন এখানে নেই।

৬. চ. ২।। ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২ : প্রসঙ্গ নারী ভাষ্য

লেখক একজন হওয়ার দরুণই 'ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা -২' তেও স্ত্রী শিক্ষা ও নারী প্রসঙ্গ খুব বেশি স্থান পায়নি। সমগ্র প্রাইমারটি জুড়ে কেবলমাত্র তিনটি জায়গায় নারীর কোনো কৃত্যালীর উল্লেখ আছে। সেগুলি হলো –

> ক. ঘরে ঘরে কুরআন পড় (পৃ. ৫)
>
> খ. রাঙা ভোরের আগে জাগো। ফজরকালে রহম মাগো (পৃ. ৫)
>
> গ. ঢ – তে ঢেকে শরীর আসছে খুকী (পৃ. ৭)

এই তিনটি নমুনার মধ্যে প্রথম দুটি ক্ষেত্রে পর্দানশীন দুটি বালিকার ছবি সন্নিবেশিত হয়েছে। তাৎপর্য শিশু পাঠক যদি বালিকা হয় তাহলে তাকেও এঁদের মতো পর্দা মেনে নামাজ ও কোরান পাঠে আগ্রহী করে তোলা। আর তৃতীয় ছবিটিতে দেখা যায় বোরখা ও হিজাব পরিহিত একটি যুবতী কন্যা। যার মধ্যে দিয়ে পর্দা মেনে চলার আদেশ দেওয়া হচ্ছে।

এরপর তাৎপর্যপূর্ণভাবে আমরা লক্ষ করবো নারীকে মাতৃত্বের গৌরবে ভূষিত করা হয়েছে এবং 'ম' বর্ণে শিক্ষার্থীকে তালিম দেওয়া হয়েছে – 'মায়ের মতো মেউ যে নাই / তাঁরই সেবা করবো ভাই'[১০৫]

আলোচ্য প্রাইমারটিতে 'কুরআন হাদিসের' জ্ঞানে প্রাজ্ঞ আদর্শ নারী আমিনার আপার কথা উপস্থাপিত হয়েছে 'পড়তে শেখো' অধ্যায়টিতে। সেখানে আমরা লক্ষ করি, আমিনা আপা কোরান হাদিসের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আসছেন। মূল পাঠের ভাষায় –

আজ বিকালে ইজতেমা হবে। বৈঠকখানায় সকলকে যেতে হবে। হাসানপুর থেকে আমিনা আপা আসবেন। সকলকে কুরআন আর হাদীসের কথা শুনাবেন। শুনাবেন রসূল আর তার সাথীদের কথা। আমরা সকলে ইজতেমায় যাই। সাহাবীদের কাহিনী শুনে আমাদের বুক ভরে যায়। ... আমিনা আপা শিশুদের গান শেখান। জীবন গড়ার গান। মানুষ হবার গান। আমরা সবাই গান শিখি আর গান করি।[১০৬]

ইজতেমা অর্থাৎ ধর্মীয় মজলিশ। আমিনা আপা এই পাঠে বেশ সক্রিয় চরিত্র। সমাজ গঠনে ও জাতি গঠনে তাঁর বেশ মেহনত আছে বলেই আমাদের মনে হয়। তাঁর কাজ এখানে অনেকটা কথক ঠাকুরের মতো মনে হয়, আবার কখনো বা মনে হয় নব্বইয়ের দশকে নিরক্ষরদের জন্য স্থাপিত গ্রামীণ শিক্ষা কেন্দ্রগুলির 'দিদি'দের মতো। তবে লক্ষ করবার বিষয় আমিনা আপু যে গান শেখান তা 'জীবন গড়ার ... মানুষ হবার গান' অর্থাৎ তা অকারণ, অহেতুক আনন্দদানের জন্য নয়। বরং তার মধ্যে শৃঙ্খলিত হওয়ার প্রেরণা থাকে, তাই 'জীবন গড়ার ও মানুষ হবার গান'। এই জায়গাটি বেশ চমৎকার, যেখানে নারীর হাতে জীবন গড়া ও মানুষ হওয়ার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। ইসলামি প্রাইমার ও শিক্ষাচিন্তার পরিসরে এই পাঠটি অভিনব এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

৬. চ. ৩।। ফুলকুঁড়ি প্রথম পাঠ : প্রসঙ্গ নারী ভাষ্য

এই প্রাইমারটিরও রচিয়তা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন। এই প্রাইমারটিতে আমরা প্রথম বালিকাদের প্রসঙ্গ পাই দ্বাদশতম পৃষ্ঠায়। যেখানে আমরা দেখি, মিনু আর দিলু একসঙ্গে খেলা করছে। তারা বকুলতলায় চড়ুইভাতি করবে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এখানে স্ত্রী পুরুষের খেলার প্রসঙ্গ এসেছে। এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় এই পাঠে রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ' এর প্রথম ভাগের পঞ্চম পাঠের প্রভাব আছে। যেখানে আমরা দেখি, বুধবার ছুটি, তাই গুপী, উমা, ঊষা কুল বনে গিয়েছে 'চড়িভাতি' করতে।[১০৭]

আলোচ্য প্রাইমারটির দশম পাঠে আমরা লক্ষ করি একজন নামহীনা 'মা' – এর উল্লেখ আছে, যিনি রমজানের সেহেরীর আয়োজনের জন্য ভর-রাতে উঠে শ্রম দান করেন। পাঠের ভাষায়:

ভোর হল।

মোরগ ডাকল।

চারিদিকে কোলাহল।

মা উঠে পড়েন।

সেহেরীর জোগাড় করেন।

কাল যে রোজা।[১০৮]

অবশ্যই এই পাঠে 'মা' - এর মধ্যে দিয়ে ধার্মিক, সংসারী ও কষ্ট সহিষ্ণু নারীর আদর্শ খাড়া করা হয়েছে। মায়ের এই কষ্ট সহিষ্ণু জীবনের পাশেই আছে সন্তানের 'অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়' অভিযানের আখ্যান :

খোকাবাবু ঘোড়া চড়ে বের হয় রোজ,

বোলপুর কোনদিকে চাই তার খোঁজ।[১০৯]

একই পৃষ্ঠায় বিন্যস্ত পাশাপাশি অবস্থিত এই দুই পাঠ থেকে আমাদের সামনে নারী-পুরুষ দায়িত্ব কর্তব্যের ছবিটিও স্পষ্ট হয়। সেইসঙ্গে লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাতিত্ব ও দায়িত্ব বিভাজনের সমাজ রাজনৈতিক ছকটিও স্পষ্ট হয়।

এই প্রাইমারটির সার্থকতা লক্ষ করি চতুর্দশ পাঠে, যেখানে আমরা দেখি মণি বলে একটি ছোটো মেয়ের আখ্যান ধরা আছে। সে কিন্তু কোনো রকম ধর্মীয় পরিচয়ে অঙ্কিত হয়নি। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে –

> মণি ছবি আঁকে। খুব ভালো ভালো ছবি। গাছ পালা, নদী – নালা, ফল – ফুল, আরো কত কি! সে তুলি দিয়ে রং করে। লাল, নীল, সাদা, কালো আরো কত রং। ... মামা বলে মণি কবি হবে। কবিরা নাকি ভালো ভালো ছবি আঁকে।[১১০]

শরিয়তে ছবি আঁকাকে নিষিদ্ধ জ্ঞান করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'বেদাত'। মুসলিম ধর্মের পারিবারিক ও ধর্মীয় ম্যানুয়াল হিসেবে খ্যাত আবদুল হামিদ কাসেমী প্রণীত 'সর্ববৃহৎ হাক্কানী নামাজ ও মাসআলা শিক্ষা' বইটিতে প্রামাণ্য নানা কেতাবের উদ্ধৃতি তুলে দিয়ে শিল্প সম্পর্কে বেশ কড়া ভাষায় বাঙালিকে সমঝে দিয়েছে। চিত্র বা তসবির সম্পর্কে বলা হয়েছে -

> হুযূর (স) বলেছেন যে ঘরে প্রাণী জাতীয় জীবজন্তুর তথা মানুষের চিত্র, ফটো ক্যালেন্ডার বা কুকুর থাকে সে গৃহে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করে না।– বুখারী, মুসলিম।[১১১]

এখনেই শেষ নয়, আরো ভয়ানক ভাবে বলা হচ্ছে চিত্রপ্রেমী মানুষদেরকে -

> যে ব্যক্তি পৃথিবীতে ছবি তৈরি করবে (প্রাণদার জীবজন্তুর) কিয়ামত দিবসে তাকে উহাতে প্রাণসঞ্চার করতে বলা হবে। কিন্তু সে ব্যর্থ হবে।(অতঃপর দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে) – বুখারী।[১১২]

আসলে এক্ষেত্রে 'আদত' বা ইসলামি অলঙ্ঘনীয় নিয়মকে উপেক্ষা করে "বেদাত" (innovation) কে কোনোভাবেই মান্যতা দেবার রেওয়াজ নেই। "বেদাত" হল কোরান নির্দেশিত পথের পরিবর্তন অথবা উক্ত পথে নতুন কিছুর প্রবর্তন। "বেদাত" ইসলাম বিরোধী বলে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।[১১৩] তাই শরিয়ত অনুসারে ছবি আঁকাও নিষিদ্ধ কাজ।

এখন প্রশ্ন হলো মণির শিল্পী এবং কবি হওয়ার মধ্যে দিয়ে কি মুসলমান বালিকার কোন ধরণের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন রচয়িতা? সচেতনভাবে লক্ষ করলে আমরা দেখবো 'মণি' নামটি ইসলামি অর্থ সংযুক্ত হয়। তাই মণির আদর্শ কোনোদিনই মুসলমান মেয়ের আদর্শ হতে পারে না। লেখক খুব সাবধানের সঙ্গে এই পাঠটি রচনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতই শিশুচিত্তের চাহিদাটুকু এখানে অব্যক্ত থাকেনি।

৬. চ. ৪।। ফুলকুঁড়ি দ্বিতীয় : প্রসঙ্গ নারী ভাষ্য

'ফুলকুঁড়ি দ্বিতীয় পাঠ' থেকে মুসলমান মেয়ের প্রকৃত আদর্শ নির্মাণ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় পাঠের 'পাঠ – ২' শুরু হয় পাকসাফ, পর্দানশীন ও নামাজি আমীনার আখ্যান দিয়ে। আমীনা নিজের বয়ানেই তাঁর সারাদিনের কৃত্যালী বর্ণনা করে :

> আমি আমীনা, আমি রোজ ভরে ঘুম থেকে উঠি। মুখ ধুই। ওযু করি। তারপর নামায পড়ে পড়তে বসি। কুরআন পড়ি। বই পড়ি। তারপর হাতের লেখা লিখি।[১১৪]

শুধু পড়াশুনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় আমীনা। সদাচার পালনেও তার জুড়ি মেলা ভার। তাই আমীনা বলে :

> সব কাজ সেরে উঠে পড়ি। মা খেতে দেন। আমি পেট ভরে খাই। কারো সাথে ঝগড়া করি না।[১১৫]

সময় সচেতন আমীনা এতটাই 'সুবোধ' এবং বিদ্যানুরাগী যে, কোনোরকম সময়ের সে অপচয় করে না। খেলাও পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছায়। তাই সে বলে –

বেলা হয়ে এল। এবার ইসকুলে যেতে হবে। আর খেলা নয়। ... আজ মাওলানা সাহেব কুরআন পড়াবেন। আমি মন দিয়ে পড়া শিখি।[১১৬]

লক্ষ করবার বিষয়, আমীনা যেন এখানে বর্ণপরিচয়ের গোপালের বালিকা সংস্করণ। তবে গোপাল পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করতো, আর আমীনা 'ইসকুলে'। কিন্তু এই 'ইস্কুল' কোন ইস্কুল তা স্পষ্ট নয়। কেননা 'ইসকুলে' 'কুরআন' পড়ানো হয় না। আমাদের মনে হয়, লেখক আমীনার মাদ্রাসায় পড়ার কথাই বলতে চেয়েছেন।

'পাঠ – ১৯' এ নূরীনের মধ্যে দিয়ে আরেক প্রস্থ মুসলমান বালিকার ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আলোচ্য পাঠের বিষয় নূরীন খুব ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। সে ক্লাসে প্রথম স্থান পেয়েছে। ক্ষুধায় অস্থির পথিককে নূরীন খাস্তা গজা কিনে দিয়েছে। তাঁর এই মহৎ কাজে খুশি হয়ে মা বলেন – 'মস্ত ভালো কাজ করেছিস। আল্লাহ জান্নাতে স্থান দেবেন। দুস্থ আর অসুস্থ লোকদের সাহায্য না করলে আল্লাহ শাস্তি দেবেন।'[১১৭]

অর্থাৎ আলোচ্য পাঠে নূরীনের মহৎ কাজের পেছনে যে অদৃশ্যে খেলা করে যায় জান্নাত লাভের উদ্দেশ্য। মায়ের কথায় তা স্পষ্ট। ইসলামে মনে করা হয়, আল্লাহকে রাজি খুশি করবার জন্যই প্রত্যেকটি কাজ করতে হবে। নূরীনের কাজের মধ্যে দিয়ে সেই দিকটিকেও যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে যে মুসলমান মেয়েরা এতকাল বাংলা প্রাইমারে 'অস্পৃশ্য' ছিল তাঁরাই যে শিক্ষার হাত ধরে 'ক্লাসে প্রথম' হচ্ছে, সেই আদর্শকে সামনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে এই শ্রেণির প্রাইমারের অবদান অস্বীকার করা যায় না।

৬. ছ।। আমাদের ছড়া - ১ : প্রসঙ্গ নারী ভাষ্য

'আমাদের ছড়া' প্রণীত হয়েছে 'সমস্ত শিশু মাদ্রাসা, নার্সারি ও কে.জি. স্কুলের শিশু শ্রেণীর জন্য।' এই বইটির দুটি ভাগ – ১ ও ২। আমরা কেবলমাত্র প্রথম ভাগটি আলোচনায় রেখেছি। কারণ দ্বিতীয় ভাগে উল্লেখযোগ্য কোনো নারী ভাষ্য আমরা লক্ষ করিনি।

আলোচ্য পুস্তকের দুটি ছড়ায় আমরা প্রত্যক্ষভাবে বালিকা বয়স থেকে নারীর আচরণীয় কর্তব্যের উল্লেখ পাই। প্রথমটিতে চিত্রসহ একটি বালিকার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় –

সাঁঝের বেলা সূর্য ডোবে,

ঘনিয়ে আসে কালো।

মাগরিবেরই পড়বো নামায,

জ্বালবো ঘরে আলো।[১১৮]

এখানে বালিকাবেলা থেকেই ছোটোমেয়েদের সহবত শেখানো হচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা তার প্রথম দায়িত্ব ঘরে আলো জ্বেলে মাগরিবের নামাজ 'আদায় করা।'

দ্বিতীয় ছড়াটিতে 'মেয়েটি' প্রত্যক্ষভাবে আসে না। বরং একটি মেয়েকে তার পিতা উপদেশ দিচ্ছেন, যাতে করে কন্যা 'আল্লাহভীরু' এবং ইমানদার হয়ে ওঠে। আল্লাহর নাম যপ করতে করতে সে যেন তার অন্তর্নিহিত সত্তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলতে পারে। তাই পিতার নীতিবাক্য:

দেহের বাহার নয়রে খুকু,

আল্লাহ দেখে মন।

মনের মাঝে আল্লাহকে তাই

ডাকবি সারাক্ষণ।[১১৯]

এই ছড়াটির সঙ্গে সপর্দা ও সবিনয়ী ভাবমূর্তির একটি মেয়ের ছবি সংযুক্ত হয়েছে।

৬. জ।। এসো পড়তে শিখি : প্রসঙ্গ নারী ভাষ্য

'এসো পড়তে শিখি' দ্বিতীয় ভাগ প্রাইমারটি আদ্যোপান্ত ইসলামি চিন্তায় ভরপুর। কাজে কাজেই এই প্রাইমারটিতেও নারীর নানা বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষত পর্দা ও নারীর পোশাকের উপর ভিত্তি করে দুটি পাঠ এই প্রাইমারটিতে সংকলিত হয়েছে।

'খুকুর পোশাক' শীর্ষক কবিতায় আমরা দেখি একটি ছোট্ট মেয়ে 'খুকু' তার পোশাকের জন্য নানা আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু সে পোশাক নিয়ে বায়না ধরেছে। তাই তার বায়না মেটাতে – ফ্রক, গাউন, ম্যাকসি মিডি, এই সমস্ত নানারকম পোশাক তার সামনে রাখা হয়। কিন্তু কোনোকিছুতেই তার মন বসে না। স্বাভাবিকভাবেই বিদেশ থেকে আরো আরো পোশাকের ডিজাইন এল, ছ'খানা দর্জি ভিরমি খেলো। তা সত্ত্বেও কেউ খুকির পছন্দ মতো পোশাক বানিয়ে দিতে পারলো না।

এমনকি অভিমানী খুকু খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিল। অবশেষে খকুর দাদুভাই যখন 'চিল্লা' অর্থাৎ চল্লিশ দিনের তবলিগি জামাত থেকে ফিরলো, তখন খুকু বললো তার 'ওড়না চাই'।

> চিল্লা থেকে ফিরলো যখন খুকুর দাদুভাই
>
> বললো খুকু এবার থেকে ওড়না আমার চাই।[১২০]

এই হলো খুকুর আসল পোশাক, যার জন্য তার লম্বা বায়না, তা এক নিমেশেই মিটে গেল 'চিল্লা' থেকে দাদুর ফেরার পর। পাঠের নিহিত তাৎপর্য মুসলমান মেয়ের জন্য বিদেশি পোশাক আসাক পরিত্যাজ্য; দরকার হল পর্দা। এখানে ওড়না, আসলে পর্দারই ভিন্ন সংস্করণ।

আলোচ্য প্রাইমারের বিশতম পৃষ্ঠায় শিরোনামহীন একটি গদ্য পাঠে এসেছে পারভীন নামের এক আদর্শ বালিকার আখ্যান। কথকের ভাষায় –

> পারভীন আমার ছোটো ভগ্নি। লেখাপড়ায় সে অধিক যত্নবান। সবসময় পড়াশুনায় মগ্ন থাকে। তার মনে কতো কি প্রশ্ন।[১২১]

এই পর্যন্ত পাঠ করবার পর আমাদের মনে হয়, সে হয়তো এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অপার সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে কৌতূহলী। কিন্তু না, তার প্রশ্নের ধরণই বাতলে দেয় সে কোন ধরণের 'লেখাপড়ায় অধিক যত্নবান।' তার প্রশ্নগুলি হল –

> জান্নাত কেমন, জাহান্নামের আগুন কেমন – এইসব প্রশ্ন তার মনে।[১২২]

পারভীনও পূর্ব পাঠের নূরীনের মতোই। তাই –

> রুগ্ন বিপন্ন মানুষ দেখলে তার অন্তর স্নেহে ভরে যায়। রোগীদের যত্ন করতে পারলে খুব খুশি হয় সে। তার একটা সুন্দর রত্নহার ছিল। একদিন সে রত্নহারটা একজন নিরন্ন এতীম শিশুকে খলে দিতে গেল। ... গরীব শিশুদের সে স্নেহ করত বেশী। ... কারও কান্না দেখলে তারও চোখে পানি আসতো।[১২৩]

অর্থাৎ পারভীন দয়ালু, হৃদয়বান এবং স্বার্থত্যাগী চারিত্র্য গুণে ভরপুর। আর নির্লোভ এবং পর্দা মান্যকারী :

লোভের কোনো চিহ্ন তার মধ্যে ছিল না। ... ঘরকন্নার কাজও সে করতে পারতো বাড়ীর মধ্যেও সে পর্দা মেনে চলতো। এমনকি রান্নাঘরের মধ্যেও তার মাথা থেকে কাপড় সরতো না। ...তার উন্নত চরিত্রের জন্য আম্মা তাকে স্নেহ করতেন।[১২৪]

এরকমই পারভীনের মতো মেয়েরা ঘরে ঘরে তৈরি হলে পিতামাতার ভালোবাসা ও সকলের থেকে বাহবা পাবেন বলেই লেখক যেন ঠারেঠোরে বলতে চান 'সকলেরই পারভীনের মতো হওয়া উচিত।'

৬. ঝ।। শিশুকথা : প্রসঙ্গ নারী ভাষ্য

'শিশুকথা' প্রাইমারটির প্রবেশিকা, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও চতুর্থ এতগুলি ভাগ থাকলেও সেখানে পুরুষের তুলনায় নারীর ভাষ্য নেই বললেই চলে। ব্যতিক্রমী যে দু'চার জায়গায় নারী ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় সেই নমুনাগুলি তুলে ধরা হল –

নমুনা – ১ :

জন্মদাত্রী আম্মাকে ভালোবাসবে। (*শিশুকথা দ্বিতীয় ভাগ,* পৃ. ২১)[১২৫]

নমুনা – ২ :

পর্দা নারীর ভূষণ। আল কুরআনে ছেলেদেরকেও পর্দা করার কথা বলা হয়েছে। ছেলেরা রাস্তায় চলার সময় তাদের দৃষ্টি (নজর) কে সংযত রাখবে। মেয়েরা গাঁয়ের চাদর ঝুলিয়ে নেবে। পর্দা কুনজর থেকে নারীদের রক্ষা করে। (*শিশুকথা দ্বিতীয় ভাগ,* পৃ. ২৭)[১২৬]

নমুনা – ৩ :

লজ্জা নারীর সজ্জা। (*শিশুকথা দ্বিতীয় ভাগ,* পৃ. ৩৩)[১২৭]

নমুনা – ৪ :

পর্দা কর বোরকা পরে

ফরয আমল সবাই করে। (ছড়া ছবিতে একের ভিতর তিন, পৃ. ১১)[১২৮]

এই পর্বের প্রাইমারগুলিতে পর্দা প্রথার বাইরে নারী সমাজের আর কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া গেল না। অর্থাৎ অবরোধবাসিনী পর্দানশীন নারীর আদর্শ নির্মাণই এই প্রাইমারগুলির লক্ষ্য।

৭ : উপপত্তি

উপরিউক্ত নমুনাগুলি যদি আমরা বিচার করি তাহলে লক্ষ করবো মুসলমান নারীর আদর্শ রচনায় পর্দা মেনে চলবার কথা যেভাবে বারবার এসেছে, সেভাবে অন্য কোনো প্রসঙ্গ এতবার আসেনি। আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে বেশ কিছু ক্ষেত্রে মুসলমান নারীর শিক্ষা গ্রহণের কথা বলা উল্লিখিত হয়েছে। এমনকি তারা 'ক্লাসে প্রথম' স্থান অধিকার করে এরকমও আদর্শ নমুনা তৈরি করা হয়েছে। যা যুগের প্রেক্ষিতে প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো সেইসমস্ত 'প্রথম স্থানাধিকারী' মেয়েরা কোথায় চলে গেলেন অর্থাৎ তাদের গন্তব্য শেষ পর্যন্ত কী? লেখক তা স্পষ্ট করেননি। তবে কি তাদের এই ক্লাসে যাওয়ার পরিধি টা মেকি? অথবা খুবই সীমায়িত পরিসরে আবদ্ধ? হতেই পারে। কেননা স্ন্যাপের রিপোর্টে আমরা লক্ষ করেছি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা অপ্রত্যাশিতভাবে স্বল্প। আর তার উপর যারা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে তারা মাধ্যমিক থেকে উচ্চশিক্ষার আঙিনা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। ফলে বিপুল সংখ্যক মানব সম্পদ পর্দার আড়ালেই কেবলমাত্র ভোটদাতা হিসেবে থেকে যান। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তাঁদের কোনো সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায় না। মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে অনেকে গালভরা মন্তব্য করে থাকলেও একথা সত্য যে, এর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ধর্মকে জানা। সেইসঙ্গে অন্য ধর্মের তুলনায় তার শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করা। তাই আমাদের আলোচ্য প্রাইমারের 'মেয়েরা' যথা – নূরীন কিংবা পারভীন তারা তাদের 'ইসকুল' (পড়ুন মাদ্রাসা)-য় যে সমস্ত প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এগিয়ে যায় সমাজ বিকাশের ধারায় সেই সমস্ত প্রশ্নের কোনো মূল্যই নেই। একালের একজন তাত্ত্বিকের স্পষ্ট বক্তব্য : 'এই ধারার শিক্ষায়তনে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি পঠন পাঠনে উৎকর্ষ ও সিদ্ধিলাভের প্রশ্নই ওঠে না।'[১২৯] আমরা সর্বতোভাবেই জেনে গিয়েছি যে নয়া উদারনীতিবাদী অর্থনৈতিক বিশ্বে বাজারের মর্জিতে মানুষের দিন যাপন, জীবিকা, খাওয়া দাওয়া, বাঁচা-মরা, স্বাধীনতা ইত্যাদি টিকে থাকে। তাই যে সমস্ত বিষয় বাজারে কেনা বেচার পণ্য ছিল না কোনোকালে - তাও আজ বেসাতির জন্য ব্যক্তি-পুঁজির বিনিয়োগজাত পণ্যে পরিণত হচ্ছে। জল, মাটি, স্বাস্থ্য এমনকি পরিবেশও আজ বাজারি পণ্যে পরিণত।[১৩০] এই

অবস্থায় বাজার অর্থনীতিকে কোনো রকম তোয়াক্কা না করেই একটি জাতি কেবলমাত্র অন্ধ বিশ্বাসে ভর করে গড়ে তুলছে তার বিকল্প বয়ান। আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলির ছত্রে ছত্রে বেশ কিছু আত্মঘাতী নমুনাও পেশ করা হয়েছে যেখানে পাত্রপাত্রীরা বর্তমান সময়ের অভিঘাতকে অস্বীকার করে উল্টোপথে হেঁটেছেন। আমাদের নির্বাচিত প্রাইমারগুলিতে নারী শিক্ষা ও নারীভাবনাও সম্পূর্ণভাবে কালের দাবি মেনে এগোতে পারেনি। দৃশ্যতই কোনো এক পর্দা এসে যেন মুসলমান নারীকে বর্তমান সমাজ ও সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। গত শতকের দুইয়ের দশকে তুরস্কে কামাল পাশার নেতৃত্বে মুসলিম সমাজে পর্দা বা অবরোধ মুক্তির ডাক উঠেছিল। সেই ডাকে সারা দিয়ে এই অবিভক্ত বাংলায় সুফিয়া কামাল, শামসুন্নাহার মাহমুদ, মাহমুদা সিদ্দিকীসহ অনেকেই বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের একটা প্ল্যাটফর্ম গড়ে দিয়েছিলেন। এঁরা সকলেই পর্দা ছেড়ে শালীন পোশাকে, মার্জিত চলনে বলনে এবং অসভ্যই দৃঢ় চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের জোরে সমাজ ও জাতীয় জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।[১৩১] কিন্তু আজ একশো বছর অতিক্রম করেও আমরা কোন সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ালাম যেখানে পর্দার বাইরে নারীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যাচ্ছে না? পর্দা নাকি ব্যক্তিত্ব, নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কে? এই প্রশ্নে শিশুপাঠ্য প্রাইমার যদি পর্দার দিকেই পাল্লা ভারি করে থাকে তাহলে আগামী দিনে এই সমস্ত শিশুর মস্তিষ্ক প্রসূত সমাজকাঠামো যে অন্ধকারের দিকেই এগিয়ে যাবে সে বিষয়ে বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. ভট্টাচার্য. সুকুমারী, *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১২৪

২. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১২৪

৩. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১২৪

৪. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১২৪

৫. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১২৪

৬. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১২৪

৭. এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. জয়দীপ ঘোষ 'অন্যস্বর' আয়োজিত 'ইতিহাসচেতনা : ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও মৌলবাদ' শীর্ষক আলোচনাসভায় চমৎকার ব্যখ্যা করেছেন। আলোচনাটি ইউটিউবে থেকে প্রাপ্ত। দেখুন. https://youtu.be/MsjY6Uk8Q0?si=nGSSI8IBVzhs_b, সময় : ১৪.০৩ – ১৪.৫২ মিনিট।

৮. খান. ফিরোজ, 'সেল্যুলয়েডের সঙ্গীত ও স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', দেখুন. Mitra Saha. Sutapa (Ed.) *Break the Bias for A Sustainable Tomorrow*, Rohini Nandan, Kolkata, December 2023, pp. 90 – 100

৯. ওয়াদুদ. আমিনা, 'ইসলামে নারী অধিকার আন্দোলন', দেখুন. হাসান. মইনুল (সম্পা.) *ইসলাম ও সমকালীন দুনিয়া,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৩৩ – ১৩৬

১০. গনি. ড. ওসমান, *চরিত্র ও সমাজ গঠনে কোরআন শরীফ চতুর্থ খণ্ড,* পারুল, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৫৮১

১১. ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৫৮১

১২. ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৬২৬

১৩. কাসেমী. আব্দুল হামিদ, *সর্ব-বৃহৎ হাক্কানী নামাজ ও মাসআলা শিক্ষা,* রহমানিয়া লাইব্রেরী, মগরাহাট, ২০১১, পৃ. ২৭৪

১৪. গনি. ড. ওসমান, *চরিত্র ও সমাজ গঠনে কোরআন শরীফ চতুর্থ খণ্ড,* পারুল, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৬২৬

১৫. গনি. ড. ওসমান, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৬২৭

১৬. গনি. ড. ওসমান, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৬২৭

১৭. গনি. ড. ওসমান, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৬২৭

১৮. গনি. ড. ওসমান, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৬২৭

১৯. গনি. ড. ওসমান, 'সুরা বাকার', ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৬২৭

২০. গনি. ড. ওসমান, 'সুরা নিসা', ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৬৯৭

২১. নাহার. মীরাতুন, 'ইসলাম-সম্মত বিবাহ : তত্ত্ব ও প্রয়োগে', *সংখ্যালঘু মানবী আমি,* গাঙচিল, কলকাতা, মার্চ ২০১৭, পৃ. ১২৭

২২. ওয়াদুদ. আমিনা, 'ইসলামে নারী অধিকার আন্দোলন', দেখুন. হাসান. মইনুল (সম্পা.) *ইসলাম ও সমকালীন দুনিয়া,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৩৩ – ১৩৬

২৩. দত্ত. মিলন, *ইসলাম,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ৪৩ – ৪৪

২৪. কাসেমী. আব্দুল হামিদ, *সর্ব-বৃহৎ হাক্কানী নামাজ ও মাসআলা শিক্ষা,* রহমানিয়া লাইব্রেরী, মগরাহাট, ২০১১, পৃ. ২৭৪ – ২৭৭

২৫. কাসেমী. আব্দুল হামিদ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২৬৬

২৬. ভট্টাচার্য. সুকুমারী, *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১২৪

২৭. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৪০৯

২৮. এঙ্গেলস. ফ্রেডরিক, *পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি,* এন. বি. এ, কলকাতা, নভেম্বর ২০১১, পৃ. ৪২ – ৪৪

২৯. চক্রবর্তী. অরিন্দম, 'আমার এ ঘর বহু যতন করে', *দেহ গেহ বন্ধুত্ব ও ছটি শারীরক তর্ক,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৪৬ – ৪৭ এবং

৩০. মুখোপাধ্যায়. ঈশিতা, নারী ও শ্রম, দেখুন. বসু. রাজশ্রী ও চক্রবর্তী. বাসবী (সম্পা.), *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা,* ঊর্বী প্রকাশন, কলকাতা, জুন ২০১২, পৃ. ১২৯ – ১৩৩

৩১. নিযামী. শামসুন্নাহার, *নারী মুক্তি আন্দোলন,* বাংলা ইসলামি প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, মার্চ ২০১৩, পৃ. ৪৮

৩২. নিযামী. শামসুন্নাহার, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৪৮

৩৩. নিযামী. শামসুন্নাহার, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৫০

৩৪. নিযামী. শামসুন্নাহার, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৫০

৩৫. দত্ত. মিলন, 'শরিয়ত', *ইসলাম,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ৫৬

৩৬. দত্ত. মিলন, 'শরিয়ত', ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৬৩

৩৭. গনি. ড. ওসমান, *ইসলামি চিন্তাও চেতনার ক্রমবিকাশ* (দশম খণ্ড), পারুল, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৫৭৩

৩৮. গনি. ড. ওসমান, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৫৭৩

৩৯. কাসেমী. আব্দুল হামিদ, 'কি রূপ স্ত্রী কাম্য', *সর্ব-বৃহৎ হাক্কানী নামাজ ও মাসআলা শিক্ষা,* রহমানিয়া লাইব্রেরী, মগরাহাট, ২০১১, পৃ. ২৫৬

৪০. কাসেমী. আব্দুল হামিদ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২৫৬

৪১. কাসেমী. আব্দুল হামিদ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২৫৬ – ২৫৭

৪২. কাসেমী. আব্দুল হামিদ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২৫৭

৪৩. রহমান, ডাঃ মসিহুর, *ইসলামী আন্দোলনঃ সমস্যা ও প্রতিকারের ভাবনা,* বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৭

৪৪. মৈত্র. শেফালী, *নৈতিকতা ও নারীবাদ : দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা,* নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৩

৪৫. ব্রেখ্‌ট. বের্টোল্ট, 'পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন', অনুবাদ শঙ্খ ঘোষ, দেখুন. *উচ্চ মাধ্যমিক সাহিত্য সংকলন,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৪২

৪৬. দত্ত. মিলন, 'পাকিস্তানও এগোতে পারে, ভারত নিশ্চল', *আনন্দবাজার পত্রিকা,* উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫

৪৭. দত্ত. মিলন, 'পাকিস্তানও এগোতে পারে, ভারত নিশ্চল', ঐ, ঐ, ঐ

৪৮. ঐ, ঐ, ঐ

৪৯. ঐ, ঐ, ঐ

৫০. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, *ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২,* ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১৯

৫১. মোল্লা. মশিয়ার রহমান, *কচিকাঁচা – ১,* পুস্তক ভারতী, হাওড়া, ২০২১ পৃ. ১১

৫২. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, *ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২,* ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮,পৃ. ১০

৫৩. দত্ত. মিলন, 'পাকিস্তানও এগোতে পারে, ভারত নিশ্চল', *আনন্দবাজার পত্রিকা,* উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫

৫৪. দত্ত. মিলন, ঐ, ঐ, ঐ

৫৫. দত্ত. মিলন, ঐ, ঐ, ঐ

৫৬. সুনান, ইবন মাজাহ, *আল হাদিস, কিতাবুল ইল্‌ম,* আশরাফিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৫, পৃ. ২০

৫৭. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২০

৫৮. Muhammad, Kutub, *Islam and Women,* Adhunik Prokashni, Dhaka, 1988, P.22

৫৯. তালিম শব্দের অর্থ এখানে 'বিদ্যা শিক্ষা'

৬০. *ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ঢাকা দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০২, পৃ. ১৬

৬১. ঐ, ঐ , ঐ পৃ. ১৭

৬২. *ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০২, পৃ. ১৭

৬৩. মিয়া, মোঃ ইসমাইল, 'মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) : শিক্ষা বিস্তার', *শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৩০

৬৪. নিযামী. শামসুন্নাহার, 'নারী মুক্তির সঠিক উপায়', দেখুন. *নারী মুক্তি আন্দোলন,* বাংলা ইসলামি প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, মার্চ ২০১৩, পৃ. ৩৮ – ৩৯

৬৫. নিযামী. শামসুন্নাহার, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৯

৬৬. রহমান, ডাঃ মসিহুর, *ইসলামী আন্দোলনঃ সমস্যা ও প্রতিকারের ভাবনা,* বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৩২ – ৩৩

৬৭. নিযামী. শামসুন্নাহার, 'নারী মুক্তির সঠিক উপায়', ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৯

৬৮. কাসেমী. আব্দুল হামিদ, 'কি রূপ স্ত্রী কাম্য', *সর্ব-বৃহৎ হাক্কানী নামাজ ও মাসআলা শিক্ষা,* রহমানিয়া লাইব্রেরী, মগরাহাট, ২০১১, পৃ. ২৫৬

৬৯. কাসেমী. আব্দুল হামিদ, 'কি রূপ স্ত্রী কাম্য', ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২৫৭

৭০. নিযামী. শামসুন্নাহার, 'নারী মুক্তির সঠিক উপায়', ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৯

৭১. দাসী. রাসসুন্দরী, *আমার জীবন,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০১১

৭২. দত্ত. মিলন, 'ছবিটা কিন্তু বদলাচ্ছে, আমরাই খবর রাখিনি, *আনন্দবাজার পত্রিকায়* প্রকাশিত উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ, ২ এপ্রিল ২০১৫

৭৩. চৌধুরী. শুভ্রনীল ও ঘোষ. শাশ্বত, মুসলমানের বাদ দিয়ে উন্নয়ন হবে না, *আনন্দবাজার পত্রিকা,* উত্তর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, ১৭ মার্চ ২০১৬

৭৪. চৌধুরী. শুভ্রনীল ও ঘোষ. শাশ্বত, ঐ, ঐ, ঐ

৭৫. দত্ত. মিলন, 'মুসলমানরা যখন রাজনীতির 'ভোটব্যাঙ্ক'', *মুসলিম জাহান,* কারিগর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৯১

৭৬. ইসলাম. নজরুল, 'সাচার কমিটির প্রতিবেদনের প্রাসঙ্গিকতা', *মুসলমানদের উন্নতির জন্য কী করতে হবে,* ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অগাস্ট ২০১২, পৃ. ২১

প্রাসঙ্গিক ও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন. ইসলাম. নজরুল, ‘গত সাড়ে তিন দশকে বাংলার মুসলমানদের প্রাপ্তি’, ঐ. ঐ. ঐ. পৃ. ২৪ – ৫৩

৭৭. চৌধুরী. শুভ্রনীল ও ঘোষ. শাশ্বত, ঐ, ঐ, ঐ

৭৮. চৌধুরী. শুভ্রনীল ও ঘোষ. শাশ্বত, ঐ, ঐ, ঐ

৭৯. দত্ত. মিলন, ‘ছবিটা কিন্তু বদলাচ্ছে, আমরাই খবর রাখিনি, *আনন্দবাজার পত্রিকায়* প্রকাশিত উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ, ২ এপ্রিল ২০১৫

৮০. চৌধুরী. শুভ্রনীল ও ঘোষ. শাশ্বত, ঐ, ঐ, ঐ

৮১. দত্ত. মিলন, ‘একা যেতে ভয় করে’, *আনন্দবাজার পত্রিকায়* প্রকাশিত উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮

৮২. চৌধুরী, আবদুল মালেক, ‘বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান নারীর স্থান’, দেখুন. সিন্‌হা, রাজ্যেশ্বর (সংকলিত ও সম্পাদিত), *আপন হতে বাহিরে,* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, কলকাতা, মে ২০২০, পৃ. ৯৭ – ৯৮

৮৩. আনিসুজ্জামান, ‘বাঙালি মুসলমান লেখকদের ভাবজগৎ’, *স্বরূপের সন্ধানে,* দে’জ প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৪১৬, পৃ. ৭৪

৮৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র, ‘কথামালা’, *বিদ্যাসাগর রচনাবলী,* সত্যম, কলকাতা, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫২৮ – ২৯

৮৫. ইসলাম, মুস্তাফা নূরউল, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ২৪-২৫

৮৬. শহিদুল্লাহ, মুহম্মদ, ‘আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা’ আল-এসলাম, ২য় বর্ষ, ২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩; দেখুন. দত্ত, মিলন, *মুসলিম জাহান,* কারিগর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১০১

৮৭. সরকার, মোহম্মদ ফকিরউদ্দিন, ‘বাসনা’, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩১৬, দত্ত, মিলন পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১০১-১০২

৮৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *বাংলা শিশুসাহিত্যের ছোটোমেয়েরা,* গাঙচিল, কলকাতা, পৌষ ১৪২৪, পৃ. ৭২

৮৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৯৪

৯০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *আবার শিশুশিক্ষা,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৪৭ – ৫৪

৯১. মাবুদ. আবদুল, *আমাদের প্রিয় নবী,* বাংলা ইসলামি প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ৫

৯২. মাবুদ. আবদুল, ঐ, ঐ, ঐ পৃ. ৪৩

৯৩. মাবুদ. আবদুল, ঐ, ঐ, ঐ পৃ. ৪৬

৯৪. মাবুদ. আবদুল, ঐ, ঐ, ঐ পৃ. ৪৬

৯৫. আলিয়াভী. অধ্যাপক মাওলানা হাফেয শাইখ আইনুল বারী, *সালাফী বর্ণ পরিচয়* (প্রথম ভাগ), সূফিয়া প্রকাশনী, কলকাতা, মে ২০১৯

৯৬. আলিয়াভী. অধ্যাপক মাওলানা হাফেয শাইখ আইনুল বারী, *সালাফী বর্ণ পরিচয়* (দ্বিতীয় ভাগ), সূফিয়া প্রকাশনী, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯ পৃ. ২৩

৯৭. আলিয়াভী. অধ্যাপক মাওলানা হাফেয শাইখ আইনুল বারী, *সালাফী বর্ণ পরিচয়* (দ্বিতীয় ভাগ), ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩১ – ৩২

৯৮. আলিয়াভী. অধ্যাপক মাওলানা হাফেয শাইখ আইনুল বারী, *সালাফী সাহিত্য বীথি (প্রথম ভাগ),* সূফিয়া প্রকাশনী, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ৩৩

৯৯. মোল্লা, মশিয়ার রহমান, *কচিকাঁচা (১),* পুস্তক ভারতী, হাওড়া, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০২১, পৃ. ৩

১০০. মোল্লা, মশিয়ার রহমান, *কচিকাঁচা (১),* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১০

১০১. মোল্লা, মশিয়ার রহমান, *কচিকাঁচা (১),* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২৩

১০২. মোল্লা, মশিয়ার রহমান, *কচিকাঁচা (১),* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৬

১০৩. মোল্লা, মশিয়ার রহমান, *কচিকাঁচা (১),* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৬

১০৪. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, *ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা - ১,* ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৩১

১০৫. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, *ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা - ২,* ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৯

১০৬. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, *ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা - ২,* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৫

১০৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সহজপাঠ* (প্রথমভাগ), ওয়েস্টবেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা, সংশোধিত সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ৩৩ – ৩৪

১০৮. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, *ফুলকুঁড়ি প্রথম পাঠ,* ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২২

১০৯. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, *ফুলকুঁড়ি প্রথম পাঠ,* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২২

১১০. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, *ফুলকুঁড়ি প্রথম পাঠ,* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৩০

১১১. কাসেমী, আব্দুল হামিদ, *সর্ব-বৃহৎ হাক্কানী নামাজ ও মাসআলা শিক্ষা,* রহমানিয়া লাইব্রেরী, মগরাহাট, ২০১১, পৃ. ২৩৮

১১২. কাসেমী, আব্দুল হামিদ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২৩৯

১১৩. 'বেদাত' হবার জন্য সঙ্গীত বা চিত্রকলা, নাট্যাভিনয় বা নৃত্যকলা সম্পর্কে ধর্মবিশ্বাস-আশ্রিত একধরনের আপত্তি দীর্ঘকাল ধরেই প্রচলিত ছিল। বিশ শতকের প্রারম্ভেই (১৯০০ সালে) আমরা দেখতে পাই *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকায় থিয়েটারের সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ায় তার মুসলমান সম্পাদককে নিদারুণ ভর্ৎসনা করছিলেন *ইসলাম প্রচারক* সম্পাদক। ইসলামে সঙ্গীত সিদ্ধ কিনা এই নিয়ে ১৯২০-র দশক জুড়েই *ইসলাম দর্শন, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মহাম্মদী, শিখা* প্রভৃতি পত্রিকায় বাদ-প্রতিবাদ চলেছিল।

১১৪. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, আহমদ. শেখ নাসিরউদ্দীন, *ফুলকুঁড়ি দ্বিতীয় পাঠ,* ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৬

১১৫. নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, আহমদ. শেখ নাসিরউদ্দীন, *ফুলকুঁড়ি দ্বিতীয় পাঠ,* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৬

১১৬. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৬

১১৭. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২৯

১১৮. রহমান. শেখ ফজলুর, *আমাদের ছড়া – ১,* ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৮

১১৯. রহমান. শেখ ফজলুর, আমাদের ছড়া – ১, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২৩

১২০. আলাউদ্দীন. মোহাম্মদ, *এসো পড়তে শিখি,* বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৫, পৃ. ১৬

১২১. আলাউদ্দীন. মোহাম্মদ, *এসো পড়তে শিখি,* ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ২০

১২২. ঐ, ঐ, ঐ

১২৩. ঐ, ঐ, ঐ

১২৪. ঐ, ঐ, ঐ

১২৫. রহমান. জামান মুস্তাফিজুর, *শিশুকথা দ্বিতীয় ভাগ,* আদর্শ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃ. ২১

১২৬. রহমান. জামান মুস্তাফিজুর, *শিশুকথা দ্বিতীয় ভাগ,* ঐ, ঐ, ঐ পৃ. ২৭

১২৭. রহমান. জামান মুস্তাফিজুর, *শিশুকথা দ্বিতীয় ভাগ,* ঐ, ঐ, ঐ পৃ. ৩৩

১২৮. ইসলাম. অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল, *ছড়া ছবিতে একের ভিতর তিন,* নিউ লেখা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃ. ১১

১২৯. বাসার. খাইরুল, 'মাদ্রাসা শিক্ষা : সোনার পাথরবাটি', দেখুন. *পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ,* মৃত্তিকা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৫৭

১৩০. বসু. পার্থিব, 'দেশে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির তিন দশক : উচ্চশিক্ষার হাল', দেখুন. দত্তগুপ্ত. শোভনলাল (সম্পা.), *নয়া উদারনীতিবাদের অভিঘাত ও বর্তমান ভারত,* বহুস্বর, কলকাতা, অক্টোবর ২০২৩, পৃ. ৮২ – ৮৩

১৩১. মোমেন. আবুল, 'পর্দা নাকি ব্যক্তিত্ব, নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে', দেখুন. *বাংলাদেশে আক্রান্ত মুক্তচিন্তা ও মুক্তির চিন্তা,* মৃত্তিকা, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ১৩৭ – ১৪০

উপসংহার

প্রাইমার হলো শিশুপাঠ্য পুস্তক – শিশুর প্রথম বর্ণ শিক্ষার বই। কিন্তু কেবলমাত্র বর্ণ, শব্দ, বাক্য কিংবা ভাষা শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনা প্রাইমারের প্রাথমিক পাঠ। বরং তার পরতে পরতে সাজানো থাকে ভবিষ্যৎ নাগরিক নির্মাণের বহুবিধ আখ্যান। তাই প্রাইমারের অপ্রশস্ত ক্ষেত্র জুড়ে মানা–না-মানা, শালীনতা-অশালীনতা, ঠিক-বেঠিক, ভালো-মন্দ, সত্য-অসত্য, ধর্ম-অধর্ম, উচিত-অনুচিত এর নানাবিধ চিহ্নের সমাহার ঘটান রচয়িতা। লেখকের বিশ্বাস ও জ্ঞান মতে সেই সমস্ত চিহ্ন কচি পাঠকের ফর্সা মগজে গেঁথে যায় অবলীলায়। অতঃপর মগজ গঠনের আদিপর্বে নিংড়ে নেওয়া সেই পাঠ আজীবন চিন্তা চেতনায় বহন করেন পাঠক। তাই আর পাঁচটা বই পুস্তকের থেকে প্রাইমারের স্থায়িত্ব সুদূরপ্রসারী।

উনিশ ও বিশ শতক হয়ে আজকের দিনের যে হিন্দু বাঙালির মন, তা অনেকাকংশে নির্মিত ও সৃজিত হয়েছে এই বাংলার মূলধারার প্রাইমারকে আশ্রয় করে। *শিশুশিক্ষা, বর্ণপরিচয়, হাসিখুশি, সহজপাঠ, নিজে পড়ো, কিশলয়, আমার বই* কিংবা *পাতাবাহার* দীর্ঘকাল ধরে এই বাংলার শিশুপাঠকের মন ও মস্তিষ্ক নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। ফলে মূলধারার এই সমস্ত প্রাইমারগুলির সৌজন্যে বাঙালি হিন্দু নিজেকে, নিজের প্রতিবেশকে বারবার আবিষ্কার করেছে বটে তবে এই সমস্ত প্রাইমারগুলি বাঙালি হিন্দুকে কঠোরভাবে 'হিন্দু' বানিয়ে ফেলবার কোনো গোপন ইচ্ছা বহন করেনি। যদিও মূলধারার এই সমস্ত প্রাইমারের অধিকাংশ পাত্রপাত্রী ও তাদের প্রতিবেশ সংখ্যাগুরু হিন্দুর জীবন ও সংস্কৃতির নিরিখে রচিত তবুও বলা যায় যে, ধর্মীয় পরচিতিকে গুরুত্ব না দিয়ে, কখনো বা সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ উপায়ে এই সমস্ত প্রাইমারে পাঠ্য বিষয়কে সকলের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। *কিশলয়, আমার বই, পাতাবাহার* এই প্রাইমারগুলি সচেতনভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার পাঠকে সামনে রেখে রচিত। আমাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে আমরা লক্ষ করেছি এই সমস্ত প্রাইমারে শুধুমাত্র হিন্দু – মুসলমান এই দুই নিকটতম প্রতিবেশী চরিত্রই উঠে আসেনি, বরং আদিবাসী থেকে শুরু করে খ্রিষ্টান পর্যন্ত প্রত্যেক ধর্ম সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছেন; যা একটি সমবায়ী ও সমন্বয়ী বাঙালি সমাজ কল্পনার রূপরেখা রচনা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় উনিশ শতকের শেষার্ধে সেই যে বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য কল্পনায় পৃথক প্রাইমারের ধারা সৃষ্টি হয়েছিল তা আজো সমানভাবে বহমান।

যে কোনো স্বতন্ত্র্য ও অভিনব শিল্পকর্মকে আমরা সর্বদাই স্বাগত জানাই। উনিশ শতকের প্রচলিত প্রাইমার সমূহে মুসলমান জীবন ও সংস্কৃতির শূন্যতা পরিমাপ করে তার প্রতিস্পর্ধী

মুসলমানের জন্য যে পৃথক প্রাইমার রচিত হয়েছিল তা আরেকটি অদেখা, অজানা, অচেনা জগতকে আমাদের সামনে এনেছে। মূলধারার প্রাইমারগুলির বিপরীতে গড়ে উঠেছে আরেকটি বিকল্প বয়ান। বাঙালির সাংস্কৃতিক আর্কাইভকে তা খানিকটা সমৃদ্ধ করেছে বলেই আমাদের মনে হয়। কিন্তু বিশ শতকের আটের দশকে যখন কিশলয় এর মতো প্রাইমার সরকারিভাবে বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্য হলো, যা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে মান্যতা দিয়ে রচিত এবং যা অখণ্ড বাঙালি সংস্কৃতির ধারক; সেখানেও কীভাবে এই সময় পর্বে মুসলমানের জন্য পৃথক প্রাইমারের পরিকল্পনা সম্ভব হয়? আমাদের মনে রাখতে হবে কিশলয়ের পর আজ অবধি যত বিদ্যালয় পাঠ্য বাংলা প্রাইমার রচিত হয়েছে তার সবগুলিই চরিত্রগত দিক ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমবায়ী চিন্তার পরিপোষক। কিন্তু আটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য এমনভাবে পালে হাওয়া পেল যে, আন্তর্জাতিকস্তর পর্যন্ত ইসলামি উপকরণ ও উপাদানের সমন্বয়ে পাঠ্যপুস্তক নির্মাণের হিড়িক লেগে গেল। যার ফলস্বরূপ ইসলামি প্রাইমার রচনা ও তার পাঠ্যবিষয় পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেল। আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা তার সবিস্তার আলোচনা করেছি। এখন বিষয় হলো একই দেশকালে কেবলমাত্র ধর্মকে কেন্দ্রে রেখে যদি একটি পৃথক ধর্মীয় সাংস্কৃতিক পাঠ ক্রমবর্ধিত হতে থাকে তাহলে একটি জাতির [এখানে বাঙালি জাতির] অখণ্ডতা কতদূর সুরক্ষিত ও সুনিশ্চিত থাকে?

আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলি নিশ্চিতভাবে একটি বিকল্প বয়ানকে আমাদের সামনে হাজির করেছে। তার ভেতর দিয়ে আমরা মুসলমান বাঙালির জীবন, সংস্কৃতি, ধর্ম, কর্ম, লোকাচার ও প্রাত্যহিকের নানা হদিশ পাই। কিন্ত প্রাইমারগুলির কুণ্ঠাহীন ঘোষণায় বাঙালি জাতিসত্তা ধর্মের নিরিখে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রাইমারগুলির আদি ও অকৃত্রিম লক্ষ্য হলো 'সাচ্চা' মুসলমান বানানো এবং 'সত্য ধর্ম' ইসলামের প্রতিষ্ঠা দেওয়া। প্রাইমারগুলির পরিপূরক গ্রন্থ সমূহে শিক্ষাব্যবস্থার খোলনলচে বদলে ফেলে ইসলামিক শিক্ষা ও ইসলামিক রাষ্ট্রেরও ভয়ানক ইঙ্গিত আছে। 'শরিয়ত ছাড়া পথ নাই' অথবা 'শরিয়তের বিধান মেনো / সিভিল কোডে পতন জেনো' এই ধরণের আপ্তবাক্যে যেন সেই ইঙ্গিতই আভাসিত হচ্ছে।

একুশ শতকীয় মানব সভ্যতা যেখানে বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে গতিশীল সেখানে চূড়ান্ত সত্য অথবা চূড়ান্ত জ্ঞান বলে কিছু নেই। প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিষ্ঠিত সত্য কোনো না কোনোভাবে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে সেখানে বহু প্রাচীন শাস্ত্রীয় বাণী ও বচন অবিকৃত রেখে প্রাইমারগুলির মধ্যে দিয়ে শিশু পাঠকের মগজে গুঁজে দেবার চেষ্টা আছে। উদ্দেশ্য ইসলামি তরিকায় মানব

সমাজ গঠন। ফলে প্রাইমারে বর্ণিত তরিকানুসারী আদর্শ বালক হাসতে জানে না, ভুল করতে জানে না, ইসলামি প্রাইমারে ধর্মনিষ্ঠ, আবেগহীন, দায়িত্ব পরায়ণ শিশুপাঠক শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ মান্য করতে করতে অল্প বয়সেই হয়ে পড়ে হাসি-আনন্দহীন জড়বস্তু। তাই তার কাছে গল্প, আড্ডা, আনন্দময় পরিবেশ অসহ্য মনে হয়। সে বলে – 'আমি ছোট্ট শিশু। খাঁটি মুসলিম হওয়াই আমার উদ্দেশ্য। তাই আমি ঠাট্টা ভালোবাসি না। অট্টহাসি হাসি না। আড্ডা দিয়ে সময় অপচয় করি না। সদা সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে মত্ত থাকি। পিতামাতা ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা করি। সুন্দর কিছু দেখলে আলহামদুলিল্লাহ্ পড়ি। ভালো কাজে বিলম্ব করি না। দম্ভ প্রকাশ করে নিজের পরকালকে পণ্ড করতে চাই না।' (*শিশুকথা*, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৩৭)

ধর্ম ও শাস্ত্রের শৃঙ্খলিত জগতের মধ্যেই এই বালকের চলাফেরা। তাই হাসি-আড্ডা এহ বাহ্য, সময়ের জ্ঞানও তার প্রবল। শিশুসুলভ কোনো সারল্য তাকে কব্জা করতে পারেনি, তাই পরকালপ্রেমিক এই বালকের ইহজাগতিক যাবতীয় কর্ম পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় জান্নাত প্রাপ্তিকে সামনে রেখেই। আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে এই বালকেরাই মুসলমান শিশুর আদর্শ বলে পরিগণিত হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে মুসলমান নারীর যে স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে তা পর্দার অন্তরালে লুক্কায়িত অবরোধবাসিনী নারীর আখ্যান। লক্ষ করবার বিষয় প্রাইমারে দেখা যায় যে, তাঁরা 'স্কুলে' [পড়ুন মাদ্রাসা] যাচ্ছে, কেউবা ক্লাসে প্রথম হচ্ছে কিন্তু তারপর তাদের আর কোন ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে পারছেন না প্রাইমার রচয়িতারা। অতঃপর লেখাপড়ায় প্রথম হওয়া পারভীনার মনের মধ্যে ঘুরপাক খায় এইসব অলৌকিক প্রশ্ন - 'জান্নাত কেমন, জাহান্নামের আগুন কেমন?' অর্থাৎ পড়ালেখার পরিবেশটুকু সরবরাহ করেও প্রাইমারে বর্ণিত মুসলমান নারীদেরকে আধুনিকতার আলোকে আলোকিত করা সম্ভব হয়নি। প্রাইমার রচিতাদের এই মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই হয়তো মুসলমান সমাজের প্রত্যাশা ও শাস্ত্র নির্ভরতার স্বরূপটি লুকিয়ে আছে।

আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে বাঙালি মুসলমানের যে আত্ম নির্মিত হয়েছে তা খাঁটি মুসলমানি আত্ম নয়। আমরা তাকে চিহ্নিত করেছি 'হাইফেনেটেড সেল্ফ' বা 'দোআঁশলা আত্ম' বলে। প্রচলিত প্রাইমারসমূহে হিন্দুর আত্ম যত বেশি খাঁটি, নির্ভেজাল এবং একক; ইসলামি প্রাইমারে মুসলমানের 'আত্ম' ঠিক ততখানি নির্ভেজাল নয়। বরং অনেকবেশি অনুসারী এবং অনুকারী। বহুক্ষেত্রে জোড়-বাঁধা। এক্ষেত্রে এই 'হাইফেনেটেড সেলফ' ঐতিহাসিকভাবেই স্বীকৃত এবং কাঙ্ক্ষিত। কেননা জাতিগত, সংস্কৃতিগত সংমিশ্রণের জন্যই এদেশে ইসলামি 'আত্ম' পৃথক ও

স্বতন্ত্র কোনো আত্ম নির্মাণ করতে পারেনি। বরং ইতিহাসের সূত্র ধরেই তাঁরা হয়ে উঠেছে পূর্বের অনুসারী ও অনুকারী। আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে আমারা বহুক্ষেত্রে লক্ষ করেছি যে, আরবি-তুরকি-ইরানিদের অনুকরণে আত্ম নির্মাণের প্রচেষ্টা হয়েছে এবং তাঁদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু সেদেশের আদর্শ সর্বদা এদেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। বরং ইসলামি প্রাইমারগুলিতে মুসলমান বালক-বালিকার আদর্শ হিসেবে যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা হলেন প্রচলিত বাংলা প্রাইমারে বর্ণিত চরিত্রগুলির নবতর ইসলামি সংস্করণ। অর্থাৎ একই অবয়ব তাঁদের; কেবল বদলে গেছে পোশাক, ধর্মীয় কৃত্যালি আর মুখে বসেছে আরবি ফার্সি বা উর্দু কিছু শব্দ। যেমন আমরা বর্ণপরিচয়ের গোপালের অনুরূপ পেয়েছি রমজান গাজী কিংবা রফিকের মতো সুবোধ পড়ুয়া বালককে। আবার 'সহজপাঠ' এর আদ্যনাথ বাবুর মত দানধ্যানী মানুষের মতো পেয়েছি 'ফুলকুঁড়ি দ্বিতীয় পাঠ' এর রহমান সাহেবকে কিংবা বর্ষাতি পরা কর্তাবাবুর সাদৃশ্যে পেয়েছি কর্তাবাবু জামাল মীর্জাকে। লক্ষণীয় বিষয়, বদলেছে কেবল ধর্ম আর কদাচিৎ পোশাকটা; কর্ম ও আদর্শে তাঁরা পূর্বসূরিদেরই অনুরূপ। তাই ইসলামি প্রাইমারে মুসলমানি 'আত্ম', অনুসারী এবং অনুকারী 'আত্ম' বলেই আমাদের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে।

আলোচ্য গবেষণায় ইসলামি প্রাইমারগুলিকে ধর্ম, নীতিশিক্ষা, আত্ম-অপর সম্পর্ক ও নারী শিক্ষা ও নারী ভাবনার নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মূলধারার প্রাইমারের সঙ্গে এই শ্রেণির প্রাইমারগুলির মৌলিক হেরফের বিচার করা হয়েছে। সেইসঙ্গে দেখতে চাওয়া হয়েছে এই শ্রেণির প্রাইমারগুলির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যকে। আলোচ্য গবেষণায় আমাদের পর্যবেক্ষণে বারবার উঠে এসেছে ধর্মকেন্দ্রিকতাই যেখানে এই শ্রেণির প্রাইমারগুলির মূল উপজীব্য সেখানে সামজিক প্রগতিশীলতা ও বিজ্ঞানচিন্তার সঙ্গে এই প্রাইমারগুলি বহুক্ষেত্রে আপোষ করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বহুক্ষেত্রে অনাথ দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে, তাদের অসামাজিক হয়ে ওঠাকে বাধা দিয়ে নতুনভাবে গড়ে তুলেছে ঠিকই কিন্তু তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া পৃথক প্রাইমার বহুক্ষেত্রে তাদেরকে সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে বলেই আমাদের মনে হয়। সাম্প্রতিককালে বহু ইসলামি মিশন স্কুলেও এই সমস্ত প্রাইমার পাঠ্য। কিন্তু শৈশবের এই পাঠ শিশু পাঠকের মন ও মস্তিস্কে যে প্রভাব ফেলবে তাতে করে মূলধারার বিদ্যালয় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের সঙ্গেও তাদের এক দুস্তর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক (Epistemological) ব্যবধান তৈরি হবে বলেই আমাদের মনে হয়। সেক্ষেত্রে এই সমস্ত প্রাইমারের ধর্মীয় আখ্যানের জায়গাগুলি পুনর্বিবেচনা করে তাকে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের (Cultural Pluralism) অঙ্গনে এনে বিজ্ঞানসম্মত যুগোপযোগী পাঠ্যবস্তু বিন্যস্ত করলে তা যেমন

শিক্ষার্থীর জ্ঞানতৃষ্ণাকে নিবারণ করবে, তেমনই সামাজিক প্রগতিশীলতার ধারাটিকেও বজায় রাখবে বলে আমাদের মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ

- 'আমার বই' (প্রথম শ্রেণি), পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ মার্চ ২০১৭।
- 'আমার বই' (দ্বিতীয় শ্রেণি), পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ মার্চ ২০১৭।
- আযম. অধ্যাপক গোলাম, 'কিশোর মনে ভাবনা জাগে', বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, এপ্রিল ২০২১।
- আলাউদ্দীন. মোহাম্মদ, 'এসো পড়তে শিখি', বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৫।
- আলাউদ্দীন. মোহাম্মদ, 'পরিবেশ পরিচিতি', বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০০৭।
- আলিয়াভী. অধ্যাপক মাওলানা হাফেজ শাইখ আইনুল বারী, 'সালাফী বর্ণ পরিচয়' (প্রথম ভাগ), সূফিয়া প্রকাশনী, কলকাতা, পরিবর্জিত নতুন সংস্করণ, মে ২০১৯।
- আলিয়াভী. অধ্যাপক মাওলানা হাফেজ শাইখ আইনুল বারী, 'সালাফী বর্ণ পরিচয়' (দ্বিতীয় ভাগ), সূফিয়া প্রকাশনী, কলকাতা, পরিবর্জিত নতুন সংস্করণ, মে ২০১৯।
- আলিয়াভী. অধ্যাপক মাওলানা হাফেয শাইখ আইনুল বারী, 'সালাফী সাহিত্য বীথি' (প্রথম ভাগ), সূফিয়া প্রকাশনী, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৯।
- ইসলাম. অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল, 'ছড়া ছবিতে একের ভিতর তিন', নিউ লেখা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।
- ইসলাম. অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল, 'ইসলামি সাহিত্য পাঠ' (তৃতীয় শ্রেণি), লেখা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।
- ইসলাম. অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল, 'ইসলামি সাহিত্য পাঠ' (পঞ্চম শ্রেণি), লেখা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।
- 'ইসলামী বর্ণপরিচয়', নাজ বুক ডিপো, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।
- 'এসো পড়তে শিখি' (দ্বিতীয় ভাগ), বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০০৫।

- ওয়াদালি. মুহাম্মদ ইয়াসিন, 'ছোটদের ইসলামী গল্প', আদি মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, জুলাই ২০১৯।
- 'কিশলয়' (প্রথম শ্রেণি), পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, নব পর্যায় সংস্করণ, ১৯৯৯ এর পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৩।
- 'কিশলয়', (প্রথম শ্রেণি), পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৯।
- 'কিশলয়' (দ্বিতীয় ভাগ), পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, নবপর্যায় প্রথম সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, ২০০৫।
- কেফায়াতুল্লাহ. হযরত মুফতী মোঃ, 'তালীমুল ইসলাম - ১', আহমদ পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ১৯৯২।
- কেফায়াতুল্লাহ. হযরত মুফতী মোঃ, 'তালীমুল ইসলাম - ২', আহমদ পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ১৯৯২।
- কেফায়াতুল্লাহ. হযরত মুফতী মোঃ, 'তালীমুল ইসলাম - ৩', আহমদ পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ১৯৯২।
- কেফায়াতুল্লাহ. হযরত মুফতী মোঃ, 'তালীমুল ইসলাম - ৪', আহমদ পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ১৯৯২।
- 'ছড়া ও রাইম্‌স্', ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭।
- ছোটদের দুআ্যা, বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯।
- ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলি', জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮।
- ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, 'সহজপাঠ' (প্রথমভাগ), ওয়েস্টবেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা, সংশোধিত সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৪।
- ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, 'সহজপাঠ' (দ্বিতীয়ভাগ), ওয়েস্টবেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা, সংশোধিত সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৪।
- তর্কালঙ্কার. মদনমোহন, 'শিশুশিক্ষা', (সম্পা. খাস্তগীর. আশিস), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯।
- নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, 'আমাদের ছড়া – ২', ছাত্রবন্ধু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০১।

- নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, 'ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ১', ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮।
- নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, সেখ. নাসিরুদ্দীন আহমদ, 'ফুলকুঁড়ি প্রবেশিকা – ২', ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮।
- নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, 'ফুলকুঁড়ি' (প্রথম পাঠ), ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬।
- নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, সেখ. নাসিরুদ্দীন আহমদ, 'ফুলকুঁড়ি' (দ্বিতীয় পাঠ), ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২।
- নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, 'ফুলকুঁড়ি' (তৃতীয় পাঠ), ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২১।
- নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, 'ফুলকুঁড়ি' (চতুর্থ পাঠ), ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮।
- নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, 'ছোটদের ইসলাম শিক্ষা' (১), ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২১।
- নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, 'ছোটদের ইসলাম শিক্ষা' (২), ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২১।
- নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, 'ছোটদের ইসলাম শিক্ষা' (৩), ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮।
- নুরুদ্দীন. মুহাম্মদ, ছোটদের ইসলাম শিক্ষা (৪), ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮।
- 'ফুলকুঁড়িদের অ আ ক খ', ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।
- বিদ্যাসাগর. শ্রীঈশ্বরচন্দ্র, 'বর্ণপরিচয়' *(প্রথম ভাগ),* দ্বিষষ্টিতম সংস্করণ, সংস্কৃত প্রেস, কলকাতা, ১৮৭৬।
- বিশ্বাস. মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন, 'ছোটদের মজার মজার ইসলামি গল্প', আদি মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, জুলাই ২০১৯।
- মাবুদ. আবদুল, 'আমাদের প্রিয় নবী', বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাষ্ট, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০।
- মাবুদ. আবদুল, 'এসো জীবন গড়ি', বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, জুলাই ২০২১।
- মোল্লা. নিযাম উদ্দীন, 'ছোটদের দুআ', বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাষ্ট, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯।

- মোল্লা. মশিয়ার রহমান, 'কচিকাঁচা (১)', পুস্তক ভারতী, হাওড়া, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২১।
- মোঃ কেফায়াতুল্লাহ. হযরত মুফতী, 'তা'লীমূল ইসলাম', *(প্রথম ভাগ)*, আহমদ পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ১৯৯২।
- রহমান. জামান মুস্তাফিজুর, 'শিশুকথা প্রথম ভাগ', আদর্শ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।
- রহমান, জামান মুস্তাফিজুর, 'শিশুকথা' (দ্বিতীয় ভাগ), আদর্শ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।
- রহমান. জামান মুস্তাফিজুর, 'শিশুকথা তৃতীয় ভাগ', আদর্শ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।
- রহমান. শেখ ফজলুর, 'আমাদের ছড়া – ১', ছাত্রবন্ধু প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭,
- রাও, সুখলতা, 'নিজে পড়ো', শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭৯।
- সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, 'হাসিখুসি' (প্রথম ভাগ), শৈবা গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশকাল অনূক্ত।
- সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, 'হাসিখুসি' (দ্বিতীয় ভাগ), সিটি বুক সোসাইটি, ৩২ শ সংস্করণ, কলকাতা, প্রকাশকাল অনূক্ত।
- হাদিউজ্জামান. মোহাম্মদ, 'শিশুকথা' (চতুর্থ ভাগ), আদর্শ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।
- হোসেন. আফযাল ও মাবুদ. আবদুল, 'ইসলাম শিক্ষা', বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০২০।
- হোসেন. মীর মশাররফ, 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা', *মশাররফ রচনা সম্ভার*, পঞ্চম খণ্ড, 'প্রথম ভাগ, প্রথম অংশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮৫।

সহায়ক গ্রন্থ

- আচার্য. অনিল (সম্পা.), সত্তর দশক (প্রথম খণ্ড), অনুষ্টুপ, কলকাতা, জুন ২০১৪।
- আচার্য. অনিল (সম্পা.), সত্তর দশক (দ্বিতীয় খণ্ড), অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রকাশসাল অনুল্লিখিত।
- আচার্য. পরমেশ, 'বাংলার দেশজ শিক্ষার ধারা', অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০০৯।

- আচার্য. পরমেশ, 'বাঙালি প্রবুদ্ধ সমাজের সীমা ও বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য প্রবন্ধ', অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫।
- আচার্য. পরমেশ, 'বাঙালির শিক্ষাচিন্তা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮।
- আজরফ. দেওয়ান মোহাম্মদ, 'নির্বাচিত প্রবন্ধ', গাউছিয়া প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৪।
- আনন্দসঙ্গী – ১ : প্রবন্ধ : আনন্দবাজার পত্রিকা সংকলন ১৩২৮ – ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১।
- আনিসুজ্জামান, 'বাঙালি ও বাংলাদেশ', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪২৪।
- আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৮৩১ – ১৯৩০)', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯।
- আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯।
- আনিসুজ্জামান. 'স্বরূপের সন্ধানে', দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৯।
- আযম. অধ্যাপক গোলাম, 'দ্বীন ইসলামের শিক্ষাদানে বুনিয়াদী গলদ', বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, এপ্রিল ২০২১।
- আযম. অধ্যাপক গোলাম, 'শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামী রূপরেখা', বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১।
- আলাওল. সৈয়দ, 'তোহফা', আহমদ শরীফ (সম্পা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৫৮।
- আলি. একরামুল, 'বাঙালি মুসলমান : লোকাচার ও সমাজ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮।
- আলি. ড. সেখ রজব, 'ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় কলকাতা মাদ্রাসা', নক্ষত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ. ২০১৩।
- আলি. এস. ওয়াজেদ, 'জীবনের শিল্প', সেরিবান, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬।
- আলী. সাইয়্যেদ আমীর, 'ইসলাম ও ইসলামী নীতিতত্ত্ব', মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৩।
- আহমেদ. ওয়াকিল, 'উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা,' বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯।
- আহমেদ. ওয়াকিল, 'বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী (১৭৫৭ - ১৮৫৭)', বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ. জানুয়ারি ২০২০।

- আহমেদ. ড. শেখ ফিরদৌস, 'ইসলামিক পদ্ধতিতে সন্তানের লালন পালন', জাভেদ পাবলিকেশন্স, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।
- ইউসফজী, নওসর আলি খাঁ, 'বঙ্গীয় মুসলমান', বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা, আগস্ট ২০১০।
- ইলিয়াস. আখতারুজ্জামান, 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০২৩।
- ইসলাম. আমিনুল, 'বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা', লেখা প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৮।
- ইসলাম. নজরুল, 'মুসলমানদের উন্নতির জন্য কী করতে হবে', ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অগাস্ট ২০১২।
- ইসলাম, মুস্তাফা নূরউল, 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭।
- ইসলাম. মৌ. মো. মাইনুল, 'শৈশবের মণিকাঞ্চন : ইসলামে, জীবনশৈলী ও শিশুর পরিপূর্ণ গাইড', আদি মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, মে ২০১৮।
- ইসলাম. শেখ মকবুল, 'মুসলমান সমাজ : বঞ্চনা, অনুন্নয়ন ও সঙ্কট', বুক্স ওয়ে, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১০।
- 'ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ঢাকা দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০২।
- 'উচ্চ মাধ্যমিক সাহিত্য সংকলন', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৬।
- উমর. বদরুদ্দীন, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৮৮।
- উমর. বদরুদ্দীন, 'ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে', সাহিত্য প্রকাশ, বাংলাদেশ, ঢাকা, ফাল্গুন ১৪০০।
- এঙ্গেলস. ফ্রেডরিক, 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, নভেম্বর ২০১১।
- ওদুদ, কাজী আব্দুল, 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ', (সংকলন ও সম্পাদনা) বরেন্দু মণ্ডল, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৫।

- কবিরাজ. নরহরি (সম্পা.), 'উনিশ শতকের বাঙলার নবজাগরণ : তর্ক ও বিতর্ক', কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৬।
- কর. আবীর, 'উনিশ শতকের বিস্মৃত বাংলা প্রাইমার', পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা, মাঘ ১৪২০।
- কার. ই. এইচ, 'কাকে বলে ইতিহাস' (অনুবাদ. দত্ত. স্নেহোৎপল ও পালিত. সৌমিত্র), কে. পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০১৫।
- কাসেমী. আব্দুল হামিদ, 'সর্ব-বৃহৎ হাক্কানী নামাজ ও মাসআলা শিক্ষা', রহমানিয়া লাইব্রেরী, মগরাহাট, ২০১১।
- খান. ড. লায়েক আলি, 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজ ও চরিত্র', সাহিত্যলোক, কলকাতা, এপ্রিল ২০০০।
- খাঁ. অধ্যক্ষ ইব্রাহীম ও উল্লাহ. মৌলবী আহছান, 'ইসলাম সোপান', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৫।
- খালেক. এ. এস. এম. আবদুল, 'প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা', অনন্যা, ঢাকা, ২০০৯।
- খাস্তগীর. আশিস, 'বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষা', পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০০৪।
- খাস্তগীর. আশিস (সম্পা), 'বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬ – ১৮৫৪)', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬।
- গনী. ড. ওসমান, 'ইসলামি চিন্তা চেতনার ও ক্রমবিকাশ', পারুল, কলকাতা, প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১৮।
- গনী. ড. ওসমান, 'চরিত্র ও সমাজ গঠনে কোরয়ান শরীফ', পারুল, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৮।
- গনী. ড. ওসমান, 'চরিত্র ও সমাজ গঠনে হাদীস শরীফ', পারুল, কলকাতা, প্রথম পারুল সংস্করণ ২০০৮।
- গাফ্ফর. আব্দুল, 'আলেমগণ নানা মতে যেতে হবে নবীর পথে', কলকাতা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, মে ২০১২।
- গুপ্ত. অতুলচন্দ্র, 'কাব্যজিজ্ঞাসা', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, আশ্বিন ১৪১৭।
- গুপ্ত. দীক্ষিত, 'নীতিশাস্ত্র', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭।
- গুপ্ত. শুভেন্দু, 'শিক্ষার রূপ : বেদ - এর কালে ও বর্তমানে', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, অক্টোবর ২০২০।

- গুহ. রণজিৎ, 'দয়া : রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা', তালপাতা, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১২।
- গুহ. রামচন্দ্র, 'গাঁধী – উত্তর ভারতবর্ষ', (অনুবাদ. লাহিড়ী. আশীষ), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, মে ২০১৯।
- গ্রামশি. আনতোনিও, 'বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা', বন্দ্যোপাধ্যায়. শমীক, ও ভট্টাচার্য. সৌরীন, (সম্পা. ও অনূদিত) অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪।
- ঘোষ. জ্যোতির্ময়, 'সাহিত্যে প্রগতির দর্শন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ', শৈবা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, মে ১৯৮৯।
- ঘোষ. নির্মাল্যকুমার, 'বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্য পাঠের ভূমিকা', ছোঁয়া, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০।
- ঘোষ. বারিদবরণ, 'কল্লোল প্রবন্ধ সংগ্রহ', পুনশ্চ, কলকাতা, মে ২০১০।
- ঘোষ. বারিদবরণ, 'ভারতবর্ষ প্রবন্ধ সংকলন', নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮।
- ঘোষ. বিনয়, 'প্রবন্ধ সংগ্রহ', প্রকাশ ভবন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯।
- ঘোষ. বিনয়, 'বাংলার নবজাগৃতি', ওরিয়েন্ট লংম্যান, নয়া দিল্লি, ১৯৭৯।
- ঘোষ. বিনয়, 'বাংলার বিদ্বৎসমাজ', প্রকাশ ভবন, কলকাতা, এপ্রিল ২০১২।
- ঘোষ, বিনয়, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা', প্রকাশ ভবন, কলকাতা, অক্টোবর ২০০৯।
- ঘোষ. বিনয়, 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ', ওরিয়েন্ট লংম্যান, হায়দ্রাবাদ, ১৯৯৩।
- ঘোষ. বিনয়, 'মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ', ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।
- ঘোষ. বিনয়, 'শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, মার্চ ২০২০।
- ঘোষ. বিনয় (সম্পা), 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমজচিত্র', দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৫।
- ঘোষ. বিনয় (সম্পা), 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমজচিত্র', চতুর্থ খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৮০।
- ঘোষ. বিনয় (সম্পা), 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমজচিত্র', ষষ্ঠ খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭।

- ঘোষ. মন্মথনাথ, 'সেকালের কৃতী বাঙালি', পারুল, কলকাতা, ২০১৪।
- ঘোষ. সাগরময় (সম্পা.), 'দেশ সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন ১৯৩৩ - ১৯৮৩', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৪।
- ঘোষাল. লিপিকা, 'মুসলিম সমাজের সদর – অন্দর কথাসাহিত্যের দর্পণে', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪।
- চক্রবর্তী. অধীর, বন্দ্যোপাধ্যায়. শচীন্দ্রনাথ, চট্টোপাধ্যায়. অনুনয়, মুখোপাধ্যায়. সুখরঞ্জন, দত্ত. ধীরেন্দ্রনাথ (সম্পা. ও সংকলন), 'আলোর ফুলকি : শিশু ও কিশোর সাহিত্য সংকলন', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯।
- চক্রবর্তী. অরিন্দম, 'এ তনু ভরিয়া : দর্শন আপাদমস্তক', অনুষ্টুপ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২২।
- চক্রবর্তী. অরিন্দম, 'দেহ গেহ বন্ধুত্ব ছটি শারীরক তর্ক', অনুষ্টুপ, কলকাতা, জুন ২০১১।
- চক্রবর্তী. অরিন্দম, 'মননের মধু', গাঙচিল, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪।
- চক্রবর্তী. চিন্তাহরণ, 'ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৩।
- চক্রবর্তী, দীপেন্দু, 'সংস্কৃতির ক্ষয়ক্ষতি ও অন্যান্য', অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪।
- চক্রবর্তী. রমাকান্ত, 'বাঙালির ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০২।
- চক্রবর্তী. সুধীর (সম্পা.), 'বুদ্ধিজীবির নোটবই', পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৪।
- চক্রবর্তী. স্বপন (সম্পা.), 'মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই', অবভাস, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৭।
- চক্রবর্তী. শ্যামল (সম্পা. ও সংকলন), 'বিজ্ঞান ও কুসংস্কার', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৬।
- চৌধুরী. আসগার আলি, 'নারী আদর্শ : বিবাহের আগে ও পরে', মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, আগস্ট ২০১৯।
- চৌধুরী. নারায়ণ, 'সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী', হাওয়া, নবদ্বীপ, জানুয়ারি ১৯৯১।
- চৌধুরী. নীরদচন্দ্র, 'বাঙালি জীবনে রমণী', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, আশ্বিন ১৪১৯।
- চৌধুরী. সুকান্ত, 'ভাষা অর্থ সত্য', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০২২।
- চট্টোপাধ্যায়. দেবীপ্রসাদ, 'অগ্রন্থিত রচনা : শিল্প ও সাহিত্য', দিন্দা. মলয়েন্দু (সম্পা.), অবভাস, কলকাতা, জুন ২০১৪।

- চট্টোপাধ্যায়. দেবীপ্রসাদ ও মৈত্র. রমাকৃষ্ণ, 'পৃথিবীর ইতিহাস', অনুষ্টুপ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৫।
- চট্টোপাধ্যায়. দেবীপ্রসাদ, 'ভারতীয় দর্শন (প্রথম খণ্ড)', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অগাস্ট ২০১২।
- চট্টোপাধ্যায়. দেবীপ্রসাদ, 'ভাষা ও সাহিত্য', অনুষ্টুপ, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৮।
- চট্টোপাধ্যায়. দেবীপ্রসাদ, 'লোকায়ত দর্শন', নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৬।
- চট্টোপাধ্যায়. পার্থ, 'ইতিহাসের উত্তরাধিকার, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১২।
- চট্টোপাধ্যায়. পার্থ, 'প্রজা ও তন্ত্র', অনুষ্টুপ, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৬।
- চট্টোপাধ্যায়. রত্নাবলী, 'তর্কে – বিতর্কে ভারতের মধ্যযুগ', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮।
- চট্টোপাধ্যায়. সুনীতিকুমার, 'সাংস্কৃতিকী', (অখণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, আগস্ট ২০১৯।
- চন্দ. পুলক, 'ইতিহাস সাম্প্রদায়িকতা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র', লেখনী প্রকাশ্ন, কলিকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৬।
- চন্দ. পুলক, 'ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা ষড়যন্ত্র : ঔপনিবেশিক শিক্ষার ইতিবৃত্ত', লেখনী প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০১।
- চন্দ্র. বিপান, 'আধুনিক ভারত : ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ', পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, মে ১৯৮৭।
- চন্দ্র. বিপান, মুখার্জি. মৃদুলা, মুখার্জি. আদিত্য, 'ভারতবর্ষ : স্বাধীনতার পরে (১৯৪৭ – ২০০০)', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৭।
- স্তলেতেভ. ড. ন., 'ছেলেমেয়ে মানুষ করা প্রসঙ্গে', (অনুবাদ. পাল. বিজয়), প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৬।
- 'জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫', রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, মার্চ ২০০৭।
- জায়সী. মালিক মুহাম্মদ, 'পদ্মাবতী', হাবিবী প্রেস, কলকাতা, ১৩৩৮।
- জোয়ারদার. মানস, 'শিক্ষা ও সমাজ : গতি এবং দুর্গতি', এখন বিসংবাদ, কলকাতা, ২০০৭।

- জোয়ারদার. সফিউদ্দীন, আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য' (প্রথম খণ্ড)', বাঙ্গাল একাডেমি, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৭।
- ঠাকুর. সুপ্রিয়, 'রবীন্দ্র চিন্তায় মানুষের স্বরূপ ও শিক্ষা', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬।
- তর্কালঙ্কার, মদনমোহন, 'শিশুশিক্ষা', আশিস খাস্তগীর (সম্পা), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯।
- দত্ত. অম্লান, 'প্রবন্ধ সংগ্রহ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৪।
- দত্ত, জ্যোতির্ভূষণ (সম্পা.), 'শিক্ষার তিন দশক এবং ভবেশ মৈত্র', পুনশ্চ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১০।
- দত্ত. ভবতোষ, 'আট দশক', প্রতিক্ষণ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮৮।
- দত্ত. ভবতোষ, 'দৃষ্টিকোণ : এক দশকের অর্থনীতির ধারাভাষ্য', প্রতিক্ষণ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮৫।
- দত্ত. মিলন, 'ইসলাম', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, নভেম্বর ২০২১।
- দত্ত. মিলন, 'চলিত ইসলামি শব্দকোষ', গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৮।
- দত্ত. মিলন, 'মুসলিম জাহান', কারিগর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭।
- দত্ত. মিলন (সম্পা.) 'হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক : ঐক্যের দ্বন্দ্বের ধন্দের', ছোঁয়া, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯।
- দত্তগুপ্ত. দেবু, 'একুশ শতক', ক্যাম্প, কলকাতা, মে ২০০২।
- দত্তগুপ্ত. শোভনলাল (সম্পা.), 'নয়া উদারনীতিবাদের অভিঘাত ও বর্তমান ভারত', বহুস্বর, কলকাতা, অক্টোবর ২০২৩।
- দত্ত রায়. সচ্চিদানন্দ, 'পরিসংখ্যানে পশ্চিমবঙ্গবাসীর জীবন মৃত্যু', সেরিবান, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯।
- দাশ. ধনঞ্জয়, 'মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক' (অখণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৩।
- দাশ. শিশিরকুমার, 'পাঠ্যক্রম ও সাহিত্য', হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, জুলাই ১৯৯২।
- দাশ. শিশিরকুমার, 'ফুলের ফসল: সংকলনের রাজনীতি', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৮।

- দাশ. শিশিরকুমার (সংকলন ও সম্পা.), 'সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪।
- দাশগুপ্ত. সুরজিৎ, 'প্রসঙ্গ : সাম্প্রদায়িকতা', আদি মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, মার্চ ২০১৪।
- দাস. রঞ্জন কুমার, 'শনিবারের চিঠি প্রবন্ধ সংকলন', নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ২০০৯।
- দাসী. রাসসুন্দরী, 'আমার জীবন', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০১১।
- দে. অমলেন্দু, 'অনুশীলন সমিতির ইতিহাস (১৯০২ – ১৯৪৭)', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪।
- দে. অমলেন্দু, 'দ্বিজাতিতত্ত্ব ও মুসলিম লিগ', প্রতিভাস, কলকাতা, জুন ২০১২।
- দে. অমলেন্দু, 'ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা', প্রতিভাস, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৪।
- দে. অমলেন্দু, 'বাংলা ভাষায় কোরানচর্চা, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪।
- দে. অমলেন্দু 'বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ', প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২।
- দে. ড. সুনীলকান্তি, 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাংলা ও মুসলিম সমাজ (১৯১৩ – ১৯১৯)', মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯২।
- 'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম', ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩।
- দ্রেজ. জঁ, সেন. অমর্ত্য, 'ভারত : উন্নয়ন ও বঞ্চনা', (অনুবাদ. চট্টোপাধ্যায়. অনির্বাণ, রানা. কুমার) আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৫।
- নন্দী. আশিস, 'জাতীয়তাবাদ ও ভারতচিন্তা', বুক পোস্ট, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০।
- নন্দী. আশিস, 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিরোধী ইস্তাহার', সেরিবান, কলকাতা, অগাস্ট ২০১৯।
- নাগ. অরুণ, 'পাঁচমিশালি', অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০২০।
- নাথ. রাখাল চন্দ্র, 'উনিশ শতক : ভাব সংঘাত ও সমন্বয়', কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৬।
- নাসিম. আবদুস শহীদ, 'কুরআন হাদীসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা', শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৯৮।
- নাসিম. আবদুস শাহিদ, 'শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি', শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা, জুন ২০১৪।
- নাহার. মীরাতুন, 'সংখ্যালঘু মানবী আমি', গাঙচিল, কলকাতা, মার্চ ২০১৭।

- নিকলসন. রেনল্ড অ্যালেন. 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাস', (অনুবাদ ও সম্পা.) সিংহ. জয়ন্ত, কাইউম. মুহাঃ আবদুল, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০১৬।
- নিযামী. শামসুন্নাহার, 'নারী মুক্তি আন্দোলন', বাংলা ইসলামি প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, মার্চ ২০১৩।
- নির্ম্মলানন্দ. স্বামী, 'হিন্দু হুঁসিয়ার', ভারত সেবাশ্রম সংঘ, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৯৭।
- পাল. পলাশবরণ, 'আ মরি বাংলা ভাষা', অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১।
- পাল. পলাশবরণ, 'ধ্বনিমালা বর্ণমালা', অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫।
- পাল. বিপিনচন্দ্র, 'নবযুগের বাংলা', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, অগাস্ট ২০১২।
- 'প্রবন্ধ সংকলন', বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ অগাস্ট, ২০০৪।
- 'প্রশ্নোত্তরে ভারতবর্ষের জাতিভেদ ও বর্ণ বিদ্বেষের চালচিত্র', বর্ণমালা, কলকাতা, জুলাই ২০১৮।
- 'প্রশ্নোত্তরে ইতিহাসের গৈরিকীকরণ বনাম প্রকৃত ইতিহাস', বর্ণমালা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯।
- 'প্রশ্নোত্তরে ইতিহাসের গৈরিকীকরণ বনাম প্রকৃত ইতিহাস', বর্ণমালা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮।
- বন্দ্যোপাধ্যায়. অভিজিৎ ও ভট্টাচার্য. স্বাতী, 'বিকল্প বিপ্লব : যেভাবে দারিদ্র কমানো সম্ভব', আনন্দ, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৯।
- বন্দ্যোপাধ্যায়. অমল, 'উত্তর আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র, 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী', সত্যম, কলকাতা, ১৪২৫।
- বন্দ্যোপাধ্যায়. চিত্তরঞ্জন (সম্পা), 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮১।
- বন্দ্যোপাধ্যায়. চিত্তরঞ্জন, 'বঙ্গ প্রসঙ্গ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুলাই ২০১৭।
- বন্দ্যোপাধ্যায়. জ্যোতিপ্রসাদ, 'ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা', সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, কলকাতা, মে ২০১৮।
- বন্দ্যোপাধ্যায়. ব্রজেন্দ্রনাথ, 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৬৬।

- বন্দ্যোপাধ্যায়. রাখালদাস, ‘বাংলার ইতিহাস (অখণ্ড)’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮।
- বন্দ্যোপাধ্যায়. শিবাজী, ‘আবার শিশুশিক্ষা’, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০,
- বন্দ্যোপাধ্যায়. শিবাজী, ‘গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য’, কারিগর, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৫।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, ‘বাংলা শিশুসাহিত্যের ছোটোমেয়েরা’, গাঙচিল, কলকাতা, পৌষ ১৪২৪।
- বন্দ্যোপাধ্যায়. শেখর, (অনুবাদ. রায়. কৃষ্ণেন্দু), ‘পলাশি থেকে পার্টিশন ও তারপর : আধুনিক ভারতের ইতিহাস’, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, হায়দ্রাবাদ, ২০১৯।
- বন্দ্যোপাধ্যায়. শ্রীকুমার ও চৌধুরী. বিশ্বপতি (সম্পা), ‘কবিকঙ্কণ চণ্ডী’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৮।
- বন্দ্যোপাধ্যায়. সন্দীপ, ‘গ্রামবাংলার গড়ন ও ইতিহাস’, অনুষ্টুপ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১১।
- বন্দ্যোপাধ্যায়. সুমন্ত, ‘উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান’, অনুষ্টুপ, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৮।
- বন্দ্যোপাধ্যায়. হরিচরণ, ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০২৩।
- বসু. অজিতনারায়ণ, ‘পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও রাজনীতি’, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩।
- বসু. অঞ্জন, ‘বাংলায় বামেরা : রাজপথে ও রাজ্যপাটে ১৯২০ - ২০১১’, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, অগাস্ট ২০২২।
- বসু. অমৃতরঞ্জন, ‘ভুঁইফোড়ের মনোবিদ্যাচর্চা’, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫।
- বসু. অরুণ কুমার (সম্পা.), ‘সারস্বত : বাংলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৮।
- বসু. পথিক (সম্পা.), ‘বিভাব প্রবন্ধ সংকলন’, প্যাপিরাস, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৪।
- বসু. পথিক, ‘বৈষম্য শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ’, প্যাপিরাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২।
- বসু. পথিক, ‘মানুষ হয়ে ওঠা’, শ্রয়ণ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৭।
- বসু. প্রদীপ, ‘উত্তর আধুনিক রাজনীতি’, সাহিত্যলোক, কলকাতা, অক্টোবর ২০১০।

- বসু. প্রদীপ, 'ভাষা দর্শন সংগীত সমীক্ষা ও সন্ধান', অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪।
- বসু. প্রদীপ, 'রাজনীতির তত্ত্ব তত্ত্বের রাজনীতি', চর্চাপদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১১।
- বসু. প্রদীপ (সম্পা.) 'সাময়িকী : পুরনো সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ সংকলন, প্রথম খণ্ড : বিজ্ঞান ও সমাজ ১৮৫০ - ১৯০১', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬।
- বসু. প্রদীপ (সম্পা.) 'সাময়িকী : পুরনো সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড : গৃহ ও পরিবার ১৮৫০ - ১৯০১', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৯।
- বসু. বিমান (সম্পা.) 'প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর', বঙ্গীয় স্বাক্ষরতা প্রসার সমিতি, কলকাতা, ২০০৮।
- বসু. বুদ্ধদেব, 'সাহিত্যচর্চা', দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, মে ২০০৯।
- বসু. রাজশ্রী ও চক্রবর্তী. বাসবী (সম্পা.), 'প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা', ঊর্বী প্রকাশন, কলকাতা, জুন ২০১২।
- বসু. শ্রী রাজনারায়ণ, 'হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা', জাতীয় যন্ত্রে মুদ্রিত, কলিকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।
- বসু. স্বপন, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', পুস্তক বিপণী, কলকাতা, অগাস্ট ২০১৬।
- বসু. স্বপন, 'সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ' (প্রথম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩।
- বসু. স্বপন, 'সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ' (দ্বিতীয় খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, অক্টোবর ২০০৩।
- বসু. স্বপন (সংকলিত ও সম্পাদিত), 'সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ', বুকস স্পেস, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯।
- বসু. স্বপন, চৌধুরী. ইন্দ্রজিৎ (সম্পা.), 'উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি', পুস্তক বিপণী, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৩।
- বসু. স্বপন, দত্ত. হর্ষ (সম্পা.), 'বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি', পুস্তক বিপণী, কলকাতা, এপ্রিল ২০১০।
- বাগচী. নির্মাল্য, 'রামমোহন চর্চা : ইতিহাসে বঞ্চনা ও অবহেলা', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৫।

- বারকাত. আবুল, আরা. রওশন, উদ্দিন. এম. তাহের, জাহিদ. ফরিদ. এম, বদিউজ্জমান. মুহাম্মদ, 'বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি উৎস বিকাশ ও প্রভাব', র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, জুলাই ২০১৭।
- বাসার. খায়রুল, 'পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ', মৃত্তিকা, কলকাতা, পৌষ ১৪৩০।
- বাহাদ্দীন. অধ্যাপক ড. মহম্মদ, 'আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা ও গবেষণার ধারণাপত্র : একটি আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৮।
- ভট্টাচার্য. জ্যোতি, 'পরিপ্রশ্ন', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৫।
- ভট্টাচার্য. জ্যোতি, 'শ্রমিকের দর্শন', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৫।
- ভট্টাচার্য. নরেন্দ্রনাথ, 'ধর্ম ও সংস্কৃতি : প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৬।
- ভট্টাচার্য. বীতশোক, লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫।
- ভট্টাচার্য. প্রদ্যুম্ন, 'টীকাটিপ্পনী', প্যাপিরাস, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৮।
- ভট্টাচার্য. রামকৃষ্ণ, 'ওরে বর্ণচোরা ঠাকুর এল ইত্যাদি বিতর্ক', অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১৪।
- ভট্টাচার্য. রামকৃষ্ণ, 'বস্তুবাদ জিজ্ঞাসা', অবভাস, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৫।
- ভট্টাচার্য. সুকান্ত, 'সুকান্ত সমগ্র', সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৬৪,
- ভট্টাচার্য. সুকুমারী, 'অপসংস্কৃতি', ক্যাম্প, কলকাতা, ২০০৩।
- ভট্টাচার্য. সুকুমারী, 'এয়োতি এবং', ক্যাম্প, কলকাতা, মার্চ ২০১৬।
- ভট্টাচার্য. সুকুমারী, 'গীতা কেন?', ক্যাম্প, কলকাতা, জুলাই ২০১৫।
- ভট্টাচার্য. সুকুমারী, 'বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ২০০৯।
- ভট্টাচার্য. সুকুমারী, 'বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, জুলাই ২০০৬।
- ভট্টাচার্য. সুকুমারী, 'ধর্ম এই সময়ে', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, বৈশাখ ১৪১১।
- ভট্টাচার্য. সুকুমারী, 'প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য' আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪২০।
- ভট্টাচার্য. সুকুমারী, 'প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৫।

- ভট্টাচার্য. সৌরীন, ‘পদ্ধতির পাঁচালী’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২।
- ভদ্র. গৌতম, ‘ইমান ও নিশান’, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৪।
- ভদ্র. গৌতম, ‘মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও আত্মসত্তার রাজনীতি’, সংহতি প্রকাশন, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৭।
- ‘ভাবনাকোষ’, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, আগস্ট ২০১৮।
- মওদূদী. সাইয়েদ আবুল আ’লা, ‘ইসলাম ও জাহেলিয়াত’, বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬।
- মওদূদী. সাইয়েদ আবুল আ’লা, ‘ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব’, বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৫।
- মওদূদী. সাইয়েদ আবুল আ’লা, ‘ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ’, বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৯।
- মওদূদী. সাইয়েদ আবুল আ’লা, ‘একমাত্র ধর্ম’, বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০১৩।
- মওদূদী. সাইয়েদ আবুল আ’লা, ‘সত্যের সাক্ষ্য’, বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, আগস্ট ২০২১।
- মজুমদার. নীহার, ‘বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী’, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০০৭।
- মনির. ড. শাহজাহান, ‘বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (১৯১৯ – ১৯৪০)’, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৩।
- মান্নান. কাজী আবদুল (সম্পা.), ‘মশাররফ রচনা সম্ভার,’ (পঞ্চম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮৫।
- মান্নান. মাওলানা মুহম্মদ আব্দুল, ‘মাতা পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য’, বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৭।
- মিত্র. অরুণ, ‘সার্ত্র ও তাঁর শেষ সংলাপ’, প্রমা, কলকাতা, ১৯৯৬।
- মিত্র. খগেন্দ্রনাথ, ‘শতাব্দীর শিশুসাহিত্য’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৯
- মিশ্র. অমলেশ কুমার, ‘যারা মুসলমান বলে গর্ব বোধ করেন’, দে পাবলিকেশন, কলকাতা, আগস্ট ২০১৩।

- মিশ্র. পুষ্পা (সম্পা.), 'সিগমুন্ড ফ্রয়েড', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৮।
- মুখোপাধ্যায়. অনির্বাণ, 'নিবন্ধ বৈচিত্র্যের তিন দশক', চর্চাপদ পাবলিকেশন, জানুয়ারি ২০১০।
- মুখোপাধ্যায়. আনন্দদেব (সম্পা.), 'মঞ্জুলা বিশ্বাস স্মরক বক্তৃতা সংকলন', বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ, কলকাতা, ২০১২।
- মুখোপাধ্যায়. প্রবীর (সংকলিত ও সম্পাদিত), 'বাঙালির শিক্ষাচিন্তা', দীপায়ন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩।
- মুখোপাধ্যায়. রামকৃষ্ণ, 'সমাজ সংস্কৃতি প্রগতি', প্যাপিরাস, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯১।
- মুখোপাধ্যায়. শক্তিসাধন, 'ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাঙ্গাল্র রেনেসাঁস', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, অক্টোবর ২০০০।
- মুখোপাধ্যায়, শ্রীধর, 'কলকাতা: উনিশ শতক ঘটনাক্রম', মহাদিগন্ত, কলকাতা ২০০৮।
- মুমেনিন. হযরত আমীরুল, চরিত্র সংশোধন বিষয়ক মূল্যবান উপদেশাবলী', আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪।
- মৈত্র. শেফালী, 'নৈতিকতা ও নারীবাদ : দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা', নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭।
- মোমেন. আবুল, 'বাংলাদেশে আক্রান্ত মুক্তচিন্তা ও মুক্তির চিন্তা', মৃত্তিকা, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৮।
- রশিদ. মোহাম্মদ হারুন (সম্পা. ও সংকলিত), বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মে ২০১৫।
- রহমান. কাজী সুফিউর, 'শিশুসাহিত্যের সারথি : বিদ্যাসাগর থেকে বেগম রোকেয়া', রেনেসাঁস পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮।
- রহমান, ডাঃ মসিহুর, 'ইসলামী আন্দোলনঃ সমস্যা ও প্রতিকারের ভাবনা', বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৪।
- রহমান. মুস্তাফিজুর শরীফ, 'নৈতিক চেতনাবোধ', ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, মার্চ ২০১৫।
- রহমান. সামসুর, 'বাঙালী মুসলিম সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিবৃত্ত', মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০১৬।

- রহিম. মুহম্মদ আব্দুর, 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮।
- রাকিব, 'মাদ্রাসা শিক্ষায় প্রচলিত বাংলা প্রাইমার : ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ', পি এইচ. ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত অপ্রকাশিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০২০।
- রানা. কুমার, 'আধিপত্য ও লোকপ্রজ্ঞা', আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৬।
- রানা. কুমার, রফিক. আবদুল, সেনগুপ্ত. অমৃতা, 'প্রতীচী শিক্ষা প্রতিবেদন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ২০০৪।
- রায়. অনুরাধা, 'ইতিহাসের হরেক গেরো', অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯।
- রায়. অন্নদাশঙ্কর, 'শিক্ষার সঙ্কট', সাহিত্যলোক, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯১।
- রায়. অন্নদাশঙ্কর, 'সংস্কৃতির বিবর্তন', বাণীশিল্প, কলকাতা, মার্চ ১৯৯৯।
- রায়. অভিষেক, 'ধর্ম ও জনসংস্কৃতি', বার্তা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯।
- রায়. অলোক, 'উনিশ শতক', প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭।
- রায়. অলোক, 'বিশ শতক', প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬।
- রায়. অলোক, নিয়োগী. গৌতম (সম্পা.), 'উনিশ শতকের বাংলা', পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।
- রায়. অলোক, সরকার. পবিত্র, ঘোষ. অভ্র, (সম্পা.), 'দুশ বছরের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য', সাহিত্য অকাদেমি, দিল্লি, ২০১৭।
- রায়. এম.এন, 'ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান', আদি মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, জুলাই ২০১৯।
- রায়. বিনয়ভূষণ, 'শিক্ষাসার থেকে বর্ণপরিচয় – সমাজের সঙ্গে প্রাথমিক পাঠের বিবর্তন – বিদ্যাসাগরের ভূমিকা', চিকিতুষী প্রকাশনী, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১১।
- রায়. বিশ্বজিৎ, 'যত বেশি জানে তত বেশি মানে : একান্তবাদী সাহিত্য সমালোচনা বিরোধী প্রস্তাব', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০।
- রায়. হরপ্রসাদ, 'মন্দির মসজিদ সংবাদ', ভারবি, কলকাতা, মাঘ ১৩৯৭।
- রুদ্র. অশোক, 'ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন', পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৬।।

- রুদ্র, অশোক, 'সমাজে নারী পুরুষ ও অন্যান্য প্রবন্ধ', পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৫।
- লাহিড়ী, অনিরুদ্ধ, 'তত্ত্বতালাশ', অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৫।
- লাহিড়ী. আশীষ, 'অন্য কোনো সাধনার ফল : বিজ্ঞান ও বাঙালি সংস্কৃতি', পাভলভ ইন্সটিটিউট, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২।
- লাহিড়ী. আশীষ, 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙালির সেক্যুলার বিবেক', অবভাস, কলকাতা, জুন ২০১৮।
- লাহিড়ী. কার্তিক, 'কলকাতার গ্রাম্যতা ও বাঙালি বুদ্ধিজীবী', প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯।
- 'শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম', ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, নভেম্বর ২০১৪।
- শরীফ. আহমদ, 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ', কথাপ্রকাশ, ঢাকা, আগস্ট ২০১৫।
- শরীফ. আহমদ, 'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ', মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭।
- শাস্ত্রী. শিবনাথ, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', ঘোষ. বারিদবরণ (সম্পা.), নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৯।
- 'শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম', ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, নভেম্বর ২০১৪।
- শিরাজী. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন, 'শিরাজী উপন্যাস সমগ্র', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯৪২।
- শূর. চিরঞ্জীব (সম্পা.) 'ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল', আলোচনাচক্র, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩।
- শূর. চিরঞ্জীব (সঙ্কলিত) 'মিশেল ফুকো', আলোচনাচক্র, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৬।
- শ্রীপান্থ, 'যখন ছাপাখানা এল', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আমাদেমি, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৯৬।
- সরকার. তুষারকান্তি, মৈত্র. শেফালী, সান্যাল. ইন্দ্রাণী (সম্পা.) 'হ্বিটগেনস্টাইন : জগৎ, ভাষা ও চিন্তন', যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, কলকাতা, আশ্বিন ১৪২০।
- সরকার. পবিত্র, 'ভাষা দেশ কাল', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪২২।
- সরকার. পিযুশকান্তি, 'বাংলায় বর্ণপরিচয়,' রাজসী প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন, মেদিনীপুর, ২০০৮।
- সরকার. বিনয় 'মগজ মেরামতের হাতিয়ার,' সেরিবান, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৮।
- সরস্বতী. সরসীকুমার, 'বাংলা প্রবন্ধ সংকলন', সেন্টার ফর আর্কিওলজিকাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৬।

- সিঙ্গার. পিটার, (রায়. ড. প্রদীপ, অনূদিত) 'ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা', অবসর, ঢাকা, মার্চ ২০১৫।
- সিদ্দীকী. ডাঃ. মাকসুদ আলম, 'ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ: মূল উৎসের সন্ধানে', ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৩।
- সিদ্দীকী. নঈম, 'চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান', বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০১২।
- সিন্‌হা. রাজ্যেশ্বর (সম্পা.), 'আপন হতে বাহিরে : মুসলমান বাঙালি সম্পাদিত সাময়িকপত্রের ভাষা ও সাহিত্য বিষয় নির্বাচিত রচনা সংকলন ১৯০০ – ১৯৩০', যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, কলকাতা, ২০২২।
- সিংহ. উদয় নারায়ণ, 'সাহিত্যের ভাষা ভাষার সাহিত্য', অনুষ্টুপ, কলকাতা, আগস্ট ২০১০।
- সুনান, ইবন মাজাহ, 'আল হাদিস, কিতাবুল ইল্‌ম', আশরাফিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৫।
- সেন. অমর্ত্য, 'জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪১৮।
- সেন. অমর্ত্য, 'তর্কপ্রিয় ভারতীয়', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৫।
- সেন. অমর্ত্য, পরিচিতি ও হিংসা', (অনুবাদ. চক্রবর্তী. ভাস্বতী), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১১।
- সেন. অমর্ত্য, 'শিশুশিক্ষার ভূমিকা', গাঙচিল, কলকাতা, জুন ২০১৬।
- সেন. অরুণ, 'দুই বাঙালি এক বাঙালি', অবভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬।
- সেন. দীনেশচন্দ্র, 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান', দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।
- সেন. প্রবোধচন্দ্র, 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ জানুয়ারি. ১৯৯১।
- সেন. সুকুমার, 'প্রবন্ধ সংকলন – ১, (সম্পা. সেন. সুভদ্রকুমার ও সেন. সুনন্দনকুমার), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, মার্চ ২০১৮।
- সেন. সুকুমার, 'প্রবন্ধ সংকলন – ৩, (সম্পা. সেন. সুভদ্রকুমার ও সেন. সুনন্দনকুমার), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, মে ২০১৭।
- সেন. সুকুমার, 'প্রবন্ধ সংকলন – ৪, (সম্পা. সেন. সুভদ্রকুমার ও সেন. সুনন্দনকুমার) আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৮।

- সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (পঞ্চম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০।
- সেন. সুকুমার (সম্পা.), 'বিপ্রদাসের মনসাবিজয়', দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৫৩।
- সেন. সুকোমল, 'ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে ধর্ম শ্রেণি ও জাতিভেদ', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, অক্টোবর ২০০৪।
- সেন. সুব্রতা, 'সতীপ্রথা ও পণপ্রথা : উৎস ও বিবর্তনের সন্ধানে', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬।
- সেনগুপ্ত. সমীর, 'মুসলমান বাঙালির ধর্মীয় পরিভাষা', অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১।
- সেনগুপ্ত. স্বরাজ, 'শিক্ষা : এক নিঃশব্দ বিপ্লব', রেনেসাঁস পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬।
- সৃষ্টি সম্পাদনা পর্ষৎ (সম্পা.), 'জাতি হিন্দু ধর্ম ও আরও কিছু জিজ্ঞাসা', সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০১।
- হক. আনসারুল, 'শিশু সাহিত্য : সৃজন নির্মাণ তত্ত্বতালাশ', অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪।
- হক. খন্দকর সিরাজুল, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।
- হফম্যান. ডঃ মুরাদ উইলফ্রেড, 'ইসলাম ও বিশ্বের ভবিষ্যৎ', বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৯।
- হাজরা. নীরদবরণ, 'কলকাতা : ইতিহাসের দিনলিপি (প্রথম পর্ব)', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৫।
- হাবিব. ইরফান, (অনুবাদ. বসু. কাবেরী) 'ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে : মার্কসীয় চেতনার আলোকে', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৫।
- হাসনাত. আবুল, 'বিনিময় অবিরাম', বিগ বুক্স, কলকাতা, ২০১৯।
- হাসান. জাহিরুল, 'বাঙালি মুসলমানের আটশো বছর', পূর্বা পাবলিকেশন, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৯।
- হাসান. জাহিরুল, 'মুসলমানকোষ', পূর্বা পাবলিকেশন, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯।
- হাসান. মইনুল (সম্পা.) 'ইসলাম ও সমকালীন দুনিয়া', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৯।

- হাসান. মইনুল, 'বাঙালি মুসলমান : জীবন ও সংস্কৃতি', নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৫।
- হাসান. মইনুল, 'মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতা ইতিহাস রচনা এবং এই সময়', রূপালী, কলকাতা, ২০১৭।
- হাসান. মইনুল (সম্পা.), 'মুসলিম সমাজ এবং এই সময়' (দ্বিতীয় খণ্ড), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৫।
- হাসান. মইনুল, 'রোহিঙ্গা মুসলমানদের ইতিবৃত্ত', বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৮।
- হেজাজী. আলি নাসিম, 'আহ্বান', বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১২।
- হোসেন. আফযাল ও মাবুদ. আবদুল, 'ইসলাম শিক্ষা', বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০।
- হোসেন. শ্রীমীর মশাররফ, 'আমার জীবনী' (প্রথম খণ্ড), কালিকা-যন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৩১৫।
- হোসেন. সাখাকেয় রোকেয়া, 'মতিচূর', (সম্পা.) নাহার. মীরাতুন, সুরাহা সম্প্রীতি, কলকাতা, ২০১০।
- হোসেন. সৈয়দ মাসুদুল, 'মুসলিম সমাজের পিছিয়ে থাকার পটভূমি ও সর্বনাশা চক্রান্ত', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।
- 'শিশুদের কিতাবুল মোকাদ্দস', দ্য বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্গালোর, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।

পত্রপত্রিকা

সংবাদপত্র

- চক্রবর্তী. দীপেশ, 'মানুষ ঋণী পৃথিবীর কাছে', আনন্দবাজার পত্রিকা, উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ, ২২ অগাস্ট, ২০২১।
- চৌধুরী. শুভ্রনীল ও ঘোষ. শাশ্বত, 'মুসলমানের বাদ দিয়ে উন্নয়ন হবে না', আনন্দবাজার পত্রিকা, উত্তর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, ১৭ মার্চ ২০১৬।

- আখতার. কাজী মাসুম, 'মাদ্রাসা সম্পর্কে আগে জেনে নেওয়া ভাল', আনন্দবাজার পত্রিকা, উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ, ২১ অক্টোবর ২০১৪
- নাসিম-এ-আলম, 'সন্ত্রাসের এই জাল এক দিনে তৈরি হয়নি', *আনন্দবাজার পত্রিকা,* উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ, ২৭ নভেম্বর ২০১৪
- হক. শেখ সাইদুল, 'সংখ্যালঘু উন্নয় নামে চটকদারি রাজনীতি', *গণশক্তি,* ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

সাহিত্য পত্রিকা

- অনুষ্টুপ, অনিল আচার্য (সম্পা.) ২৬ বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯১।
- অনুষ্টুপ, অনিল আচার্য (সম্পা.) ৩৩ বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯৮।
- অনুষ্টুপ, অনিল আচার্য (সম্পা.) ৩৯ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শারদীয় সংখ্যা, কলকাতা, ১৪১১।
- অনুষ্টুপ, অনিল আচার্য (সম্পা.) ৪৭ বর্ষ, গ্রীষ্ম – বর্ষা তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা, ২০১৩।
- অনুষ্টুপ, অনিল আচার্য (সম্পা.) ৫০ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শারদীয় সংখ্যা, কলকাতা, ১৪২২।
- অনুষ্টুপ, অনিল আচার্য (সম্পা.) ৫৪ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শারদীয় সংখ্যা, কলকাতা, ২০১৯।
- অবভাস প্রবন্ধ সংকলন, পার্থ চক্রবর্তী (সম্পা.), ২য় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, কলকাতা, ২০০৩।
- অবভাস প্রবন্ধ সংকলন জানুয়ারি – মার্চ ২০০৪, পার্থ চক্রবর্তী (সম্পা.), কলকাতা, মার্চ ২০০৪।
- অবভাস প্রবন্ধ সংকলন জানুয়ারি – মার্চ ২০০৫, পার্থ চক্রবর্তী (সম্পা.), কলকাতা, ২০০৫।
- অবভাস প্রবন্ধ সংকলন, পার্থ চক্রবর্তী (সম্পা.), ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি – মার্চ, ২০০৭, কলকাতা, ২০০৭।
- অবভাস প্রবন্ধ সংকলন জানুয়ারি – মার্চ ২০০৫, পার্থ চক্রবর্তী (সম্পা.), কলকাতা, ২০০৫
- আকাদেমি পত্রিকা, অন্নদাশঙ্কর রায় (সম্পা.) ষষ্ঠ সংখ্যা, কলকাতা, মে ১৯৯৪।
- আকাদেমি পত্রিকা, অন্নদাশঙ্কর রায় (সম্পা.) সপ্তম সংখ্যা, কলকাতা, মার্চ ১৯৯৫।
- আকাদেমি পত্রিকা, অন্নদাশঙ্কর রায় (সম্পা.) ষষ্ঠ সংখ্যা, কলকাতা, মে ১৯৯৪।
- আকাদেমি পত্রিকা, অন্নদাশঙ্কর রায় (সম্পা.) দশম সংখ্যা, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৭।
- আকাদেমি পত্রিকা, অন্নদাশঙ্কর রায় (সম্পা.) একাদশ সংখ্যা, কলকাতা, জুন ১৯৯৯।

- আলোচনাচক্র, সম্রাট সেনগুপ্ত (অতিথি সম্পাদক) 'হিংসা ও সন্ত্রাস' ক্রোড়পত্র, ৩৫ তম সংকলন, কলকাতা, অগাস্ট ২০১৩।
- আলোচনাচক্র, চিরঞ্জীব শূর (সম্পা.), ৩৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯।
- একালের রক্তকরবী, প্রদীপ ভট্টাচার্য ও গৌতম মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), ৩১ সংখ্যা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৬।
- কোরক সাহিত্য পত্রিকা, 'বাঙালি মুসলমান : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' সংখ্যা, তাপস ভৌমিক. (সম্পা.), বইমেলা ২০১১, কলকাতা, ২০১১।
- কোরক সাহিত্য পত্রিকা, তাপস ভৌমিক. (সম্পা.), শারদীয় সংখ্যা, কলকাতা, ২০১৯।
- নবপর্যায় জিজ্ঞাসা, শিবনারায়ণ রায় (সম্পা.), ২০ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় যুগ্ম সংখ্যা, কলকাতা, ১৪০৬।
- নবপর্যায় জিজ্ঞাসা, 'শিক্ষা' সংখ্যা, শিবনারায়ণ রায় (সম্পা.), ২০ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, কলকাতা, ১৪১০।
- দেশ, 'নতুন সহস্রাব্দের বাঙালির জীবনযাত্রা সংখ্যা', অভীক সরকার (সম্পা.), কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০২।
- দেশ, 'ভারতচিন্তা' সাহিত্য সংখ্যা, সাগরময় ঘোষ (সম্পা.), কলকাতা, বৈশাখ ১৩৭৪।
- পান্থজন, 'শিশু-কিশোর মনন বিকাশ' সংখ্যা, গৌর খাঁড়া (সম্পা.), তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর – ডিসেম্বর ২০২২।
- পরিকথা, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), অষ্টম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, মে ২০০৬।
- পূর্ব, 'ভারতচিন্তা' সংখ্যা, রণজিৎ অধিকারী (সম্পা.), কলকাতা, অক্টোবর ২০২১।
- পূর্ব, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' সংখ্যা, রণজিৎ অধিকারী (সম্পা.), কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৪।
- বইয়ের দেশ, সুমন সেনগুপ্ত (সম্পা.) কলকাতা, জুলাই – সেপ্টেম্বর ২০১৭।
- রোববার, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), 'ইতিহাস্যকর সংখ্যা', কলকাতা, ১১ জুন ২০২৩।
- মাদ্রাসা দর্পণ, মোহাঃ ফজলে রাব্বি (সম্পা.), পঞ্চম বর্ষ ত্রয়োদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০০৬।
- মাদ্রাসা দর্পণ, রেজানুল করিম তরফদার (সম্পা.), অষ্টাদশ বর্ষ বিয়াল্লিশতম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০১৯।
- শারদ দেশহিতৈষী, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) শারদ সংখ্যা, কলকাতা, ১৪২৪।

- সোনালি সকাল, আসাদুল ইসলাম (সম্পা.), ‘কোন মিশন কেমন’ সংখ্যা, প্রপথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৫।

ইংরাজি বই

- Acharya, Srikumar. ‘The Changing Pattern of Education in early Nineteenth century Bengal’, Punthi Pustak, Kolkata, 1992
- Ahmad. M.M., ‘Present Day Problems of Indian Education: With Special Reference to Muslim Education’, The Fine Art Press, , Bombay 1935.
- Ahmed, Rafiuddin. ‘The Bengal Muslims 1871-1906: A Quest for Identity’, Oxford University Press, Delhi, 1981.
- Beteille. Andre, ‘Inequality among Men, Basil Blackwell, London, 1977.
- Bhattacharya. Tithi, ‘Sentinels of Culture: Class, Education, and the Colonial Intellectual in Bengal’, Oxford university Press, New Delhi, 2005.
- Chaterjee. Partha, ‘Nationalist thought And the Colonial World: A Derivative Discourse’, Oxford University Press, Delhi, 1988.
- Datta. Pradip Kumar, ‘Carving Bolcs: Communal Ideology in Early Twentieth-Century Bengal’, Oxford University Press, New Delhi, 1999.
- De, Dhurjati Prasad, ‘Bengal Muslims in Search of Social Identity’The University Press Limited, Dhaka, 1998.
- Ghosh. Nityapriya & Mukhopadhyay. Ashoke Kumar (Ed.) ‘Partition of Bengal: Significant Signposts 1905-1911’, Shishu Sahitya Samsad, Kolkata, 2005.
- Ghosh. Suresh Chandra, ‘The History of Education in Modern India 1757-2007’Orient Blackswan Private Limited, Delhi, 1995.
- Guha. Ramachandra, ‘Democrats and Dissenters’, Penguin Random House, Gurgaon, 2017.

- Guha. Ramachandra, 'Makers of Modern India', Penguin Viking, New Delhi, 2016.
- Gupta. Latika, 'Education, Poverty and Gender: Schooling Muslim Girls in India', Routledge, New Delhi, 2015.
- Gupta. Nilanjana, 'Reading with Allah: Madrasas in West Bengal', Routledge, New Delhi, First published 2009.
- Halder. Epsita, 'Reclaiming Karbala: Nation, Islam and Literature of the Bengali Muslim', Routledge, New York, 2023.
- Hasan. Mushirul (ed.), 'Communal and Pan-Islamic Trends in Colonial India', Manohar Publications, New Delhi, 1981.
- Hunter. W.W, 'The Indian Mussalmans', Indological Book House, Varanasi, 1871.
- Husain. Abid S, 'The Destiny of Indian Muslims', Asia Publishing House, Bombay, 1965.
- Kamat. A.R, 'Education After Independence: A Social Analysis', Lala Lajpatrai Institute, Bombay, 1973-74.
- Mitra Saha. Sutapa, (Ed.) 'Break the Bias for A Sustainable Tomorrow', Rohini Nandan, Kolkata, December 2023.
- Muhammad. Kutub, 'Islam and Women', Adhunik Prokashni, Dhaka, 1988.
- Rahman. Fazlur, 'The Bengali Muslims and English Education 1765-1835', Bengali Academy, Dhaka, 1973.
- Roy. Anuradha, 'Nationalism as Poetic Discourse In Nineteenth Century Bengal', Papyrus, Calcutta, November 2003.
- Sarkar, Chandiprasad. The Bengali Muslims: A Study in their Politicization 1912-1929. Calcutta: K.P.Bagchi & Company, 1991
- 'Selections from the Records of the Bengal Government, Papers Relating of the Establishment of the Presidency College of Bengal',

Bengal Military orphan Press, Calcutta, 1854, Appendix Series, page XXXVII.

- Sengupta. Parna, 'Pedagogy for Religion: Missionary Education and the Self Fashioning of Hindus and Muslims in Bengal', University of California Press, Berkeley, 2011.
- Shah. Mohammad, 'In Search of an Identity: Bengali Muslims 1880-1940', K.P.Bagchi & Company, Calcutta, 1996.
- Shukla. Sureshchandra and Kaul. Rekha (Ed.) Education, 'Development and Understanding', Sage Publication, Delhi, 1998.